www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আহমদ ছফা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com
লেখক অনেকেই হন, তবে মনীষী-লেখক আমরা তাঁদেরকেই বলি যাঁদের রচনায় একই সঙ্গে যুগ ও যুগোত্তরের স্বপ্ন ও সাধনা মূর্ত হয়ে ওঠে। সদ্যপ্রয়াত আহমদ ছফা ছিলেন আমাদের দেশের সেরকম এক বিরলদৃষ্ট মনস্বিতাসম্পন্ন লেখক। লিপিকুশলতার সঙ্গে মনীষার এমন মণিকাঞ্চন যোগ সচরাচর ঘটে না, সব লেখকের বেলায় তো নয়ই। আহমদ ছফার প্রজ্ঞা, মননশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসবোধ, ঐতিহ্য-সচেতনতা, মানবপ্রীতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁকে সাহিত্যিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আমাদের কালের এক চিন্তানায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর মৃত্যুজনিত শূন্যতা আমাদের মধ্যে এই বোধকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁর জীবদ্দশায় যাঁরা হয়তো অনেক বিষয়েই তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না এমনকি তাঁদের পক্ষেও তাঁর চিন্তার প্রাতিস্বিকতা ও প্রতিভার মৌলিকত্বকে স্বীকার না করে উপায় ছিল না। একইভাবে আজ ও আগামীদিনেও তাঁর রচনার শরণাপন্ন আমাদেরকে হতে হবে।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও আহমদ ছফা তাঁর অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিলেও, তাঁর মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল বোধ করি তাঁর প্রবন্ধগুলি। বর্তমান সংকলনের সম্পাদক যাকে আমাদের গত অর্ধ-শতাব্দীর চিন্তাচর্চার সেরা প্রসূন বলে উল্লেখ করেছেন।

সেই প্রবন্ধসম্ভার থেকে বাছাই করা ৪৪টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়ে আহমদ ছফার *নির্বাচিত প্রবন্ধ* বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের গর্বিত বোধ করছি। শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-রাজনীতি, ইতিহাস-অর্থনীতি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এ-বইয়ে। মাওলা ব্রাদার্স ইতিপূর্বেও এই মনীষী-লেখকের ক'টি বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের বাইরেও তাঁর সঙ্গে আমরা এক গভীর মমতা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁর মৃত্যুতেও আমরা মনে করি তাতে ছেদ ঘটেনি। তাঁর উপদেশ-পরামর্শ আজও আমাদের চলার পথের পাথেয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশসহ যে-পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি তার অংশ হিসেবে আমাদের এ দ্বিতীয় প্রকাশনাটি আশা করি পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk
My All Garbage

ISBN 984 410 292 8

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

উৎসর্গ

[illegible]

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আহমদ ছফা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

সম্পাদনা
মোরশেদ শফিউল হাসান

My All Garbage

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার,
শাহবাগ, ঢাকা।

পরীক্ষিত

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

১৩৬৬২৭
৯২৪.৭২
ইন্দ্র
ক-২

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© নূরুল আনোয়ার

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
সম্পাদনা
৮৪০ শলাশপুর, শনির আখড়া
ঢাকা ১২০৪

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম রোড, ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 292 6

AHMED SOFA : NIRBACHITA PRABANDHA (Selected Essays of Ahmed Sofa) Edetid by Morshed Shafiul Hasan. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qyuum Chowdhury. Price : Taka Three Hundred Only.

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আহমদ ছফার মরণোত্তর প্রকাশনা
এই বইটি আমরা তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
স্মৃতিতে উৎসর্গ করছি যিনি বিশ্বাস করতেন
ভাইটি তাঁর একদিন একজন 'আলাওল' হবে।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

ভূমিকা

আহমদ ছফার পরিচয় একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি ও অনুবাদক হিসেবে। বলা যায় তাঁর বেলায় এর কোনো একটি পরিচয়ই অন্যটির তুলনায় গৌণ বা তুচ্ছ করবার মতো নয়। তবে তাঁর মননশক্তির প্রধান স্বাক্ষর বিধৃত রয়েছে বোধ করি তাঁর প্রবন্ধে। অন্তত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে যে-দ্রোহী বা প্রতিবাদী চেতনা, যে-সোচ্চার ব্যক্তিত্ব তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে তার সাক্ষাৎ আমরা তাঁর প্রবন্ধে যেভাবে বা যতটা পাই, অন্যান্য রচনায় ঠিক সেভাবে বা ততটা পাওয়া যায় না। প্রাবন্ধিক হিসেবেও চিন্তারিক্ত, শুষ্ক, তথাকথিত পণ্ডিতি রচনা তিনি একেবারেই লেখেননি। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মতো প্রবন্ধগুলিও সংবেদনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, চিন্তার ঐশ্বর্যে গরীয়ান। আমাদের এই ভূখণ্ডের গত অর্ধ-শতাব্দীর চিন্তা-চর্চার শ্রেষ্ঠ প্রসূন হিসেবে অভিহিত করা যায় আহমদ ছফার প্রবন্ধসমূহকে। যেমন তাঁর সমকালে তেমনি আগামীতেও, এমনকি যাঁরা হয়তো অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহমত নন তাঁদেরকেও, আমাদের সময় ও সমাজকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের জন্য আহমদ ছফার প্রবন্ধের শরণাপন্ন হতে হবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক যাতে একটি গ্রন্থের পরিসরে আমাদের কালের এই চিন্তানায়কের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মোটামুটি পরিচয় লাভ করতে পারেন সে-উদ্দেশ্যেই *আহমদ ছফা : নির্বাচিত প্রবন্ধ* বইটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতার কথা জানা সত্ত্বেও, বাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হকের নির্বন্ধাতিশয্যে একরকম উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতোই আমাকে বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়। আহমদ ছফার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেও — এর মাধ্যমেও হয়তো একভাবে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে ভেবে — আমি শেষপর্যন্ত কাজটা করতে স্বীকৃত হই। যদিও এ-ধরনের সম্পাদনাকর্ম যতটা সময়, শ্রম, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আশা করে নানা কারণে তার সামান্যই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র ভূমিকায় আহমদ ছফার প্রবন্ধের মূল্য বা তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। তাছাড়া পাঠকের জন্য আহমদ ছফার মূল প্রবন্ধ পাঠের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিকল্প তা নয়। যেমন বর্তমান নির্বাচিত প্রবন্ধ-সংকলনটিও কখনো আহমদ ছফার সমগ্র রচনাবলি পাঠের বিকল্প হতে পারে না। জরুরি বিবেচনায় আমরা এখানে শুধু বর্তমান সংকলনের প্রবন্ধ-নির্বাচন ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি।

একই প্রবন্ধ আহমদ ছফার একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থে অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত-ভাবেই স্থান পেয়েছে। পুনর্মুদ্রণের অভাবে আগের বইটির দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা অন্য কোনো বিবেচনায় ওই বইয়ের দু'চারটি প্রবন্ধ তিনি তাঁর পরবর্তী নতুন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সম্ভবত একই বিষয় ও বক্তব্যের চর্বিতচর্বণ করে নতুন আরেকটি প্রবন্ধ লেখার চাইতে (যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তা-ও তাঁকে করতে হয়েছে, একেবারে করেননি তা নয়; বর্তমান সংকলনেও হয়তো পাঠক যার প্রমাণ পাবেন), সময়ের দাবি ও গুরুত্ব বুঝে, বরং পুরনো রচনাটিই পুনর্মুদ্রণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

আহমদ ছফা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ পৃথক পুস্তক বা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন। যেমন : *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* (১৯৭৮), *বাঙলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা* (১৯৮১), *শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (১৯৯৭)। এর মধ্যে, অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও, শেষোক্ত প্রবন্ধটিকে আমরা প্রধানত তার দীর্ঘতার কারণেই বর্তমান গ্রন্থের বাইরে রাখতে বাধ্য হলাম। প্রায় একই কারণে তাঁর বহুল-আলোচিত রচনা *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* কিংবা তার পরিবর্তিত সংস্করণের (১৯৯৭) ভূমিকা হিসাবে লিখিত *সাম্প্রতিক বিবেচনা* অংশটিকেও গ্রন্থভুক্ত করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হল। অবশ্য *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* এবং *বাঙলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা* এ দুটি বই ও পুস্তিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ভবিষ্যতেও এগুলোর নতুন সংস্করণ বেরুবার সম্ভাবনা কম। সে কারণেও, তাছাড়া রচনা দুটিকে আহমদ ছফা তাঁর পরবর্তী অন্য গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন (প্রথম রচনাটিকে অবশ্য আংশিক বর্জিতভাবে) বলেও, আমরা লেখা দুটিকে *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধের ভূমিকায় যে-কথাটা বিশেষ করে বলা দরকার তা হলো, প্রবন্ধ-নিবন্ধের সূক্ষ্ম তফাত করাটা তাঁর বেলায় বেশ কঠিন। অনেক সময় গল্পের মতো করে প্রসঙ্গের অবতারণা করে, কিংবা কোনো ঘটনার উল্লেখ বা অভিজ্ঞতার বিবরণী দিয়ে আলোচনা শুরু করে, ক্রমশ তিনি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন। সাময়িক প্রসঙ্গ বা চলতি ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর এরকম কিছু সাংবাদিকতামূলক রচনাও চিন্তার দীপ্তিতে, মননের ঐশ্বর্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধসম্ভারের পর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে। বর্তমান সংকলনের জন্যও আমরা আহমদ ছফার সেরকম কিছু রচনা গ্রহণ করেছি। তবে, তাঁর *উপলক্ষের লেখা* (২০০১) বইটি থেকেও কয়েকটি রচনা গ্রহণ করলেও, একেবারেই সাংবাদিকতাধর্মী বা স্রেফ স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধগুলোকে — তার অন্য মূল্য বা-ই থাক — আমরা সাধারণভাবে এ-সংকলনের বাইরে রেখেছি। প্রসঙ্গত আমরা পাঠকদের এ মর্মে আশ্বস্ত করতে চাই যে, প্রবন্ধ নির্বাচনের বেলায় বিষয়গুরুত্ব এবং রচনার মূল্য বা তাৎপর্যই আমাদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য ছিল। এক্ষেত্রে অন্তত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সম্পাদকের নিজস্ব মত বা দৃষ্টিভঙ্গি যাতে প্রাধান্য না পায় সে-ব্যাপারে আমরা আগাগোড়া সচেতন থাকতে চেষ্টা করেছি। ইতোমধ্যে আহমদ ছফার অগ্রন্থিত, এমনকি এ-যাবত অপ্রকাশিত, কিছু প্রবন্ধেরও সন্ধান আমরা পেয়েছি। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি তাঁর কোনো গ্রন্থে স্থান দেননি এমন রচনাকে *নির্বাচিত প্রবন্ধ* এর অন্তর্ভুক্ত না করাই শেষপর্যন্ত আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

'যেন', 'কেন', 'যেত', 'ক্ষুদ্রতর' — এ শব্দগুলোকে আহমদ ছফা সাধারণত "যেনো", "কেনো", "যেতো", "ক্ষুদ্রতরো" এভাবে লিখতেন। অবশ্য এ-ধরনের বানানের পেছনে তাঁর যে কোনো সুনির্দিষ্ট মত বা যুক্তি ছিল তেমন মনে হয় না। নিতান্ত অভ্যাসবশেই কিছু ক্ষেত্রে তিনি এই উচ্চারণানুগ বানানরীতি অনুসরণ করে গেছেন। এমনকি একই বই বা রচনায়ও বানানের সমতা রক্ষিত হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যতটা বুঝেছি, নিজের অনুসৃত এ বানানের ব্যাপারে তাঁর কোনো সংস্কার বা গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় যেখানে এ বানানরীতি বর্জন করে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে সেখানেও তিনি বিনা আপত্তিতে তা মেনে নিয়েছেন। এ-বইয়েও আমরা তাঁর উল্লিখিত বানানগুলো পরিহার করে মোটামুটি বাংলা বানানের চালু সর্বজনগ্রাহ্য রীতি (সর্বত্র প্রমিত নয়) অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

আহমদ ছফার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা। বিষয়বস্তু নির্বিশেষে তাঁর প্রবন্ধগুলোকেও যা সরস ও প্রাঞ্জল করেছে। লেখার ব্যাপারে যাকে বলে অতিমাত্রায় সতর্ক কারুশিল্পী, তিনি কখনো তা ছিলেন না। শেষদিকে বেশ কিছু প্রবন্ধ তো তিনি শ্রুতলিপির সাহায্যে অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছেন। তারপর একবার শুনে বা পড়েই তা ছাপতে দিয়েছেন। উপরন্তু প্রুফ দেখার ব্যাপারেও তিনি খুব পটু ছিলেন না। এসব কারণে তাঁর অনেক প্রবন্ধেই বাক্য বিন্যাসগত বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের দিক থেকে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করা যায় (যদিও পরিমাণে তা বেশি নয়)। অবশ্য তেমন ক্ষেত্রেও, একান্ত অপরিহার্য বোধ না হলে, আমরা কমই হস্তাবলেপন করেছি। আমাদের ধারণা, সচেতন পাঠক নিজস্ব বোধশক্তি দিয়েই সে-বাধাটুকু অতিক্রম করতে পারবেন।

একই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ কিংবা অন্য প্রবন্ধ-সংকলনে অন্তর্ভুক্তির সময় লেখকের কোনো কোনো প্রবন্ধে অল্পাধিক পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। এমনিতে তা খুব স্বাভাবিক — লেখক তাঁর জীবদ্দশায় প্রতি সংস্করণেই এরকম সংশোধন-পরিবর্তন-বর্জন-পরিমার্জনের সুযোগ নিতেই পারেন। তবে এক্ষেত্রে পাঠান্তরের ধরন দৃষ্টে এগুলোর কতটা লেখকের নিজের কৃত বা তাঁর অনুমোদিত আর কতটাই বা প্রুফ-রিডারের বিদ্যাবুদ্ধি ও উপস্থিত বিবেচনার ফল সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার পর আমরা (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) মোটামুটি মূল বইটির প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করেছি।

রচনা বা প্রকাশের কাল অনুযায়ী নয়, মোটামুটি আলোচ্য বিষয়ের মিল বা নৈকট্য বিবেচনায়ই আমরা এখানে প্রবন্ধগুলোকে সাজাতে চেষ্টা করেছি। যাতে পাঠক কোনো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখকের চিন্তাধারা, তার বিবর্তন এমনকি সম্ভাব্য বাঁক-ফেরাটাও অনুসরণ করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রেও প্রবন্ধগুলির নিচে আমরা তার রচনা বা প্রকাশকাল এবং প্রথম যে-গ্রন্থটিতে তা স্থান পায় ও আমরা যে-সংস্করণ থেকে তা নিয়েছি তার উল্লেখ করেছি। যদিও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে দু'একটি ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব হয়নি। আশা করি বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাগুলি আমরা দূর করতে পারব।

আগাগোড়া বইটির প্রুফ সংশোধনসহ প্রকাশনার সমস্ত ব্যাপারটি আমার হয়ে দেখাশুনা করেছেন তরুণ লেখক-গবেষক সাজ্জাদুর রহমান। আর অল্প সময়ে বইটি কম্পোজ করে দিয়েছেন মুজিব রহমান। এঁদের এবং মাওলা ব্রাদার্সের প্রকাশনা-কর্মী তপন দাশের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদিও বইটির সম্পাদনাগত যা-কিছু ত্রুটি তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এককভাবে আমার।

প্রয়োজনীয় বইপত্র যোগাড় করে দিয়ে সংকলনের কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন দিলওয়ার হোসেন ও সৈয়দ মুরাদ। শেষে যাঁর কথা না বললেই নয় তিনি আহমদ ছফার অত্যন্ত স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র নূরুল আনোয়ার। পরিবারের তরফ থেকে তাঁর অনুমতি পাওয়াতেই বলা বাহুল্য আমাদের পক্ষে এ-প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

পুনরুক্তি হলেও বলি, আহমদ ছফার সমগ্র রচনাবলি পাঠের মহামূল্য অভিজ্ঞতার সামান্যই হয়তো পাঠক এ-বইটি পাঠে লাভ করবেন। তারপরও এই গ্রন্থটি পাঠের ফলে নতুন পাঠক যদি আহমদ ছফা ও তাঁর রচনাবলির প্রতি আগ্রহী হন তবে তাতেই আমাদের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সফল জ্ঞান করব।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ মো. শ. হা.

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

C136-131173

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সূচিপত্র

বাঙালী মুসলমানের মন ১৩
বাঙলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা ৩৪
বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে ৬১
বাংলার সাহিত্যাদর্শ ৭৯
সংস্কৃতির জীয়নকাঠি ৯২
রবীন্দ্রনাথ ১১৬
নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ ১২২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র ১৩৬
জীবনানন্দ দাশ : তাঁর কাব্যের লোকজ উপাদান : সাম্প্রতিক নিরিখ ১৪২
নতুন করে তিতাস পাঠ ১৪
খোয়াবনামা উপন্যাস ১৫৩
স্মরণ : দিনেশচন্দ্র সেন ১৬০
জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথকেই জিজ্ঞেস করতাম ১৬৬
বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা ১৬৯
শেখ মুজিবুর রহমান ২১৪
তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান ২২৯
মওলানা ভাসানী ২৩৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : একটি সেন্টিমেন্টাল মূল্যায়ন ২৩৯
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শোভাযাত্রা ২৪৬
বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র ২৫৪
পলাশীর যুদ্ধের একটি দূরবর্তী প্রতিতুলনা ২৬৪
ভেবে দেখতে বলি ২৬৭
মূলত মানুষ ২৭২
লালন ফকির : হিন্দু কি যবন ২৭৮
অমৃতভাণ্ড মাইজভাণ্ডার ২৮৫

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময় ২৯২
গ্যোটে : প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রেক্ষিতে ২৯৪
গ্যোটে এবং রবীন্দ্রনাথ ২৯৮
বার্ট্রান্ড রাসেল ৩০৩
মাদ্রাসা শিক্ষার কথা ৩১১
আধুনিক আরবী-ফার্সী ও আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ৩১৯
অনানুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গ ৩২২
ফারাক্কা ষড়যন্ত্রের নানান মাত্রা ৩২৬
বঙ্গভূমি আন্দোলন, রাষ্ট্র ধর্ম, মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ ৩৩২
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া : কতিপয় বিবেচনা ৩৫১
অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন ৩৬৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস : একটি রাজনৈতিক পাপ ৩৭১
ভারতীয় বই এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রসঙ্গে ৩৮৪
ভারতে বিজেপির উত্থান এবং তারপর ৩৯২
ধনতন্ত্রের নব পর্যায় ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্ভাবনা ৩৯৫
বিকল্প উন্নয়ন কৌশল ৪০২
ধনতন্ত্রের ভবিষ্যত কি? ৪০৬
বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণী এবং সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গ ৪১০
আমলারাই নিজেরাই একটি পার্টি ৪১৪

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk
My All Garbage
www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

বাঙালী মুসলমানের মন

'শহীদে কারবালা' পুঁথিতে কবি কারবালার যুদ্ধে শহীদ হজরতের দৌহিত্র হজরত হোসেনের মস্তকসহ ঘাতক সীমারের দামেস্ক যাত্রা অংশটি রচনা করতে যেয়ে তাঁর কল্পনাশক্তির অবাধ ব্যবহার করেছেন। কবি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন : কারবালা থেকে দামেস্ক যাচ্ছে সীমার, মনে অপার আনন্দ, এখন হজরত হোসেন বিগতজীবন, কাঁধের বর্শার অগ্রভাগে শোভা পাচ্ছে তাঁর কর্তিত মস্তক। লক্ষ টাকা পারিতোষিক লাভ করার পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধক অন্তর্হিত। নিশ্চয়ই বাদশাহ নামদার এজিদ তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হলো পথে। সে রাতের জন্য সীমারকে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। গৃহকর্তার নাম পুঁথিলেখকের জবানীতে আজর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তার ওপর আবার ব্রাহ্মণ। সেই রাতে হজরত হোসেনের ছিন্ন মস্তক এক অলৌকিক কাজ করে ফেলল। গৃহকর্তা আজর, তাঁর ব্রাহ্মণী, সাতপুত্র এবং সাত পুত্রবধূ এক সঙ্গে কাটা মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

পুঁথি-পুরাণের জগতে এরকম অলৌকিক কাণ্ড প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। ওই জাতীয় সাহিত্যের বেশির ভাগেরই একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মের মহিমা কীর্তন করা। সেজন্যে পুঁথি-পুরাণের নায়কদের চরিত্রে সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের ক্ষমতা এবং গুণগ্রাম আরোপ করাটাই বিধি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক প্রোপাগান্ডা লিটারেচারের সঙ্গে পুঁথিসাহিত্যের একটা সমধর্মিতা আবিষ্কার করা খুব দুরূহ কর্ম নয়। শুধু পুঁথিসাহিত্যে কেন, 'বৌদ্ধ জাতক' থেকে শুরু করে, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'মঙ্গলকাব্য' সমূহেরও উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই রকম। ঐ জাতীয় সাহিত্যে সচরাচর যে অবাস্তব-অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে, ঘেঁটে একটা তালিকা সংগ্রহ করলে ছিন্ন মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা খুব আশ্চর্য ঠেকবে না। পুঁথি-পুরাণের রচয়িতাদের পাল্লায় পড়ে বনের হিংস্র বাঘ, শিংঅলা হরিণ পর্যন্ত মানুষের ভাষায় কথা বলে, দুঃখে রোদন করে, কাটা মাথা তো কোন্ ছার! সুতরাং ধরে নেয়া ভালো পুঁথি-পুরাণের জগতে জাগতিক নিয়মের পরোয়া না করে লোমহর্ষক ঘটনারাজি একের পর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এক অবলীলায় ঘটে যেতে থাকবে। রোমাঞ্চকর হিন্দি ছবির দর্শকের মতো পাঠকের রুদ্ধশ্বাসে দেখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। যেমন : 'লাখে লাখে সৈন্য চলে কাতারে কাতার/গণিয়া দেখিল মর্দ চল্লিশ হাজার।' এ জাতীয় পংক্তি পাঠ করার পরেও বুদ্ধিমান সিরিয়াস মানুষের মনে কোনো জিজ্ঞাসা-চিহ্ন জাগে না। অর্থাৎ সকলেই ধরে নিয়ে থাকেন, পুঁথি-পুরাণের জগতে এ জাতীয় ঘটনা হামেশা ঘটতেই থাকবে। এ নিয়ে মনকে কষ্ট দেওয়া খামোখা পণ্ডশ্রম। কাণ্ডজ্ঞানকে ফাঁকি দেয় এ জাতীয় এন্তার ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে হবে, সে ব্যাপারে আগাগোড়া প্রস্তুতি গ্রহণ করেই পুঁথি-পুরাণের জগতে প্রবেশ করা উত্তম।

এরকম অভিজ্ঞতা বোধ করি অনেকেরই হয়ে থাকে। রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনার অতি সামান্য খণ্ডাংশ মুহূর্তেই ধাক্কা দিয়ে পাঠককে সচকিত করে তোলে। 'শহীদে কারবালার' বর্ণিত এই ঘটনাটিও সেই জাতীয় একটি। সীমার কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে আজর নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণের দেখা পেয়েছিল এবং তার বাড়িতে রাতের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। এই অংশটি পাঠ করার পরে মনের ভেতর একটি ঘোরতর অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সাধারণ একান্ত বাস্তব ঘটনাটিকে পাঠকের মনের জারক রস হজম করে নিতে পারে না। মনের তলাতে শিলাখণ্ডের মতো পড়ে থাকে। তিনি যদি তার বদলে ইরাকী, তুরানী, ইহুদী, খ্রিষ্টান, তাতার, তুর্কী, ইত্যাদি যে-কোনো জাতির যে-কোনো ধর্মের মানুষের সঙ্গে সীমারের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতেন, তাহলে পাঠকের মনে কোনো প্রশ্নই জাগত না। তিনি কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণকে আমদানী করলেন কোথেকে? একজন ব্রাহ্মণ কারবালা দামেস্কের মাঝপথে দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাটা মস্তকের কাছে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বসবাস করছিল, এইখানে মন ভয়ঙ্কর রকম বেঁকে বসে। শুধু 'শহীদে কারবালা' নয়, 'জঙ্গনামা' পুঁথিটার ওপর দৃষ্টি বুলোলেও এই রকম অজস্র ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'জঙ্গনামা'তে পুঁথিলেখক হজরত আলীকে দিয়ে কাফের ও বেদীনদের ওপর এমন চোটপাট চালিয়েছেন যে গদার আঘাতে থেতলানো, তলোয়ারের ঘায়ে কাটা পড়া কিংবা শেষ পর্যন্ত পবিত্র ধর্ম ইসলামের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারো রক্ষা নেই। আমীর হামজার শৌর্যবীর্য অবলম্বন করে যে পুঁথি রচিত হয়েছে তা পড়লে লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অনেক চমৎকার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রায়শ দেখানো হয়েছে, মহাবীর হামজা এমন শক্তিশালী যে তিনি দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে কাফেরদের সদলবলে পরাস্ত করছেন আর তাঁদের ঘরের সুন্দরী নারীদের পাণিপীড়ন করে চলেছেন তো চলেছেনই। কাফের এবং হিন্দু পুঁথিলেখকের কাছে অনেকটা সমার্থক। অনেক সময় কাফের বলতে হিন্দু এবং হিন্দু বলতে কাফের ধরে নিয়েছেন। সে যা হোক, আমীর হামজা এমন মস্ত বড় বীর যে তিনি দৈত্যের দেশ কোকাফে গমন করে অপার শৌর্য বলে দৈত্যদের দমন করে বীর বিক্রমে ফিরে এসেছেন। হযরত আলীর কল্পিত পুত্র মুহম্মদ হানিফার বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করে সোনাভান,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জৈগুনবিবি ইত্যাদি যেসব পুঁথি লেখা হয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সেগুলো আরও মজার। সে সকল পুঁথিতে দেখা যায় যে, মুহম্মদ হানিফা 'দুলদুল' ঘোড়ায় দুইধারী তলোয়ার ঘুরিয়ে দেশ থেকে দেশে নব অশ্বমেধযজ্ঞ করে বেড়াচ্ছেন। পথে যেসব রাজ্য পড়ছে সবগুলো নারীশাসিত, এই নারীদের সকলেই সুন্দরী: সৎ ব্রাহ্মণ-কন্যা। অবিবাহিতা এবং প্রচণ্ড রকমের বীরাঙ্গনা। আর সকলের এমন এক ধনুকভাঙা পণ যে, বাহুবলে যে পুরুষ হারাতে পারবে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিয়ে বসতে মোটেই রাজী নন। মুহম্মদ হানিফা সংবাদ শুনে হাওয়ার বেগে সে দেশে দেখা দিচ্ছেন, রণংদেহি হুংকার তুলছেন। বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণ-কন্যাদের বাহুবলে পরাস্ত করে ইসলাম ধর্ম কবুল করিয়ে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছেন। ব্যাপারটি এতই পৌনঃপুনিকভাবে ঘটেছে যে মুহম্মদ হানিফাকে মনে হবে উনবিংশ শতাব্দীর একজন কুলীন হিন্দু-সন্তান, বিয়ে করে বেড়ানোই তাঁর একমাত্র পেশা। মুহম্মদ হানিফা মস্ত বীর হলে কি হবে, অধিক সংখ্যক রূপসী স্ত্রীর সঙ্গে রতি-রণ এবং ময়দান-রণ দুই-ই একসঙ্গে করতে হলে মাঝে মাঝে এই সমস্ত ভয়ংকরী বীরাঙ্গনাদের হাতেও নাকাল হতে হয়। সেকালে বীরাঙ্গনাদের পরাজিত করতে পারলে স্বামী আর পরাজিত হলে থাকতে হত দাস হয়ে। সুতরাং হানিফারও দুর্দশার অন্ত থাকে না। সংবাদ যায় হজরত আলীর কাছে। বীর পুত্রের এসব কীর্তিকলাপ তিনি বিলক্ষণ সমর্থন করেন: আর হৃদয়ে অপত্যস্নেহও প্রচুর। হায়দরী হাঁক হেঁকে রণ-দামামা বাজিয়ে পুত্রের সাহায্যার্থে ছুটে আসেন। পুত্রকে শিখিয়ে পড়িয়ে একেবারে লায়েক করে সেই সমস্ত বিক্রমশালী রমণীদের হার মানতে বাধ্য করান। তারপরে যুদ্ধকার্য সাঙ্গ হলে পিতা-পুত্র দুজনে একই সঙ্গে দুটো বিবাহ করেন। পিতা যান দেশে ফিরে আর পুত্রবর প্রেমতৃষ্ণায় মাতাল হবে মরুভূমির ডনজুয়ানের মতো নতুন নারী-রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে সফর করেন।)

ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর এবং সাধু পুরুষদের নিয়ে যে সমস্ত পুঁথিপত্র লেখা হয়েছে তাতে তাঁদের ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় বিস্তর আদি রসাত্মক ব্যাপার-স্যাপার স্থান লাভ করেছে। যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্র পুঁথিলেখকরা তাঁদের বিষয়ের উপজীব্য করেছেন, তাতে করে চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্য সম্পূর্ণভাবে খেলাপ করে নিজেদের মনের রঙে রাঙিয়ে একেবারে জবুথবু করে হাজির করেছেন। কল্পিত চরিত্র হলে তো কথাই নেই, আগাগোড়া রঙ চড়িয়ে রঙিলা না করে ছাড়েননি। তা করতে যেয়ে পুঁথিলেখকেরা পরিবেশ, সমাজ এবং সামাজিক সংঘাত, মূল্যচেতনা দুই হাতেই দেদার ব্যবহার করেছেন।

যেমন ধরা যাক, কারবালা থেকে দামেস্কে যাওয়ার পথে কোনো ব্রাহ্মণের বসবাসের বিষয়টি। তা তো একরকম জানা কথাই যে কোনো ব্রাহ্মণের সেখানে নিবাস থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, পুঁথিলেখকের সেটি জানা থাকা চাই তো। কারবালা-দামেস্কের মাঝপথে নয়, গোটা আরবদেশে ব্রাহ্মণ না থাকুক তাতে পুঁথিলেখকের কি আসে যায়! এই বাংলাদেশে তো ব্রাহ্মণ আছে! আর আমাদের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পুঁথিলেখক ভদ্রলোকটি তো বাঙালী এবং তিনি ব্রাহ্মণ জাতটার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। সুতরাং অনায়াসে ব্রাহ্মণকে কারবালা-দামেস্কের মাঝপথে বসিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ সপরিবারে তাঁকে দিয়ে কলেমা পড়িয়ে মানসিক ঘৃণার মানসিক প্রতিশোধ নেয়া যায় এবং নিয়েছেনও।

ইতিহাসে হজরত আলীকে কম বিচক্ষণ বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তিনি মানুষ হিসেবে উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর চরিত্র এমন নির্মল সুন্দর ছিল যে এখনো পর্যন্ত তাঁর গুণগ্রাম সর্বসাধারণের অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁথিলেখক তাঁকে শক্তিমন্ত এবং বীর দেখাতে যেয়ে পশুশক্তিতে বলীয়ান হৃদকম্প সৃষ্টিকারী একজন প্রায় নারীলোলুপ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

হজরত হামজা মদীনাতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং হিন্দা নাম্নী জনৈকা কোরেশ রমণী যে তাঁর রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড চিবিয়ে খেয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। তিনি জীবনে মক্কা-মদীনার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। পুঁথিলেখক তাঁকে শতাধিক বছর পরমায়ু দান করেছেন, কমপক্ষে অর্ধশত পত্নীর স্বামী, সে অনুপাতে পুত্র- পৌত্রাদি উপহার দিয়েছেন। আমির হামজা হাজার খানেক যুদ্ধে বিজয়ী বীর, দেশ-দেশান্তরে তাঁর তো অবারিত গতায়ত, এমনকি দৈত্যের দেশ কো-কাফে যেয়েও অসমসাহসিক কাজ সমাধা করে এসেছেন। এতেও পুঁথিলেখক তৎকালীন সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং শিল্পরুচির ব্যবহার করেছেন। হিন্দু সমাজের বীরেরা যদি পাতাল বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে মুহম্মদ হানিফার মূল কাণ্ড কিছু নেই বলেই তো সুবিধে। কল্পনা যেভাবে ইচ্ছে বিচরণ করতে পেরেছে। হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে ষোল শত গোপবালা নিয়ে লীলা করতে পারেন, মুহম্মদ হানিফার কি এতোই দুর্বল হওয়া উচিত যে মাত্র এ কয়টা ব্রাহ্মণ কন্যাকে সামলাতে পারবেন না!

২

এই ধরনের দো-ভাষী পুঁথিসমূহের বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে পড়বেই। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি হলো : প্রথমত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্যই এই সকল কাহিনী লেখকেরা বিবৃত করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নায়কের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং অসমসাহসী ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে সত্যধর্মের বিজয়ই স্ফুরিত হচ্ছে, এটা স্বদেশবাসীর কাছে স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করাই বেশিরভাগ লেখকের মনোগত অভিপ্রায়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদক যেমন বলেছেন :-'মহাভারতের কথা অমৃত সমান/কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।' তাঁর অনুকরণ করে পুঁথিলেখকও পাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে লোভনীয় আবেদন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রেখেছেন। একটা দৃষ্টান্ত : 'অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত/যেবা শুনে বাড়ে তার বারেক হায়াত।' এ জাতীয় হৃদয়-মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী আশাব্যঞ্জক পংক্তিমালা পুঁথিগুলোর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং বিশ্বাস করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত করা এবং ইসলাম ধর্মাশ্রিত মানুষের হাতে যে সাংসারিক সম্পদ, সুন্দরী নারী আপনাআপনি এসে পড়ে এবং পরকালে অনন্ত সুখভোগের লীলাস্থল বেহেশত তাঁদের জন্য অবধারিত, আর শত্রুদের ওপর তাঁদের বিজয় অর্জন সে তো এক রকম স্বাভাবিকই — এ সকল বিষয় প্রমাণ করাই ছিল পুঁথিলেখকদের অধিকাংশের মনের প্রাথমিক অভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত, এই পুঁথিসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে একটা জিনিশ বারবার চোখে পড়তে থাকে। যে সময়ে ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা, ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুঁথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কী আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুঁথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তার ফলে তাদের মনেও নতুন এক ধরনের জনপ্রিয় বীরশ্রেণী জন্মলাভ করতে আরম্ভ করে। পুরনো সমাজের যে সকল নায়ক, খলনায়ক — রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, ভীম, অর্জুন, হনুমান, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, দ্রৌপদী ইত্যাদির কাহিনীতে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে মুসলমান সমাজ মনোনিবেশ করতে রাজী ছিল না। এই নূতন সমাজের নিজস্ব নায়ক চাই, চাই নিজস্ব বীর। যাঁদের জীবনকথা আলোচনা করে দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ভরসা পাওয়া যায়, যাঁরা তাদের আপনজন হবেন এবং একটি আদর্শায়িত উন্নত জীবনের বোধ সৃষ্টি করতে পারবেন। এই সকল কারণের দরুণ হযরত মুহম্মদ, হজরত আলী, বিবি ফাতেমা, হাসান-হোসেন, বীর হানিফা, আমির হামজা, হাতেমতাই, রুস্তম ইত্যাদি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নবজন্ম লাভ করে। তাঁদের জন্ম-প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি মুখ্য বিষয় মিলিমিশে গেছে। এই ঐতিহাসিক মহামানবদের যে সকল কীর্তি-কাহিনী লোকশ্রুতি-জনশ্রুতির আকারে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেছে (পুঁথিলেখকদের অধিকাংশই আরবী ফার্সী ভাষা জানতেন না এবং ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না) তার সঙ্গে মহামানব এবং সামাজিক নায়কদের সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা তৎকালীন সমাজে বলবৎ ছিল তার সংশ্লেষ ঘটেছে। তাই ইসলামের দিকপালদের নিয়ে রচিত পুঁথিসাহিত্যে যেমন চরিত্রের ঐতিহাসিকতাকে পাওয়া যাবে না, তেমনি বাঙালী সমাজের প্রচলিত বীরদের সম্বন্ধে যে ছকবাঁধা ধারণা বর্তমান ছিল তাও পুরোপুরি উঠে আসেনি। দুটি মিলে একটি তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পুঁথি সাহিত্য হলো দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। মুসলমান জনগণের মতো হিন্দু জনগণও আরেক রকমভাবে এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়েছেন, মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ঘটেছে তার প্রকাশ।

এই নবসৃষ্ট সাহিত্যকর্ম সমূহের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে নূতন সামাজিক চাহিদার জবাব রয়েছে। জনগণ যে ধরনের রসালো কাহিনী শুনতে আগ্রহী সে ধরনের কাহিনীই লেখকেরা পরিবেশন করেছেন। মুসলমান এবং হিন্দু সাহিত্যস্রষ্টারা আপনাপন সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু কবিদের অনেকগুলো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত আক্রমণমুখী বর্ধিষ্ণু মুসলমান সমাজের সঙ্গে সংঘাতে হিন্দু সমাজের তলা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনটাই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা। হিন্দু কবিরা এই সামাজিক ভীতির সঙ্গে একাত্মবোধ না করে পারেননি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখনই কোনো নতুন সামাজিক পরিবর্তন এবং নবতর মূল্যচেতনা সমাজের অভ্যন্তর থেকে সূচিত হয়েছে, তার প্রাণবস্তুটি সাহিত্য-স্রষ্টাদের কাছে আপনা থেকেই কথা করে উঠেছে। আর মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজের যে সামাজিক রূপান্তর ঘটছিল তাতে সংস্কৃতিগত ব্যবধান ছিল না, নিজেদের সংস্কৃতিকে নিজেদের প্রয়োজনে নতুনভাবে রূপদান করছিলেন। যেখানে বিষয় এবং বিষয়ীর সঙ্গে কোনো দূরত্ব বা বিরোধ নেই। সমাজের পূর্বার্জিত সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহকে পূর্ণবিশ্বাসে আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মুসলমান পুঁথিলেখকদের তুলনায় হিন্দু কবিদের রচিত সাহিত্যকর্মে যে অধিক মানসিক পরিশ্রুতি, পঠনপারিপাট্য এবং কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ তাঁদের সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে হয়নি।

তুলনামূলক বিচারে মুসলমান পুঁথিলেখকদের হাতে সে পরিমাণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধে ছিল না। প্রথমত তাঁদেরকে সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আসল স্বরূপ, তার দার্শনিক প্রতীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে মুসলমানদের আরবী-ফার্সীতে লেখা গ্রন্থসমূহের বদলে লোকশ্রুতি এবং দূরকল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। একথাও সত্য যে পুঁথিলেখকদের অধিকাংশেরই আরবী-ফার্সী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া হিন্দুদের দেব-দেবী এবং কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকাদের প্রতি মনে মনে একটি বিদ্বেষের দুরস্মৃতিও সক্রিয় ছিল। কেননা এই দেব-দেবীর পূজারীদের অত্যাচার এবং ঘৃণা থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমান পুঁথিলেখকেরা তাঁদের রচনায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন, এই দেব-দেবীর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকার প্রভাব থেকে তাঁদের মন মুক্ত হতে পারেনি। তাই তাঁরা সচেতনভাবে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই দেব-দেবীদের প্রতিস্পর্ধী নায়ক এবং চরিত্র যখন খাড়া করেছেন, এই সৃষ্ট চরিত্র সমূহের মধ্যেই দেব-দেবী নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। হজরত মুহম্মদ, হজরত আলী, আমির হামজা, মুহম্মদ হানিফা, বিবি ফাতেমা, জৈগুন বিবি এই চরিত্রসমূহ বিশ্বাসে এবং আচরণে, স্বভাবে-চরিত্রে যতদূর আরব দেশীয়, তার চাইতে বেশি এদেশীয়। তাঁদের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা এবং হৃদয়াবেগ কাব্যলেখক চাপিয়ে দিয়েছেন তা একান্তভাবেই বঙ্গদেশে প্রচলিত দেব-দেবীর অনুরূপ। বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়তো অতোটা মনে হবে না। কিন্তু গভীরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে তা ধরা না পড়ে যায় না। বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা সাহিত্যের দুই মুখ্য উপাদান। বিশ্বাস অভিজ্ঞতার নবরূপায়ণে সাহায্য করে। আলোকিত বিশ্বাস আলোকিত রূপায়ণ ঘটায় এবং অন্ধবিশ্বাস অন্ধ রূপায়ণ। মুসলমান পুঁথিলেখকদের বিশ্বাসের যে শক্তি তা অনেকটা অন্ধবিশ্বাস, কেননা ইসলামী জীবনবোধসমৃদ্ধ বিমূর্ত কোনো ধারণা তাঁদের ছিল না। তাই তাঁদের শিল্পকর্ম অতটা অকেলাসিত। প্রতি পদে কল্পনা হোঁচট খেয়েছে বলে তাঁদের রচনার শক্তি নেই। আলাওল, দৌলত উজীর প্রমুখ মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করতে পেরেছেন। তার কারণ তাঁদের কতিপয় সুযোগ ছিল। আলাওল নিজে আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যের স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ বোধ ছিল। তদুপরি তিনি রাজসভায় বসে কাব্য রচনা করেছিলেন। রাজসভায় যে রুচি-চর্চা এবং জীবনাদর্শের আলোচনা চলতে পারে, জনসভাতে তা চলে না। একই কথা দৌলত উজীর সম্বন্ধেও কম-বেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু যে সকল মুসলমান কবিকে জনগণের ধর্মবোধ পরিতৃপ্ত এবং রসপিপাসা মিটাবার জন্য কলম ধরতে হয়েছিল, সেখানে কবি কী বলতে চান, কাদের জন্য বলতে চান এবং যা বলছেন তা অনুধাবনযোগ্য হচ্ছে কিনা এইসব বিবেচনার বিষয় ছিল।

৩

মুসলমান সমাজের কোন্ অংশের সামাজিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এই পুঁথিসমূহ লেখা হয়েছিল এবং কারা লিখেছিলেন, তাঁদের বিদ্যাবত্তা এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কতদূর ছিল — তলিয়ে বিচার করলে কতিপয় বিষয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। মূলত বাঙালী সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, অধিকতর খোলসা করে বলতে গেলে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ, তাঁদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার। তাছাড়া রোসাং ইত্যাদি রাজদরবারে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে চর্চা হয়েছে, তাতে যে সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক আশাতিরিক্ত সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, জনগণের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে তার সংযোগ খুব নিবিড় কিংবা গভীর ছিল না। রাজসভার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিদ্যাবত্তা, মার্জিত রুচি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ধরনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাওল প্রমুখ শক্তিমন্ত কবির কাব্য-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আর কবিরাও ছিলেন বহুদর্শী পণ্ডিত। আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃতি ভাষাতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁদের সাধনার মধ্যে কাব্যের ঔচিত্যবোধ জখম হয়নি বটে, কিন্তু জনগণের জীবনধারার সমতলে এসে চাহিদামতো কাব্যরচনাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনগণের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কহীন জ্যোৎস্নাভুক সৌন্দর্যবিলাসী ছিলেন বলেই তাঁদেরকে কাব্যের সামাজিক আদর্শ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। আরবী-ফার্সী থেকে যে কোনো কাহিনী অনুবাদ করে রসসমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত এবং তাঁদের সে যোগ্যতায় ঘাটতি ছিল না।

দো-ভাষী পুঁথিলেখকদের সমস্যা ছিল ভিন্নরকম। তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে জনগণের শিল্পী এবং শিক্ষক। পুঁথিসমূহের অনেকগুলো রচনার পেছনে সক্রিয় ছিল সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূর্ণভাবে পালন করার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। যে সামাজিক আদর্শটি তাঁরা প্রচার করতে যাচ্ছিলেন সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং উপলব্ধি। যে সমাজে এই আদর্শ প্রচার করেছিলেন সেই বিশেষ সমাজটির লোক-সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনার মান; বিমূর্তভাবে নতুন সামাজিক আদর্শ ধারণ করার মতো মানসিক সাবালকত্ব অর্জন করেছে কিনা সে সম্বন্ধে একটা প্রাক-ধারণা এবং পূর্বের শিল্পাদর্শের অগ্রসর ধারাটির বিষয়ে তাঁদের উপযুক্ত জ্ঞান আর সেই ধারাটিকে সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা ছিল কিনা। এই তিনটি মৌল বিষয়ের কোনোটিই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁথিলেখকদের সপক্ষে ছিল না। সামাজিক বীর এবং নায়ক সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহিমা কীর্তন করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের বেশিরভাগ কাব্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান কিছু লোকশ্রুতি, জনশ্রুতি, আউলিয়া দরবেশদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত ছিল। আরবী-ফার্সী ভাষায় দখলের অভাবে অধিকাংশেরই মনে ইসলাম বলতে একটা পাঁচমিশেলী ঝাপসা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যে সেই ধারণারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাছাড়া যে সমাজের লোক-সাধারণের কাছে নতুন ধর্মের সারল্য এবং সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করছিলেন, সেই সমাজটির মানসিক পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত ছিল। কেননা নিম্নবর্ণের অধিকাংশ হিন্দুই যুগ যুগ ধরে আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিপীড়িত হওয়ার ফলে মুক্তির আশায় প্রথমে বৌদ্ধ এবং পরে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। নতুন ধর্ম গ্রহণ ছিল একটি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ। সুতরাং পূর্ববর্তী সমাজেও যে গরীয়ান একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, তাঁরা তার মর্মমধু পান করা থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আবার ইসলামী সমাজ এবং সংস্কৃতির যে একটা উন্নত উদার আদর্শ ছিল ঐতিহাসিক কারণে তাও তাঁরা অধিগত করতে পারেননি। এই অনগ্রসর জনসমাজ ইসলামের নামে যে সকল কাহিনী চাইতেন,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সেই রকম কাহিনীই তাঁদের শোনাতে হত। আর পুঁথিলেখকরা ছিলেন এই জনগণেরই কণ্ঠ।

এই সকল কারণে বাঙালী মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যে উদ্ভট রসের অতি বেশি ছড়াছড়ি। হিন্দু মহাকাব্য এবং পুরাণসমূহের বীর-বীরাঙ্গনাদের চরিত্রের অপভ্রংশ মুসলিম কবিদের সৃষ্ট বীরদের মধ্যে নতুন করে জীবনলাভ করেছে। তাই পুঁথিসাহিত্যে অগ্রসরমানতার চাইতে প্রতিক্রিয়ার জের অধিক। মনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। এর পেছনে একগুচ্ছ ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। মুসলমান পুঁথিলেখকেরা সচেতনভাবে এক সামাজিক আদর্শ, একটি শিল্পাদর্শের বদলে আরেকটি শিল্পাদর্শ নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন শিল্পাদর্শটির চেহারা কিরকম হবে, জীবনের কোন্ মূল্যচেতনার বাহন হবে, অতীতের কতদূর গ্রহণ করবে, কতদূর বর্জন করবে, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা অনেক সময়ে বহিরঙ্গের দিক দিয়ে নতুন সৃষ্টি করলেও, আসলে তা ছিল গলিত অতীতের রকমফের। উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, পরিচ্ছন্ন চিন্তার বদলে ভাবাবেগই তাঁদের শিল্পদৃষ্টিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক সময়ে এই মুসলমানের পূর্বপুরুষেরা যে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, এই অপমানজনক দূরস্মৃতি বাইবেলের 'অরিজিনাল্ সীন' বা আদি পাপের ধারণার মতো তাঁদের মনে নিরন্তর জাগরূক থেকেছে। মুসলমান রচিত পুঁথি-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ। সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে হলে এই অপমানজনক দূরস্মৃতির বিষয়টি স্মরণে রাখার প্রয়োজন আছে। মুসলিম শাসনের অবসানের পর এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া আরো গভীর এবং অন্তর্মুখী রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রতিক্রিয়ার জের বাঙালী মুসলমান সমাজে এত সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেনের সুবিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটিতেও 'শহীদে কারবালা' পুঁথির ব্রাহ্মণ আজরকে একই চেহারায়, একই পোশাকে, একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সময়ের পালাবদলের ব্যাপারটি এই অত্যন্ত শক্তিধর লেখকের মনে সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে পারেনি। পুঁথিলেখকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে তিনিও বরণ করে নিয়েছেন।

৪

যেহেতু নবদীক্ষিত মুসলমানদের বেশিরভাগই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু, তাই আর্য সংস্কৃতিরও যে একটা বিশ্বদৃষ্টি এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে একটা প্রসারিত বোধ ছিল, বর্ণাশ্রম ধর্মের কড়াকড়ির দরুণ ইসলাম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে সে সম্বন্ধেও তাঁদের মনে কোনো ধারণা জন্মাতে পারেনি। পাশাপাশি ইসলামও যে একটা উন্নততর দীপ্ত ধারার সভ্যতা এবং মহীয়ান সংস্কৃতির বাহন হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সামাজিক বিপ্লব সংসাধন করেছিল, বাঙালী মুসলমানের মনে তার কোনো গভীরাশ্রয়ী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রভাবও পড়েনি বললেই চলে। প্রথমত, ভারতে ইসলাম প্রচারে মধ্যপ্রাচ্যের সুফী দরবেশদের একটা গৌণ ভূমিকা ছিল বটে, কিন্তু লোদী , খিলজী এবং চেঙ্গিস খানের বংশধরদের সাম্রাজ্য বিস্তারই ইসলাম ধর্মের প্রসারের যে মুখ্য কারণ, তাতে কোনো সংশয় নেই। এই পাঠান-মোগলদের ইসলাম এবং আরবদের ইসলাম ঠিক একবস্তু ছিল না। আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে বাগদাদে, ফাতেমীয় খলীফাদের আমলে উত্তর আফ্রিকায় এবং উমাইয়া খলীফাদের স্পেনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা কোনদিন প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল, ভারতের মাটিতে সে যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চা একেবারেই শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া, সংগীতকলা, স্থাপত্যশিল্প, উদ্যান রচনা এবং ইরান, তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশের শাসনপদ্ধতি এবং দরবারী আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেনি।

তদুপরি, এই ভারতবর্ষের লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলে ইসলামের যেটুকু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে, বাঙলা মুলুকে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছাতে পারেনি। যে মুসলিম শাসকশ্রেণীটি নানা সময়ে বাঙলা দেশ শাসন করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদেশী। রক্ত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনেকটা ইউরোপীয় শাসকদের মতো সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তাঁরা বসবাস করতেন এবং নতুন পোশাক-আশাক, ফ্যাশান ইত্যাদির জন্যে দিল্লী কিংবা ইরানের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন। এই উঁচুকোটির মুসলিম শাসকবর্গ যাঁদের হাতে অধিকাংশ শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তাঁরা স্থানীয় জনগণের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন না। এই উঁচুকোটির মুসলমান প্রশাসকেরা এদেশীয় যে শ্রেণীটির সহায়তায় বাঙলা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন স্থানীয় উঁচু বর্ণের বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কিংবা বৈদ্য শ্রেণীর লোক। যখনই প্রয়োজন পড়েছে কিংবা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আনুগত্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জেগেছে তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর থেকে খেলাত এবং পদবী বিতরণ করে আরেকটি নেতৃশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। 'খাসনবীস', 'মহলানবীস', 'দেওয়ান', 'রায়রায়ান', 'বখসী', 'মুন্সী' 'দস্তিদার' ইত্যাদি পদবীতেই তার প্রমাণ মেলে। বাঙলার স্থানীয় মুসলমানেরা কদাচিৎ বিদেশী মুসলমান শাসকদের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক কর্মে সহায়তা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার কারণ ছিল, একটি রাজশক্তির সঙ্গে সহায়তা করার জন্য যে পরিমাণ নিরাপদ আর্থিক ভিত্তির প্রয়োজন বাঙালী মুসলমানদের তা ছিল না। মুসলিম রাজশক্তি এই দেশের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অতি সামান্যই রূপান্তর এনেছিল। তাঁরা অনেকটা নির্বিবাদেই পূর্বতন সমাজ-কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিবর্তন ততটুকুই করেছিলেন, যতটুকু তাঁদের প্রয়োজন। অর্থাৎ পূর্বেকার শাসক নেতৃশ্রেণীর শূন্যস্থানটি তাঁরা পূর্ণ করেছিলেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, পরেও সেই একই ব্যবস্থা চালু থেকেছে। তার মধ্যে কোনো মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন তাঁরা আনতে পারেননি।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পরেও স্থানীয় মুসলমানরা ইংরেজ আমলের দিশী খ্রিস্টানদের মতো একটা উন্মত্ত গর্ববোধ ছাড়া ইসলামী কিংবা আর্য সংস্কৃতির কিছুই লাভ করতে পারেননি। তাই খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মুসলমান আমলেও যাঁরা শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের উঁচু বর্ণের লোক। বাঙালী মুসলমানদের অবস্থার, পেশার এবং রুচির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁরা কতিপয় মোটা অভ্যাস বর্জন করে কতিপয় মোটা অভ্যাসকে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সংখ্যাগত দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন এবং রাজশক্তি সময়ে-অসময়ে তাঁদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন, এই সকল কারণের দরুণ তাঁদের মধ্যে দ্রুত একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করেছিল। পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ দৈর্ঘ্যে মুক্তিলাভ করেছে।

৫

এই পুঁথিসমূহের দো-ভাষী অর্থাৎ বাংলা এবং আরবী-ফার্সী মিশ্রিত হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত দূরবর্তী ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। হাদীসে তিনটি কারণে অন্যান্য ভাষার চাইতে আরবীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো কোরআনের ভাষা আরবী, দ্বিতীয় কারণ বেহেশতের অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং তৃতীয়ত হজরত মুহম্মদ নিজে একজন আরবীভাষী ছিলেন। এই তিনটি মুখ্য কারণে যে সমস্ত দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, সেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই ভাষাটিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আরব অধিকারের পূর্বে মিশর এবং আফ্রিকার দেশসমূহের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা দুই-ই ছিল। কিন্তু আরবদের অধিকারে আসার পর আরবী ভাষা এবং আরবী বর্ণমালা দুটিকেই অধিবাসীদের গ্রহণ করতে হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী ভাষা এবং ইসলাম অনেকটা অভিন্নার্থক ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ না করে ইসলাম গ্রহণ করলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না, সে সময়ে এ রকম একটা প্রবল মত অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। অন্য যে-কোনো সেমিটিক ধর্মের মতো ইসলামেও পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সারাজীবন মুসলমান হিসেবে জীবন কাটিয়ে পরকালে বেহেশতে যেয়েও ভাষাজ্ঞানের অভাবে একঘরে জীবন কাটাতে হবে এটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেরই সহ্যের অতীত একটা ব্যাপার। তাই মিশর থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা আরবী ভাষা এবং বর্ণমালা দুটিই গ্রহণ করেছিলেন।

মিশরে যেভাবে সহজে আরবী ভাষা জনগণের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, ইরানে তেমনটি হতে পারেনি। কারণ ইরানীরা ছিলেন অতিমাত্রায় ঐতিহ্য-সচেতন এবং সংস্কৃতিগত-প্রাণ জাতি। তাঁদের মহীয়ান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে এ যুক্তি উদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি যে আরবী ভাষা না আয়ত্ত করেও প্রকৃত মুসলমান

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হওয়া যায়। কোরানের প্রকৃত শিক্ষা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় বিকশিত করে তোলার মতো ভাষাগত সমৃদ্ধি এবং মনীষা দুই-ই তাঁদের ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে ইরানী সমাজ যে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, কবি ফেরদৌসী, দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ তা গ্রহণ করেছিলেন। ইরানীরা আরবী ভাষা গ্রহণ করেননি, কিন্তু আরবী বর্ণমালা তাঁদেরকে মেনে নিতে হয়েছে। তারপরে ইরান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পেরিয়ে ভারতবর্ষ অবধি মুসলিম শক্তির যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে তার পেছন পেছন ফার্সী ভাষাও ভারতে প্রবেশ করেছে। এমনকি মোগল বিজেতারা তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কীর পরিবর্তে ফার্সীকেই সরকারী ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মিশরে আরবী যেমন, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশে ফার্সী যেমন চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষে সেভাবে অনেকদিন রাজভাষা থাকার পরও ফার্সীকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের হিন্দুরা বড় আশ্চর্য জাত; তাঁরা দরবারে চাকরী করার জন্য উত্তমরূপে ফার্সীভাষা শিক্ষা করেছেন, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে কখনো ঐ ভাষাটিকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারতে ফার্সী ছিল জনগণের দৈনন্দিনতার স্পর্শলেশবর্জিত দরবারবিহারী একটি অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। স্থানীয় মুসলিম জনগণের মধ্যেও তার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। স্বাতন্ত্র্যগর্বী মুসলমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফার্সী বর্ণমালাকে গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষাসমূহের সমন্বয়ে উর্দু নামে একটি পাঁচমিশেলী ভাষা তৈরি করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন রেনেসাঁর যুগে জাতীয় ভাষাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূর্বে ল্যাটিন ভাষাতে সন্দর্ভ ইত্যাদি রচনা করতেন, তেমনি মুসলমান ধর্মবেত্তারা ধর্মগ্রন্থসমূহের টীকা-টিপ্পনী ফার্সী ভাষাতেই রচনা করতেন। সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের পর উর্দু ভাষাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ ভাষাতেই ধর্মীয় সন্দর্ভসমূহ লেখা হতে থাকে।

বাঙালী মুসলমানের চোখে ফার্সী এবং উর্দু ভাষা দুটো আরবীর মতোই পবিত্র ছিল। আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃশ্রেণীর ভাষা হওয়ায়, তাদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনোটিই তাঁদের ছিল না। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট এলাকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে ধরনের ইংরেজি বলেন কিংবা ঢাকার কুট্টি অধিবাসীরা যে উর্দু বলেন ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইংরেজী ভাষার আর ঢাকার কুট্টিদের সঙ্গে উর্দু এবং নবাবদের সামাজিক মেলামেশার যে সুযোগ ছিল, বাঙলার আপামর জনগণের সঙ্গে উর্দু-ফার্সী জানা শাসক নেতৃশ্রেণীর ততটুকুও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাঁদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অসম্ভব মনে হয়েছে তখন ঐ বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ একটা ভাষা রপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটাকে সামাজিকভাবে রপ্ত করা বলা চলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও আরবী হরফে বাংলা পুঁথিপত্র যে লেখা হয়েছে সেটাকে ক'জন অবসরভোগী পুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবী হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকেরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ, সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবী অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।

সুযোগ পেলে তাঁরা আরবীতে লিখতেন, নইলে ফার্সীতে, নিদেন পক্ষে উর্দুতে। কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তখন বাধ্য হয়েই বাংলা লিখতে এসেছেন। কেউ কেউ সন্দীপের আবদুল হাকিমের সেই 'যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি' পংক্তিগুলো আউড়ে বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি পুঁথিলেখকদের অপরিসীম দরদ ছিল। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আবদুল হাকিমের এই উক্তির মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং মর্মবেদনা লক্ষ্য করা যায়। নিশ্চয়ই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যাঁরা সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেন। আবদুল হাকিম নিজে সে শ্রেণীভুক্ত নন, তাই সে উঁচু ভাষাতে তাঁর অধিকারও নেই। তাই তিনি তাঁর একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম ভাষাতেই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

দূর অতীতের কথা বলে লাভ নেই। ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুসলমান সমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দু ভাষার সুপারিশ করেছিলেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, তিনিও বাড়িতে উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। ঢাকার কুট্টি অধিবাসীদের অনেকেই অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশেরই মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

৬

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুসৃত নীতির ফলে যে উঁচুকোটির মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি ছিল তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। ভাষাগত দিক দিয়ে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাঁরা বাঙালী মুসলমান জনগণের সঙ্গে কোনরকমে সম্পর্কিত ছিলেন না। এ দেশে অনেকটা বিদেশীর মতোই অবস্থান করতেন। সরকারী চাকুরীই ছিল তাঁদের এই দেশে অবস্থান করার মুখ্য অবলম্বন। নবাবী আমলের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন কায়েম হলো তাঁরা না পারলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, না পারলেন নিজেদের ধর্মীয় জনগণের নেতৃত্বদান করতে। রক্তগত, ভাষাগত, রুচি, সংস্কৃতি এবং আচরণগত ব্যবধানের দরুণ আপদকালে সমাজের নেতৃশ্রেণীর পালনীয় যে ভূমিকা রয়েছে, বাঙলা দেশে অবস্থানকারী অভিজাত মুসলিম শ্রেণীটির তা পালন করার কথা একবারও মনে আসেনি।

কিন্তু উত্তর ভারতে হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণীটি মোগল শাসনের অবসানের পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অত্যল্পকাল গত না হতেই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তাঁরা নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তনে লেগে যান। তার ফলশ্রুতি আলীগড় কলেজ। এই কলেজের সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য যে অবদান তা হলো মুসলিম নেতৃশ্রেণীকে পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশমুখী করা। ব্রিটিশ শাসকদেরও সিপাহী যুদ্ধের সংশয়-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে তোলার ব্যাপারে, ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে, তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীবর্গ ও প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাইতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিলেন। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার পদ্ধতিটা ভালোভাবে শিখিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা সারা ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি শেকড় বিস্তার করেছিল যে আলীগড়-শিক্ষিত মুসলমানেরা কদাচিৎ সুযোগসন্ধানী নীতি পরিহার করতে পেরেছিলেন; কেননা জনগণ এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি ও আচারগত শ্রেণীদূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো দূরত্ব ছিল না। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী একেবারে তলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক আদর্শ অটুট থেকে গেল। হিন্দু সমাজের প্রতিযোগিতা এড়িয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কৃপাকণা সম্বল করে যে সকল মুসলমান ওপরের দিকে উঠে আসতেন, মৃত মুসলিম অভিজাতদের আদর্শকেই তাঁদের নিজেদের আদর্শ বলে বরণ করে নিতেন। এঁরা আবার অনেক সময় আপন মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ যা করেছেন বাঙলা দেশের মুসলমানদের জন্য একই কাজ করা উচিত মনে করতেন।

প্রায়শ হালের একশ্রেণীর ইতিহাস-ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলে থাকেন, ব্রিটিশ শাসনের আমলে বাঙলার মুসলমান সমাজ অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এটা পুরো সত্য তো নয়ই, সিকি পরিমাণ সত্যও এর

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের পর শাসক নেতৃশ্রেণীটির দুর্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী মুসলমান জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো যোগসূত্র ছিল কি? আর মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভালো ছিল কি? নবাবী আমলেও এ দেশীয় ফার্সী জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কত জন ছিলেন এবং কত জন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এ সকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন।

উত্তর ভারতেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণী একইভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অধিকন্তু তাঁদের অনেকেই সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পরেও তাঁরা কী করে এগিয়ে আসতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হলো স্যার সৈয়দ আহমদের মতো একজন মানুষ? বাঙলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন একজন মানুষ জন্মালেন না কেন? এই সকল বিষয়ের সদুত্তর সন্ধান করলেই বাঙালী মুসলমানের যে মৌলিক সমস্যা তার মূলে যাওয়া যাবে।

বাঙালী মুসলমান কারা? এক কথায় এর উত্তর বোধ করি এভাবে দেয়া যায় : যাঁরা বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান — তাঁরাই বাঙালী মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাঙলা দেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন — যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালী ছিলেন না। আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো তাঁদের হাতে ছিল বলেই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ভেদরেখাসমূহ অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই প্রভুত্বশীল অংশের রুচি, জীবনদৃষ্টি, মনন এবং চিন্তন-পদ্ধতি অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাঙালী মুসলমানের যে ক্ষুদ্রতম অংশ কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে যখন সামাজিক প্রভুত্ব এবং প্রতাপের অধিকারী হতেন, তখনই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক চুকে যেত এবং উঁচু শ্রেণীর অভ্যাস, রুচি, জীবনদৃষ্টির এমনকি ভ্রমাত্মক প্রবণতাসমূহও কর্ষণে-ঘর্ষণে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন।

মূলত বাঙালী মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তাঁরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাঁদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল। যেমন কল্পনা করা হয়, অত সহজে এই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে পারেনি। বাঙলার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আদিম কৌম সমাজের মানুষেরা যে সর্বপ্রকারে ওই বিদেশী উন্নততর শক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন — ছড়াতে, খেলার বোলে অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের বাগে আনতে অহংপুষ্ট আর্য শক্তিকেও যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'ভারতের ধর্মসমূহ' গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। আর্য অথবা ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে সকল জনগোষ্ঠীকে পদদলিত করে এদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদেরকে একেবারে চিরতরে জন্ম-জন্মান্তরের দাস বলে চিহ্নিত করেছে। আর যে সকল শক্তি ওই আর্য শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই মর্যদার আসন দিতে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেনি। শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ যাঁরাই এসেছেন এদেশে তাঁদের সহায়তা করতে পেছপা হয়নি। কিন্তু নিজেরা বাহুবলে যাঁদের পরাজিত করেছিল, তাঁরাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পই অনুভব করেছে। তবু ভারতবর্ষে এমনকি এই বাঙলা দেশেও যে, কোনো কোনো নীচু শ্রেণীর লোক নানা বৃত্তি এবং পেশাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ওপরের শ্রেণীতে উঠে আসতে পেরেছেন তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়।

বাঙলা দেশের এই পরাজিত জনগোষ্ঠী যাঁদেরকে রাজশক্তি পাশবিক শক্তির সাহায্যে অন্ত্যজ করে রেখেছিল, তাঁদেরই সকলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সে প্রাথমিক পরাজয়ের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন আর্যধর্মের নবজীবন প্রাপ্তির পর বৌদ্ধদের এদেশে ধনপ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তার অব্যবহিত পরেই এ দেশে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে-দলে ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এদেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিমতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের অতীতকে শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা করে থাকেন।

৭

বাঙালী মুসলমানেরা শুরু থেকেই তাঁদের আর্থিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্দশার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমাগত ধর্ম পরিবর্তন করে আসছিলেন। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনের কারণে তাঁদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রভুত্ব অর্জনের উন্মেষ হলেও জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বাঙলা দেশে নতুন নতুন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেহেতু মৌলিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেনি, তাই রাজশক্তিকেও পুরনো সমাজ-সংগঠনকে মেনে নিতে হয়েছে। সে জন্যেই মুসলিম শাসনামলেও বাঙালী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মুসলমানেরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিগৃহীত ছিলেন। ইংরেজ আমলে উঁচু শ্রেণীর মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত হলে উঁচু বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই সে আসন পূরণ করেন।

বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের লোক। তাঁদের মানসিকতার মধ্যে আদিম সমাজের চিন্তন পদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুপ্রকট। বারবার ধর্ম পরিবর্তন করার পরেও বাইরের দিক ছাড়া তাঁদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার মৌলবস্তুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। দিনের পর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শাসনপদ্ধতি চালু করেছে, কিন্তু তাঁরা মনের দিক দিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতোই বারবার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালী মুসলমান এবং মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাঁদেরই মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদেরই রচিত পুঁথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্যসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে হয়তো এ সকল পুঁথির বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অপরিসীম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিপয় সামাজিক আবেগ আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্যাসের আকারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান থাকে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে সে আবেগ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে সে আবেগই ফণা মেলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাহিত্যেই প্রথমে এই জাতিগত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে কোনো মহৎ সাহিত্য যে সৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।

পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, বাঙালী আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের মনটি রাজশক্তির আনুকূল্য অনুভব করে হুঙ্কার দিয়ে ফণা মেলে জেগে উঠেছে। কিন্তু ঐ জেগে ওঠাই সার, সে মন কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাসমূহ সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। সমাজ-সংগঠন ভেঙ্গে ফেলে নবরূপায়ণ তাঁরা ঘটাতে পারেননি। কারণ মুসলিম শাসকেরাও স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে যে নেতৃশ্রেণী সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি এবং আচারগত দূরত্বের দরুণ শাসকশ্রেণীর অভ্যাস, মনন রপ্ত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাঙালী মুসলমান।

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পরে এই দেশে হিন্দুসমাজের ভেতর থেকে যে একটি মধ্যবিত্ত নেতৃশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রায় না থাকার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র ব্রিটিশের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পলিসি' কিংবা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজের অন্ধবিদ্বেষকে ধরে নিলে মুসলিম সমাজের তুলনামূলকভাবে পেছনে পড়ে থাকার কারণসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করা হবে না।

৮

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান যুগে ইউরোপীয় ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নানা আধুনিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিন্তারাশি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তা মুসলমান সমাজকে স্পর্শও করতে পারেনি। আধুনিক যুগের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক মূল্যচেতনার নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দান করেছিলেন, মুসলমান সমাজে তা একেবারে প্রসার লাভ করেনি। জগত এবং জীবনের যে সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন নবযুগের আলোকে তাঁরা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, মুসলমান সমাজ তার কিছুই গ্রহণ করেনি। সে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ যে সকল মুসলিম চিন্তানায়ক মুসলমানদের হয়ে কথা বলছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, মুসলমান সমাজের প্রকৃত দাবী কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যথার্থ বোধ তাঁদেরও ছিল না। তাঁরাও নীচুতলার মুসলমান অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান সম্বন্ধে চিন্তা করার কোনো অবকাশই পাননি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাঁদের মনে প্রভুত্ব হারান উঁচু কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল।

স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে যে অধিকারচেতনা অপেক্ষাকৃত পরে জাগ্রত হয়, আসলে তা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন ও অগ্রগতির সম্প্রসারণ মাত্র। তাঁদেরকে তা করতে গিয়ে দু'ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লেখাপড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ-স্বার্থের দিক দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত এবং অন্যদিকে উঁচু তলার মুসলমানদের মূল্যচেতনা এবং জীবনদৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। এ দু-মুখী প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে হলে যে শক্ত সামাজিক ভিত্তিভূমির প্রয়োজন ছিল, তাঁদের পেছনে তা ছিল না। তাই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে থেকেও ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ নিয়ে যাঁরা ওপরে উঠে আসতেন, উঁচুতলার মুসলমানদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সংযুক্ত করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে জামালুদ্দীন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজম' পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে আসা সমস্ত আন্দোলন-প্রবর্তনার সঙ্গে নিজেদের অংশীদার করে নিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন একান্তভাবে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আবার এই সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে জনগণের শ্রেণীগত তফাত ছাড়া ভাষা-সংস্কৃতিগত পার্থক্য যে ছিল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

না একথা বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানেরা খুব কমই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা বাঙালী মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ সমাজচেতনা এবং মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা বাঙালী জনগণের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক বিরহিত ছিল যে ভাবাদর্শিক কোনো জাগরণ আনতেই পারেনি। ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সংস্কারকে আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক।

হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন হয়নি একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁদের একাংশের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ মৌলিক চিন্তা করেছিলেন, এবং সামাজিক অনেকগুলো বদ্ধমতকে শাণিত আক্রমণ করেছিলেন; বাস্তবে না হলেও তত্ত্বগত দিক দিয়ে বেশ কিছুদূর যুক্তিবাদিতার চর্চা তাঁদের মধ্যে হয়েছে। তাঁদের কৃত আন্দোলনসমূহ যে সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফসফরাসের মতো জ্বলেছে, সমাজে গভীরে প্রবিষ্ট হতে পারেনি, তার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের যুক্তিবাদিতার চাষ একেবারে হয়নি। মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এমন মানুষ মুসলমান সমাজে খুব বেশি জন্মাতে পারেনি। নতুন যুগের আলোকে জগত এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন এমন মানুষ সত্যিই বিরল। মুসলমান সমাজে যে কোনো মনীষী জন্মাতে পারেননি তার কারণ সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রি-মুখীনতা। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের মধ্যেই বিভিন্নমুখী লক্ষ্যের কারণসমূহ সংগুপ্ত ছিল।

My All Garbage

৯

বাঙালী মুসলমান বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা মাত্র দুটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি তিতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত ওহাবী আন্দোলন। অন্যটি হাজী দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন। এই দুটি আন্দোলনেই বাঙালী মুসলমানেরা মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উঁচু শ্রেণীর মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলেও কৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দুটির হোতা। আধুনিক কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধর্মই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। সে সময়ে বাঙলা দেশে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। সমাজের নীচুতলার কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ধর্মই ছিল একমাত্র কার্যকর শক্তি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাদগামী ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই আন্দোলন দুটি ছাড়া, অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়তো ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিংবা হিন্দু সমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনো কিছুই প্রভাবিত করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মনটিতে একটু রংটং লাগলেও কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। মধ্যিখানে কয়েকটি শতাব্দীর পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বাঙালী মুসলমানের রচিত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি ধরা পড়বে। কোনো বিষয়েই তাঁরা উল্লেখ্য কোনো মৌলিক অবদান রাখতে পারেননি। সত্য বটে, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি কাব্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে, উভয়েরই রচনায় চিন্তার চাইতে আবেগের অংশ অধিক। তাছাড়া এই দুই কবির প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিল হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ নয়।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিতচর্বণ, নয়তো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামাজিক ডগ্‌মা বা বদ্ধমতসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন তেমন লেখক-কবি মুসলমান সমাজে আসেননি। বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গ্রহণ করে না মনের গভীরে। ভাসাভাসা ভাবে অনেককিছুই জানার ভান করে আসলে তার জানাশোনোার পরিধি খুবই সঙ্কুচিত। বাঙালী মুসলমানের মন এখনো একেবারে অপরিণত, সবচেয়ে মজার কথা এ-কথাটা ভুলে থাকার জন্যই সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে কসুর করে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রসারমান যান্ত্রিক কৃৎকৌশল স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করছে এবং তার একাংশ সুফলগুলোও ভোগ করছে, ফলে তার অবস্থা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এঁচড়েপাকা শিশুর মতো। অনেক কিছুরই সে সংবাদ জানে, কিন্তু কোনো কিছুকে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মনীষা দিয়ে আপনার করতে জানে না। যখনই কোনো ব্যবস্থার মধ্যে কোনরকম অসংগতি দেখা দেয়, গোঁজামিল দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এবং এই গোঁজামিল দিতে পারাটাকে রীতিমতো প্রতিভাবানের কর্ম বলে মনে করে। শিশুর মতো যা কিছু হাতের কাছে, চোখের সামনে আসে, তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। দূরদর্শিতা তার একেবারেই নেই, কেননা একমাত্র চিন্তাশীল মনই আগামীকাল কি ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে জানে। বাঙালী মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি-কালচার বলে পরিচিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বাঙালী মুসলমানের সামাজিক সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি চোখ বুলোলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সাবালক মন থেকেই উন্নত স্তরের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে তার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মনের সাবালকত্বের কোনো পরিচয় রাখতে পারেনি। যে জাতি উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টিও সম্ভব নয়। যে নিজের বিষয় নিজে চিন্তা করতে জানে না, নিজের ভালোমন্দ নিরূপণ করতে অক্ষম, অপরের পরামর্শ এবং শোনা কথায় যার সমস্ত কাজ-কারবার চলে, তাকে খোলা থেকে আগুনে কিংবা আগুন থেকে খোলায়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাফ দিতেই হয়। সুবিধার কথা হলো নিজের পঙ্গুত্বের জন্য সব সময়েই দায়ী করবার মতো কাউকে না কাউকে পেয়ে যায়। কিন্তু নিজের আসল দুর্বলতার উৎসটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না।

বাঙালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ তার মনের ওপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু'বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনের ধরণ-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।

১৯৭৭

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

বাঙলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা

শেখ মুহম্মদ (এস. এম.) সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্টা পীনস্তনী এ সকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সৃজনলীলায় মত্ত অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ জাগানিয়া এ সকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এ সকল সুন্দর সূর্যোদয়, সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরম তুলতুলে এ সকল শুভ্র-শান্ত ভোর, হিঙ্গুল বরণ মেঘ-মেখালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাঁকের নদীতীরের এ সকল দৃষ্টি-শোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউখেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাকা মেঠো পথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এ সকল সরল আটচালা, এ সকল আহ্লাদী বাছুর এবং পরিণতবয়স্ক গবাদি পশু, সর্বোপরি গোটা জনপদের জনজীবনে প্রসারিত উৎপাদনশৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকল্লারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-ঘামের ঝঙ্কার, চেষ্টার সঙ্গীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশগঙ্গার কিনারে কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়েছে।

শহরের চৌমোহনার ইট-সিমেন্টের পুরো কঠিন আবরণ ফাটিয়ে একটা ঝর্ণা যদি বন্য আদিম ভঙ্গিমায় জেগে উঠে রঙিন জলধারা হঠাৎ করে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে থাকত, পৃথিবীর অন্তরের এই নৃত্যপরায়ণ রসধারার প্রতি মানুষ যেমনি বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে দৃষ্টিপাত করত, তেমনি চোখে মানুষ সুলতানের আঁকা এ সকল ছবি দেখেছে। এই ছবিগুলো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বাঙলার অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত অতীত ফুঁড়ে প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে ওপরের সমস্ত নির্মোক বিদীর্ণ করে শিল্পীর পায়দম তুলির মাধ্যমে আমাদের যুগ এবং আমাদের কালের ঘাটে এসে আছড়ে পড়েছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তারপর কোনরকম ভনিতা না করেই বাংলাদেশের চিত্র-দর্শকদের উদ্দেশে আমোঘ নির্দেশাবলী উচ্চারণ করেছে : 'আমাদের দেখো'। বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে এবং মজেছে। রঙের পরশ দৃষ্টিপট ভেদ করে মনের পটে অক্ষয় হয়ে স্থির ইন্দ্রধনুর মতো ফুটে গেছে। গ্রাম বাঙলার এই চলমান ইতিহাসপ্রবাহের সঙ্গে দর্শকের তন্ময় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তারা নিজেদের অস্তিত্বকেও এ সকল কান্তিমান, আয়ুষ্মান চিত্রের অংশ হিসেবে মনে করতে বাধ্য হয়েছে।

সকলে চিত্রকলার মর্ম বোঝে না, সূক্ষ্মতর বোধ এবং উপলব্ধি অনেকের না থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষত সেই ইতিহাস গাজন-উৎসবের নটরাজের মতো অট্টরোলে যখন নেচে ওঠে। সুলতান বছর তিনেক আগে শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত তাঁর সর্বশেষ প্রদর্শনীটিতে বাঙলার আবহমান কালের ইতিহাসটিকে নাচিয়ে দিয়েছেন। যাঁরাই এ চিত্রগুলো দেখেছেন, তাঁদের উপলব্ধিতে একটি কথা ভ্রমরের মতো গুঞ্জরণ করেছে, আমাদের সভ্যতার প্রাণ কৃষি আর কিষাণ হল সভ্যতার নাটমঞ্চের একক কুশীলব। যখন মানুষের কানে মহাকাশ আর মহাপৃথিবীর শ্যামের বেণু অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করে তাকে ক্রমাগত মর্তলোকের সীমানা থেকে ঊর্ধ্ব-ঊর্ধ্বতর লোকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও এই প্রাচীন ভূখণ্ডটিতে আদলে এবং অবয়বে মানুষ সেই সনাতন মানুষই রয়ে গেছে। তাই সুলতানের আঁকা এই মানুষেরা বাংলাদেশের হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। যেখানেই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে সেখানেই আদিপিতা হলধর-আদমের চেহারায় তারা উপস্থিত ছিল। তারা মিশরে ছিল, চীনে ছিল, ভারতে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, রোমে সবখানে বন কেটে বসত গড়ার দিনে, মাটির মর্মমধু টেনে তোলার বেলায়, বনের অগ্নিকুণ্ড পরিত্যাগ করে ঘরের দাওয়ায় সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালাবার নম্র-মধুর ক্ষণে তারা হাজির ছিল। যেখানেই মাটি শ্রমশীল কর্মিষ্ঠ মানুষের শ্রমে-যত্নে প্রসন্ন হয়ে ফুল-ফসলের বর দিয়েছে, উপহার দিয়েছে শান্ত-স্নিগ্ধ গৃহকোণ, সেখানেই ইতিহাস গতিচঞ্চল পথ-পরিক্রমার সূচনা করেছে। মাটি এবং মানুষের এই দ্বৈত সম্পর্ক, বিশদ করে বলতে গেলে, নিসর্গ এবং মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুলতানের আঁকা চিত্রমালায় এমন আকার পেয়েছে, এমন বরণ ধরেছে যে একান্ত নির্জীব এবং পাষণ্ড না হলে তার আবেদন অস্বীকার করা প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙলার বদলে সুলতান যদি আরব দেশে জন্ম নিতেন, মরুচারী বেদুইনদের ছবি আঁকতেন। যদি জন্মাতেন নরওয়ে, সুইডেনে, তাহলে সমুদ্রচারী জেলেদের সভ্যতার পথিকৃৎ হিসেবে আঁকতেন। নেহায়েত বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন বলেই এই কৃষকদের সভ্যতার জনয়িতা ধরে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। সুন্দর প্রকৃতিতে নয় — মানুষের মনই সৌন্দর্যের নিবাসভূমি। চারিদিকে দৃষ্টিরেখা যতদূর ধাবিত হয় এবং সামনে-পেছনে চিন্তা-কল্পনা অনেকদূর বিহার করার পর যে অনড় বিন্দুটিতে এসে স্থির হয়, সংহত হয়, সেইখানে, কেবল সেইখানেই সৌন্দর্যের নিভৃত নিকুঞ্জ। সেজন্য একজন আরবের চোখে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লু হাওয়া তাড়িত ধু-ধু মরুভূমি সুন্দর. একজন এস্কিমোর চোখে তুষার-আচ্ছাদিত ধবল তুন্দ্রা সুন্দর।

সুলতানকে বাঙলার প্রকৃতিতে, বাঙলার ইতিহাসে এবং বাঙলার মানুষের শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং শিল্পী-জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তাও কম বিস্ময়কর নয়। পরে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাবে। আপন অন্তরস্থিত সৌন্দর্যবোধ নিসর্গ, ইতিহাস এবং জীবন্ত শ্রমশীল মানুষের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে ক্যানভাসে সবকিছু মূর্ত করে তোলা — এর সবটুকু তাঁর একক কৃতিত্ব বা শৈল্পিক-প্রয়াসের ফলশ্রুতি নয়। তার জন্য এই সুপ্রাচীন দেশটিকে সাম্প্রতিককালে একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে হয়েছে। একটি উদ্ভিদ-সমতুল ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের মানব সাধারণের ভেতর বন্দুকের আওয়াজে, কামানের হুঙ্কারে যে জাগরণ এসেছে, বা তাদের সম্মিলিত সৃষ্টিশক্তির তেজ উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছে, তার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। ইনকুয়েবেটর যন্ত্রের তাপে ডিমের খোলস ফেটে যেমন করে মুরগীর বাচ্চা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের উত্তাপে শিল্পীর অন্তর চিরে এসকল ছবি বেরিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সবটুকু আবেগ, সবটুকু জীবনোল্লাস; সবটুকু স্পর্ধা এবং দুঃসাহস এই ছবিগুলো ধরে রেখেছে। এরকম একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা না ঘটলে সুলতানের তুলি কস্মিনকালেও এরকম আশ্চর্য ছবি প্রসব করতে সক্ষম হত না, যত প্রতিভাই তাঁর থাকুক, কিষাণ-জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ-মমতা যতই নিবিড়-গভীর হোক না কেন। বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে অন্তঃস্থল থেকেই এসকল চিত্রের উদ্ভব। এ কারণে এ ছবিগুলো দর্শকের মনেও প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। হয়তো দর্শক সচেতনভাবে অনুভব করতে পারেন না, কিন্তু অন্তরালে এই বোধ ক্রিয়াশীল থাকে ঠিকই। ইতিহাসের এই জাগ্রত দেবতার প্রতি অজানিত শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দলে দলে মানুষ এই সকল ছবি দর্শন করতে এসেছে। যুদ্ধে পরাজিত, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ ভেনিসের মরমে মরে যাওয়া জনসাধারণও আজ থেকে বহুকাল পূর্বে একদা তরুণ শিল্পী মিকেলেঞ্জেলোর অপূর্ব মূর্তি ডেভিডের দিকে ভেনিসের অপরাজেয় ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক হিসেবে মমতা-মেদুর নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিল। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পী এবং সমালোচক এ দু'জাতের দৃষ্টিসীমার অনেক দূরে এই পরিপ্রেক্ষিতের অবস্থিতির দরুণ তাঁরা এ অমর চিত্রসমূহের প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে প্রণতি জানাতে পারেননি।

২

শিল্পকলার সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতার একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। স্থবির সমাজের শিল্পকলাও বলতে গেলে একরকম পরিবর্তনবিমুখ। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সেখানে একই রকম পট আঁকা হয়, একই ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করা হয়। নতুন পুরুষের অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা, অভিযাত্রার প্রাণস্পন্দন স্থবির সমাজের ঐতিহ্য-নির্ভর শিল্পকর্মে কদাচিৎ সঞ্চারিত হতে পারে। পুরুষ-পরম্পরা একই রকম প্রক্রিয়ায় একই বস্তু প্রথাসিদ্ধ উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, একে নির্মাণ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। একটি অচল সমাজ ভেতর থেকে প্রাণ পেয়ে চলতে আরম্ভ করলে তার নানামুখী শিল্প-প্রয়াসের মধ্যে এই চলার বেগ, এই গতির ছন্দ নবনব ভঙ্গী এবং নবনব দ্যোতনার জন্ম দিয়েই চলে। শিল্পকলার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ঘটতে থাকে রূপান্তর।

সামগ্রিকভাবে বাঙলার শিল্প-সাহিত্য ইংরেজী তথা ইউরোপীয় শিল্প সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটা নতুন বেগ, নতুন ভঙ্গী এবং নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অর্থাৎ এই সময়ের পূর্ববর্তী বাঙলার যে চিন্ময় সৃষ্টি তা পরবর্তী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। পরবর্তীকালের চিন্ময় সৃষ্টিসমূহে এমন কতিপয় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে পূর্ববর্তী সময়ের যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম তন্ন তন্ন করে দেখলেও যার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পরিবর্তন শুধু একা মৃন্ময় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আসেনি, গোটা সমাজের ধনবন্টন থেকে শুরু করে আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা, রুচি-পছন্দ, পোশাক-আশাক সবকিছুর মধ্যে এমনভাবে এসেছে যে, সন্ধান করলে ধরা পড়ে যাবে সম্পূর্ণ মানব-সম্পর্কের ধরনটিই আমূলবিস্তর পাল্টে গেছে এবং সমাজের কাঠামো বা ছকটির মধ্যেও অনেকদূর পালাবদল ঘটে গেছে। এই সামাজিক পালাবদলের যে সুবিশাল যজ্ঞ, সাহিত্যে তার গতিপরিক্রমা মাইকেল, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে মুখ্যত ঝাঁক বেঁধে ফুটে উঠেছে। এ সময়ের প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসসমূহের মধ্যে একটা দ্বিমুখী মনোভঙ্গী সবসময়ে লক্ষ্যগোচর। একদিকে ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির স্পর্শে স্রষ্টাকুল শিউরে শিউরে জেগে উঠেছেন আর অন্যদিকে এই জাগরণের বেগ-আবেগ ঐতিহ্যের ভেতর চারিয়ে দেয়ার জন্য ঐতিহ্যের ভিতটি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন এবং সম্প্রসারিত করে যাচ্ছেন। সাহিত্য নব্য-ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মনীষার স্পর্শ এবং বিত্তের সমর্থনে অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে নতুন কলেবর ধারণ করে। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত চিত্রকলার ভাগ্যে সে সুদিনের আগমন ঘটেনি। সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে চিত্রকলার প্রতি অনুরাগের অভাবই সেজন্য দায়ী। আর এক অংশে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, ধর্ম-অর্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে চিত্রচর্চার যে চল ছিল তাতে ইউরোপ এবং ইউরোপীয়ানার কোনো প্রভাব সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে পড়তে পারেনি। তাছাড়া চিত্রকলার প্রসার এবং ব্যক্তির সঙ্গে সামগ্রিক সমাজের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নটিও বিজড়িত ছিল। তাই অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী চিত্রকরেরা স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির অক্ষম অনুকরণ এবং নবিসগিরি করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা যা আঁকতেন বাঙালী চিত্রকরেরা হুবহু তার কার্বন কপি তৈরি করতেন। এ অবস্থাটা বেশ কিছুদিন চলেছে। এই ইউরোপ-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নবিস চিত্রকরদের কারো অঙ্কন পদ্ধতিতে সৃষ্টিশীলতার ছন্দ সঞ্চারিত হয়নি। এ পর্যায়ের চিত্রশিল্পীদের কেউ দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নেয়ার কথা দূরে থাকুক, যে ইউরোপের অনুকরণ করেছেন দিবস-রজনীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমে, তাদের সামান্য অনুমোদন পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির অনুশাসন ছিন্ন করে একটা নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কারের হার্দ্য এবং মেধাবী প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রাজস্থানী, মোগল, অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি চিত্রকলার প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেন এবং এসবের মধ্যে তাঁর অভীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়ে যান। তাছাড়া সে সময়ে প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। প্রাচ্য শিল্পাদর্শের মহিমা প্রচার এবং প্রাচ্যরীতির শিল্পের প্রসার কল্পে এই শিল্পী স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ওকাকুরা এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনে কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন, বলা মুশকিল। মোটের ওপর দু'য়ের সাক্ষাতের ফলে একটা চরম অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সময়টার কথাও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। সবেমাত্র চিত্রকলা ব্লকের মাধ্যমে মুদ্রিত হয়ে পত্র-পত্রিকায় ছেপে সাধারণের গোচরে আনার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এদেশে। গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লেগেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার একটা দুর্বার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাহিদা : জাতীয় সাহিত্য চাই, জাতীয় বিজ্ঞান চাই, জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাণিজ্য চাই। ভারতের উঠতি বুর্জোয়া সর্বক্ষেত্রে নিজের অধিকার প্রসারিত করার জন্য মারি-কি-মরি পণ করে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার একটা নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করলেন। তা সর্বাংশে যেমন ভারতীয় নয়, তেমনি সর্ব অবয়বে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণও নয়। দু'য়ের সংশ্লেষে হয়ে উঠল তৃতীয় বস্তু। অসাধারণ মৌলিকত্বসম্পন্ন এসকল চিত্রকর্ম দেশের আলোকিত অংশের মন কেড়ে নিল। বিদেশীরাও প্রশংসা করল। অবনীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় শিল্পের জনক এবং ভারতের আত্মার অমর উদ্বোধক পুরোহিত হিসেবে আখ্যাত হলেন। কিন্তু কোন্ ভারত? যে ভারতে যক্ষ দয়িতার বিরহে একাকী অশ্রুমোচন করে, যে ভারতে মোগল সম্রাট শাহজাহানের ধ্যাননেত্রে তাজমহলের মর্মর সমাধিতলে শয়ান মমতাজ বেগমের মতো সুন্দর মৃত্যুস্বপন ঘনিয়ে আসে। অতীত ইতিহাস থেকে সন্ধান করে যে রীতি ধ্যানে, সাধনায় বের করে আনলেন; গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজোর মতো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা অতীত রোমন্থনের মধ্যেই সীমায়িত রাখলেন। অতীত তাঁর সামনে এমন কুহক জাল মেলে ধরেছিল যে তার গণ্ডী ভেদ করে বর্তমানের পথে পদচারণা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। চলমান জীবনের কোনো ছবি আঁকলেও অতীতের সেই সুন্দর কুয়াশা এসে বর্তমানের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মগুলো ভারতের চিত্রকলার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আকাশে উজ্জ্বল অনুপম বরণ বিশিষ্ট ইন্দ্রধনুর মহিমা নিয়ে জেগে থাকবে, একথা সত্যি। কিন্তু সেগুলো বাস্তবের কেউ নয়। হালকা মনোরম পুঞ্জ পুঞ্জ রঙের প্রলেপে সৃষ্ট অর্ধেক শরীর অর্ধেক ছায়া মাত্র। শুধু আকাশে সঞ্চরণ করে, মেরুদণ্ড সোজা করে স্মৃতি-স্বপ্নভারে ভারাতুর এ সকল ফিগার মাটিতে দাঁড়াতে পারবে না।

তাঁর এই সীমানা শিল্পী স্বয়ং জানতেন। জানতেন এই যে ফাঁক রয়ে গেল তা তিনি ভরাট করতে পারবেন না। এ তাঁর সাধ্যের বাইরে। তিনিও তাঁর আঁকা চিত্রের মতো স্বপ্ন-স্মৃতিভারে অতিশয় কাতর। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটিতে শিল্পের তত্ত্ব হিসেবে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাও তাঁর স্মৃতি-স্বপ্নেরই অংশ মাত্র। তথাপি তিনি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে কামনা করতেন, কেউ একজন আসুক যে আঁকবে নিটোল রক্তমাংস বিশিষ্ট সামাজিক মানুষের ছবি। বোধ করি সে আশায় বুক বেঁধে বেঙ্গল আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করছিলেন এবং 'বাংলার ব্রত' বইটি লিখেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' বইটিতে বাঙালী সমাজ-জীবনের আনাচ-কানাচ অনুসন্ধান করে বাঙালীর শিল্পের প্রাণ-ভোমরাটিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করেছিলেন। একটি গভীর স্বাদেশিক এবং শৈল্পিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। এই সমাজের সহজ-সরল কিন্তু লীলায়িত শিল্প-নিদর্শন এবং অন্তরালবর্তী 'মটিফ'সমূহ আত্যন্তিক যত্নে নৃবিজ্ঞানীর দক্ষতা সহকারে শুধু সংকলন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর ছাত্ররা যেন নিজেদের এ সকল ঐতিহ্য-সম্পদকে নিয়মিত চর্চা এবং ক্রমাগত নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন, সেদিকে তিনি সতত সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সে প্রত্যাশার সবটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায়ের শিল্প-সাধনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সে আকাঙ্ক্ষার অনেকখানিই চরিতার্থতা লাভ করেছে।

MyAllGarbage

৩

নন্দলাল বসুই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে প্রকৃত অর্থে সার্থক বাঙালী চিত্রশিল্পীর শিরোপা দেয়া যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের কুয়াশাচ্ছন্ন স্বপ্নমণ্ডিত তন্ময় পরিবেশের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে নন্দলালের রেখাপ্রধান চিত্রসমূহ বস্তু-ঘনিষ্ঠতা লাভ করে বাস্তব জগতে মেরুদণ্ডের ওপর থিতু হয়ে দাঁড়াবার জন্য যেন সংগ্রাম করছে। তাই বলে নন্দলাল বসু পৌরাণিক চিত্র আঁকেননি এমন নয়। তবে তাঁর পৌরাণিক চিত্রগুলো দেখেও মনে একটা ধারণা জন্মাবে যে, সেগুলো পৌরাণিক জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। তাঁর ধ্যানী বুদ্ধ ছবিটির কথা ধরা যাক। এখানে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্নতাটাই সব নয়, তাঁর রক্ত-মাংসের অস্তিত্বটাও ধরা পড়েছে। আবার যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ কিংবা মহাত্মা গান্ধীর ছবি আঁকেন রেখার বাঁকে বাঁকে একটুখানি পৌরাণিকতা যেন প্রাণ পেয়ে ওঠে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চলমান সাঁওতাল রমণীর চিত্রে যে ভঙ্গী ফুটে বেরিয়েছে তা অনেকটা এরকম : চিত্রটি সাঁওতাল রমণীর, কোনো সন্দেহ নেই। শরীরে যৌবন জ্বলছে, খোঁপায় দুলছে বনফুলের আভরণ, বলিষ্ঠ পায়ের গোছ, চলার ছন্দে বিজন বনভূমি ছন্দায়িত হয়ে উঠছে। এসব তো রয়েছেই। এটুকু না থাকলে শিল্প হবে কেমন করে? তবু, তবু কোথায় এ রমণীটির আদলের মধ্যে এমন কিছু আছে যেন একটুখানি ফুরসত পেলেই সে সাঁওতাল বেশভূষা পরিত্যাগ করে নারীত্বের একটা ইমেজ মাত্র হয়ে স্বপ্নলোক-ধ্যানলোকের দিকে ধাওয়া করে। নন্দলালের আঁকা বিরান মাঠের মাঝখানে তালগাছ দেখেও একই রকম ভাবনা জন্মাবে। এই তালগাছটি তালগাছ বটে, আবার তালগাছ নয়ও। সামান্য সুযোগ পেলেই অণু অণু স্বপ্ন হয়ে আকাশলোকের কোথাও মিলিয়ে যাবে। শিল্প-সাহিত্যে কেউ বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সাধনা করে, কেউ ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার; যার যতদূর যাত্রা হয়, ততদূর সফলতা। নন্দলাল বসু এই বাইরে থেকে ঘরে আসার সাধনাই করেছিলেন। সবটা ফিরতে পারেননি। তথাপি নন্দলাল একজন বিরাট শিল্পী। বাংলার চিত্রশিল্পকে লোকায়ত ও ধ্রুপদ, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য রীতির মিশেল ঘটিয়ে, নানা ভাঙচুরের মাধ্যমে একটি ফ্রেমের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

৪

যামিনী রায় ঘরেই ছিলেন, তাঁকে ছবি আঁকা শিখতে হয়েছে বটে কিন্তু ঘরে ফেরার সাধনা করতে হয়নি। বাঙলার চিত্রকলার ঐতিহ্য আপনিই সেধে এসে তাঁর তুলিতে ধরা দিয়েছে। কোনো গুরু এবং প্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদ অর্জন করার বহু আগেই কলালক্ষ্মী আদর করে এই দরিদ্র এবং অভিভূত ভক্তের হাতে গোপন অমৃতভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছেন।

যামিনী রায় সম্পর্কে সামান্য পেছনের কথা বলা প্রয়োজন। তৎকালীন গ্রামীণ বা শহুরে মধ্যবিত্তের কেউ ছিলেন না এই যামিনী রায়। চিত্রকলা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে যে নবীন ভাবধারার জোয়ার শহর কলকাতায় খলখল ছলছল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল আর্ট স্কুলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। ভক্তিমান এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাহিত্যরসিকের পুত্র, সুতরাং ভক্তিই তাঁর ধ্যান এবং ভক্তিই জ্ঞান হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। দেশের যে সকল কুমোর পুরুষ-পরম্পরা ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়ত, পুতুল বানাত, পট আঁকত এবং জীবিকার তাগিদে এসব যাঁরা বাঙলা দেশের হাটে হাটে মেলায় মেলায় ফেরি করে বেড়াত তাদের কাছেই প্রথম যামিনী রায়ের হাতেখড়ি। যদি কলকাতার শহরে একটা আর্টস্কুল জন্ম না নিত, একটা শিল্প-আন্দোলন মধ্যবিত্ত সচেতন বাঙালী মানসে সুবর্ণ তরঙ্গ না তুলত, কে জানে হয়তো উত্তরকালে উক্ত যামিনী রায়ও একজন দক্ষ পট আঁকিয়ে এবং পুতুল গড়িয়ে হিসেবে ধর্মপ্রাণ হিন্দু মহিলার মনে ভক্তি এবং শিশুদের মধ্যে আচমকা বিস্ময়বোধ জাগিয়ে নামহারা পটুয়াদের ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যেতেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বৈষ্ণব সাহিত্যের ঢলঢল লাবণীস্রোতে তো সিঞ্চিতই ছিল তাঁর মানসপট। আর্ট স্কুলের শিক্ষা তাতে একটা স্নিগ্ধ তরঙ্গ জাগিয়ে দিল। বাঙলার কুমোরের হাতে গড়া পুতুলেরা, কালীঘাটের ডাসাডাসা পটলচেরা চোখের অচল পটেরা যামিনী রায়ের হাতের জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে বহু যুগ আগের ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ করে জেগে উঠল যেন। যামিনী রায়ের আঁকা এ সকল ছবি দর্শক দেখা মাত্রই চিনে নিল। পুলকিত বিস্ময়বোধের তাড়নায় কলারসিকের মনে একটা আশ্চর্যান্বিত জিজ্ঞাসা গুনগুনিয়ে উঠল : আরে এ তো আমাদের জিনিস, এই যে নারী তার অনুপম দেহবল্লরী, পূর্ণিমা চাঁদের আকৃতির মুখমণ্ডল সে তো প্রতিদিন আমাদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে, এমন রসঘন নিবিড় গভীর চোখের দৃষ্টি, তার আলোকেই তো আমাদের সমাজ-সংসার আলোকিত। এমন নিটোল সুকুমার শোভনশালীন গড়ন ভঙ্গী, আর এত নম্র যেন দলে দলে ব্রজবালারা কেলিকলা লীলারসের বেশভূষা ছেড়ে আমাদের সংসার-সীমান্তে কন্যা-জায়া-ভগিনী হয়ে আটপৌরে বসনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যে-ই আঁকুক এ সকল ছবি; যে ঘনীভূত আবেগে বৈষ্ণব কবিরা গঠন করেছেন অতীতে পদাবলীর শরীর; সেই অচঞ্চল আবেগ, সেই অচলা ভক্তি নতুন ব্যঞ্জনায় মর্মরিত হয়ে উঠেছে এসকল ছবিতে। কে আঁকল, কে সেই আমাদের অতিশয় আপনার জন চিত্রকর!

রাতারাতি বাঙলা দেশে বাঙলা দেশের নিজস্ব চিত্রকর হিসেবে, বাঙলার গহন সৌন্দর্যের রূপকার যামিনী রায় পরিচিতি লাভ করলেন। খ্যাতির ঢেউ দেশ পেরিয়ে বিদেশেও একটুখানি হাওয়া সৃজন করল। ধীমান কলাবিদ শাহেদ সুহ্‌রাওয়ার্দী যামিনী রায়কে নিয়ে বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকায় একটি মনস্বিতাসম্পন্ন রচনা প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানত শাহেদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর দূতিয়ালীতেই যামিনী রায়ের বৈদেশিক খ্যাতি। আমাদের এ রচনার নায়ক শেখ সুলতানের শিল্পী-জীবনের সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করার বেলায় আরও একবার আমাদেরকে শাহেদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

যামিনী রায় দেশীয় রীতিতে ঐতিহ্যনির্ভর মনোমুগ্ধকর অঙ্কনশৈলীর উদ্ভাবক এবং বাঙলার একান্ত ঘরোয়া চিত্রশিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকে বোধকরি জানেন না একসময় ক্লাসিক প্যাটার্নে অনেক ছবি তিনি এঁকেছিলেন। ইউরোপীয় চিত্রকরদের আদর্শে অঙ্কিত এ সকল চিত্র আজকাল কোথায় কি হালে আছে সম্ভবত কেউ বলতে পারবেন না। ছবি হিসেবে এগুলো একেবারে উৎকর্ষ বিবর্জিত ছিল একথাও বলা চলে না। তথাপি সে পথে শিল্পীর যাওয়া হয়নি। এটা শিল্পী যামিনী রায়ের জন্য ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে তা আজ অনুমান এবং বিতর্কের বিষয়। মোট কথা সে সময়ে দেশের মানুষ যামিনী রায়ের ছবির যে বিশেষ ভঙ্গীটি এবং যে বিশেষ অন্তরাবেগটির সহজ দৃষ্টিতে প্রশংসা করত, দেশীয়ানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারত অনায়াসে, অনবরত যামিনী রায়কে সেই ছবিই এঁকে যেতে হয়েছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তুলির স্বচ্ছন্দ টানে টানাটানা ভাসাভাসা চোখ, চোখের ভেতর থেকে প্রকাশমান দীঘির বুকের নিথর কালো গভীর জলের অতল প্রশান্তি, মুখে মাখানো এমন একটা সহজ সারল্য, এমন একটা সহজিয়া আবেগ যে দর্শন মাত্রই মনে একটা প্রীতির ভাব ঢেউ খেলে যায়: এই সহজ গভীর ভাবের শিল্পী যামিনী রায়। একজন শিল্পী অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রকাশভঙ্গীর যে একটা সহজতা, অনায়াসপনা অর্জন করে, এটা সে সহজতা নয়। এই সহজতা জলের মতো সরল, ঐতিহ্যের ভেতর থেকে সংস্কৃতির মর্মমধুর ভাণ্ডার থেকে বালক বয়সেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি তা মাতৃস্তন্যের মতো পান করেছিলেন। তারপরেও কিন্তু গভীর সাধনার আশীর্বাদ ছাড়া কেউ তা অর্জন করতে পারে না। তবে এই সাধনার ধারাটা যত বেশি সচঞ্চল মনোবৃত্তির অনবচ্ছিন্ন অন্তরাল প্রক্রিয়া বাইরে তার অভিঘাত বড় বেশি পরিদৃশ্যমান নয়। কোনো কোনো ওস্তাদ ঘরানার ছোট ছোট ছেলেরা যেমন গলা খেলিয়ে দুরূহ রাগ-রাগিনীর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় সে রকম আর কি! সেখানেও একটা শিক্ষার প্রশ্ন থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থী তা অজান্তে বিনাশ্রমে বিনাযত্নে পরিবেশের কাছ থেকে অর্জন করে ফেলে। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যাই আঁকুন না কেন তাঁর ছবিতে একটা বাৎসল্য রসের আভাস বড় বেশি ফুটে ওঠে। কতিপয় পরিচিত অভিব্যক্তির বাইরে, অন্য কোনো ভঙ্গীতে অন্য কোনো রসমূর্তিতে যামিনী রায়কে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর শিল্পী-জীবনের কোনো বাঁক, কোনো মোড়, কোনো পরিবর্তন, কোনো রূপান্তর নেই যেন। আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যাওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁকে কোনদিন পেয়ে বসেনি। সুন্দর নিশ্চল বস্তুঘনতার জগত থেকে আকাশমণ্ডল কিংবা চলমান জগতপ্রপঞ্চ অভিমুখে অভিযাত্রা নয়, অভিসারের আকাঙ্ক্ষাও তাঁকে তাড়িত করেনি। সুন্দর বদন, পেলব সুকুমার শরীর এবং প্রাণ লাবণ্যের রূপকার যামিনী রায়। যামিনী রায়ের হাতে বাঙলার পুতুল, কালীঘাটের পট এবং আরও নানা শিল্প-ঐতিহ্য নবীন জীবন লাভ করেছে।

৫

তাই বলে যামিনী রায়ের শিল্প শ্রম-ঘামের সংঘাত এবং জীবনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল আরো একজন শিল্পীর। তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাকের ছবি জয়নুল আবেদীনের ললাটে শিল্প-সম্ভাবনার সোনালী রেখা এঁকে দিয়েছিল। এটা চিন্তাকে নাড়া দেওয়ার মতো একটা সংবাদ বটে। অবনীন্দ্রনাথের অলকাপুরীর দূরদূরান্তরের আধেক স্পষ্ট আধেক অস্পষ্ট স্বপ্নবিজড়িত রোমাঞ্চ কল্পনা নয়, নন্দলালের ছন্দায়িত অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক অবাস্তবের আলিঙ্গনে বাঁধাপড়া ছিমছাম সুন্দর কোনো ফিগার নয়, আর মুখে বৈষ্ণব কবিতার ঢলঢলে লাবণী মাখানো গহন নয়না কোনো কামনার ধন নারীও নয়, অমঙ্গলের বার্তাবাহক একটা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

[illegible] ঢাকা।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাক — তাও আবার মন্বন্তরের কাক — শিল্পীর তুলিতে জন্মলাভ করে সকলের মনোহরণ করল। কিন্তু কেন? আর যিনি আঁকলেন তাঁর সমাজের মধ্যে, ঐতিহ্যের ভেতরে, পরিবার কিংবা পরিমণ্ডলের পরিসরে তুলির লেখনের কোনো আদর ছিল না। তথাপি এই তরুণ মুসলমান শিল্পী সৃজনীশক্তির যাদুতে কাকের ছবির মধ্যে মন্বন্তরের সমস্ত ভয়াবহতা, সমস্ত হাহাকার, সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সমস্ত হৃদয়হীনতা এমনভাবে মূর্ত করে তুললেন, এই সংবাদটির ভেতরে অনেকগুলো বড় বড় সংবাদ আত্মগোপন করে আছে।

অবনীন্দ্রনাথ যে সমাজের নিরাপদ পাটাতনে উপবেশন করে স্নিগ্ধ রুচি এবং পূর্ণিমার মধুযামিনীর স্বপ্নচর্চা করতেন, কালের ইঁদুর সেই নিশ্চিন্ত বিলাস-বাসরের কড়ি-বরগা এবং খিলানে খিলানে দংস্ট্রারেখা প্রবিষ্ট করিয়ে কেটেকুটে একাকার ছত্রখান করে ছেড়েছে। আর সেই রামধনু ছেঁকে তোলা চমৎকার সূক্ষ্ম রুচিরেখা কালের জল সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে নিয়ে গেছে। নন্দলালের স্বপ্ন-বাস্তব জড়াজড়ি করা ফিগারসমূহ ভয়ঙ্কর এবং অমঙ্গলের ত্রাসিত রূপ দেখে সভয়ে পালিয়ে বিশ্বভারতীর কলাভবনে মুখ লুকিয়ে বেঁচেছে। যামিনী রায়ের চাঁদপানা মুখের রমণীরা দুর্ভিক্ষের দেশ ছেড়ে, হাভাতের হা-ঘরেদের মুলুকের সীমানা অতিক্রম করে নগদ রজতমুদ্রার বিনিময়ে গোরা সৈন্যদের বগলে চড়ে ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছে। এই দুর্ভিক্ষ, এই অনাহার-যন্ত্রণা, এই ধ্বংসলীলা, এই অমঙ্গলের ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করবে কোন্ শিল্পীর চেতনালোক? জয়নুল আবেদন তাঁর শিল্পী-জীবনের সূচনা পর্বে সরল সবল বাহু দুটি দিয়ে এই বিনষ্টি, এই বীভৎসতাকেই আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

My All Garbage

গোটা মুসলিম সমাজটার চিত্রকলার হাতেখড়ি হয়েছে জয়নুলের মাধ্যমে। ব্যক্তি হিসেবে জয়নুলের জন্য এটা একটা অভাবিত ঘটনা বটে। কিন্তু সমাজটার কথা চিন্তা করলে মনে প্রত্যয় জন্মায় যে ঠিক সময়েই ঠিক মানুষটি জন্ম নিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের সিংহনাদ এবং বুলবুল-বচন বাঙলার কাব্যলোক ও সঙ্গীতলোকে বজ্রবাণ আর পুষ্পবৃষ্টি দুই-ই বর্ষণ করেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম নামের সিংহ-দরজা পেরিয়ে প্রাণের পতাকা উড়িয়ে বাঙলার কাব্যকাননে এলেন জসীম উদ্‌দীন, মহুয়ার মাদকতার সঙ্গে নিধুয়া পাথারের বিরহব্যথা সুরের দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে দিয়ে সঙ্গীত জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন আব্বাসউদ্দীন। প্রায় একই সময়ে চরণে ঝঙ্কার তুলে অপরূপ লীলালাস্য এবং গতিভঙ্গীমা সহ বুলবুল চৌধুরী গন্ধর্ব জগতে এসে উদিত হলেন। এই শিল্পী চতুষ্টয় আব্বাস-জসীম-জয়নুল-বুলবুল, ক্ষেত্র আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, কোথায় যেন এঁরা একই সূত্রে বাঁধা পড়ে আছেন। ছোটোখাটো বৈপরীত্যসমূহ আলাদা করে নিলে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে চারজনের মর্মমূলে একই ধরনের জীবনানুভূতি ক্রিয়াশীল। চারজনের ধমনীর শোণিতপ্রবাহে একই আকারের লোহিত তরঙ্গ জাগছে আর ভাঙছে। একই সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে একই সমাজের ভেতর থেকে একই সৌন্দর্যের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অগ্নিকাণ্ডে আত্মাহুতি দান করার জন্য এই ভক্ত চতুষ্টয় যেন সমবেত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের মানসে কর্ষণে, ঘর্ষণে এবং অনুশীলনে যে জীবনবোধের উন্মেষ এবং বিকাশ, এঁদের অবস্থান তার চাইতে অনেক দূরে। বুদ্ধির চাইতে আবেগ, চিন্তার চাইতে সংবেদনা, রীতির চাইতে স্বতঃস্ফূর্ততার দোলা, অনুশীলনের চাইতে সহজ প্রকাশের প্রবণতা এঁদের অনেক অনেক গুণে বেশি। এঁদের সকলের সাধনা এ সকল গুণে গুণান্বিত এবং পাশাপাশি এ সকল অবগুণে অবগুণ্ঠিতও বটে। তথাপি এ চারজন সমাজ-সংস্কৃতির এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত অবলীলায় প্রকাশমান করে তুলেছেন যার বোধটি পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর ছিল না; অথচ তা এ দেশেরই, এ সমাজেরই কর্মজীবী মানব- গোষ্ঠীর উজ্জ্বল, অতিশয় উজ্জ্বল এক উত্তরাধিকার।

উদাহরণস্বরূপ জসীম উদ্‌দীন যখন লিখলেন : "এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল / কালো মুখে কালো ভ্রমর কিসের রঙীন ফুল" — এই বর্ণনার একটা অমোঘ আকর্ষণী শক্তি আছে। শব্দের মধ্যে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না, শব্দার্থের মধ্যেও নয়, কিন্তু একঝোঁকে সবটা উচ্চারণ করে গেলে একটা সুঠামকান্তি গ্রাম্য যুবকের ছবি মনের পর্দায় ফুটে ওঠে। সেই ছবিটাই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। সে আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা একরকম অসম্ভব। অবচেতনে গোপন, বাঙালীর দ্রাবিড় পুরুষের চেহারায় চাষার ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়ালে পর সজ্ঞানে হেলাফেলা করলেও অবচেতনে খোঁজখবর নিয়ে সেবাযত্ন না করে উপায় নেই। আবার যখন জসীম উদ্‌দীন বলেন, "ইতলবিতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করে / দেইখ্যা আইলাম কালো মেয়ে গদাই নমুর ঘরে / ধানের পরে ধানের ছড়া তার উপরে টিয়া / নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারি পাখ্না দিয়া" এই চারটি পংক্তি পাঠ করার পরে একটি কর্মিষ্ঠা কালোবরণ নমু সমাজের চঞ্চলা বালিকার ছবি যেন হাওয়া ফাঁক করে মূর্তি ধরে জেগে ওঠে। তাকে কি সুন্দর বলা যাবে? এ দেশের কাব্যের সৌন্দর্যের বাঁধাধরা যে সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, না সে বিচারে নমুর মেয়েকে সুন্দরী বলা যাবে না। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, রাধা-কৃষ্ণ লীলায়, এমনকি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সে অর্থেও নমুকন্যা সুন্দরী নয়। ইরান-তুরানের রূপকথা-উপকথা অবলম্বন করে পুঁথি-সাহিত্যের যে ভাণ্ডার রচিত হয়েছে, সেখানে কাজলটানা সুর্মাআঁকা চোখের যে সকল নায়িকাকে আদর্শ সুন্দরী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাদের দলেরও কেউ নয় আমাদের এই নমু ঘরের কালোবরণ বালিকাটি। তাহলে কি তাকে 'সুন্দরী নয়' বলব? এইখানে সমস্ত অনুভূতি পড়ে পাওয়া নান্দনিক বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে; চেতনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দৈববাণীর মতো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে : সে সুন্দরী, সে সুন্দরী। কোনো ধরনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মেলে না কিন্তু সুন্দর হয় কেমন করে, আর অসুন্দর বলতেও মনে চাইছে না, আবার সে দৈববাণী ঘোষিত হয় চেতনার স্তরে : এ সৌন্দর্য বিচারের নয়, বোধ করার; বাইরের নয়, ভেতরের। এ তর্ক করার নয়, মেনে নেয়ার। লম্বা মাথার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চুল কালোবরণ চাষীর ছেলে সে সুন্দর, নম্রুর ঘরে কালো মেয়ে যে সর্বক্ষণ কাজ করে বেড়ায় সে সুন্দরী। এই সুন্দর এ সুন্দরীরা শুরু থেকে আমাদের ইতিহাস আলো করে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আমাদের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত, কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তা যারা কস্মিনকালেও করেনি অথচ ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকলে হাজার হাজার বছর ধরে পিষ্ট হয়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দর পেলব বৈশিষ্ট্যসমূহকেও অনাদর করতে শিক্ষা করেছে, জসীম উদ্‌দীনের কবিতা তার প্রথম শিল্পিত প্রতিবাদ। জসীম উদ্‌দীন কাব্যকলার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন শ্রমনিষ্ঠ মানুষ-মানুষীর মধ্যে। এই শ্রমনিষ্ঠ মানুষের অন্তরের সুন্দর সুরে সুরে মুক্তি দিয়েছেন আব্বাসউদ্দীন। এই মানুষদেরই চলার ছন্দ, জীবনস্পন্দনের হাজারো রকম বৈচিত্র্য বুলবুল চৌধুরী নাচের তালে তালে ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়নুল আবেদীনের ছবিতে এই কর্মচঞ্চল মানুষ-মানুষীরাই নতুন প্রাণের বরে চিরদিনের জন্য আয়ুষ্মান হয়ে রয়েছে। জয়নুল আবেদীনের হাত দিয়ে বাঙলার চিত্রকলা নতুন একটা কক্ষপথে যাত্রা শুরু করল। জয়নুল আবেদীনের শিল্প-কর্মে একটি সমাজের গভীর জীবনভাবনা আন্দোলিত হয়েছে, একটি সমাজের চলচ্ছবি দ্রুত ধাবমান বিজুরীরেখার গতিশীলতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অবনঠাকুর, নন্দলাল কিংবা যামিনী রায়কে জীবনের সে সংঘাতময় চলমানতা, সে গতিচ্ছন্দ তাঁদের শিল্পে মূর্ত করার কথা ভাবতে হয়নি। তার কারণ আংশিক সামাজিক এবং আংশিক শৈল্পিক। অবনীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে মানুষ, যে বোধ উপলব্ধি তাঁর শিল্পচর্চার রক্তবাহী শিরার মতো তাঁকে বেগ-আবেগ দুইই যুগিয়েছে, সেই বোধ সেই উপলব্ধি তাঁকে ইতিহাসের অতি দূর-দূরান্তরের পরিব্রাজক করে ছেড়েছে, রামধনুর কায়াহীন ছায়ার সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়েছে। এদেশীয় চিত্রকলার নবজীবন প্রাপ্তির প্রদোষকালে অবনীন্দ্রনাথের এই ভূমিকা অতিশয় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ছিল। মাটির পৃথিবীতে অনুপম স্বর্গলোক সৃজনের প্রয়াস নন্দলালের পক্ষেই শোভা পায়। চাঁদপনা মুখের একই ডৌল একই ভঙ্গীর প্রতিমা নির্মাণ যামিনী রায়কেই মানায় ভালো।

কিন্তু জয়নুল আবেদীন? তিনি ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন যুগের, ভিন্ন সমাজের শিল্পী। তাঁর চেতনার স্তরে স্তরে ভিন্নরকম জীবনবীক্ষা এবং জীবন-অভিজ্ঞতা মর্মর ধ্বনিতে বাঙলার মুসলিম সমাজ, বৃহত্তর অর্থে বাংলার কৃষক সমাজের জীবন সঙ্গীত বাজিয়ে তুলছে। যোজন-যোজন মাঠব্যাপী ছড়ানো উৎপাদন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙলার কৃষক, বংশ-পরম্পরা কায়িক শ্রমে যাদের একমাত্র উত্তরাধিকার। এই বৃক্ষপ্রতিম অচল সমাজের মানুষেরা শিল্পীর মনের দুয়ারে সবেমাত্র টোকা দিতে আরম্ভ করেছে। শ্রমে-স্বেদে সিক্ত মলিনমুখো মানুষেরা শিল্পীর কাছে আবেদন জানাতে লেগেছে : আমাদের মূর্তিমান করো, প্রকাশিত করো। অবনীন্দ্রনাথ কেমন করে সে আহ্বান শুনতে পাবেন? নন্দলাল কেমন করে স্নিগ্ধ রঙে চুবিয়ে রোদে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা এই মানুষদের ছবি আঁকবেন? যামিনী রায় কোন্ সাহসে সুন্দরীদের সঙ্গ ছেড়ে এমন নিস্বাদ চাঁচাছোলা জীবনসংগ্রামের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হবেন? এই নিসর্গনির্ভর মানুষদের বার্তাবাহক একজন শিল্পী প্রয়োজন। তাই এলেন জয়নুল আবেদীন।

তেরোশো পঞ্চাশের ভয়াবহ মহামারী-মন্বন্তর, মহাযুদ্ধের বীভৎসতা এবং শহর কলকাতার দুঃসহ সামাজিক বাস্তবতা একযোগে তাঁর স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে দিয়ে কাকের ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিল। একটি পর্যায়ে, শুধু একটি পর্যায়ে তাঁর তুলি মানবতার বীভৎস করুণ রূপসৃষ্টির দিকে ধাবিত হয়েছিল। এটা শিল্পীর স্থায়ী পরিচয় নয়, পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা। শিল্পী জয়নুল তাঁর যৌবন-দিনে একবার জ্বলে উঠে, এই পর্যায়ের চিত্রসমূহের মধ্যে যুগের পরিবর্তন, শিল্প-রুচি এবং শিল্পাদর্শের পালাবদল এবং সমাজ-আদর্শের রূপান্তর কত কিছুর ঘোষণা রটিয়ে দিতে পেরেছিলেন! এ সকল কারণেই তাঁর এ পর্যায়ের ছবিসমূহ হানা দিয়ে চিত্রপ্রেমিকদের মনে স্থান দখল করে নিতে পেরেছে।

কিন্তু সামাজিক চিত্রাবলীর মধ্যেই শিল্পী জয়নুলের প্রকৃত এবং স্থায়ী পরিচয়। যে সকল চিত্রের মধ্যে বাঙলার ইতিহাস হাজার বছরের ওপার থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, শত অবগুণ্ঠনের অন্তরাল ভেদ করে গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষের সরল জীবনযাত্রা উঁকি দিতে পেরেছে, সেখানে, কেবলমাত্র সেখানেই জয়নুলের সুন্দর চিত্র-শরীরে কান্তিমান হয়েছে। তাঁর পিতৃনিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের ধারের ময়মনসিংহের সে পাটক্ষেত, সে চাষা, সে মাঝি, সে নৌকো, সে ধানক্ষেত, হাল-লাঙল-বলদ, পাঁড়াগেঁয়ে বিয়ের আসর, পাল্কি চড়ে নববধূর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, দুধাল গাই, গুণটানা নাও, তেজী ষাঁড়, গাবের কষে রাঙানো জেলেদের মাছ ধরা জাল, কৃচিৎ কখনো একজন-দু'জন বিরল সাঁওতাল রমণী, বাঙলার আবহমান কালের চিরপরিচিত এ সকল দৃশ্যে জয়নুল আবেদীন তাঁর সুন্দরকে আবিষ্কার করেছিলেন। এ সুন্দর অবনীন্দ্রনাথের মায়ামরীচিকার সুন্দর নয়, নন্দলাল বসুর স্নিগ্ধশোভন ধ্যানদৃষ্টির সুন্দর নয়, যামিনী রায়ের অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে অন্তর উদ্ভাসিত হওয়া সুন্দর নয়। এ সুন্দর রক্তমাংসে চলা-অচলা, স্থূলে-চিকনে মেশানো সুন্দর। জসীম উদ্‌দীনের কবিতার মতো তাকে হাত দিয়ে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো একটি আভাস মাত্র রচনা করে ধূপের শরীর ধরে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় না।

জয়নুলের আঁকা ছবিগুলো একটার পাশে আরেকটা সাজালে গ্রামীণ মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের বিচিত্রমুখী রূপটিই প্রকটিত করে তুলবে। মনে হবে এক একটি ছবি আরেকটি বড় ছবির স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। আর সে বড় ছবিটি বাঙলার উৎপাদনশীল মেহনতী মানুষের সমাজ-কাঠামো। এই পরিপ্রেক্ষিতটা আবিষ্কার করাই হলো চিত্রকলার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীনের মৌলিক অবদান।

আর্ট স্কুলে ছাত্র হিসেবে অবনঠাকুর-নন্দলাল-যামিনী রায়ের ঘরানা যে স্টাইল বা অঙ্কন-শৈলী তিনি রপ্ত করেছিলেন, তাঁর আপন বিষয়ে প্রয়োগের বেলায় দেখা গেল সে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রীতি ছোট মাছধরা জালে সামুদ্রিক তিমি আটকাবার দুরাকাঙ্ক্ষার মতোই অকেজো এবং হাস্যকর। এই গ্রাম বাঙলার শ্রম-ঘাম সংগ্রামে কাতর মানুষের ছবি ফোটাতে গিয়ে তুলির মুখে জেগে উঠল বিদ্রোহের ঢেউ, রেখা গেল বেঁকে, শ্রমজীবী মানুষের চকচকে পেশী সাপের ফনার মতো রঙের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় ফুলে উঠল। কখনো বা রঙের যাদু সময়-সমুদ্র মন্থন করে এমন একখানা মুখদর্পণ কোত্থেকে টেনে আনল, চোখ পড়লে হঠাৎ করে অনেক প্রকাশহীন কথা বুকে কারণহীন ব্যথায় আকুলিবিকুলি করে। এই তো জয়নুল আবেদীন! অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের যে ধারাটি রামধনুর রঙে রঙে মুক্তি দিয়েছিলেন, ইতিহাসের স্বপ্ন-কল্পনার জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই একই ধারাটিকে তিনি অপার মমতায় বাঙলার প্রাকৃত জনগণের জীবনের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে গেঁথে দিতে পেরেছেন। এ কি কম কথা! তবু এই জয়নুল আবেদীন বড় বেশি একঘেঁয়ে, বড় বেশি প্রাদেশিক। ইনস্টিঙ্কটকে ছাড়িয়ে তাঁর ছবি কোনো উচ্চতর আবেদন, সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সত্যি অপারগ। তাঁর ছবির নর-নারীগুলো যেন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল এক একটা টাইপ বিষয়বস্তু। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ বড় একটা চোখে পড়ে না। তাঁর শিল্পী-জীবনেও তেরোশো পঞ্চাশের হঠাৎ জ্বলে ওঠার ক্ষণটি ছাড়া আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রাণধর্মী তাগিদ কিংবা প্রেরণার বড় অভাব। শেষ পর্যন্ত জয়নুল আবেদীন চিত্র আঁকার শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন, আর শিল্পী ছিলেন না। উনিশশো সত্তর সালের সর্বগ্রাসী বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের পর 'মনপুরা' শীর্ষক চিত্রে আরেকবার যৌবন দিনের মতো জ্বলে উঠবার একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভয়বহতার প্রতীক স্বরূপ ঢেউগুলোকে হাঙ্গরের বিরাট বিরাট হা-য়ের মতো করে এঁকেও ছিলেন। কিন্তু সে ছবি অভ্যস্ত হস্তের নির্মাণ কৌশল অতিক্রম করে সঠিক সৃজনকর্ম হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। চিত্রকলার বোধ এবং উপলব্ধির দিক দিয়ে, নিষ্ঠা এবং সাধনার গভীরতার বিচারে জয়নুল আবেদীন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল. যামিনী রায় এই তিনজন শিল্পীর পাশাপাশি স্থান পেতে পারে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে দেখতে হবে। তথাপি জয়নুল আবেদীন বড়, তাঁর হাতে আটকোটি মানুষের একটা জাতি চিত্রশিল্পের দীক্ষালাভ করেছে। বলতে গেলে তাঁর একক প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে একটি চিত্রকলার পীঠস্থান রচিত হয়েছে। একসময় ভারত ভাগ না হলে হয়তো জয়নুল আবেদীনকে সে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হত না এবং তিনি আরো বড় শিল্পী হতে পারতেন। কিন্তু সব কথার সার কথা হলো, ভারত বিভক্ত হয়েছিল। ছবি আঁকা বাদ দিয়ে জয়নুলকে ছবি আঁকার মাস্টার হতে হয়েছিল।

৬

'কবিকে যাবে না পাওয়া জীবন-চরিতে' — রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দিত বাক্য কবির বেলায় সত্য হতেও পারে। কিন্তু কবিকে পাওয়া যাবে কোথায়? সহজ উত্তর : কবিতায়।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কিন্তু কবিতায় যেটুকু পাওয়া যায় — অর্থাৎ কবির প্রাণ-পাতালের আলো-আঁধারের ঝিকিমিকি — সেই চিন্ময় প্রাপ্তিতে মন যখন বশ মানে না, বুদ্ধি সন্তুষ্ট হতে চায় না, বাকীটুকু খুঁজতে হবে কোথায়? তারও সহজ উত্তর : জীবন। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই : কবিকে পাওয়া যাবে প্রথমে কবিতায়, তারপর জীবন-চরিতে — অবশ্য যদি হয় তেমন জীবন-চরিত।

শিল্পীকে পাওয়া যাবে শিল্পে। সেটাও এক ধরনের পাওয়া বটে। সে পাওয়া দিয়ে শিল্প উপভোগ করা যায়, তারিফ করা যায়, বাহবা দেওয়া যায়, কিন্তু শিল্পের বিচার করা যায় না। রেনেসাঁস পরবর্তী যুগে অনেক কলা সমালোচক রেনেসাঁস যুগের চিত্রকর ও ভাস্করদের অঙ্কনরীতি এবং নির্মাণশৈলীর নানারকম ব্যাখ্যা-বিচার করেছেন। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ইতিহাসে কার কোথায় স্থান, কার প্রভাব কার ওপরে কতটুকু, কার প্রাতিস্বিকতা কতদূর — এসব নিয়ে বিস্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। ভাসারীর সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থটির পাশে এসব তত্ত্ব এবং তথ্য বিন্যাস, নন্দনতত্ত্বের উর্ণাতন্তু বিস্তার বড় বেশি কাগুজে এবং বড় বেশি মেকী মনে হয়। তার একটি মুখ্য কারণ, ভাসারী শিল্পের আর শিল্পীর এমন একটি সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছেন, পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার সজীব ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কের তুলনামাত্র যার সাথে করা যায়। তিনি বহু খ্যাত, কম খ্যাত এবং একেবারে অখ্যাত শিল্পী আর ভাস্করদের জীবনবৃত্তান্ত এমনভাবে সংকলন করেছেন, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ ঘরোয়া স্বভাব এবং বেপরোয়া প্রবণতাসমূহ এমনভাবে ধরেছেন, শিল্পে সেগুলোর ছায়াপাত কিভাবে ঘটেছে এমনভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, কাঁচের আঁধারে শাখা-পত্রে পল্লবে-মুকুলে বর্ধিষ্ণু তরুর দীঘল শরীর যেমন দৃষ্টিগোচর; তেমনিভাবে শিল্পীদের মানস-পরিণতির ছবিটি লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচনায় এই সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত গ্রন্থটি এত অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে যে আরভিং স্টোন যখন মিকেলেঞ্জেলো ও ভ্যানগ'র জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, সমারসেট মম যখন পল গঁগার জীবনকাহিনী লেখেন অথবা রঁমা রঁলা উপন্যাসের পরিসরে সঙ্গীত-শিল্পী বেটোফোনের মানস-জীবনের নিরন্তর ঝঞ্ঝাকে ধারণ করতে চেষ্টা করেন, তখন সকল প্রয়াসের মধ্যে ভাসারীর 'লাইভ্‌স অব দ্য রেনেসাঁস পেইন্টার্স'-এর একটা জলছবি কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কেমন যেন ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়।

এ দেশের চিত্রকলার আলোচনা-সমালোচনার ধারাটি বলতে গেলে একেবারেই অর্বাচীন এবং সে কারণেই গভীরতা বিবর্জিত। অজন্তা গুহাগাত্রের আশ্চর্য ছবিগুলো কারা এঁকেছিলেন? প্রশ্ন করলে গুহার অভ্যন্তরে সে প্রশ্ন শুধু ধ্বনি-প্রতিধ্বনি রচনা করে, কোনো জবাব টেনে আনে না। তাজমহলের স্থপতি কে বা কারা? এ ব্যাপারেও একরাশ মৌনতা চারপাশ থেকে ছুটে এসে প্রশ্নকারীর কণ্ঠস্বর গ্রাস করে ফেলে — জবাব মেলে না। ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যকলার স্রষ্টারা মা-মাকড়সার মতো। হাড়-মাংস অস্থি-মজ্জা সবটুকু ক্ষয় করে বাচ্চা ফুটানোর কাজে। যখন বাচ্চা ডিম ফুটে বেরুলো পৈয়াজের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

খোসার মত ফুরফুরে একখানি কঙ্কাল ছাড়া আর কোথাও মায়ের চিহ্ন নেই। ছবি আঁকা হয়ে গেলে, ভাস্কর্য গঠিত হওয়ার পরে শিল্পীর আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাই অজন্তাতে হোক, ইলোরাতে হোক, তাজমহলে, কুতুব মিনারে, রাজপুত চিত্রে, কানাড়া চিত্রে, মোগল চিত্রে যিনি শিল্পী তিনি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, তাঁর নাম-ধাম কুল-পরিচয় কেউ জানে না।

ইউরোপীয় আদর্শে নব্য-চিত্রকলার বিকাশ ঘটলেও যথার্থ অর্থে চিত্র-সমালোচনার ধারাটি এখানে অধ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। এখানে এক ধরনের সমালোচনার চল আছে, তা যে একেবারে অন্ধ তাও সত্য নয়। এমন পারঙ্গম চিত্র ভাষ্যকার যথেষ্ট ছিলেন, বা এখনো আছেন যাঁরা উৎকৃষ্ট চিত্রের মর্মোপলব্ধি করতে পারেন, শিল্পীর প্রাতিস্বিকতা অনুভব করতে পারেন, রঙ-রেখার আঁকাবাঁকা বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান করে তুলতে পারেন, বিমূর্ত চিত্রের মধ্যে অর্থের ব্যঞ্জনাও আবিষ্কার করতে পারেন। তারপরেও কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যায়। শিল্প আর শিল্পীর মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক, জৈবিক এবং সক্রিয় সম্পর্ক সূচক চিত্র-আলোচনার ধারা এখানে আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। আমাদের দেশে প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীকে এখনো অনেকটা বিশেষ জাতের, বিশেষ ধাঁচের উন্নত শ্রেণীর কারিগর হিসেবে বিচার করা হয়। শিল্প থেকে শিল্পীকে আলাদা করে দেখার সনাতন অনীহা কাটতে কাটতেও যেন কাটে না। একজন বিজ্ঞানী যে মেধাশক্তি প্রয়োগ করে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন, যে মেধার বলে পারস্পরিক যুক্তি-শৃঙ্খলার বিন্যাসে একজন দার্শনিক জীবন এবং জগতের নতুন অর্থ নির্দেশ করেন, একজন উৎকৃষ্ট কবি যেভাবে সনিষ্ঠ মেধাশক্তির প্রয়োগে উপমা-চিত্রকলা-ছন্দ-অলংকার সহযোগে আনন্দলোকের দুয়ার মুক্ত করেন, চিত্রকরের দক্ষতাকে কবি-বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের সেরকম সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে বরণ করার মতো মানসিক পরিপক্কতা আমাদের সমাজ অর্জন করতে পারেনি। চিত্র-শিল্পীর প্রতিভার যে কদর আমাদের সমাজে তা অনেকটা দায়ে পড়ে, ঠেকে এবং বাধ্য হয়ে কদাচিৎ তা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিশীলতা খাটো করে দেখা হয় বলেই আমাদের সমাজে চিত্রশিল্পীর এমন অনাদর। চিত্র-শিল্প সমাজের বৈঠকখানায় ঠাঁই পেয়েছে বটে, অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেনি। এটা আমাদের ইউরোপীয়দের কাছ থেকে দেখাদেখি শেখা। এখনো পুরোপুরি আপনার নিজের জিনিস করে নিতে পারেনি। অবশ্য এর সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক রুচির পরিশীলন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

সে যা হোক, শেখ মুহম্মদ সুলতানের চিত্রকর্ম আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই তাঁর জীবন আলোচনা করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে জয়নুল আবেদীন পর্যন্ত সমস্ত শিল্পীর যে জীবনবৃত্তান্ত আমরা জানি তার সঙ্গে শেখ সুলতানের জীবনবৃত্তের সামান্যতম মিল কোথাও নেই। অন্য সকল শিল্পীর জীবন এবং তাদের কৃত শিল্পকর্ম একটা ছকে ফেলে বিচার করা যায়। শেখ সুলতানের জীবনকে যেমন তেমনি তাঁর ছবিকেও বিচার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করতে হবে অনেকগুলো ছকে ফেলে এবং তার সবগুলো আমাদের মানস-দৃষ্টির সামনে উপস্থিতও নেই। সুলতানের জীবন বলতে বড়জোর যা বলতে পারি তা হলো, লালমিয়া নামে একটি শিশু যশোর জেলার একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে আজ থেকে পঞ্চান্ন কি ষাট বছর আগে জন্ম নিয়েছিল। সেই শিশুটিই এখন শেখ সুলতান নাম ধারণ করে যশোরের সেই কৃষক সমাজে ঝাঁকড়া কেশ দুলিয়ে নমঃশূদ্র নর-নারীর আদরের গোসাই সেজে, অর্ধেক ছন্নছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া, অর্ধেক সন্তের বেশে সাপ-শেয়াল-ইঁদুর-বেড়াল নিয়ে রঙের সংসার পেতে বসে আছেন।

আজকের দিনে সুলতান বলতে যশোরের যে ঝাঁকড়া কেশের আউলা-ঝাউলা মানুষটিকে বোঝায়, যিনি প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে বেশ কিছুদিন আগে পা রেখেছেন; পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-সংসারহীন একেবারে একাকী একজন প্রাকৃতিক মানুষ; তিনি যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, উনিশশো সাতাত্তর সালে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীর প্রদর্শনী উপলক্ষে আঁকা এ সকল চিত্র-সন্তান ছাড়া তাঁর নামের অমরতা ঘোষণা করার আর কেউ থাকবে না।

কস্তুরী হরিণের মতো আপনার গন্ধের পেছনে আপনি কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর বেগে, প্রাণ-প্রবাহের তাপে, 'হেথা নয় হেথা নয়' নিরন্তর তিরিশটি বছরের ছুটে চলা জীবনের সমস্ত বেগ, সমস্ত আবেগ যশোরের ভাঙা মন্দিরের দ্বারে দ্বারে, জীর্ণ অট্টালিকার খিলানে-অলিন্দে, তরুলতার সংসারে, পশু-পাখির সমাজে অসহায় শিশুর মতো গৃহ-সন্ধান করে চলেছে। জীবন যাঁকে হেঁচকা টানে গৃহ-সমাজ-সংসারের বন্ধন খসিয়ে শিল্পতীর্থের যাত্রী করেছে, শিল্পের মানস-সায়রের উপকূলেই তো তাঁকে গৃহ-সন্ধান করে নিতে হয়। এ গৃহের সন্ধান তিনি একবার পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন উনিশশো একাত্তর সাল। হাজার বছরের পরাধীন বাঙলা, প্রাণ-পাতালের অভ্যন্তরে অপরাজেয় সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, দর্পিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে, ভেতর থেকে শিউরে শিউরে আগুনবরণ ফণা মেলে জেগে উঠেছিল। বাঙলার ইতিহাসের সেই অভাবিত, সেই অচিন্তিত-পূর্ব জাগরণের তরুণ আভায় তাঁর একখানি আশ্রয় নিকুঞ্জের ছায়াদর্শন করেছিলেন শেখ সুলতান, কামান-বন্দুকের হুঙ্কারের মধ্যে গৃহের কল-কাকলি কান পেতে শুনেছিলেন। ইতিহাসের এই থরেথরে কম্পিত জাগরণের মধ্যে তিনি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন : সমাজের ওপরতলার শ্রেণীগুলো, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে যারা উপনিবেশিক শক্তির সহায়তা দিতে দিতে উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কহীন পরগাছার মত ফাঁপানো-ফোলানো জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই সামাজিক ভূমিকম্পে তাদের অস্তিত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, সময়ের প্রখর তাপে তাঁরা মোমের পুতুলের মতো গলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই কম্পনের বেগ ধারণ করা তাদের সাধ্যের বাইরে — এই জাগরণের আগ্নেয় সংবাদ বহন করতে গিয়ে তাঁরা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। পাশাপাশি আরেকটি শ্রেণীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, প্রকৃতি এবং ইতিহাসের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গভীরতম অঙ্গীকার যারা নিরবধিকাল ধরে বহন করে চলেছে, নতুন ফুটন্ত ইতিহাসের আবেগ-উত্তাপ সবটুকু পান করে ফুটে উঠবার বীর্য এবং বিকাশমান সৃষ্টিশীলতা যাদের আছে। সেই শ্রমজীবী কিষাণ জনগণকে তিনি বাঙলার ইতিহাসের নবীন কুশীলব হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। এ দেখা সমাজ-বিজ্ঞানীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল বিচার নয়, অর্থশাস্ত্রীর চুলচেরা শ্রেণী-বিশ্লেষণ নয়। এ দেখা শিল্পীর দেখা : বিন্দুতে সিন্ধু ঝিলমিলিয়ে ওঠে, ক্ষুদ্র তিল পরিমাণ বীজকণার অন্তরে সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে শায়িত থাকে বিশাল মহীরুহ।

তাই সুলতানের কৃষক জয়নুল আবেদীনের কৃষক নয়। জয়নুল আবেদীনের কৃষকেরা জীবনের সংগ্রাম করে। সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন। তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশীর শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রকৃতিকে ফুলে-ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে। এইখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন, আজ এবং আগামীকাল একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। সুলতানের কৃষকেরা নেহায়েত মাটির করুণা-কাঙাল নয়। রামচন্দ্র যেমন অহল্যা পাষাণীকে স্পর্শ করে মানবী রূপ দান করেছিলেন, তেমনি তাঁর মেহনতি মানুষদের পরশ লাগা মাত্রই ভেতর থেকে মাটির প্রাণ সুন্দর মধুর স্বপ্নে ভাপিয়ে উঠতে থাকে। এ মানুষগুলো পাখা থাকলে দেবদূতের মতো আকাশের অভিমুখে উড়াল দিতে পারত। কিন্তু একটি বিশেষ ব্রতে, একটি বিশেষ অঙ্গীকারে আবদ্ধ বলেই তারা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে আছে। সে অঙ্গীকারটি, সে ব্রতটি মাটিকে গর্ভবতী ও ফসলশালিনী করা। মাথার ওপরে স্বর্গলোকের যা কিছু প্রতিশ্রুতি, যা কিছু প্রেরণা তার সবটুকু – আকাশের নীল থেকে, রামধনুর বর্ণের সুষমা থেকে ছেঁকে এনে মাটির ভেতরে চারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই মানুষ-মানুষীর দল। ম্যাক্সিম গোর্কীর সেই বাক্যটি 'কি দর্পিত, কি ব্যঞ্জনাময় এই মানুষ শব্দটি' — উচ্চারণ মাত্রই নিসর্গের অন্তরে কি ব্যাকুল সাড়া এবং কানাকানি পড়ে যায়। সুলতানের আঁকা এই কৃষকদের যিনি দেখেছেন, অবশ্যই একমত হবেন, ম্যাক্সিম গোর্কীর মানুষ সম্পর্কিত মন্তব্য কত সার্থক এবং যথার্থ হয়েছে।

ইতিহাসের অয়নান্তকালে একটি নতুন শ্রেণী সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে নতুন ঐতিহাসিক বলে বলীয়ান হয়ে, নতুন সামাজিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন জাগ্রত হয়; শিল্পকলাতে সে সমাজের ব্যক্তি-স্বরূপের অভিব্যক্তি যখন ঘটতে থাকে, তখন ব্যক্তি ব্যক্তিমাত্র থাকে না, জাগরণশীল নিখিলের অংশ হয়ে যায়। রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মধ্যে একবার জাগরণশীল নয়া নিখিল পুরনো চরাচরের নাগপাশ ছিন্ন করে মূর্তিমান হয়েছিল। দেবতা এবং দেবলোকের নষ্ট-অপচিত স্বপ্নের অশরীরী সৌন্দর্যের মায়াকাননের বলয় গ্রাস থেকে চিন্তা-কল্পনাকে মুক্ত করে প্রাকৃতিক নিয়ম শাসিত এই পৃথিবীর দিকে, এবং সমস্ত সুন্দরের নিবাসভূমি এই দেহ-দেউলের প্রতি বিস্ময়াপ্লুত নয়ন মেলে অগ্রপথিক মানুষেরা যখন নয়া মানব-বিজ্ঞানের প্রসাদে, সম্ভাবনা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্পন্দিত অন্তরে তাকাতে আরম্ভ করেছে: সেই দেখার আবেগ, প্রত্যাশাই রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

শরীরী সৌন্দর্যের প্রতি এই গভীর অনুরাগ, সুন্দর এবং শক্তির এই যুগল সম্মিলন রচনার কৌশল সুলতানের রেনেসাঁস শিল্পীদের কাছে শেখা। ভাগ্যবশত রেনেসাঁস শিল্পের পীঠস্থানসমূহে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ তাঁর হয়েছিল। পুরনো দেবতারা যেমন মরে না, পুরনো শিল্পীও তেমনি অমর। গ্রীসের রঙ্গমঞ্চ যখন শুধু একটা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, দেবী এ্যাথেনীর মন্দির যখন একটা পাথুরে কঙ্কাল মাত্র, ভাস্করের খোদাই করা রস-লাবণ্য মাখানো মূর্তিসমূহ খোঁড়া-অন্ধ-বিকলাঙ্গ, কালের প্রহার অঙ্গে ধারণ করে সময়-সমুদ্রে বিলীন গরীয়ান গ্রীক সভ্যতার যৌবন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দর্শকের বুকে একটু করুণা, একটি দীর্ঘশ্বাস জাগাবার জন্য দিবস-রজনী, মাস-বছর, যুগ-যুগান্ত প্রতীক্ষা করছে; সেই সময়ে খৃষ্ট-ধর্মের বর্বরতা ঠাসা আদিম অন্ধকার থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় 'আলো-আলো' বলে চিৎকার করছে তামাম ইউরোপ। আলো চাই, আরো আলো চাই। টলেডো, কর্ডোবা, গ্রানাডার মুর পণ্ডিতেরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে দিক-নির্দেশ করল : যাও গ্রীসে যাও। আলো জ্বালানোর কৌশল শিখতে চাও তো গ্রীক লেখকদের লেখা পড়ো, তাদের ধ্যানের দীপ্তি, মননের ঐশ্বর্য অন্তরে ধারণ করো।

ইহজাগতিকতা বা সেক্যুলারিজম, যার অর্থ এই জগৎ সুন্দর, এই জীবন সুন্দর, এই জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কর্ম, সমস্ত অভিব্যক্তি সুন্দর। প্রাচীন গ্রীস বার্ধক্যের জীর্ণতার ভারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লেও তার হৃদয়ে এই অবিনাশী সৌন্দর্যের প্রেরণার ঝর্ণা-ধারা, এই ধ্বংশস্তূপের অন্তরালে, এই মৃত্যু-হীম শীতলতার গভীরে এখনো উষ্ণস্রোতে প্রবহমান। ইউরোপে সে কি উৎসবের সাড়া! দলে দলে বলাকারা যেমন মানস-সরোবরের সন্ধানে যায়, ইউরোপের আলোকিত আত্মারা প্রাচীন এ্যাথেন্স নগরীর অভিমুখে মানস-যাত্রা রচনা করল। রব উঠল : গ্রীকদের মতো চিত্র আঁকতে হবে, ভাস্কর্য গড়তে হবে, নাটক লিখতে হবে, খ্রিস্ট ধর্ম যেসব একান্ত মানবিক বোধের মুখে পাথর চাপা দিয়েছে সে সমস্ত অর্গল টুটিয়ে দিয়ে একান্ত জৈবিক অনুভূতিসমূহও থরে থরে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই ফোটার কাজ শিল্প-সাহিত্যে, চিত্র-ভাস্কর্যে, বিজ্ঞানে-দর্শনে এমনিভাবে ঘটেছে সৃজন-ঋতুর কল্পনা করা মাত্রই মন একলাফে রোম, ভেনিস, জেনোয়া — এ সকল নগরীর দিকে যাযাবর বিহঙ্গের মতো ছুটে যেতে চায়।

শেখ সুলতানের মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জোলো, রাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর প্রকাণ্ড কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এত গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ, কোনরকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া, সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে এই উনিশশো সাতাত্তুর সালের বাংলাদেশের কৃষক সমাজে এসে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে। পরিবারের মায়া, বংশধারার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রবাহিত করার স্বাভাবিক জৈবিক আকাঙ্ক্ষা ভেতর থেকে ছেটে দিয়ে, এই চিত্র-সন্তান জন্ম দেয়ার একাগ্রপ্রায় কাপালিক সাধনায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে সারাজীবন। শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাঙলার শিল্পীর হাত দিয়ে বাঙলার প্রকৃতি এবং বাঙলার ইতিহাসের একেবারে ভেতর থেকে রেনেসাঁস যুগের ফুল ফুটেছে। সুলতানের সাধনা মিথ্যা হয়ে যেত, যদি না বাঙলার শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করে একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জাগ্রত-দেবতা আপন স্বরূপে শিল্পীরা সামনে এসে না দাঁড়াতেন।

এইখানেই সুলতানের অনন্যতা। এইখানেই বাঙলার কোনো শিল্পীর সঙ্গে, ভারতবর্ষের কোনো শিল্পীর সঙ্গে সুলতানের তুলনা চলে না। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল, জয়নুল আবেদীন, আবদার রহমান চাঘতাই, নাগী — এ সকল দিকপাল শিল্পীর মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, তবু সকলের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র অবশ্যই রয়ে গেছে। হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পাদর্শের যে ব্যাপক সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, কেউ তার আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি — একমাত্র সুলতান ছাড়া। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন যখন মহাকাব্য লিখেছেন তার বহু আগেই ইউরোপে মহাকাব্য লেখার কাজ চুকেবুকে গেছে। কিন্তু মধুসূদন মহাকাব্য লিখলেন বাংলা ভাষায়। মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য বাংলার সাহিত্যগগনে সূর্য-সঙ্কাশ দীপ্তি নিয়ে, অনন্যতার নিদর্শন হয়ে মানব কল্পনার কুতুবমিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অতিকায় কল্পনার বোঝা আরো অধিক বহন করবার জন্য তাঁর স্বগোত্রীয় কবিকুলের মধ্যে দু'চারজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মালেও ক্ষমতা কারো যে ছিল না, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুলতানের এই চিত্রগুলোও অনেকটা সে গৌরবে গরীয়ান।

শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন মহেন্দ্রক্ষণের হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে যখন গোটা ইতিহাসের ধারাটাই শিল্পীর চেতনলোকে মাতম করে ওঠে। সেই বিশেষ সময়টিতে নিসর্গের স্থূল-চিকন দৃষ্টি-অগোচর কার্যকারণ সম্পর্কের সম্পূর্ণ সূত্রটাই শিল্পী-চেতনার মুকুরে এমনভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই গহন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বভাব সম্বন্ধে শিল্পীর নিজেরও কোনো স্বচ্ছ, যুক্তিনিষ্ঠ ধারণা থাকে না। তা থাকা সম্ভবও নয়, আর শিল্পীর জন্য প্রয়োজনও নয়। এই একান্ত সংগোপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দোলা, যার আবেশে শিল্পী সব ভুলে শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করে, তার সহজ নাম প্রেরণা। প্রেরণার স্পর্শ না পেলে কিছুই নির্মাণের স্তর অতিক্রম করে শিল্পকর্মের ব্যঞ্জনা লাভ করে না। আবার সব শিল্পীর প্রেরণার ধরনও এক নয়। প্রেরণা নিজের অস্তিত্বকে পুড়িয়ে অন্যরূপে রূপান্তরিত করার সুন্দর-সুখকর আনন্দ-বেদনাদায়ক অনুভূতি। এই অনুভূতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন রসে আত্মপ্রকাশ করে। কোনো বিশেষ সময়ে স্নিগ্ধ রঙ, শান্ত রস, কোনো সময়ে উজ্জ্বল চড়া খুন-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

খারাবীর মতো রঙ আর ভয়ঙ্কর রস প্রাধান্য পায়। সময়ের বৈশিষ্ট্যের মতো শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ভেদেও একেক রঙ একেক রস মুখ্য হয়ে ওঠে। কোনো শিল্পী স্নিগ্ধ রঙের, শান্ত রসের, কোনো শিল্পী মধুর রসের আর চিত্তহারী রঙের, কোনো শিল্পী হাল্কা ফুরফুরে তুলিতে হাল্কা রস বিকশিত করতে পারেন। রাগ সঙ্গীতের মতো। যেমন সব রাগ সকলের কণ্ঠে সমান খেলে না। শিল্পে যুগ-বিভাগ অর্থাৎ একেক যুগের শিল্পের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ধরে নিয়ে একযুগের শিল্পকর্মকে অন্যযুগের চাইতে আলাদা করার যে একটা প্রচলিত পদ্ধতি আছে, তাতে সময়ের রঙ এবং রসের ব্যাপারটিকেই নির্ণায়ক হিসেবে ধরা হয়। শিল্পীর ক্ষমতা এবং যোগ্যতায় যত আকাশ-পাতাল ফারাক থাকুক না কেন, একই সময়ের সৃষ্ট নানা শিল্পের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপ্ত লক্ষণ অবশ্যই ধরা পড়বে। প্রাক-রেনেসাঁস চিত্রের একটা সাধারণ, সহজে চেনা যায় এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে রেনেসাঁস, উত্তর-রেনেসাঁস ইমপ্রেশানিস্ট, ইমেজিস্ট, সুররিয়ালিস্ট প্রতিটি যুগের শিল্পের আলাদা আলাদা কতক সাধারণ ধরন।

কোনো কোনো শিল্পীর চেতনার ইতিহাসের অন্তর্লীন সূত্রটি রক্তশিখায় জ্বলে ওঠে, মাদল-ধ্বনিতে বেজে ওঠে। কোনো আতশকাঁচ সূর্যের সামনে ধরলে আগুন জ্বলে, সাধারণ কাঁচ জ্বলে না — কেন? সেরকম কোনো কোনো জাতের শিল্পী আছে উপযুক্ত সমিধ পেলে চেতনায় গোটা ইতিহাসের ধারাটিই জ্বালিয়ে তুলতে পারেন। এটি একটি দেবদুর্লভ ক্ষমতা। যার আসে এমনিই আসে। ইতিহাস যাকে মনোনীত করেন, অনেক দুঃখ দিয়েই যোগ্য করে তোলেন। অনেকে আবার দুঃখ সহ্য করেন বটে কিন্তু শিল্প-সৃজনলোকে নির্বাণ লাভ করতে পারেন না, এ-ও ঘটে। তুলনা করলে দেখা যাবে শিল্পতীর্থের অভিযাত্রী হাজার হাজার জনের মধ্যে কৃচিৎ কখনো দুয়েকটি প্রাণ সেই অমরলোকে সশরীরে হাজির হতে পেরেছে।

তান্ত্রিক সাধনার মতো শোনাবে। শিল্প-সাধনা আসলে একধরনের তান্ত্রিক সাধনারই ফলিত প্রকাশ রূপ। কথাটা শুনলে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রয়োগ করে বিষয়টি বিচার করলে সে ভুলটা অতি সহজে ঘুচে যাবে। তান্ত্রিক বাউল এমনকি সুফী সাধকেরাও বিভিন্নভাবে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ঊর্ধ্বায়িত করার সাধনা করেন। শিল্পীর কাজও অনেকটা সেরকম। তবে তিনি সজ্ঞানে বোধ করতে চান না যে সে সাধনাটিই তিনি করছেন। শিল্পী একটা বিশেষ ছবি আঁকতে চান, কবিতা লিখতে চান, তাতে মনের বিশেষ ভাব-অনুভাবগুলো জ্বালিয়ে তুলতে চান। এই বিশেষ ছবি আঁকতে গিয়ে, বিশেষ কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁকে সর্বপ্রথম নিজের অস্তিত্বের বিপক্ষে যেতে হয়।

হয়তো অস্তিত্বের বিপক্ষে যাত্রা করেও আরেকটি অস্তিত্ব কেউ কেউ আবিষ্কার করেন। সমাজ যদি এই বৃহত্তম অস্তিত্ব অভিমুখে যাত্রার পথ করে না দেয়, শিল্পীর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংবৃদ্ধি এবং পরিবৃদ্ধির সেখানেই ইতি। শিল্পীকে সমাজের নানা কিছুর মধ্যে দিয়েই পথ করে বয়ে যেতে হয়। শিল্পী যা-ই কিছু সৃষ্টি করেন, তার গোটা সৃজন-ক্রিয়ার মাধ্যমে আপন অন্তর্নিহিত চেতনার সামাজিক রূপান্তর সাধন করেন। শিল্পীর আপন অন্তরকে বাইরে টেনে আনার এই যে পদ্ধতি তার স্বরূপটিও দ্বান্দ্বিক। বাছুর যেমন ঢুস দিয়ে গাভীর ওলান থেকে দুধ বের করে আনে, কিছুটা তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতসমূহও চেতনার নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর শিল্পের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি প্রকাশরূপ লাভ করে।

এইখানেই একজন শিল্পীর সঙ্গে তান্ত্রিক সাধক, বাউল বা সুফী সাধকের পার্থক্য। গোটা সমাজের দিকে পিঠ দিয়ে গহন বনে, জনতার অগম্য অরণ্যে সাধক গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন, সমাজের কথা না ভাবলেও চলে। অন্তরের মর্মরিত স্পন্দনের গভীর আবেগে সর্ব অস্তিত্ব সমর্পণ করতে পারলেই তিনি প্রকৃত সাধকের শিরোপা লাভ করেন। সাধকের চেতনা নিজের ভেতরে আবর্তিত হয়, আর শিল্পীর চেতনা সমাজকে আলোড়িত-বিলোড়িত করে। যদিও দু'য়ের মধ্যে জল-অচল এরকম কোনো নিরেট পাথুরে প্রাচীরের ব্যবধান নেই। প্রায়ই বড় শিল্পী প্রকৃতিতে কিছুটা সাধক এবং সাধকেরাও প্রকৃতিতে কিছুটা শিল্পী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

চেতনার ঊর্ধ্বে উড্ডীন অবস্থা থেকেই শিল্পের সৃষ্টি। সমাজে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলতে গিয়ে শিল্পী নিজেও কিছুটা আউট-সাইডার হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সমাজের কার্যকারণ সম্পর্কে সুগ্রথিত চেতনাস্তর থেকে অন্য একটি কল্পিত স্তরে নিজেকে টেনে তুলতে হয়। এই টেনে তুলতে গিয়েই শিল্পী সমাজের সঙ্গে কেজো সম্পর্কটি হারিয়ে বসেন। তখন শিল্পকলাই সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার একটা কৃত্রিম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সমাজটির চেতনাও যদি আনুপাতিক হারে শিল্পীর চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে তাহলে শিল্পীকে দুটি পরিণতির একটিকে বেছে নিতে হয়। হয়তো তাকে আত্মধ্বংসী কোনো প্রবণতাকে আমন্ত্রণ করে আনতে হয়, নতুবা তান্ত্রিক বা বাউল কিংবা অন্য কোনো সাধকের পথ ধরতে হয়। বলাবাহুল্য এ দুটোই শিল্পীর শিল্পসত্তার প্রেতরূপ। শিল্পীর চেতনার গতি যদি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় আর সমাজের চেতনার গতিটি যদি থাকে গাণিতিক, সেখানে শিল্পীচেতনার সঙ্গে সামাজিক চেতনার একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। বড় শিল্পী, বড় কবি, বড় লেখকদের জীবনে চেতনার এই বিস্রস্ত অগ্রথিত সময়কে বলা হয় মানস-সংকট কাল।

এমনও দেখা যায় কোনো কবি, কোনো শিল্পী জীবদ্দশায় একজনও সহৃদয় হৃদয়-সংবেদী পাঠক বা দর্শক পেল না। দেখা গেল মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা কবিতা বা আঁকা ছবি নিয়ে সমাজে বেশ মাতামাতি চলছে। উদাহরণস্বরূপ বোদলেয়ারের কথা বলা যেতে পারে। বোদলেয়ার তাঁর জীবদ্দশায় একেবারে অনালোচিত থেকে গেছেন। জীবনানন্দ দাশ ট্রামের তলায় পড়ে মারা গিয়েছিলেন, সে সংবাদটিও ভালো করে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কাগজে ছাপা হয়নি। এটা কেন ঘটে – ঘটে এ কারণে যে শিল্পী বা কবির চেতনা ঋদ্ধি-সমৃদ্ধি লাভ করেছে, এবং শিল্পের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, কিন্তু সে হারে সমাজের নাড়ী চঞ্চল হয়ে ওঠেনি; তাই সমাজের বুকে কোনো সাড়া, কোনো চঞ্চলতা জাগছে না। পরে যখন সমাজ সাড়া দেয়ার শক্তি অর্জন করেছে তখন হয়তো দেখা যাবে শিল্পী বেঁচে নেই। অনাত্মীয় সমাজের দ্বারে-দ্বারে হৃদয়ের অর্ঘ্য সাজিয়ে কত কবি-শিল্পী যে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে? সুতরাং কোনো কোনো কবি, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিককে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই আউট-সাইডারই থেকে যেতে হয়। দুই কারণেই শিল্পী আউট-সাইডার হয়ে পড়েন। চেতনার প্রচণ্ড উল্লম্ফন প্রক্রিয়ার অভিঘাতে কেউ কেউ আউট-সাইডার হয়ে পড়েন, আবার কেউ কেউ প্রচলিত সমাজ-কাঠামোতে কোনো সহায়ক ভিত্তি না থাকার দরুণ আউট-সাইডার হয়ে পড়েন। শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলা হলো এ কারণে যে শেখ মুহম্মদ সুলতান তাঁর জীবনের আদি, মধ্য, এমনকি হালের অন্তপর্বেও এই আউট-সাইডারের জীবন যাপন করে যাচ্ছেন।

কোনো কোনো মানুষ জন্মায়, জন্মের সীমানা যাদের ধরে রাখতে পারে না। অথচ তাদের সবাইকে ক্ষণজন্মাও বলা যাবে না। এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির শিশু অনেক জন্মগ্রহণ করে জগতে, জন্মের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যাদের রয়েছে এক স্বাভাবিক আকুতি। তাদের সকলের জন্মে জন্মান্তর ঘটে না। কোটিতে গুটি হয়তো মেলে যারা জন্মেই জন্মান্তরের নির্বাণ লাভ করে। জীবনের দেবতা আপনি এগিয়ে এসে তাদের প্রাণের দেহলীতে সে আশ্চর্য পিদিম জ্বালিয়ে দিয়ে যান। সৌভাগ্য হোক, দুর্ভাগ্য হোক এ সকলের হয় না। শেখ মুহম্মদ সুলতান সে সৌভাগ্যের বরে ভাগ্যবান, আবার সে দুর্ভাগ্যের অভিশাপে অভিশপ্ত।

সুলতান ওরফে লালমিয়ার জন্ম যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার একটি কৃষক পরিবারে। কৃষি ছাড়াও তাঁর বাবা বছরের অকর্মা মাসগুলোতে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য করতেন রাজমিস্ত্রীর কাজ। রাজমিস্ত্রী গ্রামীণ সমাজের পেশা বিচারে একটি বিশিষ্ট কর্ম।

সে যাক, উত্তরাধিকারসূত্রে বিচার করলে বড় জোর এটুকু বলা যেতে পারে, রাজমিস্ত্রী শিল্পী-পিতার কাছ থেকেই লালমিয়ার মনে অপূর্ব বস্তু-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু সেটাও সবার কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হবে, তেমন বলার উপায় নেই। সে যা হোক, শিশু লালমিয়া সুযোগ পেলেই কাঠ-কয়লা দিয়ে ছবি আঁকত, রঙ পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু রঙ পাবে কই? তাই সে কাঁচা হলুদ আর পুঁই গাছের ফলের রস টিপে টিপে ছবি আঁকত। একদিন লালমিয়ার আঁকা এ সকল ছবি স্থানীয় জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে। জমিদার মশায় খুবই অবাক হয়ে যান। তিনি লালকে ছবি আঁকার কিছু রঙ কিনে দেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে তাঁর পড়াশোনা কতদূর হয়েছিল, বিশদ জানা যায়নি। তবে এটুকু সত্য যে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করার আগেই লালমিয়া পালিয়ে কলকাতা চলে যায়।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কলকাতাতেই কিভাবে জানা যায়নি কলা-সমালোচক শাহেদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর চোখে পড়ে কিশোর লালমিয়ার ছবি। তিনি তাঁকে বাসায় নিয়ে থাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেন, জামা-কাপড় কিনে দেন এবং নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সুপারিশ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তার নামান্তর ঘটে যায়। সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব লালমিয়ার নতুন নামকরণ করলেন শেখ মুহম্মদ সুলতান। এই নামান্তর ঘটিয়েই জন্মান্তরের একটি ধাপ পার করে দিলেন। আর্ট স্কুলেও তার আঁকাবুকির পালা সাঙ্গ হবার আগে লালমিয়া ওরফে সুলতান আরো একবার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন, রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের সে সুকুমার স্নিগ্ধকান্তি কিশোরটির মতো। অযাচিতভাবে পাওয়া আদর-যত্ন বিত্ত-বৈভব এবং ভাবী স্ত্রীর মায়া পরিত্যাগ করে বিয়ের আগের দিন সে কাউকে না বলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার গ্রামের লালমিয়া পালিয়ে শহর কলকাতায় এসেছিল। দ্বিতীয়বার শহর কলকাতা ছেড়ে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত গোটা ভারতবর্ষ অভিমুখে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। শাহেদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর মতো একজন স্নেহশীল অভিভাবকের আশ্রয়, সুহ্‌রাওয়ার্দী পরিবারের গরিমা কিছুই সুলতানকে আটকে রাখতে পারেনি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। সুলতান পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে গোরা সৈন্যের ছবি আঁকছে, আর ভারতের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়-ভাবনা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই, আছে শুধু সুন্দরের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ আর ছুটে চলার গতি। এ সময়ে আঁকা ছবিগুলোর কি হয়েছে, কোথা থেকে কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারে না। ভারতবর্ষের নানা শহরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোর বিলম্বিত সংবাদ আজ বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেবে। অনুমান করারও উপায় নেই, সে সময়ে তাঁর অঙ্কনশৈলী কি রকম ছিল। সময়ের এবং বয়সের ব্যবধানে কতদূর বিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়েছে অঙ্কনরীতি, বোধ এবং উপলব্ধি।

তারপরে ভারত তো ভাগ হলো। সুলতান এলেন পাকিস্তানে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-করাচিতে অবস্থান করার সময় কখনো ঘরবাঁধার স্বপ্ন এ ঘরছাড়া মানুষটির মনে ঘনিয়ে এসেছিল কিনা, সে অন্তর্গত সমাচার দেওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য। সুর্মা-আঁকা কাজলটানা কোনো রমণীর ব্রীড়াভঙ্গী তাকে চঞ্চল এবং উতলা করেছিল কিনা, বলতে পারব না। তেমনি করতে পারব না ছবির সম্পর্কে কোনো মন্তব্য। এ সময়ে তিনি বিমূর্ত রীতিতে নাকি দেদার ছবি এঁকেছেন। পরী-কন্যার স্তনের গল্পের মতো কেবল গল্পই শুনব। কোনদিন চোখে দেখতে পাব না। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর অনেক প্রদর্শনী হয়েছে, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সে সকল প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন, সংবাদপত্রের প্রশংসা-প্রশস্তির সবটুকু হারিয়ে যায়নি। নানা সাময়িকীর কল্যাণে দু'একটার মুদ্রিত ব্লকও হয়তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। সেগুলো তো আর ছবি নয়। ছবির ছবি। সুতরাং সুচিন্তিত মন্তব্য করা অসম্ভব।

বিলেতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ছবিগুলো সম্পর্কেও আমরা একই রকম অন্ধকারে থেকে গেছি। যদিও 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার উষ্ণ আলোচনা থেকে অনুভব করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারি ছবিগুলো ভালো হয়েছিল এবং দর্শকেরা প্রাণভরে উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু আসল ছবি যেখানে অনুপস্থিত সেখানে কি কোনো কথা চলে? মন্তব্যগুলো শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিলেতের পর আমেরিকা। সেখানেও সুলতান ছবি এঁকেছেন, সে ছবিগুলো কে কিনেছে, কোথায় কিভাবে আছে, অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে না হারিয়ে গেছে, কার কাছে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাওয়া যাবে জানি না। এখানেই নিরুদ্দেশ যাত্রার ইতি। অন্যূন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘরবিবাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারব না, তেমনি তাঁর এ সুদীর্ঘ কালের আঁকা ছবির ওপর কোনো মন্তব্য রাখতেও পারব না। তাবৎ কলা-সমালোচকের মনে সুলতানের এ-পর্যায়ে আঁকা ছবিগুলো একটা অতৃপ্ত কৌতূহল এবং একটা আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সুলতান বলতে যশোরের গওগ্রাম নিবাসী, মুসলমান চাষী এবং নমঃশূদ্র জীবনের একান্ত শরীক এই মানুষটিকেই চরম ও পরমভাবে মেনে নিতে হবে। তাঁর জীবনের যেন কোনো সূচনা নেই, শৈশব নেই, কৈশোর নেই, হঠাৎ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে একরাশ কাঁচাপাকা বাবরী চুল দুলিয়ে জেগে উঠেছেন। তাঁর ছবির সম্পর্কেও একই কথা। এ ছবিগুলোও অতীতের একেবারে কোলঘেঁষা অন্ধকার ভেদ করে দলে-দলে জগৎ-সংসারের কাছে এই মানুষ, এই সভ্যতা, এই সমাজ, এই ইতিহাস এবং এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের বার্তা প্রেরণ করার জন্য যেন আচমকা কার মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বানে ছুটে এসেছে।

এই যুদ্ধ এই জাগরণের একটা উদ্ভাসিত বার্তা তো ছবিগুলোর মধ্যে আছে। হাজার-হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন করে একটা জাতি প্রাকৃতিক সত্যের মতো জেগে উঠেছে, শিল্পীর তুলিতে যখন এ জাগরণ-বৃত্তান্ত মূর্তিমান হয়, সে প্রবল প্রাণস্পন্দন ঝঙ্কারিত না হয়ে কি পারে? কিন্তু পাশাপাশি একটা বেদনার দিক আছে। সুলতানের আঁকা একটা ছবি আছে, যা তিনি প্রদর্শনীতে হাজির করেননি। ছবিটির নাম 'বিপ্লব'। একজন শক্ত-সমর্থ মানুষ আপন হাতে তাঁর মস্তক ছিঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিজেই নিজের হাত ভেঙে ফেলছে, পা মচকে দিচ্ছে। প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের ফলে যে বিপ্লবীশক্তি মুক্তি পেয়েছে, তা যে কি রকম আত্মঘাতী রূপ নিতে পারে এই ছবিটিতে তার সবটুকু বিধৃত রয়েছে। আজকের বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সুলতানের এই ছবিটিই যথেষ্ট। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির কোনো বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন নেই।

সুলতান নিরুদ্দেশ যাত্রা অন্তে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বোধকরি উনিশশো চুয়াত্ত কি পঞ্চান্ন সাল। ঢাকাতে জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে একটি চিত্রপিঠ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সুলতানের কোনো ঠাঁই হলো না। কারণ অতিশয় স্পষ্ট, যে নতুন মধ্যবিত্তটি সবেমাত্র জেগে উঠেছে এবং শিল্প-সাহিত্যের নানাদিকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে যাত্রা শুরু করেছে, তার মানস অতিশয় সঙ্কীর্ণ, রাজনৈতিক লক্ষ্য অস্পষ্ট-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কুয়াশাচ্ছন্ন, শিল্প-সংস্কৃতির কোনো গভীর উপলব্ধিতে রঞ্জিত হয়নি তার মানস পরিমণ্ডল। স্নিগ্ধতার বদলে উগ্রতা, উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, স্থূল আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্মর মোহ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে কোনো বিকশিত চেতনার প্রতি প্রণত হওয়া তার ধাতের মধ্যেই স্থান পেতে পারেনি। সুলতানের কলেজের সার্টিফিকেট নেই এটা উপলক্ষ মাত্র। এমনিভাবে এ শ্রেণী সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো সাহিত্যের একজন দিকপালকেও দেশের বাইরে ছুঁড়ে দিতে সামান্যতম দ্বিধান্বিত হয়নি। মুজতবা আলীর ক্ষেত্রেও উপলক্ষের অভাব ঘটেনি। আসলে সে সময়টাই ছিল এমন : বাংলাদেশের মধ্যবিত্তটি তার ফিলিস্টিন মানসিকতার কারণে যা কিছু তার জাগতিক অধিকার বোধের বিপক্ষে যায় তার বিরোধিতা করেছে এবং প্রদর্শন করেছে অসহিষ্ণুতা।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ছিল, আর বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকসমাজ ছিল, সর্বোপরি সমাজের ওপরতলায় একটা স্থায়ী আশ্রয় ছিল। তাই তিনি নির্বিবাদে ফিরে যেতে পারলেন বিশ্বভারতীতে এবং সেখানে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হলেন। কিন্তু সুলতান? তিনি তো আপন পরিচয়ের সূত্র আপন হাতে কেটে দিয়ে সমাজ এবং সময়ের স্রোতের ভেতর দিয়ে কেবল বয়েই গেছেন। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত কোনো সমাজেই গৃহীত হওয়ার মতো কোনো কিছুই তিনি অর্জন করেননি, না স্ত্রী না পুত্র না স্বভাব-চরিত্র আদব-কায়দা। বিত্ত-বেসাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কিছুই নেই, বুকের তলায় উজ্জ্বল আলোকিত চেতনা ছাড়া। তিনি যাবেন কোথায়? বিশ্বভুবনে এমন কে আছে তাঁকে গ্রহণ করে?

অগত্যা তাঁকে যেতে হলো সেই বহুকাল আগের ছেড়ে আসা পিতৃপুরুষের নিবাসে, সেই কিশোর লালমিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হলো। সে কি সোজা কথা গ্রাম বাঙলার লাজুক কিশোরটির সঙ্গে বিশ্ব-পরিব্রাজকের ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ দৃষ্টির, বোধের, অনুভবের সম্মিলন।

শেষপর্যন্ত তাও সম্ভব হলো তবে তার পেছনে সুলতানের সক্রিয় চেষ্টার চাইতে সময়ের ধারার ভূমিকাই অনেক বেশি। যে-মধ্যশ্রেণীটি উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছিল, উনিশশো একাত্তর সালে এসে তাকে চূড়ান্ত অনিচ্ছায় একটা যুদ্ধকে কাঁধে নিতে হলো। কিন্তু শ্রেণীটির দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধ দিয়ে না পারল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে, না পারল অর্জন করতে যুদ্ধের ভার বইবার মতো ঋজু মেরুদণ্ড। এই শ্রেণীর শৈল্পিক প্রতিনিধি জয়নুল আবেদীন তাঁর 'মনপুরা' শীর্ষক চিত্রমালায় জানাতে বাধ্য হলেন যে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি ক্ষমতার সবটুকু অবসিত। সত্যিসত্যি তার নতুন কিছু সৃজন করার ক্ষমতার আর অবশিষ্ট নেই।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন আরেকটি শ্রেণীর ডাক পড়েছে। কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে সে শ্রেণীটি কোনো আকার লাভ করেনি। মধ্যশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরস্পর বিজড়িত হয়ে রয়েছে, কার লক্ষ্য কোথায় স্থির করা হয়নি। প্রথম শিল্প-সাহিত্যেই তার প্রভাবটা বড় বেশি তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হতে থাকল। বাংলাদেশের পাতিবুর্জোয়া লিখতে গিয়ে বোধ করতে থাকল, এই সময়ের উপযোগী গল্প-কবিতা তার লেখনি দিয়ে আর আসছে না। অথচ অতীতের মতো লিখতেও সে পারছে না। ঘটনার অভিঘাত চঞ্চল চেতনাপ্রবাহে ভিন্ন একটা ঢেউ জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। গায়ক অনুভব করল তার কণ্ঠের গানে সময়ের সংবেদনা বেজে উঠছে না। ছবি আঁকিয়েরা অনুভব করল সময়ের খরতরঙ্গের দোলা জাগছে না তাঁদের চিত্রলেখায়। সর্বত্র একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। সকলে বুঝতে পারছে, তাদের অন্যকিছু করা উচিত — কিন্তু সেটা কী স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। এই লজ্জার কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তারা কোলাহল দিয়ে সুরের অভাব, কথার পাশে কথা গেঁথে সাহিত্যের শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টায় অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। প্রতারকদের সুযোগ দেবে কেন? দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধটি আরো দুলিয়ে দিয়ে তাদের নায়ক শেখ মুজিবকে সপরিবারে নিরস্তিত্ব করে দিল সময়। কিন্তু জাতি অর্ধেক ভূমিষ্ঠ হলো, অর্ধেক রয়ে গেল ইতিহাসের জরায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে।

সুলতান শিল্পের জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে জাতির ইতিহাসকে মুক্ত করে দিলেন। আগামীতে যাঁদের সাধনায়-সংগ্রামে বাঙলার ইতিহাস পাবে গতি, পাবে প্রাণ, সেই অনাহারক্লিষ্ট, রোগগ্রস্ত, ন্যুব্জদেহ কিষাণ-কিষাণীকে আঁকলেন বীর করে: রেনেসাঁস-পেইন্টারেরা যেমন তাঁদের আঁকা চিত্রে, গড়া ভাস্কর্যে মানুষ-মানুষীকে সৌন্দর্য এবং অজেয়তার প্রতীক করে নির্মাণ করেছেন, সুলতান সেই সৌন্দর্য, সেই অজেয়তা চারিয়ে দিয়েছেন বাঙলার কিষাণ-কিষাণীর শরীরে। একটি সমাজের মানুষকে তার তুলি বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্তের উত্থানযুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলে বুর্জোয়ার প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য উল্লম্ফিত আবেগে শিহরিত-চমকিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি কি বীররসে শেষপর্যন্ত স্থিত থাকতে পেরেছেন? তাঁকে কি করুণ-রসের অগাধ সলিলে অবগাহন করতে হয়নি? সুলতানও কি সবটুকু বীরত্বের প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে নায়কেরা নিজ হস্তে নিজের মস্তক কেন ছেদন করে? কেন তারা নিজের হাত-পা নিজে ভেঙে বিজয়ের উল্লাশ প্রকাশ করে? তা হোক, তবু মধুসূদন একজন, তেমনি সুলতান আরেকজন। সময়, পরিবেশ, সমাজ, সামাজিক আদর্শ সব আলাদা। তবু তাঁদের কোনো পূর্বসূরী নেই, নেই কোনো উত্তরসূরী। আচমকা জলতল থেকে সবর্ণ স্তম্ভের মতো উত্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে রয়েছেন।

১৯৮০

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)

My All Garbage
www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে

বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই-পুস্তক নেই। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব ইত্যাকার বিষয়ের চর্চা বাংলা ভাষায় এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। আসলে প্রাথমিক পর্যায় বলতে যে একটি সুচিন্তিত এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী সূচনাপর্ব বোঝায়, কোনো কোনো বিষয়ে সেটিও হয়নি। তবু কথাটি বললাম এ কারণে যে সর্বস্তরে বাংলা চালু করতে হবে, এই দাবীর বিরুদ্ধে কোনো বিষয়ের বিশেজ্ঞরাও প্রকাশ্যে এখন কিছু বলতে সাহস পাবেন না। কোনো বিষয়ের শিক্ষকেরা যদি বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনার কাজ আরম্ভ করে দেন এবং ছাত্রেরা যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করতে জেদ প্রকাশ করেন, আজকের দিনে এক বা একাধিক ইংরেজী-মনস্ক ব্যক্তির উষ্মা কিংবা বিরক্তি তাতে কোনো বাধাই জন্মাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে নিয়ে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে এত বেশি মারামারি, ধরাধরি এবং খুনোখুনি হয়েছে যে, নেহায়েত ইংরেজীর মহিমা দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে গেলে যে পিঠ বাঁচবে না, এ বুদ্ধি সে ইঙ্গ-বঙ্গ পণ্ডিত শ্রেণীর মাথায়ও প্রচুর পরিমাণে আছে।

কিন্তু ফ্যাকড়াটি আসে অন্য দিক থেকে। যখন বাংলার মাধ্যমে পড়াবার প্রশ্ন ওঠে, তখনই প্রশ্ন আসে বই-পুস্তক কোথায়? যে-সকল দেশপ্রেমিক বাংলা ভাষা-হিতৈষী এখানেসেখানে বাংলা ভাষা চালুর নামে লাঠালাঠি করে ভাষা-জননীর সেবা করছেন ভেবে নির্মল আনন্দ লাভ করে থাকেন, সেই বীর-পঙ্গুবেরাও কখনো-সখনো এরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে সরাসরি পিঠটান দেওয়াটাকেই যথার্থ বীরত্বের কাজ বলে মনে করতে বাধ্য হন। এতকাল ধরে ইংরেজীঅলারা শিক্ষা-সংস্কৃতির বড়-বড় আসন এবং সরকারের বড়-বড় চাকুরীগুলো শুধু ইংরেজী বিদ্যার জোরে দখল করেছিলেন বলে বাংলাঅলাদের মধ্যে প্রচুর পেশাগত ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু তাঁদের ক্ষোভ-দুঃখ বুকের তলে চাপা দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। হালে অর্থাৎ বাংলাদেশ 'স্বাধীন' হওয়ার পরে একটা সামাজিক শক্তিকে তাঁদের স্বপক্ষে পেয়ে গেছেন। 'জয় বাংলা'র যুগে বাংলাভাষা চালুর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি উচ্চারণ করলে রক্ষা পাওয়ার জো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেই। রাস্তার মানুষেরা ঘরে এসে পিটিয়ে দিয়ে যায়। সাধারণত রাস্তার মানুষ রাস্তা দিয়েই হাঁটে – অপরিহার্য প্রয়োজন না হলে ঘরে এসে উৎপাত বাধায় না। কেউ নিশ্চয়ই এই দেশপ্রেমিক রাস্তার লোকদের কানে মন্ত্র দেয়, তাদের গেট খুলে দিয়ে নিয়ে আসে এবং জাঁদরেল ইংরেজীঅলাদের দেখিয়ে বলে এঁরাই আমাদের ভাষা-জননীর জানের দুশমন। রাস্তার লোকদের বৈশিষ্ট্য, তারা জোরে-জবরে বাংলা ভাষা চালু করতে চায়। সেজন্য লাঠিসোটাটা সব সময় হাতে-হাতে নিয়ে বেড়ায়। স্থান এবং সময় বিশেষে তার দু'চার ঘা যে ইংরেজীঅলাদের পিঠে পড়েনি এ কথাও সত্যি নয়। তারপর থেকে ইংরেজীঅলারাও হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। ঠেকলে কে না শেখে! বাংলা ভাষা চালু করার কথা উঠলে তাঁরাও সমস্বরে কণ্ঠস্বর বাংলাঅলাদের চাইতে আরেক ডিগ্রী বাড়িয়ে বলে, 'হাঁ হাঁ, বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে শুরু করে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।' বাংলাঅলারা অতটুকু পর্যন্ত শুনে বর্তে যান। অর্থাৎ সবকিছুই যখন বাংলার মাধ্যমে হওয়ার একটা আয়োজন চলছে, অনতিভবিষ্যতে তাঁরাও জাতে উঠে যাবেন। এক কথায় মনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বাংলা ভাষার আগুনে একেবারে ধুয়েমুছে যথার্থ ভদ্রলোক হওয়ার একটা সোনালী সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে প্রচণ্ড দুরাশায় বুক বেঁধে রইলেন।

ওদিকে ব্যাপার চলছিল অন্যরকম। স্বাধীনতার অপজাত সঙ্কটগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে বিরাট বিরাট শরীর দেখিয়ে মন্ত্রী মহোদয়দের নিবেদন করলেন, এই যে হুজুর আমরা আপনাদের রাজত্বে খোদার রহমতে দিনে-দিনে নাদুশ-নুদুশ হয়ে উঠছি গায়ে-গতরে, একদিন প্রকাশ্য ময়দানে মোলাকাত হবে। মন্ত্রী মহোদয়েরা কি ভাবলেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু তারপর থেকে বাংলা ভাষার পেছনে নিজেরাই লেগে রইলেন। বলে বেড়াতে লাগলেন, বাংলা ভাষাকে হেন করতে হবে, তেন করতে হবে। সব কথার সার কথা বা বললেন তার মর্ম অনেকটা এরকম, "ওহে বাঙালী মনুষ্যজাতি, তোমরা অনেক কষ্ট করিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়াছ। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তোমাদের নাম লিখিত থাকিবে। বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর দেশ। সেজন্য উহাকে আমরা মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকি। বাংলা ভাষা হলো আমাদের সেই মাতৃদেবীর মুখের ভাষা। তোমরা ইহার উন্নতির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। যাহারা ইহার বিরুদ্ধে ভাবে, কথা বলে এবং কর্ম করে উহাদিগকে আমরা কলাবরেটর বলি এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর কহি। উহারা বাঙালী মনুষ্য নামের অযোগ্য এবং পাষণ্ডও বটে। তোমরা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়াছ। স্বাধীন বাংলাদেশে তোমরা যদি কাপড় পরিধান করিতে না পারো বাঙালী সংস্কৃতি দিয়া তোমাদের লজ্জা নিবারণ করিও। আর যদি দুইবেলা ভাত খাইতে না পাও মজা করিয়া বাংলা ভাষা চিবাইয়া খাইও। বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা, তারি মধুর। উহার সমতুল্য ভূমণ্ডলে নাই।" মন্ত্রী মহোদয়েরা বাংলা ভাষার পক্ষে এসব চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করার পরেও যখন ইডেন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিল্ডিয়ের খাস কামরায় প্রবিষ্ট হন, তাঁদেরই মুখ দিয়ে অনর্গল টুটাফাটা ইংরেজী বুলি নির্গত হতে থাকে। এই ইংরেজীর দাপটেই পিয়ন, বেয়ারা থেকে শুরু করে স্বয়ং সেক্রেটারী পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠেন। মন্ত্রী সাহেবরাও মনে মনে ঐ ভাষাটির গুরুত্ব তখন অস্বীকার করতে পারেন না। তিনিও তো আমাদের মতো বাঙালী। বাংলা ভাষাতে যে অধঃস্তন কর্মচারীদের আদেশ দেয়া চলে না, দিলেও ঠিক ঠিক কাজ হয় না, কোন বাঙালীটি অস্বীকার করবে? সেক্রেটারী সাহেবেরা মন্ত্রী সাহেবদের টুটাফাটা ইংরেজীর জবাব যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ইংরেজীতেই দিয়ে থাকেন। আদেশ-নির্দেশ, কৈফিয়ৎ তলব, নিয়োগ-বদলী ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ ভাষাটিকে তরতর জলের মতো ব্যবহার করে থাকেন। বাঙালী মন্ত্রী সাহেবেরা সবকিছু দেখে মনের আনন্দে রবীবাবুর সেই কবিতাটিকে ঈষৎ রূপান্তরিত করে গেয়ে ওঠেন, 'আমরা সবাই ভালো আমাদের এই ভালোর রাজত্বে।' সামান্য এতটুকু ব্যতিক্রম বাদে বাংলা চালু করার কাজটি এই তুলনাহীন পদ্ধতিতে বেশ বহাল তবিয়তে এগিয়ে চলেছে। ব্যতিক্রমটারও একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কিছুকিছু বাংলাঅলা পণ্ডিত আছে না-হক চেল্লাচেল্লি করাই তাঁদের একটা স্থায়ী স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়েরা এদের মুখে পূর্বাহ্নেই মুখোশ পরিয়ে দিয়েছেন। আঠারো-উনিশটা কমিটি ইত্যাদি গঠন করে যোগ্যতা বিচার করে কাউকে সম্পাদক এবং কাউকে সভাপতি করে দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থাও। সুতরাং বাংলাদেশে পণ্ডিত নামধেয় মহাপুরুষদের যাত্রাগানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে বিনা আয়েশেই উপলব্ধি করতে পারবেন, সেখানে ডিম আগে না বাচ্চা আগে এই বিতর্ক বেশ সুমসৃন গতিতে চলে আসছে। ইতোমধ্যে কোনো একটা আকস্মিক সামাজিক গোলযোগ যদি না ঘটে যায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আসর স্থায়ী হবে।

বাংলা ভাষা চালু কর্মসূচীর সঙ্গে সে রাজার দুধের দীঘি খনন করার গল্পটির তুলনা করা যায়। এক রাজা একবার ভাবলেন একটা দীঘি খনন করিয়ে রাজ্যের সমস্ত প্রজার কাছে নির্দেশ দিবেন স্বেচ্ছায় একেক ঘটি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ তারা যেন দীঘিতে ঢেলে দেয়। রাষ্ট্র কুড়িয়ে বেল। এমনি করে সকলের দানে সমৃদ্ধ হয়ে দুগ্ধের ধবল সরোবর থলথল করে জেগে উঠবে।

পরদিন সকালে প্রথম প্রজা ভাবল অন্য সকলে বাটি দুধই নিয়ে যাবে, অতএব আমি একঘটি জল নিয়ে যাই না কেন। লক্ষ ঘটি বাটি দুধের সঙ্গে আমার এক ঘটি জল পরম নির্বিবাদে মিশে থাকতে পারবে। অত আর দেখে কে? ঐ রাজ্যের সকলে মহামানব ছিল কিনা বলতে পারব না, সকলেই ঐ এক নম্বর প্রজার মতো ভেবেছিল। বাংলা ভাষা চালুর প্রহসনটিও মোটামুটি একই রকম। তবে মাঝেমাঝে কিছু দুর্মুখের আক্ষেপ শোনা যায়, বাংলা ভাষায় কোনো জ্ঞানগর্ভ বই প্রকাশিত হচ্ছে না। সুতরাং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করে অকাট মুর্খই যদি থেকে যেতে হয়, তার চাইতে একেবারে পড়াশোনা না করাই ঢের উত্তম।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই নেই। অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর পঠন এবং অনুশীলনযোগ্য কোনো পুস্তক লেখা হয়নি। এসব নিরেট সত্য কথা। এত বেশি সত্য যে এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হলে লাঠি মেরে বাংলা চালাতে চায় সেরকম অত্যুৎসাহী লোকদের অপরিমিত আবেগ-উৎসাহও ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যায়। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই নেই। লেখা হয় না এই দোষটা কার? বাংলা ভাষায়? না বিজ্ঞান শাস্ত্রের? অনুরূপ প্রশ্ন অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপরও করা যায়। কতেক ভাষা পৃথিবীতে আছে যেমন আফ্রিকার হটেনটটদের ভাষা। ঐ ভাষার প্রকাশভঙ্গী এতই সীমিত যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কথা দূরে থাক, মনের সামান্য ভাব-অনুভাবও শব্দে প্রকাশ করা যায় না; পরিবর্তে অঙ্গভঙ্গী এবং হাত-পায়ের নানারকম মুদ্রা ব্যবহার করতে হয়। প্রতিটি বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ ভঙ্গী এবং শব্দসম্ভারের প্রয়োজন, তার সহস্রাংশের এক অংশও ঐ ভাষাতে নেই। ঠিক হটেনটটদের মতো তত অনুন্নত এবং অবিকশিত না হলেও যথার্থ অর্থে অনুন্নত ঐ রকম বহু ভাষা পৃথিবীতে আছে। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের অনেকগুলো ভাষাকে ঐ মানদণ্ডে বিচার করে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ভাবধারার বাহক হওয়ার পক্ষে অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা যায়। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। কোনো অনুন্নত উপজাতি যদি তার সংস্কৃতি এবং ভাষার মান নানা আধুনিক টেকনিক অবলম্বন করে উন্নত করে, তারই মাধ্যমে যদি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে প্রয়াস-প্রযত্ন নিয়োজিত করে, তার কথা আমি তুলছিনে। সাধারণভাবে শুধু আমি বলছি, এই ভারতীয় উপমহাদেশেরও অনেকগুলো ভাষা এখন যেমন আছে তেমনি ধরে নিলে তার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বাংলা ভাষা কি একটা তেমন ধরনের ভাষা? বাংলা ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা কি সত্যিসত্যি সংকুচিত? কথাটি নির্মোহ দৃষ্টিতে — আবেগ-অনুভূতি, কিছুটা তথাকথিত দেশপ্রেম বর্জন করে খতিয়ে দেখার অপেক্ষা রাখে।

ভাষাকে 'ঐশ্বরিক দান' ,'ভগবানের নিঃশ্বাস', 'সামাজিক মানুষের চেকন-মোটা নানাবিধ সম্বন্ধের প্রকাশ' এবং 'নির্বাচিত বস্তুর নাম' ইত্যাদি নানা সংজ্ঞায় বিশেষিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন্‌টা ভ্রান্ত সে তর্কের কচকচিতে প্রবেশ না করেও একটা কথা বলে দেয়া যায় পরম নিশ্চিন্তে : ভাষা একটি জাতির নানামুখী অভিজ্ঞতার ফলিত প্রকাশ। যে জাতির অভিজ্ঞতা যত সীমিত তার ভাষাও তত দুর্বল। আর যে জাতির মানস এবং বস্তুগত অভিজ্ঞতা যত সমৃদ্ধ তার ভাষাও তত বেগবান এবং শব্দসম্ভারে ধনবান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা জাতির জাগতিক উন্নতি-অবনতির সঙ্গে ভাষার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে ভাষাকে একটা জাতির রক্তবাহী ধমনী বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়, পৃথিবীর জ্ঞানান্বেষী মানুষ পরম প্রযত্নে প্রাচীন গ্রীসের ভাষা আয়ত্ত্ব করে থাকেন কিন্তু আধুনিক গ্রীসের প্রতি কারো তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এর কারণ কি? প্রাচীন গ্রীক সমাজ ছিল তৎকালীন পৃথিবীর উন্নততম মানবসমাজ। সেই উন্নততম সমাজের মানুষ জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে যে নানামুখী চিন্তাভাবনা করেছিলেন তার গুরুত্ব এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বস্তুত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির কোন্ শাখাটি গ্রীক মনীষার দানে সমৃদ্ধ হয়নি? সুতরাং আধুনিক সভ্যতার ঠিকুজী-কুলজী নিরূপণের বেলাতে সভ্যতার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ডাক যে পড়বে তা তো একরকম স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক গ্রীস জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। জাতি হিসেবে তারা ভয়ংকর অধঃপতিত এবং অবনমিত। ঐতিহাসিক লেনপুল এদের বিষয়ে লিখেছিলেন, হালের গ্রীকদের সঙ্গে করমর্দন করলে বিশেষ ধরনের রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে জাতীয় ভাষার বিকাশেরও একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আবার জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বলতে জাতির সঙ্গে সম্পর্কশীল নানা কিছুরই সুষম বিকাশ বোঝায়। একটা দশ বছরের বালকের শরীরে যেমন পঁচিশ বছরের পুরুষের হাত-পা কল্পনা করা যায় না, তেমনি একটি হীনবল মাজাভাঙ্গা জাতিও বলবান ভাষার অধিকারী হয়েছে, একথাও সমান অকল্পনীয়। এ সকল কথা স্মরণে রেখে পূর্বের আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। বাংলা ভাষায় যে নানা বিষয়ে বই-পুস্তক লেখা হয়নি সে দোষটি কি বাংলা ভাষার? নাকি বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের?

প্রশ্নটির ওপর সুবিচার করতে হলে আংশিক দোষ ভাষার ওপর চাপাতে হবে এবং আংশিক দোষ বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের ওপর চাপাতে হবে। তারপরেও কিন্তু আসল কারণটির অনেকাংশ অনুদঘাটিত থেকে যাবে। প্রথমত বাংলা ভাষাতে পূর্ব থেকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা হয়নি। সে কারণে ভাষার মর্মবেগের সঙ্গে প্রায় অপরিচিত একটি বিষয়ের অবতারণা করতে গেলে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, সে তো একরকম জানা কথাই। স্বাভাবিকভাবে অনেকে এই কঠিন শ্রমসাধ্য পথে পা বাড়াতে চাইবে না। বরঞ্চ অন্য ভাষার মাধ্যমে যদি বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া যায়, সাধারণত কেউ তার বাংলায়নে বিশেষ আগ্রহী হবে না। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রশ্নটি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যাঁরা ইংরেজীর মারফত নানা বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন সে বিষয়সমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসার একটা নৈতিক দায়িত্ব তাঁদের ওপর ছিল। তাঁদের বেশিরভাগই সে দায়িত্ব পালন করেননি। অর্থাৎ নানা বিষয়ের জ্ঞান এবং বিদ্যাকে বাংলায় নিয়ে আসার জন্য তাঁদের অতি অল্পসংখ্যকই কোনরকমের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। বেশিরভাগই এ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিষয়ে কোনরকমের খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখার অবকাশ পাননি। এটুকু বললে কিন্তু পুরো সত্যি বলা হবে না। আমরা শুনেছি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সমস্ত দুরূহ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফর্মূলা বাংলা ভাষার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে তীক্ষ্ণ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য তিনি নাকি নানা সংস্কৃত প্রতিশব্দও তৈরি করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে এ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বর্জন করতে হয়। কারণ সেই সময়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার কোনো চল ছিল না। বাংলাতে লিখলে সাধারণ লোকের দুর্বোধ্য এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাঠক পাওয়া যেত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো বিষয়ের ওপর প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা এবং সেই বিষয়কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকাটাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রয়োগ করার একমাত্র হেতু হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থাটিকেও বিচার করে দেখতে হবে। কোনো জ্ঞান কিংবা বিদ্যা অনিবার্য সামাজিক চাহিদার পর্যায়ে না এলে সমাজে তার চল হয় না, হতে পারে না। এই একই কারণে ইয়ং বেঙ্গলের যুগে ড. রাজেন্দ্র লাল মিত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ড. মহেন্দ্র লাল সরকার প্রমুখ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বাঙালী সমাজে তা চালু হতে পারেনি। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে, বিজ্ঞানের প্রতি এবং অন্যান্য বিদ্যার প্রতি একটি শ্রেণীর আগ্রহ ধীরেধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে সেকথা সত্যি। তার কারণ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিদ্যার প্রতি নির্মল-নির্মোহ অনুরাগ নয়। ঐ সকল বিষয়ে যাঁরা শিক্ষাদীক্ষা করতে আসতেন তাঁদের সামনে ছিল স্বচ্ছল জীবনযাত্রা, বেশি মাইনের চাকুরী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ।

অবিভক্ত বাঙলা দেশে যখন থেকে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু হয়েছে, একই সময় থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও নানা জ্ঞান এবং বিদ্যার শিক্ষাদানের কথা অনেকেই চিন্তা করে আসছিলেন। বাংলাভাষার প্রসার ও প্রচারকল্পে অনেকে জীবন পর্যন্ত পাত করেছেন। তথাপি মাতৃভাষা বাংলাতে কেউ জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা করেননি। পক্ষান্তরে বিদেশী ভাষা ইংরেজীকেই লোকে বরণ করে নিয়েছেন। বাংলার সমৃদ্ধি না ঘটিয়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মাতৃভাষার অহেতুক অপমান করে রাজভাষার প্রতি অত্যধিক আনুগত্য প্রকাশ করেছে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ইংরেজী ছিল সরকারী ভাষা; না শিখলে সরকারের কোনো চাকুরীবাকুরী পাওয়ার উপায় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে লেখাপড়া শিক্ষা করতে আসতেন যাঁরা সমাজে জ্ঞান বিদ্যার প্রচার কিংবা নিছক লোকহিতৈষণা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। সহজলভ্য চাকুরীই ছিল তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান। ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে লাগসইভাবে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে তাঁদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যেত। আর সে আমলে যাঁরা লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা কারা? সেটাও দেখতে হবে। তাঁদের পেছন দিকের বস্তুভিত্তি এবং সামনের লক্ষ্য কি সেটাও দেখা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রয়োজন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতি টিকিয়ে রাখার কারণেই তাদের সৃষ্টি। লর্ড মেকলে বিঘোষিত, আমরা এবং আমরা যে লক্ষ-লক্ষ জনসমষ্টিকে শাসন করি, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এমন একদল মানুষ সৃষ্টি করব, যারা রক্তে, মাংসে হবেন এদেশীয়, রুচি ও শিক্ষাদীক্ষায় হবেন ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন। এই 'ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন' শব্দ দুটো জোর দিয়ে উচ্চারণ করছি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাথমিক যুগে যাঁরা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন, তাঁরা যে ভুল চিন্তা করেছিলেন একথা সত্যি নয়। একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি দানের জন্যে এবং ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। তবে তাঁদের চিন্তাটা ঠিক সময়োচিত ছিল না। কারণ তাঁরা যত নিখুঁত চিন্তাই করুন না কেন, কোনো ব্রিটিশ-মনোভাবাপন্ন মানুষের কোনরকম সহযোগিতা বা স্বীকৃতি আদায়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আবার এই বাংলা ভাষা প্রেমিকদের অনেকেও কট্টর ব্রিটিশপ্রেমিক ছিলেন। অন্য সকলের কথা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের পর্যন্ত ব্রিটিশের প্রতি অন্ধমোহ কখনো দূরীভূত হয়নি। বস্তুত তাঁরা একদিকে বাংলা ভাষা মারফত শিক্ষা দানের কথা বলে নিজ দেশের জনগণ এবং সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতেন, অন্যদিকে তাঁদের স্থিতি এবং বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনীয়তাও কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতেন। এ দুটো ছিল পরস্পরবিরোধী ধারণা। বাঙালী মধ্যবিত্তের হাতে যে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটেছে, তার বিস্তৃতিও ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বলয় ভেদ করে বৃহত্তর জনসাধারণকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, শুধু সংস্কৃতি এবং আর্থিক ভিত্তি নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত কোনো স্বদেশ-হিতৈষণামূলক এবং জনকল্যাণধর্মী কোনো কর্মসূচীই সেই শ্রেণীটার গণ্ডী ভেদ করে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তা করতে গেলে শুধু ভাষা, সাহিত্য, নিছক জনকল্যাণ, গুটিকয় বিধবার বিয়ে, অল্পস্বল্প সহমরণকামী মহিলার অকাল মৃত্যু ঠেকানো কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের মধ্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজোর প্রচারের মধ্যে নিজেদের সীমিত না রেখে সরাসরি ব্রিটিশ-বিরোধী একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বদান করতে হত। শ্রেণীগত কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা তখনো সংহত হয়নি এবং তার মধ্যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেনি। স্বভাবতই ব্রিটিশের সামাজিক শাসন কাঠামোর আওতায় থেকে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই তাঁরা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। তাঁরা ছিলেন কমবেশি সকলে ইংরেজী জানা ভদ্রলোক। কিন্তু আন্দোলনের বেগ সঞ্চারের এবং সাফল্যের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেখা যাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নানা পর্যায়ে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতবর্ষের ভাষাগুলো এবং নানা জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ বিকশিত হয়ে নবরূপ লাভ করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের মূল্যচিন্তার ক্ষেত্রে অনেকদূর বিবর্তন এবং কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপপ্লব পর্যন্ত ঘটে গেছে। কিন্তু সামাজিক চাহিদার নিরিখে এর খোলনলচে দুয়ের যে পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। কারণ, নতুন মূল্যচেতনা-সমৃদ্ধ আরেকটি রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতা দখল করে সেই সামাজিক চাহিদাকে রাজনৈতিক নির্দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি। যে শ্রেণীটির হাতে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাঁরা ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁদের শাসন কায়েম রাখার জন্য যতদূর জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ সাধন প্রয়োজন তার বাইরে একচুল অগ্রসরও হতে পারে না। জনগণের চাহিদা যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন। এই সকল কারণের জন্যেই ইংরেজী ভাষা ভারত উপমহাদেশের জনগণের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো অদ্যাবধি স্থায়ী হয়ে রয়েছে।

২

এখন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা চালু করার সমস্ত বাহ্যিক বাধা দূর হয়ে গেছে। উপরি-উপরি দেখলে ব্যাপারটা কতকটা তাই বটে। ব্রিটিশ শাসন নেই, পাকিস্তানীরা চলে গেছে। সুতরাং বাংলা চালুর কাজটিকে শাসনদণ্ড হাতে লালচোখ দেখিয়ে ঠেকায় কে? আমরা জাতীয় সরকার পেয়েছি, জাতীয় ভাষা পেয়েছি, জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি আইন সভা, সংবিধান যা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল সবই পেয়ে গেছি। এখন বাংলা ভাষা চালু করতে হলে হৈ-হৈ করে লাঠি হাতে কেউ ছুটে আসবে না। তাছাড়া একটা সুখবর আছে। আমাদের মন্ত্রীসভার এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না। সুতরাং বাংলার ব্যাপারে ভাবিত হওয়ার অত কী থাকতে পারে! আপনা-আপনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সবকিছু চালু হয়ে যাবে।

গোড়ার দিকে অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন। পরে দেখা গেল ব্যাপার ঠিক অন্যরকম। মন্ত্রী মহোদয়দের আদি এবং একমাত্র ভাষা বাংলা হলেও ঠিক বাংলা ভাষাটি চালু হয়ে যায় না। কেননা সমাজে একটা জিনিসের চল নেই অথচ চালু করতে হলে সে জিনিসটিকে সমাজের কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়ার মতো নানা ভাঙচুর করে উপযুক্ত করে নিতে হয় যেমন, তেমনি সমাজটাকেও ভেঙে পুনরায় বিন্যাস করে নিতে হয়। সেই নতুন জিনিসকে আবার গ্রহণ করা না করা জনগণেরই ইচ্ছা। যেমন পাকিস্তানী আমলে সরকারীভাবে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে এমন শব্দকে গ্রহণ করেননি জনগণ। তবু ধরে নেয়া যাক, ভাষার মধ্যে অদলবদল করা হলো জনসাধারণের রুচি এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধুমাত্র তা করে তো বাংলা ভাষাকে চালু করা যাবে না। তার জন্য সমাজটিকেও তো ভাঙার প্রয়োজন। সমাজ ভাঙতে যাবে কে? নতুন উন্নত সমাজ গঠন করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া পুরনো সমাজ ভাঙতে চেষ্টা করা কি বাতুলতা নয়?

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলা ভাষাকে এই বাংলাদেশেরই জনগণের মধ্যে চালু করতে হলে বাংলা ভাষার মতো বাঙালী সমাজকেও ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে হবে। সমাজের ভাঙাগড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ীভূত এবং অর্থনীতি হবে তার নিয়ামক শক্তি। বর্তমানে যে ধরনের পুঁজিবাদী সামন্ত-প্রভাবিত ও সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সম্বন্ধের জটাজালের মধ্যে এই দেশের মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে, তাকে একেবারে নতুন করে ঢালাই করতে হবে। এই নতুনভাবে ঢালাই করার কাজটিকে এক কথায় বলা যেতে পারে সমাজ বিপ্লব। একটি সত্যিকার সমাজ বিপ্লব ব্যতিরেকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা যে সত্যিকার মর্যাদার আসনে বসবে না পরবর্তী আলোচনায় তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

৩

হালে অনেকে সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে বাংলা চালু করার ধ্বনি তুলেছেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার কথা বলছেন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে গণমুখী রূপদান করার কথা সভা-সমিতি পত্র-পত্রিকায় হরদম বলে যাচ্ছেন। এগুলো অন্তঃসারশূন্য কথা। কেননা এই বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বইজন মানুষ সেই দেড় হাজার বছর আগে থেকে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই কাজ-কারবার চালিয়ে আসছেন। একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষা শিক্ষা করার অবকাশ তাঁদের হয়নি। এখনো জীবনের সর্বকাজে সর্বচিন্তায় বাংলা ভাষাকেই প্রয়োগ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচার করা আর নিউ ক্যাসেলে কয়লা বয়ে নেয়া একই কথা। তাঁরা যদি পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত সংস্কৃতিবান বাঙালী বলে পরিচয় দিতে না পারেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাঁরা দায়ী নন। সমাজ তাঁদেরকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না, তাই তাঁরা অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে থেকেও যাঁরা লেখাপড়া শিখে চাকরীবাকরী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের বদৌলতে আলাদা হয়ে পড়ছেন সম্পূর্ণ নতুন একটি শ্রেণীতেই তাদের উত্তরণ ঘটছে।

আজকের বাংলাদেশের জনগণকে ভাষা এবং সংস্কৃতিগতভাবে বিচার করলে দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। একদল সবদিক দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনে-শোষণে উৎপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হয়েছেন। অন্যদল ঔপনিবেশিক শোষণের ফায়দাটুকু লুট করার সুবিধা পেয়েছেন। যাঁরা উৎপীড়িত হয়েছেন, তাদের মুখের ভাষা আদিম যুগের বাংলা ভাষাই থেকে গেছে, এখনো সেই ভাষা তাঁদের মুখেমুখে জীবিত রয়েছে। আর যাঁরা ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তা করছেন তাঁরা শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। নিজেদের মুখের ভাষা আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সুবিধা লাভ করেছেন। এভাবেই তো ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপুটে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির সৃষ্টি। তাঁরা শহর কলকাতা এবং কলকাতা শহরের আশেপাশের

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানুষের কথ্যবুলিকে লেখ্যভাষায় উন্নীত করে তা বাংলা ভাষাভাষীর একমাত্র ভাষা হিসেবে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙলা বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠে। তাঁরা সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাভাবনা একেবারেই করেননি বললেই চলে। তাঁদের কৃত শিল্প-সাহিত্য এ উক্তির যথার্থতার সাক্ষ্য দেবে। লোলুপতা এবং চটুলতা এই বিশেষ শ্রেণীটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উদ্ভাবনশীলতার প্রতি তাঁদের প্রবণতা ধাবিত হয় না বলেই তাঁরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। গত পঁচিশ বছর ধরে সর্বক্ষেত্রে তাঁরা অনুকরণই করে আসছেন। কৃষিসমাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা শিক্ষা-সংস্কৃতির আস্বাদ গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছেন, তাঁরাও চিন্তা-চেতনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিশীলিত করে তোলেননি। কেউ পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অনুকরণ করেছেন, কেউ পশ্চিম পাকিস্তানীদের এবং কেউ পশ্চিম বাংলার। অবশ্য এই অনুকরণপ্রিয়তার দেশওয়ারী পার্থক্যের মধ্যেও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তথা অর্থনীতি অন্তরালে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তার ফলে পশ্চিম বাংলা থেকে যে বাংলা ভাষাটিকে এঁরা নিয়ে এসেছিলেন, অনেকবার ইসলামের নামে ওর মূল কাঠামোটিকে নষ্ট করা ছাড়া তৎকালীন পূর্ব বাঙলার মানুষের মুখের ভাষা এবং লেখ্য ভাষার মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনে একে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে আসার কোনো যেধাবী প্রয়াস এই শ্রেণী গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে যখনই সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষার ওপর সরকারী হামলা এসেছে তখনই ব্রিটিশ-সৃষ্ট কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নায়ক সাহিত্যিকদের অসময়ে পুনর্জীবন দান করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। বর্তমানের কর্তব্য তামাদির খাতায় সঞ্চিত রেখে দিয়েছেন। আসলে বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ বর্তমানে যে বাংলা ভাষাটি ব্যবহার করেন, সেটা তাঁদের মুখের ভাষা নয়। লেখাপড়া শিখে লায়েক হলে এই বাংলা ভাষাটি তাঁদের মুখে আপনিই এসে যায়।

হালের বাংলাদেশে যাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করছেন এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের স্থিতি ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান সৃষ্ট ঔপনিবেশিক সমাজের পাটাতনে। ব্রিটিশ চলে যাবার পরে কয়েকবার ক্ষমতার রদবদল হলেও তাঁরা ব্রিটিশ আদর্শে নতুন পাটাতন নির্মাণ করে নিজেদের শ্রেণীগত অস্তিত্ব নিরাপদ এবং নিশ্চিত করার চেষ্টা কম করেননি। সুতরাং সেই পুরনো সমাজের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে নতুন মূল্যচিন্তার স্ফূরণ ভাষা ও সংস্কৃতিতে নবতর প্রাণপ্রবাহের সংযোজন তাঁরা করতে পারেন না। কেননা এ হবে তাঁদের পক্ষে স্ব-শ্রেণীর বিরোধী কাজ। তা করলে তাঁরা যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে শাসন-শোষণ করছেন তার মর্মমূলেই আঘাত করা হবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। বর্তমানে যে সকল পণ্ডিত, লেখক, অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষা চালুর পক্ষে কলম ধরেন, সভা-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সমিতিতে বিবৃতি পাঠ করেন, মুখেমুখে বাংলা ভাষাপ্রেমিক বলে জাহির করেন তাঁদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা কোন্ বাংলা ভাষাটি চালু করার কথা বলছেন? কলকাতার যে বাংলা ভাষাটি এখন চালু আছে সেটি নয়তো? যদি বলেন, কলকাতার বাংলা ভাষাটি যদি ভাঙ্কুর না করা হয় তা'হলে বাংলাদেশের মানুষের উপযোগী বাংলা ভাষা তো তৈরি হতে পারবে না। এ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য কি প্রকার? সম্ভবত তাঁরা কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না।

তদুপরি আরেকটা জিনিস দেখা প্রয়োজন। যে সকল মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন, বাংলা ভাষার জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন, লোকজনকে উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেন না, তাঁরা যে এসব করেন, তা কি চাকুরী বজায় রাখার জন্য করেন, নাকি নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য করেন অথবা সামাজিক সম্মান আদায়ের জন্য করেন, তাও দেখতে হবে। এখন এই তিন শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতি করার ভার গ্রহণ করেছেন। সত্যিসত্যি যদি বাংলা ভাষাটা চালু না হয় জাগতিকভাবে কি এঁদেরকে কোনো ক্ষতি সইতে হবে? যদি তাঁদের চাকুরী না যায়, সমাজ যদি বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদের বরখাস্ত করতে না পারে, তাহলে এগুলোকে মনে করতে হবে কথার কথা। কারণ যে শ্রেণীটি বর্তমানে বাংলার কথা বলছেন বাংলা চালু হলে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এঁরাই। তাঁদেরকে নতুন একটি ভাষা শিখতে হবে, প্রয়োগের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে হবে। আর যাঁরা বাংলা জানেন তাঁদেরকেও এর নতুন রূপ এবং আঙ্গিকের জন্য যত্নবান হতে হবে। সেও নতুন একটি ভাষা শিক্ষা করার চাইতে কম শ্রমসাধ্য কর্ম নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, আজকে গণমুখী শিক্ষা, জনগণের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যে সকল কথা শোনা যাচ্ছে এসব শুধু ধাপ্পাবাজি। এতে সের পরিমাণ মিথ্যের অন্তরালে ছটাক পরিমাণ সত্যও নেই।

৪

প্রকৃত গণমুখী শিক্ষা, বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল স্তরে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান, সকল সরকারী বেসরকারী কর্মে মাতৃভাষার ব্যবহারের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে সকল শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান, অতীতের ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বাংলাদেশের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং বিদেশী শোষকদের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় স্বদেশী শোষকরা শাসন করে যাচ্ছেন, সেই শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলা এবং শোষিত মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নত করে তাদের সামনে একটি সমৃদ্ধ সমাজের ছবি তুলে ধরা; যাতে করে এই পচা ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার জন্য শরীরে-মনে পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বর্তমানে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি জনগণের মুখের ভাষার অতি প্রকৃত মমতা বোধ করেন, তাঁদেরও দৃষ্টির সামনে একটি সুস্পষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নেই। তাই সমাজের অন্যান্য চালিকা শক্তিগুলোর সঙ্গে ভাষাও যে একটা শক্তি, তারও যে পালন করার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। হ্যাঁ, ভাষা একটা সামাজিক শক্তি। সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক শক্তি একটি জাতির আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বংস করতে পারে। দীর্ঘদিনের জন্য তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে রাখতে পারে। তার ভাষার প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ থিতিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জাতির যখনই চেতনা আসবে, প্রথম সুযোগেই তার আত্মচেতনা ঐ ভাষাকে আশ্রয় করেই জেগে উঠবে। এটাই নিয়ম। এর অন্যথা হয় না। ফলকথা, গায়ের জোরে, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে একটি জাতির ভাষাকে ধ্বংস কবা প্রায় অসম্ভব, যদি না সে জাতি আপনার থেকে সানন্দে সে ভাষা বর্জন করতে স্বীকৃত হয়। একেকটি ভাষা একেকটি জাতির চিন্ময় সত্তাকেই ধারণ করে। জাতির জাগরণের প্রথম স্পন্দনও ভাষার শরীরেই অনুভূত হয়। ধর্মীয় গোড়ামি, সামাজিক জাড্য, কূর্মবৃত্তি, কূপমণ্ডূকতা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি যে সকল অনড়-স্থবির বন্ধন জাতিকে বৃক্ষের মতো অচল এবং প্রাণোচ্ছ্বাসহীন করে রাখে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ভাষাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতীতের এবং বর্তমানের যে ভাষাগুলো মনন ও চিত্তসম্পদে সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে সেগুলোর বিকাশের একটা পর্যায়ে ভাষাকে সামাজিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাষাও স্বয়ংসৃষ্ট কিছু নয়। সামাজিক মানুষের সচেতন প্রয়াসে সৃজিত হয়েছে। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ভাষার অস্তিত্ব নেই, এই মানুষের সমাজ যখন সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে তখনই ভাষাকেও হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

এই দেশীয় কোনো কোনো পণ্ডিত প্রায়শ বলে থাকেন যে আমরা ঐতিহ্যবোধকে বিস্মৃত হচ্ছি বলেই আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে না। তাঁরা ঐতিহ্য বলতে অতীতের ঠিক কোন্ জিনিসটিকে বোঝাতে চান, বোধকরি তাঁদের নিজেদের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। বাঙালীর অতীত ঐতিহ্য বলতে কেউ বোঝাতে চান সদলবলে গামছা বুনতে লেগে যাওয়া। কেউ মনে করেন উদোম গায়ে পরনের লুঙ্গি উচিয়ে বকরী নৃত্য করা, আবার কেউ বলেন সকলে মিলে ভাওয়াইয়া গানের তালিম নেয়া বা লোকসাহিত্যের ঘুঁটে কুড়ানোই খাঁটি বাঙালী ঐতিহ্য। নিজেদেরকে যাঁরা সত্যিসত্যি বিদ্বান ভাবেন তাঁদের মতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুদেব জ্ঞান করা এবং কলকাতার বঙ্গ-সন্তানদের অনুকরণে কথা বলাই যথার্থ বাঙালীর ঐতিহ্য। অতীতে আরবী-ফার্সী শব্দের ওপর অহেতুক প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য অনেক চলতি শব্দ বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী ভাষা সৃষ্টির নামে বিস্তর কেলেঙ্কারী করা হয়েছে। এই একই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পদ্ধতিতে জনগণের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করার নামে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশালের পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত গালাগাল দেয়ার ভাষাকে তুলে আনা বুঝতে পারেন কেউ। অথবা মনে করতে পারেন জনগণের অনগ্রসর এবং প্রাণচাঞ্চল্যবিহীন স্থবির ভাষাকে ইট-পাথরের মতো বয়ে শহরে নিয়ে আসাটাই জাতীয় ঐতিহ্যের সেবা। আমরা জনগণের মুখের ভাষাকে আধুনিক রূপ দান করার অর্থে বোঝাতে চাই তাতে আধুনিক চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত করানো। বাংলা সাহিত্যের দু'তিনজন শক্তিমান সৃজনশীল প্রতিভার দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা অধিকতর সহজ এবং সকলের বোধগম্য হবে আশা করি। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে বাঙলার গ্রামকে তুলে ধরেছেন এবং লোকদের যথাযথ চেহারায় নিয়ে এসেছেন। তাঁদের সংস্কার, অভাব, সুখদুঃখ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাতে বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তার চূড়ান্ত বিকাশ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। একইভাবে আধুনিক জীবন-চেতনায় সমৃদ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এমন সব গ্রামীণ শব্দ নিয়ে এসেছেন এবং আবহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে নিন্দুক ছাড়া কেউ 'গ্রাম্য লোক' বলতে পারবে না। একই ব্যাপার ঘটেছে বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ এবং পশ্চিম বাংলার গ্রাম-জীবনের শক্তিমন্ত ভাষ্যকার আবদুল জব্বারের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে যেমন অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে, তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সৃষ্টিশীলতাও অনেক আপাত কঠিন এবং জটিল জিনিসকে সহজ, উপলব্ধিগোচর করে তোলে। তবে সে আন্দোলনটি হওয়া উচিত ঠিক বহতা নদীর মতো। জনগণের চাহিদার সঙ্গে, তাদের সমস্যার সঙ্গে, তার সমাধানের সঙ্গে আন্দোলনের সংযোগ নিবিড় হওয়া চাই। বর্তমানে হতশ্রী, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এবং শোষণ-প্রপীড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের আধুনিক জীবনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রকৃত প্রতিশ্রুতি সে রাজনৈতিক আন্দোলনের থাকা চাই। ফলকথা, আমরা যা বলতে চাই, একজন বিপ্লবী কর্মী একজন কৃষক বা শ্রমিকের সঙ্গে মিশে নিজেকে তাঁদের কুসংস্কার কিংবা অজ্ঞতার অংশভাগী করেন না। ধীরে ধীরে ঐ কৃষক শ্রমিকদেরই তাঁর নিজের স্তরে নিয়ে আসেন। তেমনি জনগণের মুখের ভাষার নিকটবর্তী করে বাংলা ভাষাকে নতুনভাবে বিন্যাস করার মানেও এই যে, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং বিদ্যার জগৎকে তাঁদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসা। যাতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, জ্ঞানে তাঁদের অধিকার থাকা উচিত। তাঁদেরও সৌন্দর্যপ্রীতি রয়েছে, তাঁরাও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। কম শ্রমে, কম ব্যয়ে তাঁরা যাতে ঐ সকল আয়ত্ব করতে পারেন সে ব্যবস্থা করা। তাঁদের জ্ঞান, বিদ্যা এবং সৌন্দর্য-চর্চার পথে হাজার হাজার বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে যে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে সেগুলোকে সমূলে উৎখাত করা।

বাংলাদেশের যে সকল রাজনৈতিক শক্তি সামাজিক নেতৃত্বের আসনে আসীন রয়েছে, যে সকল সংস্কৃতিবিশারদকে শ্বেতহস্তীর মতো প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রতিপালন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করছেন, তাঁদের কাজই হলো প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দারোয়ানের মতো সযত্নে পাহারা দেয়া। তাই তাঁরা যখন বাংলা ভাষা চালুর কথা বলেন বুঝে নিতে হবে তাঁরা বাংলা ভাষারই সচেতন বিরোধিতা করছেন।

আগেই বলা হয়েছে, একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে বাংলার মতো একটি অর্ধোন্নত ভাষা কিছুতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন এবং আধুনিক ভাবধারার ধারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আজকের বাংলা ভাষার দীনতা ঘুচাবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কিছুতেই ঘুচবে না। একই সঙ্গে সামাজিক দীনতা দূর করার কর্মসূচিও গ্রহণ করা চাই। সেটা রাজনীতির কর্ম। বাংলাদেশের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবপুষ্ট পরনির্ভরশীল পুঁজিনির্ভর শ্রেণীভিত্তিক সমাজ যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, যে সকল প্রবল বন্ধন এই সমাজের মানুষদের প্রায় আদিম মানুষের পর্যায়ে বাস করতে বাধ্য করছে, তাঁদের জীবনকে হতাশা, দুঃখ এবং কুশ্রীতায় ভরিয়ে তুলেছে, যে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে বৃহত্তর জগৎ এবং মহত্তর পদ্ধতির জীবনযাপনের ছবিকে আড়াল করে রেখেছে, খাঁটি জনকল্যাণমূলক রাজনীতিতে এই সবের বিরুদ্ধে সত্যিকার চ্যালেঞ্জ থাকা চাই। তখন ভাষাও জাতীয় উন্নতির একটি সক্রিয় হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কেননা ভাষা হলো সামাজিক মানুষের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রূপ। সেই সমাজের সমষ্টিগত জীবন যখন সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে, ভাষা আপনা-আপনিই সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হবে। সামাজিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা না করে শুধুমাত্র ভাষাকে মাজা-ঘষা করে উন্নত করার প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত খাবার এবং ব্যায়ামের বদলে রুজ-পাউডার ইত্যাদি মেখে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধির অপচেষ্টার মতো অর্থহীন।

পৃথিবীর প্রতিটি সমৃদ্ধিশালী ভাষা বিশেষ-বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বে সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধায়নের সংগ্রামে এই হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরোধ যখন চরম রূপ ধারণ করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কাঠামো থেকে বহির্গত হয়ে ইংল্যাণ্ডের ভক্ত খ্রিস্টানদের ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য ল্যাটিন বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন উইক্লিফ। ইংরেজ জনগণের গল্প শোনার আগ্রহ চরিতার্থ এবং রস-পিপাসা মিটাবার জন্য চসার 'ক্যান্টারবেরীস টেল্‌স' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাদরী পুরোহিতের উৎপাতে যখন জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, মানুষের জিজ্ঞাসা ধর্মের নামে চারদিক থেকে দাবিয়ে দেয়া হচ্ছিল, তারই প্রতিবাদে আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের পূর্বসূরী লর্ড বেকন তাঁর অভিজ্ঞতাভিত্তিক দর্শনের সন্দর্ভগুলো রচনা করেন। হব্‌স এবং লকের রাজনৈতিক রচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বর্তমানকালে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সেগুলো যে সময়ে রচিত হয়েছিল, তাঁরা কোনো রাজনৈতিক মতামতের পক্ষাবলম্বন অথবা বিরোধিতা করার জন্যই কলম ধরেছিলেন। অর্থশাস্ত্রী এডাম স্মিথকে অর্থশাস্ত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। তিনিও সামন্ত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অর্থনীতির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া অর্থনীতির মহিমা কীর্তন করার জন্য এবং অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতি গণসমর্থন আদায় করার জন্যই 'দ্যা ওয়েলথ অব নেশন্স' গ্রন্থ লিখেছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোনো বিষয়ের জ্ঞান যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, তা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের অধিকাংশ মানুষের চাহিদার বিষয় না হয়ে ওঠে, সমাজে তা চালু হয় না। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, বিদ্যা এবং মতামতের পক্ষে যখন একটা জনমত গড়ে ওঠে, তখন ভাষার কাজ দাঁড়ায় সে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা এবং জীবনে প্রয়োগ করলে জীবনে কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হবে তা সমাজের মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া। সে কাজটি নিশ্চয়ই ঝুঁকিহীন নয়। সব সময়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরাই জ্ঞান এবং বিদ্যার বিরোধিতা করে আসছে। কেননা সমাজে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসার হলে তাদের শাসন-শোষণের নিরাপদ আসনগুলো অটল থাকবে না। ফরাসী দেশের রাজার অনুচরেরা ভলতেয়ারকে গণিকাদের গোরস্থানে কবর দিতে বাধ্য করেছিল। ভলতেয়ারের অপরাধ ছিল তিনি দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ইত্যাকার বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়, গীর্জা এবং ঝুনো মাথার পণ্ডিতদের ধূসর জগৎ থেকে প্রতিভাবলে ছিনিয়ে এনে ক্যাফে হাউস এবং শ্রমজীবী মানুষের ভাবনাচিন্তার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। ফরাসী এনসাইক্লোপিডিষ্ট আন্দোলনের মনীষীদের কাজই ছিল জনগণকে জ্ঞান, বিদ্যা, কলা এবং সৌন্দর্যের বিষয়ে জ্ঞানী, ধীমান এবং সচেতন করে তোলা। আধুনিক ফরাসী ভাষায় এত সুন্দর প্রকাশক্ষমতা এবং এত সুষম অনুভূতির ধারক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিকবৃন্দের অবদান যে অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। জনগণের মধ্যে জ্ঞান এবং বিদ্যা তাঁরা সেদিন নিরাপদে সমাজে প্রচার করতে পারেননি। পদে পদে তাঁদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁদের জ্ঞানের প্রচারের ফলে যে শ্রেণীটির আসন টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, তারা ফাঁদে-ধরা পশুর মতো এই জ্ঞানী মানুষদের জীবন অত্যাচার, নির্যাতন, কারাদণ্ডে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

বিদেশী ভাষার কথা বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় আসা যাক। রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক গদ্য সাহিত্যের উদগাতা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গদ্য সাহিত্যের একজন প্রধান স্থপতির মর্যাদা দেয়া হয়। তাঁরা উভয়েই কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাঁদের মতামত প্রকাশের জন্য সে অর্থে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে নিয়েছিলেন। এই হাতিয়ার হতে পেরেছিল বলেই বাংলা গদ্য অত দ্রুত আধুনিক অবয়ব লাভ করেছে। তা না হয়ে যদি শুধুমাত্র ছাত্রদের পড়ার এবং পণ্ডিতদের পড়ানোর বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে বাংলা কখনও এত তাড়াতাড়ি ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত না। যেহেতু বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাঁরা কতিপয় সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই ভাষাটিকে জনগণের বোধগম্য সরল এবং বক্তব্য-প্রধান করে নিতে হয়েছিল, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, বিচার করে দেখতে পারে এবং তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে ওঠে। সেদিন তাঁরা এক ঈশ্বরের আরাধনা,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সহমরণ প্রথা নিবারণ, বিধবার বিয়ে দেয়া ইত্যাদি সংস্কারমূলক নানা বক্তব্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে টেনে এনেছিলেন। তার বাইরে যাবার কোনো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কেননা তা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা তাঁদের করতে হত। ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ প্রকারে অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তাও হয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহন হওয়ার ফলে। জ্ঞান বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একথা যদি প্রমাণিত হয় মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুস্থ, উন্নত এবং মহীয়ান করার কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের কাছে তার কোনো দাম নেই, দাম থাকা উচিত নয়। যে সমাজে মানুষ ধরুন গরুর গাড়িতে চলতে পারে না, সেই সমাজে পরমাণুতত্ত্বের গবেষণা করে কি লাভ হবে, সমাজের কোন্ উপকারটি এই পরমাণুতত্ত্ব সাধন করতে পারে? তাই বলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির যে বিশাল সম্ভাবনাময় ভূমিকা রয়েছে তা কিন্তু অস্বীকার করছিনে। যে দেশে বিজ্ঞানের প্রাথমিক আবিষ্কারগুলোর কল্যাণ থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত থাকতে হয়, সেই দেশে জটিল এবং উন্নত বিজ্ঞানের চর্চা করলে তা সামাজিক কোনো উপকারই সাধন করতে পারবে না। হয়তো দুয়েকজন ভালো বিজ্ঞানী বেরিয়ে আসবেন, তাঁরা উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমাবেন। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান তো আর সাজিয়ে রাখার জন্য দরকার নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন জীবনের মূলধন হিসেবে। যদি সেভাবে ওসব না আসে রবি ঠাকুরের 'বিদায় অভিশাপ' গীতিনাট্যের দেবযানীর অভিশাপের মতো জ্ঞানী-গুণীরা চিনির বলদ হয়ে থাকতে বাধ্য হবেন। বর্তমানের হতাশা-জর্জরিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যাদের হাতে শাসনদণ্ড তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কামনা করেন না। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সুন্দরের বোধে উদ্দীপ্ত সচেতন মানুষের বদলে দাস-মনোভাবাপন্ন জনগণেরই প্রয়োজন তাঁদের বেশি। বাংলা ভাষা যতই অবিকাশিত থাকে ততই তাঁদের লাভ, জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার মান যত নিচে থাকবে সিংহাসনে তাঁদের স্থায়িত্ব তত অধিক হবে। তা হলেই সুদীর্ঘকাল নির্বিবাদে শাসন-শোষণ চালাতে পারবে।

এই আলোচনার মধ্য থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অজ্ঞানতার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে পুরোপুরি। অর্থাৎ যে শ্রমিক পণ্য উৎপাদন করে সে তার ন্যায্য মজুরী পায় না, যে কৃষক গায়ে-গতরে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় সে খেতে পায় না। কেন কৃষক খেতে পাবে না? কেন শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পাবে না? এটি কি ন্যায়ের কথা? অথচ গোটা সমাজ মজুর-কিষাণের শ্রমে বেঁচে আছে এবং তাদেরই রক্তঝরা শ্রমের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর হস্তে সমস্ত বিত্ত সঞ্চিত হচ্ছে। তারা রাজা-উজির বানাবে, স্কুল-কলেজে পড়বে, আরাম-আয়েশ করবে, নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেবে, তারা আইন বানাবে, আদালত চালাবে, কল-কারখানার মালিক হবে। এক কথায় তারা হবে প্রভুশ্রেণী।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাদেরই কথায় গোটা সমাজের সংখ্যাধিক মানুষকে ওঠবস করতে হবে, তারা হবে রুটি-রুজীর মালিক। এটি কি চূড়ান্ত অজ্ঞানতা নয়? একই রকম রক্ত-মাংস-মেদমজ্জা বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে একদল প্রভুশ্রেণী আর একদল দাসশ্রেণী হবে মানুষের শরীরতত্ত্বের মধ্যে তো তার কোনো ইঙ্গিত নেই। এটা কৃত্রিম। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ মানুষের উপরে প্রভুত্ব করছে এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এটাই বৈশিষ্ট্য। কৃত্রিমতার ওপর যে সমাজের বুনিয়াদ খাড়া রয়েছে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা কি চূড়ান্ত অজ্ঞতা নয়? জ্ঞানের প্রথম কাজ হলো এই সমাজব্যবস্থা যে মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখিয়ে দেয়া। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, জ্ঞানকে মানব সমাজের মূল্যবান সম্পদ মনে করেন তাঁদের কাজ হওয়া উচিত অজ্ঞানতার ওপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তা ভাঙ্গার কাজে অংশগ্রহণ করা। কেননা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যাপকহারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চল হলেও সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শ্রমিক-কৃষককে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করে। শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা শোষকশ্রেণীর সেবাদাসে পরিণত হতে বাধ্য হয়। তাঁদের প্রতিভাকে অপরের লোভপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে হয়। অথচ প্রতিভার দানে জগৎ সুন্দর, সুখকর এবং মানবসমাজ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং প্রীতিস্নিগ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে মানুষের সৃজনীশক্তিরই সাহায্য নিয়ে একদল মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষদের দাস-গোলামে পরিণত করে। পৃথিবীকে কারাগার বানিয়ে রাখে।

My All Garbage

৫

যা বলছিলাম, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার শত্রু যদি কেউ থাকে তাহলে তা কোনো ভাষা বিশেষ হতে পারে না। সে কারণে ইংরেজী, উর্দু কিংবা হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষা কিছুতেই বাংলা ভাষার শত্রু নয়। ঐ সকল ভাষা তখনই বাংলা ভাষার শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করে যখন তার সঙ্গে একটি শোষকশ্রেণীর সচেতন অভিপ্রায় সংযুক্ত হয়। ইংরেজীর প্রতি এই দেশের মানুষ তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করেছেন, তার কারণ ইংরেজরা এই দেশে এক সময় শাসন এবং শোষণ করে জনগণের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই ইংরেজী ভাষাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের এদেশবাসীকে শোষণ করার একটা প্রতীক। একইভাবে উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণা করছেন এই কারণে যে তারাও এই দেশের কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করেছে।

বর্তমানেও এই বাংলাদেশে ইংরেজী মর্যাদার আসনে রয়েছে। তার কারণ এই নয় যে ইংরেজী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজীর মতো অথবা তার চাইতেও আরো অনেক সমৃদ্ধ ভাষা রয়েছে কিন্তু সেগুলোর প্রতি খুব কম লোকই কদাচিৎ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইংরেজী এই দেশে এখনও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত এই কারণে যে ইংরেজরা যে সমাজব্যবস্থা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সৃষ্টি করে গিয়েছিল, তার কোনো অদলবদল হয়নি। বরঞ্চ দিনেদিনে তা আরো সুদৃঢ় এবং সংহত হয়েছে। তাই ইংরেজরা চলে যাবার পরে এই দেশে যে পরিমাণ তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, সম অনুপাতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত মানুষ বৃদ্ধি পায়নি। ইংরেজ আমলে প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়ার ইংরেজী-মাধ্যম যে কয়টা স্কুল ছিল তা সংখ্যায় অনেকগুণে বেড়েছে। ইংরেজী ভাষার এমন কি মহিমা যে ইংরেজ চলে যাবার পরে এই দেশে তার চল হু-হু করে বেড়ে যাবে? আসলে ইংরেজীর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া সামাজিক মর্যাদার অংশ হিসেবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে-সমস্ত বাংলার পণ্ডিতেরা মাঠে-ময়দানে বাংলা ভাষার সপক্ষে বিস্তর চেল্লাচেল্লি করেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা করতে পাঠান। এমনও দেখা গেছে, জোচ্চোর ঠিকাদার, চূড়ান্ত সমাজবিরোধী, কালোবাজারী, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের একফোঁটা অনুরাগ নেই, তারাও ছেলেমেয়েদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাচ্ছে। ইংরেজ শাসন নেই অথচ ইংরেজীর প্রসার বাড়ছে — এর কারণ কি?

কারণ, ইংরেজরা যে শ্রেণীটি তৈরি করে দিয়ে গেছে সেই শ্রেণীটি এখনও এই দেশের প্রাণশক্তিকে বুকে পা দিয়ে দাবিয়ে রেখেছে। এই দাবিয়ে রাখার জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদী, প্রভুত্ব বিস্তারকারী যে কোনো দেশের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলতে পেছপা হবে না। বর্তমানে ইংরেজীর ছদ্মবেশে হামেশা যা দেখি তা হলো ঔপনিবেশিক মানসিকতা। এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি থেকে দিনেদিনে প্রাণরস আহরণ করছে। এই ঔপনিবেশিক মানসিকতাই বাংলা ভাষার সর্বপ্রধান শত্রু। তা যতদিন পর্যন্ত দূর করা না যাবে, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি কখনও গণমুখী রূপ পরিগ্রহ করবে না। যে অর্থনৈতিক ভিত্তি এই ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে তা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে জনগণের মুখের ভাষাকে টুঁটি টিপে ধরছে এবং জনগণের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখছে। সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে না ফেলা পর্যন্ত আপনাআপনি দূরীভূত হবে না। এই পদ্ধতিকে বর্তমানের মতো চলতে দিয়ে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য অশ্রুপাত করা রুগ্ন ছেলের চিকিৎসা না করিয়ে শিয়রে বসে কাঁদুনি গাওয়ার শামিল। এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজেই এই বাংলা ভাষাকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ইংরেজী, ফরাসী, রুশ প্রত্যেকটি ভাষা ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলা ভাষাকেও বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি স্থান এবং প্রতিটি মন লড়াই করে জয় করতে হবে। বাংলার সমাজবিপ্লবের প্রথম শোণিত বাংলা ভাষার শরীর থেকেই নির্গত হবে।

১৯৭৪ *বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে*
(১৯৭৫)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

বাঙলার সাহিত্যাদর্শ

'প্রতিটি সাহিত্যাদর্শের মধ্যে একটি সামাজিক আদর্শ ভ্রূণের মতো সংগুপ্ত থাকে।'

ইংরেজদের আসার আগে বাঙলার সমাজ বাস্তবতার অবস্থা ছিল কার্ল মার্কস বর্ণিত বৃক্ষ-জীবনের মতো স্থবির এবং নিশ্চল। বাঙালী সমাজ আচার-সংস্কারের শত বেড়াজালে অবরুদ্ধ ছিল। এই আচারলাঞ্ছিত সংস্কারপীড়িত সমাজে একটা মানসিক বন্ধ্যাত্বের ভার পাষাণের মতো চেপে বসেছিল। সামাজিক গতিশীলতা যার স্পর্শে জীবনে নতুন মহিমা, সাহিত্যে অভিনব ব্যঞ্জনা সূচিত হয়, একেবারে ছিল না বললেই চলে। যুগ-যুগ ধরে জীর্ণ চিন্তার ভারে এবং মানসিক নৈরাজ্যের পীড়নে গোটা সমাজ-শরীরে আচ্ছন্ন করেছিল একটা হতাশাবোধ। এই সময়ে, এই ধরনের পরিবেশে জীবনের প্রতি 'হাঁ'বাচক কোনো সৃষ্টির আশা করা যায় না। বাঙলার সমাজকাঠামো ছিল প্রাচ্যের তৎকালীন অন্যান্য দেশের মতো সামন্ততান্ত্রিক। অথচ বহুকাল আগেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামন্ত সমাজ সৃষ্টির বীর্য, যৌবনের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছে। তুর্কী মুসলমানদের এদেশে আগমনের ফলে যে তীক্ষ্ণ সমাজসংঘাত ঘটে তার স্পর্শে যে একটা সৃষ্টিচেতনা লহরিত হয়, বৈষ্ণব কবিতার আকারে যা পুষ্পিত হয়, মঙ্গল কাব্যরূপে চেতনার একটা স্রোতধারা রচনা করে, সমাজের গতিশীলতার অভাবে তা পটে আঁকা চিত্রের মতো চাঞ্চল্যবিহীন স্থৈর্যের মায়া-মুকুরে বন্দী হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী সমাজে একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসমষ্টির মধ্য থেকে একটি নতুন শ্রেণী প্রবাল-দ্বীপের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। এঁরা রুচিতে ভিন্ন, সামন্তদের সঙ্গে যুক্ত নয়। বিদেশীর স্বার্থেই এঁদের সৃষ্টি এবং বিদেশীর স্বার্থেই এঁদের স্বার্থ। তাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের তড়িৎ স্পর্শে বাঙালী সমাজে প্রথম আধুনিক বিদ্রোহ মুখিয়ে ওঠে। ভিনদেশী সরকারের নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রাচীন সামন্তশ্রেণীর বুকে বজ্রশেলের মতো আঘাত করে তার মাজা ভেঙ্গে ফেলে একেবারে উত্থানশক্তিহীন করে দেয়। এই ভাবে বাঙালী সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে হবে তাদের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঝাড়েবংশে নির্মূল করে বাঙলা দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী তার আবির্ভাব ঘোষণা করে। বুর্জোয়া শ্রেণীও নিজের পদ্ধতিতে সমাজে চালিকাশক্তি হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে আসছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে এই উঠতি বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মবিশ্বাসী সংগ্রামী মনোভঙ্গীই স্ফুরিত হয়েছে। প্রতীচীর আদর্শে দীক্ষিত একদল অত্যুগ্র যুবকই ছিলেন এই আন্দোলনের হোতা। তাঁরা মনে করতেন প্রতীচীর যা কিছু সব ভালো আর প্রাচীর সব খারাপ। অতএব ঘৃণা এবং বর্জনীয়। তাঁরা ছিলেন বাঙলা দেশের অত্যন্ত রক্ষণশীলদের একেবারে বিপরীত। এঁরা তাঁদের সত্যপ্রীতি, জ্ঞানতৃষ্ণা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সমাজ বিপ্লবের প্রতি আগ্রহ — এসবের মধ্য দিয়ে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে একটা মানসিক পরিবর্তন সম্ভাবিত করে তুলেছিলেন। তার ফলে বাঙলার কতিপয় মানুষের সৃষ্টিচেতনা গভীর আবেগে শিহরিত হয়ে ওঠে। বাঙালী মনের এই উর্ধ্বমুখী শিহরণ, আগে যা কখনো ঘটেনি, তার সৃষ্টিশক্তিকে নানান দিকে প্রভাবিত করে নিয়ে যায়। তার সৃষ্টিচঞ্চল চিত্তদোলা — একে ইতিহাসে বাঙলার নবজাগরণ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাঙালী মনের গ্রহণশীলতার কোনো তুলনা নেই। স্বল্পসময়ের মধ্যেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস তথা সৃষ্টিচঞ্চল চিত্তদোলার সমস্ত প্রভাময় রশ্মি নিজেদের চেতনায় অঙ্গীভূত করেনি শুধু, সীমিত পরিসরে, ক্ষুদ্র হলেও চারিত্র্যের দিক দিয়ে একইরকম আরেকটি সৃজনঋতু প্রাণের ফসলে ভরিয়ে তুলেছে।

ইয়ং বেঙ্গল দল ছাড়াও বাঙলা দেশে আরো কতিপয় সুস্থ মানুষ ছিলেন। তাঁরা শান্তভাবে বিচার করে প্রতীচীর শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন, কিন্তু পুরোপুরিভাবে প্রতীচ্য সমাজের আদর্শ অন্ধভাবে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং সে সঙ্গে প্রতীচ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শেও এসেছিলেন। তার ফলে তাঁদেরকে সমাজ সংস্কারকের জীবন বেছে নিতে হয়। এই সমাজ সংস্কারকেরা ছিলেন রেনেসাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্ব। বাংলা গদ্যের প্রবর্তন, তাতে গতিদান করা এবং সেরকম আরও নানা সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁদের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শক্তির সে উন্মুখর তরঙ্গ যা বুর্জোয়াশ্রেণীকে কর্মক্ষেত্রে তাড়িত করেছে বাঙালী সমাজের প্রাথমিক দিকপালদের সাহিত্যকর্মে পুরোপুরি তার উদ্ভাসন মেলে না। তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁদের মতামত প্রকাশের বাহন করে তোলেন। রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যকে তাঁর ধর্মমত প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মানববাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলা গদ্যে প্রাণসঞ্চার করলেন, দান করলেন গতিশীলতা। কিন্তু তিনিও তাঁর জীবনের এক খণ্ডাংশ মাত্র ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য ব্যয় করেছেন। তাঁর সংস্কৃত কাব্যের স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ, যাতে ধর্মবোধের লেশমাত্র নেই, সেগুলো ছাড়া বিদ্যাসাগরের অন্য কোনো সাহিত্যকর্মে বুর্জোয়াসুলভ জীবনবীক্ষার সাক্ষাৎ কদাচিৎ পাই।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মাইকেল মধুসূদন দত্তই হলেন বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিদ্রোহী জীবনোল্লাস পারিপার্শ্বিকের সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাধবধ কাব্য' প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর জাগরণ গীতি। মাইকেলের উদ্দাম কল্পনা করার ক্ষমতা, কবিতা রচনার অসাধারণ প্রতিভা, তাঁর ঐতিহ্য, মানস সংগঠন, শিক্ষা, সাধনা, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা, প্রাচীন কবিদের রচনারীতির প্রতি অনাগ্রহ এবং সর্বোপরি বীররসের কাব্য রচনা করার অনিভস্ত কামনা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নবযুগের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যান্য মহৎ কবিদের মতো তিনিও তাঁর যুগের চাইতে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলার প্রতি তাঁর জাগত সহানুভূতি তাঁদেরকে মূল রামায়ণের রাম, লক্ষণ, সীতার চাইতে অধিকতর মহৎ এবং বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত করেছে। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলার চরিত্রে সাহিত্যিক মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়ে মাইকেল ঐতিহ্য এবং সংস্কারের বুকে যে প্রচণ্ড আঘাত করলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মাইকেলের সময়ের আলোকপ্রাপ্ত সমাজ একটা পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু মাইকেলের অঘটন-ঘটন-পটয়সী প্রতিভা যা করল তা সহ্য করার মানসিকতা তখনো অনেকের জন্মায়নি। মাইকেলের একচোখা সমালোচক, অন্ধঅনুকারকদের কথা বলে লাভ নেই, এমনকি যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং মাইকেলের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি সাফল্য অকল্পনীয়। কিন্তু মাইকেলে তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দকে তাঁর প্রতিভার অযোগ্য মাধ্যম মনে করলেন। তাঁর অন্তর্লোকের আগ্নেয়বার্তা বহন করার জন্য বাংলা ভাষায় আরেকটি নতুন ছন্দের প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন। কোনো খেয়াল কিংবা অগভীর রুচিবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেননি। জানতেন যে তিনি এক মহা বীর্যবতী সঙ্গীতকে মুক্তি দিচ্ছেন, বীরসুলভ যন্ত্রণা ও বেদনাবোধ থেকে বুকে অঙ্কুরিত হয়েছে এই মহান সঙ্গীত। এতে মাইকেল সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। বীরত্বব্যঞ্জক বেদনাবোধ, তাকে তো উপযুক্ত বসন পরাতে হবে। কোন্ বসনে মানায়, তাই বাংলা ভাষায় এলো গুরুগম্ভীর ধ্বনিসৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

তাঁর রাবণ-প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ এঁরা উঠতি বুর্জোয়ার সজীব প্রাণবন্ত প্রতীক। ইতিহাস তাঁর মধ্যে এমনভাবে কাজ করেছে স্বয়ং স্রষ্টা সচেতনভাবে সে বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তা হোক মাইকেল তাঁব যুগের চৈতন্যকে অপরূপ প্রভায় প্রভাময় করেছেন। এ হচ্ছে প্রতিটি মৌলিক স্রষ্টার এক অনুপম চারিত্র্যলক্ষণ। যদিও তিনি স্থান এবং কালের পরিধিতে বন্দী, তবু তিনি এমন শক্তিশালী যে নিজের অন্তর খনন করে খনিজ তিমিরে এমন আলো আবিষ্কার করেন যা ভূগোল-ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে যায়। মাইকেল ছিলেন চূড়ান্তভাবে বিপ্লবী। তাঁর কল্পনা এ্যাসিডের মতো যখন প্রাচীন কাব্যের চরিত্রগুলো স্পর্শ করেছে তাদের ধর্মের লৌহবর্ম খসে পড়ছে, রক্তমাংসের সৌন্দর্য নতুন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে আরেকটি উজ্জ্বল জগতের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে। এটা ঘটেছে কবির আগ্নেয় ফার্নেসে চরিত্রগুলো নবজন্ম লাভ করছে বলে। তাঁরা আর ধর্মীয় মতের বাহন রইলেন না। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের সাহসী এবং প্রেমোন্মত্তা নায়িকারা আধুনিক পোশাকে আধুনিক জগতে পদার্পণ করলেন। এটা পুরনো বোতলে নতুন সুরা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রেম, কাম, দম্ভ এসবকে জীবনে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হলো। ট্র্যাজেডীর বীজ রোপন করা হলো; পূর্বের ভারতীয় ঐতিহ্যে ট্র্যাজেডীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। জীবনের প্রেক্ষিতটাই সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল। বাংলা সাহিত্যে এটা একটা নবতর সমৃদ্ধ প্রবর্তনা, যার সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারের তুলনা করা যেতে পারে, যা মানুষকে নতুনভাবে জীবনকে দেখতে এবং বিচার করতে বাধ্য করল। নতুন সাহিত্যাদর্শের গতিশীলতা সমাজ আদর্শের মধ্যে একটা সংঘাত বাধিয়ে তুলল। একটি মানববাদী সাহিত্যাদর্শ সৃজনে মাইকেল পুরোপুরি তাঁর যুগের কাছে ঋণী ছিলেন না। এর গৌরব তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেই দিতে হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিশ্বজনীন মানুষ। দুর্ভাগ্যবশত বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের মতো মানববাদী সৃষ্টিশীল মানুষ অধিক আসেননি। তাঁর উত্তরাধিকারী, অনুসারী এবং অনুকারকদের কেউই প্রকৃত মানববাদী একটা সাহিত্যাদর্শ খাড়া করতে পারেননি। তার পরিবর্তে সাহিত্যিকেরা বৃথাই হিন্দু আদর্শে নির্বাণ সন্ধান করেছেন। মাইকেলের মানববাদী-সাহিত্যাদর্শ পুনরুদ্ধার করতে বাংলা সাহিত্যকে অনেক দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে।

মাইকেলের পরে বঙ্কিম হলেন সাহিত্যের আদর্শ নির্মাতাদের একজন। তিনি ছিলেন প্রতীচীর শিক্ষায় সুশিক্ষিত মানুষ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহনস ওয়াইফ' ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। বলতে গেলে যাঁদের জন্য লেখা 'রাজমোহনস ওয়াইফ' সে ইংরেজ এবং ইংরেজী শিক্ষিত এদেশীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। এই অবহেলা বঙ্কিমচন্দ্র এবং বাংলা সাহিত্যের জন্য শাপে বর হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের ধূর্ত মনোভঙ্গী বা মেকলের নানা রচনায় প্রকাশ লাভ করেছে তার নিহিতার্থ হলো, ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করবেন যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনসমষ্টিকে শাসন করা যায়। কিন্তু এই নীতি ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে বিফল প্রমাণিত হল। কারণ মানুষের মনের অন্তঃস্রোতকে শাসন করার কোনো ক্ষমতা বিদেশী কূটনীতির ছিল না। বিশেষত সে নীতি যখন জাতির সমস্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রলিপ্ত। বঙ্কিম এবং মাইকেল উভয়েই ইংরেজীতে লিখতে আশা পোষণ করেছেন এবং সেজন্য ব্যাপক প্রস্তুতিও নিয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের লিখতে হলো মাতৃভাষা বাংলাতেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের যোগ্য উত্তরসূরী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু দুই মহান শিল্পীর মধ্যে যে পার্থক্য তা দুস্তর। প্রথমত সময়ের কথা ধরতে হয়। মাইকেল এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন যখন গোটা পরিবেশ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে জাগিয়ে উঠেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র হিসেবে যখন তিনি হিন্দু কলেজে আসেন তখনো কলেজের বয়স্ক ছাত্রদের মনে তরুণ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জ্ঞানসাধক হেনরী ডিরোজিওর স্মৃতি একেবারে তরতাজা রয়েছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ছিলেন মাইকেলের প্রিয় শিক্ষক, তিনি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের শিক্ষাদান করার জন্য দুর্নামের অধিকারী হয়েছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের ব্যাপার আলাদা। সে সময়ে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় হয়ে বসেছে এবং একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রতীচীর বিদ্যা আহরণ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থিতিয়ে এসেছে। বাস্তবের সংঘাতে মানুষ শান্তভাবে ইতিহাসের শিক্ষা কি চিন্তা করতে বাধ্য হল। সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে লেগেছে। তার ফলে শাসকদের সম্বন্ধে শাসিতের মনে এক ধরনের সন্দেহের উদয় হয়। রাজত্বের প্রথম দিকে ব্রিটিশ জনসাধারণ এদেশীদের চোখে যে মর্যাদার অধিকারী ছিল বাস্তবের কঠোর সংঘাতে তাদের অনেক নিচে নেমে আসতে হয়, তারা মর্যাদা হারাতে থাকে। এ দেশের চিন্তাশীল মানুষের মনে এ প্রতীতি জন্মাল যে বিদেশী লোকেরা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে কয়েদ করতে এসেছে, তাদের সাহায্যে জাতীয় মুক্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সংশয়ী মনোভাব সে যুগের চিন্তাশীল মানুষদের মন-মানস অধিকার করেছিল। পাশাপাশি এক ধরনের জাতীয় চেতনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং মনের মধ্যে একটা নিরাপদ ভিত্তি সন্ধান করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষেরা ইউরোপীয় জাতীয় চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বাঙলার সে দূরদর্শী স্বাপ্নিকেরা ভুলে গিয়েছিলেন প্রকৃত অতীতের ওপরই ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্মাণ করা যায়। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে তাঁরা ভারতীয় হিন্দুদের অতীত বলতে বুঝতেন সে সময়, যখন আর্যেরা এ সুপ্রাচীন দেশে এসে তাঁদের বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ভারতীয় হিন্দুদের অতীত একমাত্র সেই সময়ের মধ্যে নিবদ্ধ মনে করতেন। এই উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছরের মুসলিম শাসনকে আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন জ্ঞান করে আলাদা করে রাখলেন। কি কারণে এই খণ্ডিত ইতিহাসবোধ প্রাধান্য লাভ করেছে তার বিচার করার সময় এ নয়। এ হয়েছে ব্রিটিশের বিভক্ত করে শাসন করার নীতির কারণে, সংস্কারাবদ্ধ হিন্দুমনের প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং মুসলমানদের সামাজিক জাড্যের প্রভাবে। এই তিন কারণের মধ্যে কোনটি প্রধান এখনও তা বিতর্কের বিষয়। সাহিত্যের আরেকটি নতুন আদর্শের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন।

মাইকেল এবং বঙ্কিমের মধ্যে দ্বিতীয় দফা পার্থক্য হলো, বংশানুক্রম, ব্যক্তিক, সামাজিক পার্থক্য; যেগুলো একজন সৃষ্টিধর প্রতিভার অন্তর্লোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মাইকেল সম্পূর্ণ সত্তা একটি মাত্র প্রতিজ্ঞায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শেকস্‌পীয়র, মিলটনের মতো একজন মহৎ কবি হবেন। একটা অস্থির সৃষ্টিচেতনা তাঁকে বারেবারে চঞ্চল এবং উতলা করেছে। এই সৃষ্টিচেতনার নির্দেশেই তিনি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পিতৃপুরুষের ধর্ম ছাড়লেন, ইংরেজীতে কবিতা লিখতে থাকলেন এবং বিলেতে পাড়ি জমালেন। এই সৃষ্টি-চেতনাই তাঁকে আবার কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং শ্রী রাধিকার দেশে ফিরিয়ে এনেছে। তাঁর ছিল একমুখী মন যা তিনি সব সময় সম্ভব-অসম্ভব কাব্যিক ভাবনায় পূর্ণ করে রাখতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরেক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন দান করার দিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রাখলেন। তাঁর প্রতীচীর জ্ঞান, শৈল্পিক প্রতিভা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যা কিছু তাঁকে মহৎ করেছে সব এ কাজে ব্যবহার করলেন। একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয়। তিনি তাঁর যুগ এবং সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন — কথাটা সত্যি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের একজন সে বিষয়ে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য পূর্ণতা লাভ করে, ভাষা এমন পেলব হয়ে ওঠে যে অন্তরের তার-অনুভাব ধারণ করার মতো বেগবান এবং ক্ষিপ্ররূপ পরিগ্রহ করে। তাঁর গদ্য রচনা যেন স্থাপত্যকলার স্বজাতি, থরেথরে গড়ে উঠেছে, বিকাশলাভ করেছে। নিপুণ নক্শাকারের মতো কাহিনীর প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন এবং আকাঙ্ক্ষিত কক্ষটিকে রোমান্সের গাঢ় মসৃণ দৃষ্টিহারী প্রাণের গভীর থেকে নিঃসরিত রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। উপন্যাস শিল্পে তাঁর যে অবদান তার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির উৎপত্তি, বিকাশ এবং পূর্ণতাও তাঁর মধ্যেই হয়েছে। এই আনন্দিত কিন্তু কঠিন অভিযানে যে সকল বিদেশী লেখক তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন সাফল্যের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, তিনি তাঁদেরও ছাড়িয়ে গেছেন মনে হয়। একখণ্ড মৃত অতীতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোতে সে সকল উপাদান ছিল। তিনি ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন করতে পারতেন চমৎকার। নিয়ত পরিবর্তনশীল ইতিহাস-স্রোতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে কোন্ ভূমিকায় দাঁড় করাতে হবে, তিনি জানতেন। এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। কল্পনার সঙ্গে ঘটনা এবং ঘটনার সঙ্গে চরিত্র যিনি মেলাতে পারেন তিনি উপন্যাসে নিশ্চিতভাবে সাফল্য অর্জন করবেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর বিরুদ্ধে নালিশ হলো এতে ইতিহাসবোধ লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর যুগের চাইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে কতদূর এগিয়ে ছিলেন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি বাঙালী জনগণের ইতিহাস রচনার তাগিদ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। জনগণের ইতিহাস বলতে কি বোঝায় তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বাঙালী জনগণের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি বাঙলার অন্যান্য মানুষের চাইতে অত্যন্ত ভালোভাবে জানতেন যে বাঙালী মিশ্র জাতি। তাদের মধ্যে আর্যরক্তের ধারা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু তাঁর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর চরিত্রে এক ধরনের আর্যামীর ভড়ং দেখা যায়। এটা একটা প্রহেলিকা যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিন মুক্ত হতে পারেননি। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ও তাঁকে খুবই স্বল্প সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের নানা শাখার সংবাদ তার মনের সংকীর্ণতা দূর করতে পারেনি। মজ্জাগত হীনম্মন্যতাবোধ থেকে কিছুই তাঁকে আরোগ্য করতে পারেনি। এসব কারণেই তিনি মানববাদী আদর্শ থেকে নেমে এসে সাম্প্রদায়িক আদর্শকেই বরণ করে নিলেন। শিল্পী নিজেকে হিন্দু ধর্মের আদর্শের সঙ্গে এক করে ফেললেন। অন্য ধর্ম, অন্য জাত এবং দেশের প্রতি মানসিক কারণেই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন। হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম ধর্ম ছাড়া আর কিছুই তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর কল্পনাশক্তিকে আপন সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে কামানের গোলার মতো ছুঁড়ে দিলেন। যা কিছু প্রতীচী থেকে জেনেছেন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে অনুরঞ্জিত হয়েছে তাঁর গোঁড়া সংস্কারাবদ্ধ মানসিক বৃত্তির কারণে। আপন সম্প্রদায়ের হিতের জন্য তিনি যে কোনো দুঃখ-কষ্ট সইতে রাজী ছিলেন। তিনি ভেবেছেন ইতিহাস বিকৃত করলে সম্প্রদায়ের কল্যাণ হবে, তাই তিনি ইতিহাস বিকৃত করেছেন। মিল, বেনথাম, ভলতেয়ার, রুশো এবং প্রতীচীর অন্যান্য লেখকদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অধ্যয়ন করে তিনি 'কৃষ্ণচরিত' লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। লেখার সময়ে তিনি মনের মধ্যে এ বিশ্বাস সব সময়েই পোষণ করেছেন যে তাঁর আপন সমাজের মানুষ বইটি পড়ে উদ্দীপ্ত হবে। বঙ্কিম এবং তাঁর প্রতীচীর গুরুদের মধ্যে সর্বপ্রধান তফাৎ হলো তাঁরা বাইবেল এবং খ্রিস্ট ধর্ম দুই-ই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ উভয়কেই সারসত্য ধরে নিয়েছেন বঙ্কিম। স্বজাতির কল্যাণকামনা এত অধিক ছিল যে তিনি রাজনৈতিক সন্দর্ভও রচনা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'আনন্দমঠে' নিজের পদ্ধতিতে জাতীয় মুক্তির পন্থাও নির্দেশ করেন। তাতে তিনি এক ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রচার করেন। যুক্তিবাদী মানুষের কাছে বঙ্কিমের এ মতবাদ হাতুড়েপনার চাইতে অধিক কিছু মনে হবে না। কিন্তু এই হাতুড়ে, গোঁড়া, সংস্কারান্ধ, বিজ্ঞানবিমুখ বঙ্কিম তাঁর সমাজ এবং সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। তাঁর অস্তিত্বের মহত্তম অংশ পরবর্তী সময়ের গবেষণার বিষয় হওয়ার জন্য সে সময়ে কোনও দাম পায়নি। তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত বিকৃত মতবাদ গোঁড়া সংস্কারান্ধ হিন্দুদের উৎসাহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে একরকম পুজো করতেন। 'আনন্দমঠ' ছিল বিপ্লবীদের প্রেরণাপুস্তক এবং ধ্বংসের দেবী করালবদনা কালী ছিলেন তাঁদের একমাত্র আরাধ্য। বন্দেমাতরমকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগীত ঘোষণা করা হল। বঙ্কিম যা আশা করেছিলেন, তাঁর উত্তরপুরুষেরা পরবর্তীকালে রূপায়িত করেছেন। গোঁড়া সংস্কারান্ধ মনের নরম পলিতে তিনি যে বিষের বীজ বপন করেছিলেন কালে তাতে ফল ফলতে আরম্ভ করে। তিনি চাইলে আরো ভালোভাবে আপন সম্প্রদায়ের সেবা করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারতেন। তাঁর সে যোগ্যতা এবং প্রতিভা ছিল। বস্তুত তিনি জাতির বন্ধু হওয়ার চাইতে শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তো মূলত শিল্পী। গানের পাখীর গুরুমশায় হওয়া চলে না। তাঁর শিক্ষা তাঁরই সম্প্রদায়কে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের পথে চালিত করেছে। পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণিত করেছে। সম্ভবত বাঙলা বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিস্মৃতির অতল থেকে একই মানুষের দুটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে। একটা প্রেম-ভালোবাসা এবং আশাবাদে উজ্জ্বল, অন্যটি মৃত্যু-কীটের নিবাসভূমি।* বঙ্কিম সানন্দে যে অন্ধকার ছড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো একজন ব্যক্তিত্বের জীবনভর সংগ্রাম তা দূর করতে পারেনি পুরোপুরি। শয়তান তার প্রাপ্য আদায় না করে ছাড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এমন পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন যা তাঁর মানসপ্রবৃত্তিতে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা দান করেছে। তিনি এমন এক পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন যিনি মস্তিষ্ক এবং মানসসম্পদের জোরে উত্তরকালে মহর্ষিতে রূপান্তরিত হন। রাজা রামমোহন রায়ের অন্তর-খোঁচানো অনুসন্ধিৎসা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়মন সবটা অধিকার করেছিল। ঠাকুর পরিবার রাজা রামমোহনের ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একেশ্বরবাদী মতের সঙ্গে সেমেটিক ধর্মগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে। রামমোহন রায় ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। তিনি সচেতনভাবে একটা ধর্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা মনের দিগন্তের প্রসার ঘটাবে এবং তাঁর দেশবাসীকে নীচতা-হীনতা থেকে উদ্ধার করবে। যদিও রামমোহন প্রগাঢ় জ্ঞানী লোক ছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন বাস্তববুদ্ধির মানুষ। জীবনের প্রতি তিনি উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। এই কারণেই তাঁর মতামতের সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের খুবই স্বল্প সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁর বিশ্বাসের আগুন লক্ষ হৃদয়ে জ্বলে ওঠেনি। আসলে এটা ছিল একটা সুচিন্তিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনাকে অগুনতি দেব-দেবীর পূজো করার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর দেশের মানুষের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর যথার্থ জ্ঞান ছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেশের মানুষ অলস মস্তিষ্ক দিয়ে যুক্তি বুঝতে পারবে না। অন্তত এক ঈশ্বরের ধ্যান তাঁদের চেতনাকে কিছু অংশে নির্মল করবে, তার ফলে আপনা থেকেই যুক্তিবাদিতা জন্ম নেবে। তিনি তাঁর ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যুক্তিকে খুব একটা দাম দেননি। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল হিন্দু ধর্মের দিকে আর কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ছদ্মবেশী খ্রিস্টান।

* বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আহমদ ছফার বিস্তৃত মূল্যায়ন রয়েছে ১৯৭৭-এ প্রকাশিত তাঁর *শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে। — সম্পা.

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেবেন্দ্রনাথের সন্তান রবীন্দ্রনাথের মাইকেলের মতো উদ্দাম কিংবা বঙ্কিমের মতো গোঁড়া হওয়ার খুব অল্পই সুযোগ ছিল। কারণ তিনি যে পরিবেশে জন্ম নিয়েছেন তা বিশ্বজনীন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মনোবৃত্তি এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে বিনা দ্বিধায় তিনি প্রত্যেকটি দেশ, জাতি এবং ধর্মের যা কিছু মহৎ, শ্রেষ্ঠ সবকিছুকে সম্মান করতে পারতেন। মনের এই যে সংস্কারমুক্ত গড়ন, তা তাঁকে এক আশ্চর্য গ্রহণশীলতা দান করেছে। মনের গভীরে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, সব মানুষের অন্তরপ্রকৃতি একই রকম। এই একত্বের অনুভূতিই তাঁর কাব্যের ঈশ্বরচেতনা, যাকে কবি স্বয়ং 'জীবনদেবতা' বলে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা বাধ্যবাধকতামুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর মতে ঈশ্বর একটা সুন্দর ধারণা, একটা পুলকিত বিশ্বাসবোধ, অধিক কিছু নয়। এই প্রতীতিই তাঁর অনুভূতিকে কোমলতর এবং মধুরতর করেছে, তাঁকে সামনে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ চয়ন করেছেন, বয়ন করেছেন, আপনার সীমা আপনি ভঙ্গ করেছেন।

তাঁর ভগবৎ-বিশ্বাস এবং ধর্মগ্রন্থের বিশ্বাসে আকাশপাতাল তফাৎ। সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে এই পুলকিত ধারণাই যুগিয়েছে তাঁর সৃষ্টিধর্মিতাতে বেগ-আবেগ। ক্রমশ তিনি সামনে গিয়েছেন। নিরন্তর অভিযাত্রার এই শান্ত সাহস তাঁকে মূর্ত থেকে বিমূর্তে, স্পর্শ থেকে স্পর্শাতীতে, জীবন থেকে শিল্পে, জন্মভূমি থেকে উদার বিশ্বে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে নানানভাবে নানান ভঙ্গীতে এই নিরন্তর যাত্রার স্পন্দন মধুর চিত্তহারী ধ্বনিতে বেজে উঠেছে। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তা কবির কাছে বহির্বিশ্বের একটা ছাড়পত্র মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের নাম সুমিতি এবং পূর্ণতার প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে। মূলত তিনি কবি হলেও সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর অক্ষয় করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মানুষ, এই বিশেষণের আড়ালে ঢেকে রাখার চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিধি অনেক দূর সম্প্রসারিত। তিনি কথা বলার এমন ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন যেন তা মানুষের মনের চিরন্তনী আকুতির ফলিত প্রকাশ। তাঁর জীবনদর্শনকে দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ-কালিমার স্পর্শলেশ বর্জিত সুন্দর একটি বোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গানের ধারা তাঁর কণ্ঠে ঝরণার মতো উছলে উঠেছে, চিত্রকলা প্রিয় সখার মতো এসে হাত ধরেছে। শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্যে যদি বলা হয় এখানেই ভগবানের প্রাচুর্য, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলা উচিত, এইখানেই জীবনের বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানববাদী। আপন অন্তরস্থিত শুভকামনা এবং ভগবৎ-চেতনা ছিল তাঁর যুগল দিকনির্দেশক। এই দুটি শক্তিমান বোধকে আজন্ম নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর শৈল্পিক বোধের সঙ্গে কোনরকমের জাগতিক নীচতা আঁতাত পাতাতে পারেনি। বিবেক সব সময় তাঁকে যা কিছু ভালো, স্বাস্থ্যপ্রদ, সুন্দর,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সত্তা এবং প্রাণদায়িনী, জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে তাড়িত করেছে। কিন্তু মানববাদীরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরল বিশ্বাসই হল তাঁর যাদুকাঠি। তিনি বিশুদ্ধ ধ্যানের মধ্যেই নির্বাণ কামনা করেন। কিন্তু বিশ্বাস এবং ধ্যান কাউকেই বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে না। তিনি মঙ্গলের পূজারী এবং সে কারণে জগৎ-সংসার ছেঁকে মঙ্গল টেনে বের করে আনবেন বলে ভরসা রাখেন। পৃথিবী আপন কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। সামাজিক নিয়মের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন আসে। কবি বাস্তবজীবনের এই কঠোরতার কোনো ধার ধারেন না। কিন্তু নিজের অন্তরের অপার করুণাধারার ওপর স্থির বিশ্বাস রাখেন। এই অনমনীয় আত্মবিশ্বাসই তাঁর মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। রবীন্দ্রনাথে তা কখনও উদ্ধতরূপ ধারণ করতে পারেনি। তাই অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সংজ্ঞায়নের অতীত বলে ভুল বোঝা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল সুশৃঙ্খল ও সুবলয়িত, ভাষার ওপর ছিল অপরিসীম পারঙ্গমতা, সাহিত্যের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় অনায়াসে বিহার করতে পারতেন — ইত্যাকার গুণগ্রামের কারণে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী অনেক সময় তাঁকে বিপ্লবী কমরেড এবং আধুনিক অস্তিত্ববাদী এই উভয় আখ্যাই দিয়ে থাকেন। এটা যে বাড়াবাড়ি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আঁশগুলো পরীক্ষা করে দেখলে ধরা পড়ে তিনি ছিলেন একজন মহান সামন্ত, যদিও পরবর্তীকালে বুর্জোয়া গুণপনা প্রশংসা করার মতো মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। মানুষে-মানুষে সহজ সম্বন্ধের কথা যখন তিনি বলেছেন তা তাঁর সাহিত্যে একটি নতুন ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে প্রতীকী নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মানুষগুলোও তাঁর কল্পনা-জগতের নাগরিক, সমসাময়িক ইতিহাসে তারা বাস করে না। তিনি মানুষে-মানুষে সহজ সম্পর্কের কথা বলতেন, কেননা এটা সামন্তবাদের অত্যন্ত একটি হাঁ-বোধক মানবিক দিক। বুর্জোয়া শ্রেণী এই সরল সম্পর্ককে টাকার সম্বন্ধে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর মর্জি-মেজাজও ছিল সামন্তোচিত। কিন্তু তাঁকে এমন এক পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে হয়েছে যা পুরোপুরি এই বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকারে চলে গেছে। কবি স্বয়ং তা জানতেন। সেই জন্যই তিনি সমাজ থেকে আংশিক আলাদা হয়ে স্বপ্ন এবং ধ্যানের জগতে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। একজন ভগবানের আনন্দিত সান্নিধ্যে তিনি দায়মুক্ত এবং নির্ভার মনে করতেন। এ ভগবানকেই তিনি রামমোহন রায় থেকে বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, জগতের বঞ্চিত-লাঞ্ছিত এবং হতভাগ্য জনের প্রতি মমতা, মঙ্গলের প্রতি তাঁর অনির্বাণ বিশ্বাসবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে ভূমিকা পালন করেন তা বাঙালী জাতি এবং বাংলা সাহিত্যের তুলনাবিহীন কল্যাণ সাধন করেছে। তাঁর প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বঙ্কিম এবং অন্যান্য লেখকেরা পূর্বে যে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে ছিলেন তার ধার অনেকটা মরে আসে। তাঁর জীবদ্দশাতেই তুলনামূলকভাবে অনেক পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-অভিজ্ঞতা সাহিত্যে পূর্ণ-প্রাণাবেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

একটি ভাববিপ্লবের মশালচী হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা কি জানার আগে যে সমাজ কবিকে সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া প্রয়োজন। কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিম বাংলার একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে পরিবার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা কিংবা ভাবধারার কোনো গৌরব করতে পারে না। নজরুল ইসলাম খুবই স্বল্পকালের জন্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। তাঁর স্বভাব ছিল দূরন্ত প্রকৃতির, কোনো কিছুতেই লেগে থাকতে পারতেন না। ছাত্রাবস্থাতেই বাঙালী পল্টনে তিনি যোগ দেন এবং তাঁকে করাচীতে পাঠানো হয়। সামরিক ব্যারাকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন, তার কিছু কিছু কলকাতার নানা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়।

সামরিক ব্যারাক থেকে তিনি সোজা কলকাতা চলে আসেন। সে সময়ে সমস্ত ভারত উপমহাদেশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেতে উঠেছে। বাঙলা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। বাঙলা সাংবিধানিক এবং সংবিধানবহির্ভূত এই উভয় প্রকার সংগ্রামেই নেতৃত্বদান করছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা স্বাধীনতার বেদীতে তাঁদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। রক্ত দান, প্রাণ দেয়া-নেয়ার রোমাঞ্চে গোটা যুগ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আগের কবি, লেখক এঁরা ছিলেন শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি। এই সামাজিক উপপ্লবে কোন্ ভাষায়, কোন্ সুরে কথা কইতে হয় তাঁরা জানেন না। তাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

নবযুগ যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলো, কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিচেতনায় তা উর্ধ্বমুখী শিহরণের সঞ্চার করে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যুগ কথা কয়ে উঠল কাজী নজরুলের কণ্ঠে। তাঁর কাব্যে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব আছে, চাহিদার তৃপ্তি আছে। কাজী নজরুল ইসলাম রাতারাতি বাংলা ভাষাভাষী জগতের একটি অতিপরিচিত নাম হয়ে দাঁড়াল। তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' জলস্তম্ভের মতো চেতনার উর্ধ্বে উড্ডীন অবস্থার প্রকাশ; তা যেমন চিত্তহারী, তেমনি বলিষ্ঠ। এই চিত্তহারী বলিষ্ঠতাই নজরুল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। প্রচণ্ড স্পর্ধা নিয়ে তিনি উদ্‌ঘোষণায় ফেটে পড়তে পারতেন। তাঁর সঙ্গে রুশো বর্ণিত মহান বর্বরের তুলনা করা যায়। তাঁর মহৎ অন্তরাবেগ কখনও বুদ্ধির অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নেয়নি। নিজের মর্মের বেদনাবোধ চেপে রাখার মতো ছলনার শিক্ষা তিনি পাননি। যদি তাই হত, সম্ভবত বাংলা সাহিত্য নজরুল ইসলামের প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হত।

সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি আছেন ভাস্বর সূর্যের গৌরবে; ঘিরে আছে তাঁরই আলোকে আলোকিত, ভাবনায় ভাবিত গ্রহ এবং

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

উপগ্রহের ঝাঁক। নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটে গেল। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কবিতার ভারকেন্দ্রের পালাবদল ঘটে। কবিতা গজদন্ত মিনার ছেড়ে রাজপথে নেমে এল এবং সামাজিক শক্তির অংশ হিসেবে স্বরূপ প্রকাশ করল। সমাজের নির্যাতিত মানুষেরা কবিতায় স্বীকৃতি পেল, কাজী নজরুলের কবিতা তাঁদের ভাগ্যলিপি হয়ে দেখা দিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-অভিজ্ঞতার বলিষ্ঠ এবং কুশলী রূপায়ণ ঘটতে থাকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত পুরাণ, রূপকথা, মুসলিম গৃহে উচ্চারিত আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শব্দসম্ভার কবিতায় এন্তার ব্যবহার করতে থাকেন তিনি নিঃসঙ্কোচে। এই শব্দ ব্যবহারের ফলে কবিতার সাবলীলতা, শৈল্পিক সৌন্দর্য খুব কমই ক্ষুণ্ন হয়েছে। নজরুল ইসলামের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সেগুলো হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ-অভিজ্ঞতা, ইতিহাস-চেতনা এবং জীবনবোধের আশ্চর্য সমন্বয়। বাংলা গদ্যে যাঁরা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, নজরুল ইসলাম তার পথিকৃৎদের একজন।

নজরুল ইসলাম যেমনটি পেরেছেন অন্য কোনো মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা নিয়ে সার্থক কবিতা লিখতে পারেননি। অন্য কোনো বাঙালী কবি হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মিলন ঘটাবার এমন একনিষ্ঠ চেষ্টা করেননি। এই উপমহাদেশের অন্য কোনো বিপ্লবী কবি নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তির সংগীত এমন উদাত্ত আবেগে গাইতে পারেননি; বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম যে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন এই তিনটি বৈশিষ্ট্যেই তার পরিচয় বিধৃত।

জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রতীচীর আদর্শে আধুনিক বাংলা কবিতা ঢালাই করেছেন, এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাঁদেরও নজরুল ইসলামের শরণ নিতে হয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কবি যাঁরা মার্কসবাদী কবি অথবা বিপ্লবের কবি বলে পরিচিত, নজরুলের প্রভাববলয় ছাড়িয়ে বেশিদূর যেতে পারেননি। ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন যাঁদের স্বপ্ন এবং বিশ্বাস ইসলামী আদর্শের পুনর্জীবনের মধ্যে প্রোথিত, তাঁরা আজও নজরুলের পরিত্যক্ত জগতে অসহায় বন্দীর মতো আটকা পড়ে আছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন শিল্পী যাঁকে আবেগসম্পদের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু অতিরেক আবেগ কখনো সুমিত গদ্যের জন্য ভালো নয়। তাঁর অনিয়ন্ত্রিত আবেগ গদ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে যুক্তিগ্রাহ্যতা কিংবা শৃঙ্খলাবোধ দুয়ের কোনটারই দেখা মেলে না। তা সত্ত্বেও নজরুলের গদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর উপন্যাস এবং গল্পে স্থানীয় মানুষদের তাদের স্বকীয় চেহারায়

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

উপস্থিত করেছেন। নায়ক-নায়িকার মুখে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষাও জুড়ে দিয়েছেন। গল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে পরবর্তী ঔপন্যাসিক এবং গল্পকারদের একরকম পথিকৃৎ বলা যায়। পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার গ্রাম বাঙলার নানা শ্রেণীর মানুষকে পূর্ণ সত্তায় উপস্থিত করেছেন।

আমাদের সাহিত্যের এ পর্যন্ত সর্বশেষ আদর্শ নির্মাতা এবং শেষতম শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের পূর্ণ মূল্যায়ন এখনো হয়নি।

১৯৬৯ *বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে*
(১৯৭৫)

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংস্কৃতির জীয়নকাঠি

সংস্কৃতির আশ্রয়েই বাংলাদেশের নতুন জাতীয়সত্তার বিকাশ, পুষ্টি এবং সমৃদ্ধি; বাঙলার ঐতিহাসিক অহং-এর চৈতন্যোদয়, বাঙালীর অন্তর্লোকের অচিন্তিতপূর্ব জাগরণ। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ধর্ম-শাসিত একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের জাড্য কুসংস্কার এবং নিরঙ্কুশ যুক্তিহীনতার অতলে সংস্কৃতির সোনার কাঠির ছোঁয়ায় একটি প্রবল চিন্তদোলা ভেতর থেকে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। স্বাভাবিকতার পথ ধরে চিৎপ্রকর্ষের দীপ্তির সোনার আলো তেরছা-তেরছা রেখার মতো উঁকি দিচ্ছিল। তার গতি অবাধ হতে পারেনি। ক্রমবিকাশ একটা পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। যদি তাই হত, আজকের পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে প্রাণের যে তাজা আবেগ, জীবনীশক্তির শরতরঙ্গের যে অস্ফুট অনুরণন শ্রুত হচ্ছে, তা অন্তত তেইশ বছরের সময়সীমার মধ্যে এমন একটা মহীয়ান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে পারত যা গোটা বাঙলার সাংস্কৃতিক ধমনীর নতুন শোণিতপ্রবাহ অনেক বেশি সৃষ্টিময় করে রাখত। কল্পনার যে ঊর্ধ্বে উড্ডীন অবস্থা শিল্প-সৃজনের প্রয়াসে দেয় সাফল্য, রাষ্ট্রিক বিধিনিষেধের কঠিন বর্ম তাকে বারেবারে জখম করেছে। চিত্তের যে সহজ অবলীলাসঞ্জাত স্ফূর্তি সামাজিক অভিজ্ঞতাকে মোমের মতো গলিয়ে শিল্পে রূপান্তর ঘটায়, তাতে উপর থেকে একটা কঠিন অর্গল এঁটে দেওয়া হয়েছিল।

আজকের বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, তাতে গতি আছে, ধার আছে, উত্তাপও আছে; যা নেই তা হলো বুদ্ধির পূর্ণাঙ্গ এবং সুষম বিকাশ, দীর্ঘকালব্যাপী সুস্থির মননের সুন্দর লাবণ্য। তার কারণ, যে ফুল্ল অবসর এবং অনুকূল আবেষ্টনীর আশ্রয়ে ওসব ধীরেধীরে বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে, বিগত তেইশ বছরে বাংলাদেশে তেমন অবস্থা কখনও আসেনি। পাহাড়ী নদীর মতো বাঙালীর সৃজনশীলতা বারেবারে খাত পরিবর্তন করেছে। তাতে বিক্ষুব্ধ মানস এবং অসহিষ্ণুতার দিকটি যত বেশী দৃশ্যমান হোক না কেন, তবু আজকের বাংলাদেশের সর্বাত্মক যুদ্ধ-ঘোষণার ইশারাটি তার মধ্যে বীজস্থ ভ্রূণের মতো প্রহর গুনছিল।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিগত তেইশ বছরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিপথের নিশানা স্পষ্ট করে দেখাবার জন্যে জলছবির মতো আভাসে হলেও একটু অতীতের কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা ভাষা, বাঙালী সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই চেষ্টা, শ্রম, সাধনার সৃষ্টি এবং আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, চিত্তসম্পদের প্রবাহিনী নদী — এ তথ্য স্বীকার করে নিয়েও একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্মিতি-পর্বে মুসলান সম্প্রদায়ের কোনো মনীষী পুরুষ সাহিত্যে হিন্দু-মনীষীদের সঙ্গে উৎকর্ষ বিচারে তুলনীয় কোনো অবদান রেখে যেতে পারেননি। তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণ নিশ্চয়ই আছে। উপস্থিত মুহূর্তে তা আলোচনা করার অবকাশ নেই। হিন্দু সমাজের মনীষী পুরুষেরা প্রতীচীর আদর্শে বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদিতার বীজ বপন করেছিলেন। যে-সকল মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সে সময়ে তাঁরা যুক্তির আলোকে বিচারবুদ্ধিকে শাণিয়ে তোলেন নি। সমাজ-সংস্কারের সমস্ত সমস্যার যৌক্তিক সমাধান তাই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠেনি। এর জন্য মনের অনেকদূর মোহমুক্তি ঘটা প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে তা আসা অনেকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল নানা কারণে। সে যা হোক, মুসলমান সমাজেও এমন সময় এল যখন ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনের নানা প্রশ্ন যুক্তি নিয়ে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। মুসলমান সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ সহানুভূতিশীল মনোভঙ্গীতে এবং কোনরকমের হীনম্মন্যতাবোধমুক্ত কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশে মুসলমানের সমাজ-অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক রূপায়ণ ঘটতে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম তো কোনরকমের সঙ্কোচ না করেই মুসলমানের ঘরের ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দগুলো সাহিত্যে এন্তার ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর পথ ধরেই সাহিত্যের আসরে আসেন জসীম উদ্‌দীন, আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী এবং হুমায়ুন কবীর প্রমুখ। তাঁদের সৃষ্টি সেদিন বাংলা সাহিত্যকে ভাব এবং বুদ্ধি-সম্পদে না হোক রূপ-রস এবং প্রাণ-সম্পদে পুষ্ট করে তুলেছে। বাঙলা দেশে বসবাসকারী নানা সম্প্রদায়ের সমাজ-অভিজ্ঞতার সার্থক বাণীমূর্তি লাভের মধ্যেই বাঙলার অন্তরাত্মার গহীন রাগিনী পূর্ণসুরে বেজে ওঠার কথা। তেমন একটা সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কলা-রসিক ব্যক্তিমাত্রই নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। জসীম উদ্‌দীনের আদর্শায়িত চরের রাখালের চেহারায় দ্রাবিড় পূর্বপুরুষের তারুণ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙালী। আব্বাসউদ্দীনের গানে মন ভিজিয়েছিলেন, জয়নুল আবেদীনের ছবিতে দৃষ্টি রাঙিয়েছিলেন। বাঙালী ঐতিহ্য এঁদের দানে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে একথা যে কোনো বাঙালী স্বীকার করে আনন্দ পাবেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষাশিক্ষা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অতীতবিষয়ক গবেষণা বাংলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছে। মওলানা আকরম খাঁ সুবৃহৎ গ্রন্থ 'মোস্তফা চরিতে' হজরত মুহম্মদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। অন্য যে কোনো মহাপুরুষের মতো মুহম্মদের জীবনকে ঘিরেও যে-সকল কল্পকথা প্রচলিত ছিল যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে তিনি সেগুলো একেবারে ছেঁটে দেন এবং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আসল মানুষটি, তাঁর চরিত্রের অনন্যত্ব কঠোর চুলচেরা যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে বেগবান ভাষায় প্রকাশ করেন। উপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো দেশবিভাগের পূর্বেই তাঁদের যেগুলো পরিণত সৃষ্টি বলে স্বীকৃত — প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী এবং হুমায়ুন কবীর — এই চারজন ছাড়া সকলে দেশবিভাগের পরে পাকিস্তানে চলে আসেন। এঁদের সকলের সম্পর্কেই একটি নির্মম সত্য ভাষণ হলো এই যে, তাঁরা যদিও সুদীর্ঘ পরমায়ু পেয়েছিলেন, অনেকে এখনো বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশেষ একটা উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম করেননি, তারপর বরঞ্চ ধর্ম-আলোচনাতেই অধিক আনন্দ পেতেন। জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় আবেগের সে ঘনত্বের ছায়াপাত পাকিস্তান আমলে হয়নি। এককালে কবি ছিলেন এই স্মৃতির কুণ্ডয়নই তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু। আব্বাসউদ্দীন এক সময়ে প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে কুচবিহারের গ্রামীণ গানের মধুময় সুরের ঝঙ্কারে শহর কলকাতা মাতিয়ে তুলেছিলেন, ঢাকাতে গান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তাঁকেও বড় একটা দেখা যায়নি। গান তিনি গাইতেন বটে তবে সে-ও যেন পুরনো অভ্যেসের বসে। জয়নুল আবেদীনের চিত্রে বারেবারে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়াস স্ফুরিত হয়নি। বরঞ্চ একটা ছবি যেন বার বার এঁকে প্রেরণার অভাব রঙ দিয়ে ভরিয়েছেন। মওলানা আকরম খাঁ একদম যুক্তিকে কবর দিয়ে সাম্প্রদায়িক চেহারায় দেখা দিলেন। কেন এমন হলো? সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভাগুলো বাংলাদেশে এসে হঠাৎ করে এমন ভাব-হারা, কল্পনা-হারা, তেজ-হারা হয়ে পড়লেন কেন? সৃষ্টিশীল শিল্পীর জীবনের সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দতার বিনিময় করে তাঁরা তুষ্ট হতে পেরেছিলেন কি? বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে কতকটা তাই। কিন্তু তলিয়ে দেখলে ধরা না পড়ার কথা নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির একটা অঘোষিত দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সে দ্বন্দ্বের প্রভাবেই এককালের বাঙলার সৃষ্টিধর শিল্পীরা ঐতিহ্যের কোল থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছিলেন। বিষয়টা একটু খোলাসা করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে বাঙলার সংস্কৃতিকে ইসলাম এবং মুসলমানিত্বের ছাঁচে ফেলে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করার একটা অতন্দ্র প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান একটা সংস্কৃতির অন্তর্বর্তী এলাকা বলে চালাবার জন্য শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য তাঁরা নানা কর্মপন্থাও গ্রহণ করেন। সেগুলো আজ হাসির উদ্রেক করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালীকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই শাসকগোষ্ঠীর আরোপিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতি-হত্যার ষড়যন্ত্র করার মধ্যে তাদের উপনিবেশবাদী চরিত্রের পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপীয় কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অধীন উপনিবেশের সংস্কৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতো হস্তক্ষেপ করেছেন, তার প্রমাণ নেই। বাংলা সাহিত্যের যে সময়টিকে আমরা স্বর্ণযুগ বলে ভাবতে অভ্যস্ত ব্রিটিশ শাসনামলেই তার উন্মেষ এবং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঢাকা।

বিকাশ, বলতে গেলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির হাত ধরেই বাঙলার সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে ধাবিত হয়েছে। ব্রিটিশ সেদিন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

পক্ষান্তরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পদে পদে বাঙলার সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত করেছে। ঐতিহ্যের কোল থেকে সবলে ছিনিয়ে এনেছে বাঙলার সংস্কৃতি এবং সকল সময় চেয়েছে একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক খাতে গোটা জাতির চেতনা প্রবাহিত হোক। শাসকগোষ্ঠী সেজন্য যে-সমস্ত পন্থা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর অবৈজ্ঞানিকতা, উদ্ভটত্ব এবং অসারতা দেখে তাদেরকে বোকা বলে ধারণা করা যায় অতি সহজে, কিন্তু তাতে করে তাদের অভিসন্ধিটা মিথ্যে হয়ে যায় না। তাঁরা সমস্ত পাকিস্তানে উর্দু-বাংলা মিশিয়ে একটা ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং বছরের পর বছর ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে তা জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছেন। আরবী, উর্দু কিংবা রোমান হরফে বাংলা লেখার ধুঁয়া তুলেছেন। নিজেদের মর্জি মোতাবেক বাংলা সাহিত্যের একটা মনগড়া ইতিহাস দাঁড় করিয়ে বিশেষজ্ঞদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করেছেন। বাঙলার সংস্কৃতির অতীত মনীষীদেরকে কোনরকমের সুযুক্তিপূর্ণ সমালোচনা ছাড়াই শুধু অমুসলমান বলে এক কথায় নাকচ করে দিয়েছেন। দুটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির উন্মাদনার মুহূর্তে এক কবি মন্তব্য করেছিলেন, জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও বাদ দেব। সেই বর্ষীয়ান কবি এখনো বেঁচে আছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনাও করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মিতার প্রশংসায় তিনিও কারো চাইতে কম যান না। অথচ তার সে দিনের উক্তিতে মনের সায় কতটুকু ছিল এবং উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করার সচেতন প্রয়াস কতটুকু ছিল, তা বলা সত্যিসত্যি মুশকিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান যৌথ রচনায় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাতে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি শাসনগোষ্ঠীর মনোভাব পুরোপুরি তুলে ধরা হয়েছে। দু' সম্প্রদায়ের কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী এবং সাহিত্যকর্ম আলোচনায় পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা দেখে যে-কোনো নিরপেক্ষ পাঠক শিউরে উঠবেন। হয়তো দেখা যাবে কায়কোবাদের উপর আলোচনা করা হয়েছে চল্লিশ পৃষ্ঠা, একই সঙ্গে দেখতে পাবেন বঙ্কিমের উপর আলোচনা নমো-নমো করে চার কি পাঁচ পৃষ্ঠায় সারা হয়েছে। স্বয়ং কায়কোবাদ যদি কবর থেকে উঠে এ পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনা দেখতে পেতেন নিজেই হতবাক হতেন সবচেয়ে বেশী। যাঁরা ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তাঁরাও জানতেন যে, এটা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সেদিন তাঁদের মেনে নিতে হয়েছিল, তাঁরা না মেনে নিলে অন্য লোক মেনে নিতেন। বাঙলার সংস্কৃতির গতি একদিকে, শাসকবর্গ লাঠি মেরে গায়ের জোরে তাকে অপর দিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রেডিও, টেলিভিশন, সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যন্ত পশ্চিমা শাসকদের ইচ্ছেকেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অথচ তাঁরা নিজেদের দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রশ্নে ন্যূনতম বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেনি।

বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিমাদের মনোভাব কোনো সময়েই অনুকূল ছিল না। তারা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে বিদ্রূপ করত, বাঙালী সংস্কৃতিকে বাবু-কালচার বলতে মজা পেত, এমনকি বাংলাদেশের মুসলমানদের হিন্দুদের জারজ সন্তান বলতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সমরনায়ক আয়ুব খান থেকে পুঁচকে সাময়িকী-সম্পাদক পর্যন্ত একমত ছিল। বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা, তাই শাসকগোষ্ঠীর মনঃপুত নয়, সুতরাং বাংলা ভাষাকে ঢেলে সাজাবার ঢালাও হুকুম দিতে তাদের বাধেনি। দাস-জাতির কোনো সংস্কৃতি থাকে না অথবা সংস্কৃতি হত্যা করে যে কোনো জাতিকেই দাস-জাতিতে রূপান্তরিত করা যায়। বলা বাহুল্য, বাঙালীর প্রতি পশ্চিমারা কখনো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায়নি। অবশ্য একথা সকল পশ্চিম পাকিস্তানী লোকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে সাধারণ বাঙালীর প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব কি রকম, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাবে। বেশ কয়েক বছর আগে লাহোরের বিখ্যাত প্রকাশক ফিরোজ এণ্ড সন্স উর্দুর একটি অভিধান সংকলন করেন। তাতে বাঙালী শব্দের অর্থ করেছিলেন, 'আগর বাঙালী ইনসান হো তো ভূত কঁহো কিসকো'। অর্থাৎ বাঙালী যদি মানুষ হয় তাহলে ভূত বলব কাকে?

বাঙালীর প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি মুষ্টিমেয়ের অশ্রদ্ধা প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ্যেও প্রচারিত হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। তার ফলে বাঙালী সংস্কৃতি হত্যার এ পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সঙ্গত একটি ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়েছে; বিবেকবান মহল থেকে প্রতিবাদের ক্ষীণতম শব্দও শোনা যায়নি। সে সুযোগে পশ্চিমা ইকবালকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের উপরও চাপিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা, ইকবাল-সাহিত্যের সেরা রচনাগুলো ঢেকে রেখে তাঁর একপেশে রচনাগুলোকে বাংলা ভাষাভাষীর কাছে তুলে ধরেছে। ইকবাল ভাল কবি, বড় কবি, যে কোনো কাব্যপিপাসু ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই তাঁর কাব্যের স্বাদ নিতে পারেন। তিনি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সে পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্থান হয়নি। সুতরাং তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে বাঙলার উপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ কি হতে পারে?

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বাংলাদেশে গত সুদীর্ঘ তেইশ বছরেও কোনো স্থায়ী সাময়িকপত্রের জন্ম হতে পারেনি। তার কারণ এই নয় যে, বাঙালীর সংস্কৃতি-প্রেম ছিল না, বাঙলার সংস্কৃতিকে জীবন্ত-প্রাণবন্ত করার জন্য তাঁদের উদ্যমের ঘাটতি ছিল। তথাপি বাংলাদেশে সাময়িকপত্র জন্মেছে এবং মরেছে। অন্যদিকে দেখা যাবে সিনেমার চিত্র-নট-নটীদের নিয়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা হু-হু করে বেড়েছে।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সাময়িকপত্রের টিকে থাকতে না পারার প্রধান কারণ, সরকার সকল সময়েই সাময়িক পত্রগুলোর প্রতি বাঁকা দৃষ্টি পেতে রাখত। প্রতিটি গল্প, প্রবন্ধ কবিতার সঙ্গে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর একটু অমিল হলেই পত্রিকার মুদ্রণ এবং প্রকাশনা বন্ধ করে দিত। প্রতিটি জাতির, প্রতিটি সংস্কৃতির এমন কতক বিষয় থাকে, যার বিষয়ে প্রশ্নশীল মনের বিতর্ক জমে উঠা চাই-ই। বিতর্কের মাধ্যমে জীর্ণ অংশ বাদ দিয়ে প্রাণের ইশারাটুকু সম্মুখগামিনী করতে না পারলে সংস্কৃতিতে পঙ্গুত্ব আসতে বাধ্য। এই দায়িত্বটি পুরোপুরিভাবে সাময়িকপত্রের। বাংলা সাহিত্যের নবতর চেতনার উদ্বোধনের মর্মবাণীটি 'সংবাদ-প্রভাকর', 'বঙ্গ দর্শন' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। ও-সমস্ত পত্রিকা প্রতিভা সৃষ্টি করেছে, যুগের চেতনার নতুন মূল্যায়ন করেছে। জাতীয় মনীষার জাগরণে ও ভাষা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ও-সমস্ত পত্রপত্রিকা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সংস্কৃতিপ্রেমিক বাঙালী মাত্রই যুগের পর যুগ ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। বাঙলা দেশে সাময়িকপত্রের প্রসার না হওয়ায় বাঙালী মনীষার সুষম বিকাশ অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। এটা স্বাভাবিক কোনো কারণে ঘটেনি, সরকার আইন করে ঘটিয়েছে। ধর্মের সঙ্কীর্ণ খোলসের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে আটক করে একটা কৃত্রিম জগাখিচুড়ি সাহিত্য সৃষ্টি করার কাজে তারা বছরের পর বছর ধরে হাত পাকিয়েছে। সুতরাং চারিদিক থেকে ঘোষিত এবং অঘোষিতভাবে সংস্কৃতির উপর আক্রমণের কারণেই অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম স্রষ্টাদের সৃষ্টিচেতনা ক্ষয়ে এসেছিল। ঐতিহ্যিক উদারতার সৃষ্টিশক্তিই তাঁদেরকে একদা কীর্তিমান, খ্যাতিমান এবং যশস্বী করেছে। সে প্রশস্ত অঙ্গন থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁদের ভাবের ঘরে তালা পড়বে, এটা এমন বিচিত্র কিছু নয়।

প্রতিটি আন্দোলনের না-ধর্মী কিছু দিক যেমন থাকে তেমনি হাঁ-ধর্মীও কিছু উপাদান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বাঙলার মুসলমান সমাজ একদা অকৃত্রিম আবেগে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। এই আবেগের সঙ্গে বাস্তব সত্যের সংযোগ কত ঠুনকো পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। তবু এই উন্মথিত, অকেলাসিত আবেগের অল্পস্বল্প শৈল্পিক রূপায়ণ হয়েছে। তাতে প্রাণের স্ফূর্তি ও আনন্দ-বেদনার উল্লাস-ক্রন্দন স্ফুরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত কবি ফররুখ আহ্‌মদের নাম উল্লেখ করা যায়। কাব্যে তিনি একটা নতুন ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কাব্যিক আমেজের রোমান্টিক স্পর্শে বুখারা ও সমরকন্দের চিত্রকল্প ফুলের মতো সুন্দর হয়ে ফুটেছে। দেদার আরবী-ফার্সীর প্রয়োগ নজরুল কাব্যে একটি গতিময় ভঙ্গিমা দিয়েছিল। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগের চেষ্টা নজরুলের পূর্বেও অনেকে করেছিলেন, কিন্তু তিনি অনেক বেশী শিল্প-সার্থক হিসেবে তা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে নজরুলের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী একটা সাধনার ধারা কিছু অংশে পূর্ণতাপ্রাপ্ত করেছিল বলা যেতে পারে। মুসলমান বলেই তিনি আরবী-ফার্সী শব্দের আমদানী করেছিলেন কথাটা সত্য নয়। তাঁর আগেও যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের কেউই মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু ফররুখ আহ্‌মদ গোটা ব্যাপারটিই আগাগোড়া ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেখলেন। যেহেতু তিনি মুসলমান এবং সচেতনভাবে নিজেকে অনুভব করেন পাকিস্তানী, তাই বেছে বেছে বাংলার স্থলে আরবী, উর্দু, ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করে কাব্যের শরীর নির্মাণ করতে থাকলেন। এ প্রচেষ্টা শোভন নয়। এতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি না পেয়ে তাহাতে আড়ষ্টতা এসেছে বেশী। কবি ফররুখ আহমদের এটা যেন একটা প্রচণ্ড জেদ। প্রতিভাবানদের কত রকম খেয়ালই তো থাকে। দুঃখের কথা হলো, পদ্য-গদ্য অল্পস্বল্প লিখতে সক্ষম এমন ব্যক্তিরাও ফররুখ আহমদের আদর্শের মৃতবৎসা গাভীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সরকারী খরচে। এন্তার কবিতা-গল্প লেখা হয়েছে, দেদার উর্দু-ফার্সীর ব্যবহার তিনি করেছেন। পশ্চিমারা এই গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে থাকে। আজকের বাংলাদেশে তাঁরা অনেকেই সাহিত্যিকভাবে মৃত। কিন্তু এক সময়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হয়ে বাঙালীর সংস্কৃতির নিঃশ্বাসবায়ু চেপে রেখেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের সৃষ্টি, অবদানের দিক দিয়ে একটু উনিশ-বিশ হলোই বা — তাঁরা এ জ্বলন্ত ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি সাধন করেছেন। এই অপসংস্কৃতির ক্যাভেলিয়রবৎ তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকরাই বাঙালীর চেতনা বাঙলার মাটিতে স্থিত করার বদলে আরব-ইরানের মরুভূমির ঊষর দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মানুষেরা অধিকাংশই বাঙলার উর্বরা পাললিক মৃত্তিকার খাঁটি সন্তান নয় বলে রায় দিয়েছেন এবং বলেছেন তাঁরা আরব-ইরানীদেরই উত্তরপুরুষ। সুতরাং আরব-ইরানের সংস্কৃতিই তাঁদের সংস্কৃতি। খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মান্ধাতার আমলের চেতনা ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। বিগত তেইশ বছরে পাকিস্তানী জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির অফিসারেরা পাকিস্তানের অস্তিত্বের কথা, অখণ্ডত্বের কথা ঘোষণা করতে যেয়ে বারবার সত্যকে হত্যা করেছে, ইতিহাসবোধকে লাঞ্ছিত করেছে, বিজ্ঞান-চিন্তার মুখে পাথর চাপা দিয়েছে। এই শ্রেণীটির কাছে থেকেই পরোক্ষ নৈতিক সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল বলেই সংখ্যাধিক মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে একটুও ভেবে দেখার প্রয়োজন হয়নি। যেমনি জিন্নাহ্, তেমনি নাজিমুদ্দীন এক বাক্যে ঘোষণা করে দিলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। বাঙালী সে ঘোষণা মেনে নেয়নি। প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। কিন্তু মুখের ভাষার প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য বুকের রক্ত ঢালতে হয়েছে — এর আগে পৃথিবী যা কোনদিন ভাবেনি, চিন্তা করেনি, কল্পনা করেনি।

উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতির ইতিহাসের নবযুগের প্রবেশপথের তোরণদ্বার। যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালী জাতি মধ্যযুগীয় বোধ, বিস্মৃতি এবং মোহনিদ্রা থেকে জেগে মজ্জাগত শৌর্যে স্থিত হবে আপন জাতীয় অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং বিকাশ কামনা করেছে। গোড়ার দিকে এ আন্দোলন শিক্ষিত নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র-তরুণদের মধ্যে সীমিত থাকলেও একে বাঙলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সংগ্রামের চৌমোহনা বলা যেতে পারে। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের রক্তস্নানে স্নাত হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের রক্ত-মুকুল দল মেলেছে।

দেশবিভাগের পূর্বে যে সকল সংস্কৃতিসেবীর সাধনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁ-প্রভাব কমবেশী সক্রিয় ছিল, এমনকি ধর্মীয় বিষয়ে লেখা গ্রন্থেও বিচারশীলতা এবং মানবিক আবেদন জোরালো হয়ে উঠেছিল, তাঁদের জীবনের পাকিস্তান-পর্বে পূর্বের সৃষ্টিশীল পর্যায় আর আসেনি। একটা কথা আছে, আদা গুকোলেও ঝাঁঝ যায় না। বাঙলার ঐতিহ্যের কোলে লালিত এবং সংবর্ধিত সংস্কৃতসেবীরাও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে পাকিস্তানের শাসকবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন না। এটা উদারতর পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ এবং মানসিক বৃত্তিগুলোতে যুক্তিধর্মিতার বুননির সুফল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনেকগুলো প্রশ্নে যে-ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাতে তাঁর চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কোনরকম সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে নানা বিষয়ে তিনি আসতে পারেননি কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার স্বপক্ষে যে যুক্তিধারার অবতারণা করেছিলেন, তাতে তাঁর ভাষাপ্রীতি এবং দেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহরই সমান বয়সী প্রায়। বাঙলার সংস্কৃতির নানা প্রশ্নে তিনি অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাষা আন্দোলনের সমকালীন তাঁর রচনাগুলো সত্যিসত্যি তরুণ সমাজে গাঢ় ছাপ ফেলেছিল। বুড়ো বয়সের রচনা হলেও বয়োধর্ম-জনিত কোনো জড়তা কাজী মোতাহার হোসেনের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গীকে ম্লান করেনি। এর পরে আবুল ফজলের কথা বলা যায়। কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তিনি কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'শিখা'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গোড়া থেকেই তাঁর রচনার কিছুটা সুঠাম যুক্তিধর্মিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তবে তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তনক্রিয়াও শোধিত হয়েছে এবং বারেবারে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। প্রাক-পাকিস্তান আমলের এ তিনজন বিদগ্ধ পুরুষ ভাষা-আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। ও বয়সের অন্যান্য কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সরকারী সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন। ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁদের ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বললে তাঁদের ওপর খুব বেশী অবিচার করা হবে না বলে মনে করি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক এ দাবী সমর্থন করলেও বাংলাদেশের মর্মে-মর্মে নবযুগের হাওয়া হু-হু করে প্রবেশ করে যে একটা ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি ফাল্গুনের ঋতু ডেকে এনেছিল একমাত্র আবুল ফজলের চেতনায় তার ছিটেফোঁটা আভাস দেখা যায়। অন্যান্যদের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিকতায় শক্তি সঞ্চার করেনি। তাঁরা রয়ে গেলেন যেই সেই। অবশ্য সৃষ্টি করা ছাড়া বিবৃতি-ভাষণ প্রগতিশীল সংস্কৃতির সপক্ষেই দিয়েছেন। কিন্তু লেখক-মানুষ কথা করে কিছু একটা করতে পারে এ বিশ্বাস একটা আহাম্মকি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তরুণেরাই বুকের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেছেন। তরুণদের রক্তক্ষরা প্রয়াসেই গোটা বাংলাদেশে মুসলিম লীগের কবর রচিত হয়েছে। তরুণদেরই রচনার মধ্যে ভাষা-আন্দোলনের খরতীব্র চেতনাজগৎ এবং জীবনকে দেখার নূতন একটা ভঙ্গিমা লাভ করবে, তা তো একরকম স্বাভাবিকই। বাস্তবিকই এই সময়ে বাংলাদেশের আদিম সৃষ্টিশক্তির হাজার বছরের রুদ্ধ উৎসমুখ প্রবল একটা ভূমিকম্পে খুলে গিয়েছিল। বাংলাদেশে এল একেবারে অভিনব সৃষ্টিমুখর একটা তরঙ্গ-প্রবাহ। অভিনব এ কারণে যে, বাংলাদেশের বুক চিরে এই উৎস উষ্ণ আবেগে ঝলকিয়ে উঠেছে তরুণদের শোণিতে-শিরায়। তা ধারালো, তেজোময়, সংস্কারের প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং আবেদনের দিক দিয়ে মানবিক। বাংলাদেশের বেদনার খনি ও সম্ভাবনার প্রত্যাশা থেকেই এই সাহিত্যের উৎপত্তি। দীর্ঘদিনের অভ্যেসে রপ্ত করা রুচির রেশমী মসৃণতা এই সাহিত্যে অনুপস্থিত বললেই চলে, অন্যদিকে আবার ইসলামী অনুশাসনের মহিমা- কীর্তনের কোনো সজ্ঞান প্রয়াস নেই। এ সাহিত্যে হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষ আসর জমিয়েছে। তাই বলে কলকাতার কোনরকম অনুকরণও একে বলা চলে না। কিন্তু এ তো আবহমান কালের বাঙলার সংস্কৃতির স্তন্যরসে পুষ্ট। এ সাহিত্যে মুসলিম সমাজ-জীবনের ছায়াপাত আছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনপ্রবাহের চিত্র আছে, ইসলাম কিংবা অন্য ধর্মবোধের প্রতি অন্ধ আনুগত্য কদাচ চোখে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের যুগে সাহিত্যের যে শাখাটি সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, যাতে সমাজ-জীবনের নানা সমস্যা, ব্যক্তি-জীবনের গভীর-গোপন দুঃখ স্থান পেয়েছিল সে ছোটগল্প। বাংলাদেশের নানান জেলা থেকে গল্পকারেরা এসে কথার হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথা শুধু কথা নয়; আনন্দময়, বেদনাময়, দুঃখময় কিংবা দুঃখ-তাড়ানিয়া কথার সরিৎ-সাগর যেন। এত গল্পকার ভালো গল্প লিখলেন, যার নাম গুনে শেষ করা যায় না। শাহেদ আলী, শওকত ওসমান, সরদার জয়েন উদ্‌দীন, সুচরিত চৌধুরী, জহির রায়হান, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দীন আল-আজাদ, আরো অনেকে। একই সময়ে দু-দু'খানি উপন্যাস প্রকাশিত হলো। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু'। পশ্চিম বাংলার সাহিত্য-রসিকেরা একটু বিস্মিত হয়েই পূর্বের দিকে তাকালেন। এ দুটো উপন্যাস যে অনেক ভালো হয়েছে তা-ই বিস্ময়ের কারণ নয়। পূর্ব বাংলার নবীন লেখকেরা এরই মধ্যে ইসলামী আদর্শের ফানুসের মায়া কাটিয়ে তাদের গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা নিজেদের ভাষায়, অনুভূতির রসে জারিত করে বলতে পারেন; তাই তাঁদেরকে পূর্ব বাংলার নতুন লেখকদের সম্বন্ধে ধারণা পাল্টাতে বাধ্য করেছিল। সবচেয়ে যেটা সত্যি কথা, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সাহিত্য অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ। যন্ত্রযুগে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে যেই প্রবেশ করতে লেগেছে বাংলাদেশ, তার দৃঢ় সংঘবদ্ধ ধর্মশাসিত সমাজের বুকে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। চাপচাপ সামাজিক অন্ধকারের অতলে আরেকটা নতুন সমাজের উপাদান সঞ্চিত হয়েছে। এই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দু'আদর্শের দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই উপন্যাসে, ছোটগল্পে লেখকের সৃজনীশক্তির স্পর্শে প্রাণ পেয়েছে। গণতন্ত্রের হাওয়ার অনুপ্রবেশ এবং পাকিস্তানের ইসলামিক রাষ্ট্রদর্শনের স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তার পরাজয়ের কারণে শিল্পে-সাহিত্যে শত পুষ্প ফুটতে আরম্ভ করেছিল। সংস্কৃতসেবীরা সকলে এ বিষয়ে সচেতন না থাকলেও নতুন যুগের ভাবধারা তাঁদের চিন্তা-চেতনায় এমন একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে যে, তাতে সুস্থির মানসিকতা এবং সুশৃঙ্খল মননের অভাব আছে একথা সত্য, কিন্তু গুণ এবং পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে তা অনেক বেশী প্রাগসর, মাটি-ঘেঁষা এবং উদার সূর্যের আলোকবিলাসী। এ সময়েই প্রকাশিত খোন্দকার মোহম্মদ ইলিয়াসের ভ্রমণকাহিনী 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রচনারীতির বৈশিষ্ট্য তো আছেই, তাছাড়া আগাগোড়া গ্রন্থটিকে মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী চরিত্রের একটা আদর্শায়িত রূপ বাংলাদেশের গণসংগ্রামের নিরিখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যদিও যুক্তিবিচারের চাইতে মোহমুগ্ধতাই লেখকদের তাড়িত করেছে বেশী, তথাপি যে বেদনার উত্তাপ, যে প্রত্যাশার ঝলক আবেগের স্পর্শে জ্বলে উঠেছে তাতে নতুন যুগের ভাবধারারই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরী, আশকার ইবনে শাইখ বোধহয় অনেক বেশী আন্তরিক, কিন্তু নাট্যগুণের চাইতে কাব্যগুণই তাঁদের নাটকে বেশী। নবযুগের ছায়াপাত আবছাভাবে থাকলেও নতুন আইডিয়ার বীজ নাটকীয় কুশীলবের চরিত্রের গভীরে প্রোথিত করেননি। তার জন্য অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন নাট্যকারের প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষায় সার্থক নাটকের সংখ্যা অল্প। প্রায়ই নাট্যকারের নাটকীয় সত্তা এক ধরনের বাউল-সুলভ চেতনার প্রভাবে জোলো হয়ে উঠেছে। দৃঢ়সন্নবদ্ধ ভাষাশৈলী, ভাঙা কাঁচের মতো তেরছা সংলাপ, জীবনের মতো স্বাভাবিক গতিময়তা এবং নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তির সাথে সংগ্রাম কবার প্রমিথিউস-সুলভ অচল প্রত্যয়; ব্যক্তির মরণেও মানুষী চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন, ধ্যান এবং সংগ্রাম শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে, এমন নাটক বাংলাদেশে লেখা হয়নি। বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যে এ দীনতা সর্বাধিক পরিস্ফুট। নুরুল মোমেন বিভাগ-পূর্ব আমল থেকে নাটক লিখে আসছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী নাটকগুলোতে সংঘাতের বদলে 'কনফাউণ্ডেড ফিলজফি' অর্থাৎ পেঁচানো দর্শনই ব্যক্ত হয়েছে অনেক বেশী। বলতে কোনরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ থাকার কথা নয়, যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম এঁরা সকলে একরকম অসফল নাট্যকার। ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী সাহিত্য কতদূর শিল্প-সার্থক হতে পেরেছে, তার চাইতে কতটুকু ভাবী সম্ভাবনার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে তা-ই বলার বিষয়। পাকিস্তানী দর্শনে ঢোলা জামার মোটা তেরপল বিদীর্ণ করে সৃষ্টি-চেতনা জাতীয় খাতে বইতে আরম্ভ করেছিল এবং দিনেদিনে প্রতিবাদী চেতনায় তা ডাঁটো হয়ে উঠেছে, তার একটা রেখাচিত্র ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সাহিত্যের কবিতা শাখাটি ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তীকালে সর্বাধিক শ্রীময় হয়ে উঠেছে। তার কারণ কবিতাতে মনের সূক্ষ্মতম

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চিন্তাও যত সহজে প্রকাশ করা যায়, গল্প-উপন্যাস-নাটকে তা প্রকাশ করতে অনেক বেশী জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। একই সাথে সৃষ্টি এবং জবাবদিহি করার কাজ একই ব্যক্তির পক্ষে করা এরকম অসম্ভব। সমাজকে সে সুযোগ করে দিতে হয়। কবি কিছু সুবিধে পেয়ে থাকেন। কারণ সমাজের গতিধারা বিশ্লেষণ না করে অবচেতনে প্রোথিত সমাজবোধের উপর নির্ভর করে তিনি সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন। খুব বেশী অসহনীয় হয়ে না উঠলে সমাজ তাঁর সাধনায় বাধা দিতে হৈ-হৈ করে ছুটে আসে না। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী কবিরাও এ সুযোগ পেয়েছেন এবং এর সদ্ব্যবহার করেছেন। এ তরুণ কবিকুল বাঙলার ঐতিহ্য, আধুনিক বাংলা কবিতার সিদ্ধি আত্মস্থ করেছেন এবং অনেকেই তিরিশের যুগের কবিদের পৃথিবী মন্থন-করা চেতনা মানসে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মত ও পথের দ্বন্দ্ব আছে। কেউ বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, কেউ ইউরোপীয় কাব্য-চেতনার সচেতন অনুসারী। কিন্তু একটি বিষয়ে সমস্ত তরুণ কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মিল দেখা যায়। পাকিস্তান আন্দোলনের যুগের কবি ফররুখ আহ্‌মদ যে ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে কবিতায় উর্দু-বাংলা মিশিয়ে একটি অখণ্ড পাকিস্তানী সংস্কৃতির মডেল নির্মাণে তৎপর হয়েছিলেন, কবি গোলাম মোস্তফা অগভীর বুদ্ধি এবং অকর্ষিত হৃদয়াবেগ দিয়ে বাহ্‌বা কুড়োবার আশায় পাকিস্তান সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর লম্বা-লম্বা পদ্য রচনা করছিলেন, সে জীবন-বিনাশী, কল্পনা-বিনাশী এবং সৃষ্টি-বিনাশী মরীচিকা থেকে পথ কেটে বেরিয়ে আসা চাই-ই চাই। এই পর্যায়ে কবির চাইতে কবিকর্মীর সৃষ্টি হয় বেশী। সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাকিস্তানী সংস্কৃতির যে স্বল্প-পরিসর আবেষ্টনীর মধ্যে জীবন এবং সৃষ্টি-চেতনা আটকে রাখা হয়েছিল তা বিদীর্ণ করার কাজই তাঁরা করছিলেন। তাই দেখা যাবে এ যুগের সকল তরুণ কবির রচনার মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা, একটা জেদ, একটা মারমুখো অসহিষ্ণুতা কাব্যের শরীর জড়িয়ে-পেঁচিয়ে রেখেছে। কারো কম কারো বেশী। কেউ রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে বাম-ঘেঁষা, কেউ পাশ্চাত্য চেতনায় উৎসাহী। এ দুটি প্রধান ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। বিশিষ্ট স্রষ্টা খুবই কম। কারো একটা কবিতা ভাল হয়েছে, কারো দুটি এবং কারো অনেকগুলো। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক 'সমকাল' পত্রিকা ধর্মীয় খোলস ভেঙ্গে ফেলে ধর্মনিরপেক্ষ খাতে সংস্কৃতি-চেতনা প্রবাহিত করার জন্য সাহস নিষ্ঠা এবং অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, তাতে করে 'সমকাল' পত্রিকা এবং পত্রিকা সম্পাদকের ইমেজটি সংস্কৃতি-প্রেমিক বঙ্গবাসীর মনে গেঁথে গেছে। সত্যিসত্যি পাকিস্তানী দর্শনের স্বেচ্ছাচার ও গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন প্রবর্তিত ইসলামী আদর্শের পৌনঃপুনিক পদ্যেলেখা স্লোগানের অশুভ প্রভাব থেকে কাব্য-পাঠকের মন সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করে। পাকিস্তানী ধর্মীয় আদর্শ কাব্যের জগৎ থেকে চিরদিনের মতো সেই যে নির্বাসনে গেল কোনদিন তা আবার প্রতিষ্ঠা পাবে তার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও বর্তমান রইল না। এই যুগের কবিরা হলেন সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, সানাউল হক, আবদুল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গনি হাজারী, আলাউদ্দীন আল-আজাদ, ওমর আলী, মুহম্মদ মুনিরুজ্জামান, শামসুল হক, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখ। এঁরা সকলে যে প্রাণবন্ত কবি তেমন কথা বলা যায় না। কেউ কেউ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ মাঝেমধ্যে লেখেন, কেউ শখ করে লেখেন। তবে সত্যিকারের প্রতিভাও আছেন। তাঁদের কাব্যিক সৃষ্টির উৎকর্ষ ওপার বাংলার যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করা যেতে পারে। ওপার বাংলার হালের কাব্যের পাঠকমাত্রই শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এবং বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি শহীদ কাদরীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত বলেই তাঁদের একাংশের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনায় আমার মনে হয়েছে।

উনিশশো ছাপান্ন সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাগমারীতে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বাঙলার শিল্পী, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতবৃন্দ সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নানা বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়। সেই সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া পশ্চিম বাঙলায় কিরকমভাবে হয়েছিল তা অনুমান করার উপায় নেই। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় তরুণ সম্প্রদায়ের মনে একটি প্রত্যাসন্ন সম্ভাবনার দিগন্ত মূর্ত করে তুলেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রপত্রিকাগুলো এই সম্মেলনের সাফল্যে ভয়ানক চটে গিয়েছিল, কাগজগুলোর সেই সময়কার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো পাঠ করলেই তার বিবরণ পাওয়া যাবে। অনেক এলেমদার আদমী সভা-সমিতি করে, কাগজে বিবৃতি দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে সম্মেলনের নিন্দা করেছিলেন। সম্মেলনের বিষয়ে আজকের দিনে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। পাকিস্তানী সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা এই সম্মেলনে ব্যক্ত বাঙালী চেতনার বিকিরণে মনেমনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সেই আশঙ্কাই পত্র-পত্রিকায় ধমকের আকারে ফেটে পড়েছে।

ভাষা-আন্দোলনে পূর্বকৃত চিন্তার কোনো সচেতন দিক-নির্দেশনা ছিল না। অত্যাচারে, লাঞ্ছনায়, জীবনের সঙ্গে জীবনের বাস্তব ঘর্ষণের স্বতঃস্ফূর্ত সমূহ ধ্বংসের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ এ আন্দোলন পূর্ববর্তী অনড় সমাজের গর্ভ থেকে জলস্তম্ভের মতো ফুলেফুলে জেগে উঠেছে। এতে সমাজের চিন্তাশীল অংশের সুচিন্তিত নেতৃত্বের কোনো বালাই ছিল না। যে ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যে সম্প্রদায় এ নেতৃত্ব দানে সক্ষম তাও এ আন্দোলনের ফলে সমুদ্রগর্ভে প্রবালদ্বীপের মতো ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, কাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চয় করে সংহত রূপ পেয়েছে। তার আগে তেমন কোনো ভিত্তি ছিল না। তাই দেখা যাবে এটাই বিরাট গণতান্ত্রিক বিজয় কোনরকম সুফল প্রসব করার পূর্বেই পাকিস্তানের শাসকেরা বিরানব্বই-ক ধারা দিয়ে বাংলাদেশের জয়যাত্রার রথ স্তব্ধ করে দিয়েছে। বাঙালীরা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বিশেষ কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ভাষা-আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রের

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক চরিত্রের একটা মৌলিক সাদৃশ্য এখানেই বেরিয়ে আসে। সাহিত্যে জীবনের আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস রূপ পেয়েছে, জাতির মুক্তিপিপাসাও সূচীমুখ হয়েছে, কিন্তু মেরুদণ্ড যেমন করে সমস্ত শরীরের ভার সবলে ধারণ করে তেমন জোরালো কাণ্ডজ্ঞানের একটা শক্তি বাঙলার সংস্কৃতি তখনো লাভ করেনি। তাই এই সময়কার সাহিত্যে সুস্থিরতার বদলে তরল আবেগ, মানুষের মানুষী পরিচয়কে ছাড়িয়ে তার প্রবণতাগুলো মাথাচাড়া দিয়েছে। কোনরকমের প্রবণতা, তা যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করে না, সভ্যতা এগিয়ে দেয় না। প্রবণতাও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। ধর্ম, ধর্মশাসিত রাষ্ট্র বা সমাজ, সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং কার্যকারণহীন বিপ্লবের হাওয়াই-স্বপ্ন ভাষা-আন্দোলনের তরুণ সাহিত্যিকদের অধিকাংশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন রেখেছিল। তাই দেখা যাবে এই সময়ে বাংলাদেশে প্রবন্ধ-সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠেনি। কেননা প্রবন্ধে স্বতঃস্ফূর্ততার তো প্রয়োজন আছে, সে সঙ্গে মনোভূমির অনেক দূর পর্যন্ত কর্ষণ করে স্বভাবশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে একমুখিতাও আনা চাই। মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের পর্যায়ে পৌঁছুবার জন্য বাংলাদেশকে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। গণতন্ত্র-হত্যার যুগে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে-সংঘাত চলেছে সেই সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে কতিপয় ঔপন্যাসিক কিছু উপন্যাস রচনা করেন। তাতে প্রাণধর্ম এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা সংযোগ রাখার প্রয়াসও দেখা যায়। আগের জোলো ভাব অনেক কেটে গিয়েছে। সামাজিক নিরিখে উপন্যাসের চরিত্রের জটিলতাগ্রন্থি-উন্মোচনের সূচনা হয়। আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', শওকত ওসমানের 'জননী' এবং আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে বয়স, মেজাজ ও রুচির দিক দিয়ে। কিন্তু সকলের মিল আছে এক জায়গায়; তিন জনই সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি খড়্গহস্ত। মতাদর্শের দিক দিয়ে কেউ নৈরাজ্যবাদী, কেউ অতিলোহিত বিপ্লবী, কেউ সংস্কারবাদী।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ-গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থোক্ত রচনাগুলো ভাষা-আন্দোলনের পূর্ব থেকে তিনি নানা সাময়িকপত্রে লিখে আসছিলেন। বলতে গেলে তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থটি দিয়েই বাংলাদেশে প্রবন্ধ-সাহিত্যের শুরু। তাঁর রুচি পরিশীলিত, মনোভাব উদার, দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং মানবিক, ভাষা সরস; যা ভেবেছেন ভাষায় বাঁধতে পেরেছেন, যা পড়েছেন বাঙালী মনে গৃহীত হয় মতো করে তার থেকে সারভাগ চয়ন করেছেন — এতগুলো গুণ যে গ্রন্থের তা সমাদৃত হওয়ারই কথা — নাই বা রইল কোনো মৌলিকতা। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংযত প্রকাশভঙ্গী বাংলাদেশের চিন্তাশীল তরুণমনের মননশীলতায় বেগ এবং আবেগ দুই-ই দিয়েছে। শুধু তরুণ কেন অনেক বয়েসী লেখকও তারুণ্যের স্পর্ধা নিয়ে বুঝতে-বোঝাতে, ভাঙতে-ভাঙাতে এবং সত্য আবিষ্কারের দুর্মর আগ্রহে সাহিত্যের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আসরে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে যুক্তিবিচার আছে, ইতিহাসবোধ রয়েছে, বিজ্ঞানী-সুলভ নিস্পৃহতা, ভাষা এবং সংস্কৃতিতে প্রেম, নতুন সমাজ গড়ার প্রেরণা কম-বেশী সক্রিয় ছিল। তা আরো পরের ঘটনা। হঠাৎ করে প্রবন্ধকারেরা এসে সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেননি। বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে। এরই মধ্যে জেনারেল আয়ুব পাকিস্তানের সিংহাসনে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। তিনি গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরলেন, সে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিক্রমণ পথও রুদ্ধ হয়ে এল। সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি প্রচারযন্ত্রে রূপান্তরিত করলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন, অনেকগুলো সাময়িকপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করলেন, লেখকদের সঙ্ঘ স্থাপন করে প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের চড়া দামে কিনে নিলেন। কোনরকম স্বাধীন চিন্তা, নতুন অন্বেষার পথ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। পশ্চিম বাংলার বই আমদানী নিষিদ্ধ করলেন। বলতে গেলে নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশের সমস্ত ব্যবস্থা করে এই স্বেচ্ছাচারী নায়ক নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আঁটঘাট-বাঁধা ব্যবস্থা থেকে সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যেও রবার ষ্ট্যাম্প-মার্কা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হতে থাকে। যেহেতু রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ, তাই তরুণ কবি ও গল্পকারেরা কোনরকম চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপনার বদলে কথার পিঠে কথা সাজাতে লাগলেন। এই চিন্তাহীন, স্বপ্নহীন, বেদনাহীন শুধু কথার প্রকাশ এবং চিহ্নিত ক'জন কথক পোষণ করার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সরকারী কাগজের দ্বার অবারিত করে রাখলেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে হয়তো এমন প্রত্যাশাহীন সময় তেইশ বছরে কোনদিন আসেনি। রাজনীতির মতো সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একটা ধু-ধু মরীচিকার রাজত্ব যেন কায়েম হয়ে বসেছিল। নতুন সৃষ্টির উল্লাস নেই, নতুন বেদনার উদ্বোধন নেই, শুধু চর্বিতচর্বণ। খাড়া বড়ি থোড় আর থোড় বড়ি খাড়া।

তলায় তলায় ইতিহাস কাজ করে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে একদিন আয়ুব খানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দিলেন। গোটা জাতি তার প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে ওঠে। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় গোটা জাতি সংস্কৃতির উপর এ হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সরকারের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। সরকার পশ্চিম বাংলার বইয়ের আমদানী বন্ধ করে মনে করেছিলেন সজীব চিন্তার গতিপথ রোধ করা হয়ে গেল, তা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। তলায় তলায় ঢাকাতে একদল প্রকাশক গড়ে উঠেছে, দেশের লেখকের সমৃদ্ধ চেতনাসম্পন্ন লেখা প্রকাশে এঁদের আগ্রহ অপরিসীম। বলতে গেলে তাঁরাই সাময়িকপত্রের অভাবটুকু পূরণ করলেন। এই প্রকাশকেরাই নতুন বই প্রকাশ করে যেতে থাকেন। নতুন বই মানে নতুন ভাবধারা। দেশের মানুষের মনও নানা সংঘাতে তৈরি হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি, নানাজাতীয় প্রশ্নে কি মত পোষণ করেন, জানার জন্য সাধারণ পাঠকের আগ্রহও বেড়ে যায়। এইভাবে দারুণ একটা দুঃসময়ে বাংলাদেশের শক্তিমান লেখক এবং চিন্তাশীল পাঠকের পরিচয় হয় বাংলাবাজারের প্রকাশকদের মাধ্যমে।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেশের মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নতুন সমাজ-বাস্তবের অভিঘাতে পাঠকের রূপতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণায়ও একটা পরিবর্তন গোটা সমাজ-সংগঠনের আলোকিত অংশে ঝি-ঝি করে কাঁপছিল। গোটা বাংলাদেশের এই কম্পান্বিত চাহিদার তীক্ষ্ণ তাগিদ লেখক সৃষ্টি করে নিল। এই পর্যায়ের লেখকদের ক্ষেত্র অনেকদূর বিস্তৃত এবং গভীর। তাঁদের সন্ধানের চৌহদ্দী, অন্বেষার বৃত্ত আগের তুলনায় অনেক প্রসারিত এবং বৃহত্তর। কারো কারো রচনায় 'নলেজ ইজ পাওয়ার' এই প্রবচনের ভাবকল্পের আভাস ফুটিফুটি করছিল। মামুলী কবি, গল্পকার এবং মজার কাহিনী নিয়ে ইতরের মনকাড়া উপন্যাস লেখকদের কথা বলছিনে। সব দেশে, সব যুগে এ ধরনের ভাবের ঘরে সিঁদকাটা কবি-সাহিত্যিকেরা থাকেন অল্প-বিস্তর। কিন্তু তাঁদের বাইরেও কিছু লেখক থাকেন যাঁরা আপন মনের গভীরতম বেদনা সাহিত্যে অভিব্যক্ত করে তোলেন, আপন কল্যাণবোধের নিরিখে সমাজের ভালোমন্দ যাচাই করেন ও চেতনাকে বস্তুনিষ্ঠ এবং মানুষের কল্যাণমুখী করার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার বরণ করে নেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে কোনো মনীষী-পুরুষের আগমন ঘটেনি। কাজী আবদুল ওদুদের এ উক্তি সত্যের কাছাকাছি। কিন্তু তিনি তার কারণ উদঘাটনে কোনো প্রয়াস করেননি। ভাষা, রাজনীতি, সংস্কৃতির মতো মনীষী-পুরুষও জাতির সামগ্রিক সংগ্রামের পরিশ্রুত চেতনাকে কোল দিয়ে সূর্যালোকে এসে দাঁড়ান। বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-সংগঠনের মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় আঁধার সংগুপ্ত অবস্থায় সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রণ করছিল। মুসলমান ভাই-ভাই, বাঙলার মুসলমান, পাঞ্জাবের মুসলমান ও ইরান-তুরানের মুসলমানে কোনো ভেদ নেই; পাকিস্তানের মুসলমানের তো কোনো কথাই ওঠে না। বাস্তবে দেখা গেল পশ্চিমা মুসলমানেরাও শোষণ-শাসনের দিক দিয়ে ব্রিটিশ বেনিয়া এবং অমুসলমান জমিদার-মহাজনদের চাইতে অধিকতর ভয়ঙ্কর, নৃশংস। ওরা শোষণ করত কিন্তু ফাঁকি দিত না। কিন্তু এরা শোষণও করে, মিষ্টি-মধুর ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফাঁকিটাও দেয়, যাতে ব্যথাটা একটু কম লাগে। বাস্তব কাজ কিন্তু বাস্তব ফল প্রসব করল। সমাজের উপর-নিচ সব মহল থেকে বল্লমের ফলার মতো প্রতিবাদ ফুঁড়ে উঠতে থাকে। বাস্তব অবস্থার দ্বন্দ্বে প্রতিবাদী সমাজের চিন্তাশীল অংশের মধ্যে ভাবধারার বেগ এবং আবেগ দুই-ই সৃজনশীলতার রূপে দেখা দেয়। বাংলাদেশের আত্মার গভীরে নাড়া খেয়ে তার জাতিসত্তার স্বরূপটি প্রকটিত হয়। এই জাতির শিরাগুলো কোথায়, হৃৎপিণ্ড কোথায়, অতীতের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্রগুলো কি, মহাকাশে রকেট ছুটিয়ে চলা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে চলবে কি করে এবং কোন্ পর্বত-প্রমাণ বাধাটি তার বিকাশের পথ আটকে রেখেছে, এসব প্রশ্ন যা একটি বিকাশোন্মুখ জাতি সচেতনভাবে না ভেবে পারে না, সে সকল মৌলিক প্রশ্ন কিছুসংখ্যক সুধীজনের মনে আলোড়নের সঞ্চার করে। তখনই তাঁদের মনে ক্ষীণশক্তি দার্শনিক প্রতীতিগুলো ডাঁটো হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতিকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার, বিচার করার একটা অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ধারা সূচিত হয়। শওকত ওসমান, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রমুখ সৃষ্টিশীল লেখক আভাসে-ইঙ্গিতে গল্প-উপন্যাসে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তাতে সৃজনশীল বেদনার দানের তুলনায় জাতিকে দিক্-নির্দেশনার সজ্ঞান প্রচেষ্টা স্বল্প। অবশ্য শিল্পী আপন শরীরের বেদনার মতো করে দেশের বেদনাকে অনুভব করতে না পারলে দেশকে পথ দেখাবার বেদনার্ত দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায় না। এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটা উক্তি স্মর্তব্য : 'দায়িত্ব যে বোঝে তার, অন্য লোকের নয়'। তবু উল্লম্ফনশীল সামাজিক বেদনার উত্তাপে বর্ষীয়ান লেখকদেরও কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনবরত সোচ্চার সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন। আবুল ফজলের নাম করতে পারি। তিনি তাঁর যুক্তিবাদী পদ্ধতিতে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সব কিছুর দোষ কলমের খোঁচায়-খোঁচায় সূর্যালোকে টেনে এনেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারীর যুগে যাঁদের লেখার মধ্যে সম্ভাবনার চমক দেখা গিয়েছিল, তাঁদের অনেকেই আয়ুব খানের কাছে ভাবধারা বিক্রয় করে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। কারো নাম করতে চাইনে, তবে অনেকেই নেতিয়ে পড়েছিলেন। দু'চারজনের অসহিষ্ণু উত্তাপ মননের স্পর্শে স্নিগ্ধ, গভীর এবং বিশ্বের নানা ভাবধারা গ্রহণের দিক দিয়ে সঞ্চয়ীও হয়েছে। তাছাড়া বেশিরভাগ লেখকই ভাসাভাসা চিন্তা-সম্পর্কহীন প্রবন্ধ, হালকা নাটক, স্বৈরাচারী সরকার সমর্থক দামী সম্পাদকীয় এবং টেলিভিশনের স্ক্রিপ্ট লিখে অর্থোপার্জন করেছেন। জাতীয় চূড়ান্ত দুর্দশার দিনে এককালের সম্ভাবনাময় সংস্কৃতিসেবীদের এ দেশপ্রেমহীন মনোভঙ্গী বাংলাদেশের মানুষের ভুলে যেতে সময়ের দরকার। সুখের কথা সংস্কৃতিক্ষেত্রে এমন কতক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল, জীবনের প্রথম পর্যায়ে কিংবা যৌবনে যাঁদের লেখক-ভাবুক বলে কেউ জানতেন না। তাঁরা ভাবতেন নিশ্চয়ই তবে লিখতেন না; লিখলেও অল্প-স্বল্প। এ প্রসঙ্গে কম করে হলেও তিন জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং তাঁদের সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি না দিলে অবিচার করা হবে বলে মনে করি।

প্রথমত শ্রী সত্যেন সেনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর নিজের ভাষায়, যে বয়সে লোকে শান্তিলাভের জন্য বনে যায় সে বয়সেই তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। উনিশশো সাতান্ন সালে সিপাহী সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি দেশপ্রেমের আত্মত্যাগে প্রোজ্জ্বল কতক মানুষের জীবন, কতক মানুষের কর্ম এবং কতক মানুষের অপূর্ব সাহসিকতাসম্পন্ন আত্মত্যাগের কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ঢাকায় তখনো প্রকাশনা ক্ষেত্র গড়ে ওঠেনি। যাহোক তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হলো। আয়ুব খান কৃপা করে কারাগারে পাঠালেন। এর আগেও জীবনের অনেকগুলো বছর তিনি তাঁর দুর্দিনের বন্ধুদের সঙ্গে কারাগারে কাটিয়েছেন। কিন্তু কোনসময় লেখার কথা মনে আসেনি। এবারের প্রবাস দীর্ঘ, বন্দী জীবন নিঃসঙ্গ। বয়সের চাপ এবং নানারোগের যন্ত্রনার সঙ্গে লড়ে প্রায় সাতান্ন-আটান্ন বছর বয়সে লেখার জন্য কলম ধরলেন। এ দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। লিখে ফেললেন অনেকগুলো উপন্যাস।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিচিত্র ধরনের সমস্যা, নানা যুগের সংগ্রামকে এক-একটি আলাদা উপন্যাসে ভাষারূপ দিলেন। বৈদিক যুগের কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'পুরুষমেধ', বৌদ্ধযুগ নিয়ে লিখলেন 'কুমারজীব', পাল আমলের কৈবর্তদের সংগ্রামকে 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' গ্রন্থে ভাষায়িত করলেন। বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে প্রাচীন ইহুদী জাতিদের নিয়ে লিখলেন দু'খণ্ডে 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান'। মোগল রাজকুমার ফিরোজ শাহের আমৃত্যু ইংরেজবিরোধী সংগ্রামী জীবনের নানা দুঃখকষ্টের চিত্র 'অপরাজেয়' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুললেন। বিশ্ববিখ্যাত আরবীয় বৈজ্ঞানিক আলবেরুণীর জীবনী নিয়ে লিখলেন 'আলবেরুণী' শীর্ষক বাংলাদেশের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। তা ছাড়াও তিনি বেশ কটি উপন্যাস লেখেন। 'পদচিহ্ন', 'সেয়ানা', 'উত্তরণ', 'সাত নম্বর ওয়ার্ড', 'একূল নড়ে ওকূল ভাঙ্গে' এ সকল উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। উপন্যাস ছাড়াও তিনি অত্যন্ত সার্থকভাবে নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। 'বিকিরণ', 'আইসোটোপ', 'আমাদের এই পৃথিবী' ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে এমন নিখুঁতভাবে লিখেছেন যে, তাঁকে বিজ্ঞানী বলে যে কোনো লোকের ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই স্বল্পভাষী আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন মানুষটি গ্রাম-বাংলায় ঘুরে বেড়িয়ে কৃষক আন্দোলনের কাহিনী সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন; ঢাকা শহরের উপর সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ লিখেছেন। অগ্নিযুগের পুরনো বিপ্লবীদের সংগ্রামের কাহিনী থেকে সমাজ-কর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মী 'মনোরমা মাসীমা'র জীবনকাহিনী পর্যন্ত নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে সার্থক উপন্যাস লেখেন। তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং তন্ময়, প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা প্রথম যুগের খ্রিষ্টান সন্তদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি যখন ভেবেছেন বিজ্ঞানের উপর লিখলে সংস্কারের দোষ তাড়াতাড়ি কেটে যাবে, অমনিই বিজ্ঞানের উপর লিখেছেন। সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাস সম্পর্কে মিথ্যেবোধ, অতীতকে গৌরবময় করে তোলা, প্রতিটি সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখা, গণঐক্য, শ্রমের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ভাবধারার শক্তি, মানুষের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, দুঃখ-দারিদ্র্য, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখলে মানুষের মানবোধ প্রবল হবে এবং সামাজিক বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হবে মনে করেছেন, লিখেছেন। আশ্চর্য জাদুকরী হাত তাঁর। ভাষা সহজ, সাবলীল, একটু প্রাচীন-গন্ধী, হাস্যরসবিহীন — কিন্তু অতুলনীয় সহানুভূতি প্রতিটি রচনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বাংলাদেশের একজন শক্তিমন্ত প্রবীণ লেখক এক সময় তাঁর 'আলবেরুণী' পড়ে একখানা ইংরেজী কাগজে সমালোচনা করেছিলেন, 'সরলতা যে রচনার সর্বপ্রধান গুণ এতদিন পরে তা আবার নতুন করে অনুভব করলাম।' শ্রী সত্যেন সেনের রচনায় সমালোচক নানা ত্রুটি খুঁজে পাবেন হয়তো। তবু একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হালের গোটা বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁকে ছাড়া আজকের বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ। শ্রী সেনের অনেকগুলো বইয়ের একসঙ্গে প্রকাশ এবং আর্থিক সাফল্য প্রকাশকদের যেমন অনুপ্রাণিত করেছে, নতুন নতুন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লেখকদেরও নানা বিষয়ে লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও শিশু-সাহিত্যে চেনা এবং অচেনা লেখক আসতে থাকেন। বাংলাবাজারের প্রকাশকরা বেশিরভাগ পাঠ্যবই ছাপতেন, ধর্মীয় বই বেচতেন এবং কলকাতার বই আমদানী করতেন। কলকাতার বই আমদানী আইন করে বন্ধ করে দেয়া হলে অনেকেই বেনামিতে নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছেপে চুরি করে কলকাতার বই চোরাবাজারে বেচতেন। শ্রী সত্যেন সেনের বইগুলোর অর্থনৈতিক সাফল্য প্রকাশকদের সামনে এ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে, এদেশেও এমন বই লেখা সম্ভব যা পাঠক ট্যাকের পয়সা খরচ করে পড়ে। বাস্তবিক তাই হলো। নানা বই ছাপা হতে লাগল, নতুন প্রকাশকেরা এগিয়ে এলেন এবং পাঠকসংখ্যাও আশাতীতভাবে বাড়তে লাগল। দু'তিন বছরে ঢাকাতে গ্রন্থ প্রকাশনার এমন একটা ক্ষেত্র গড়ে উঠল, বিশেষ বিশেষ বিষয় ছাড়া তা লেখকের কাছে কলকাতার অভাব মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাবাজারে জ্ঞানচর্চার, রসচর্চার একটা মধুচক্র যে গড়ে উঠেছে তাতে শ্রী সত্যেন সেনের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রদর্শিত পুঁথি-সাহিত্যের অধ্যয়ন ও তার উপর গবেষণায় তিনি গোটা যৌবনকাল কাটিয়ে দিয়েছেন। বলতে গেলে বয়সের ভাঁটির দিকে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে যেতে থাকেন। তাঁর বক্তব্য চাঁচাছোলা, তাতে কোনরকম রঙ চড়িয়ে গুরুত্ব একটুকুও নষ্ট করেন না। যা বলতে চান, বলেন সহজভাবে, সরলভাবে এবং জোর দিয়ে। যে সকল বিষয়ের উপর আলোচনা বাংলাদেশে সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক কারণে নিষিদ্ধ তিনি সেগুলোর উপরই আলোচনা করেন। মধ্যযুগীয় ধর্মের আবরণ ভেঙ্গে ফেলার আগ্রহ তাঁর এত প্রবল কখনো কখনো তাঁকে সর্বাঙ্গে উত্তপ্ত বিপ্লবী বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। অথচ তিনি যুক্তিবাদী মানুষ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যুক্তির প্রতিষ্ঠা চান। একটি ধর্মশাসিত দেশে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই বলে, তার বিরুদ্ধে তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অনেক সময় হাতুড়ির আঘাতের মতো প্রবল মনে হয়। এ পর্যন্ত তাঁর তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'বিচিত চিন্তা', 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' এবং 'স্বদেশ অন্বেষা'। চতুর্থ প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশের পথে। ডঃ আহমদ শরীফ সহজ কথা আরো সহজ করে বলতে পারেন। ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, পাকিস্তান এবং মুসলিম ঐক্য-বিরোধী কথা বলার ঝুঁকি নিতে পেরেছেন। সমাজের গোঁড়া মানুষের অপছন্দ বিষয়ের প্রশংসা করতে পারেন, আবার পছন্দের বিষয়ে নিন্দা করতে পারেন। এই মানুষটি সর্বাঙ্গে বাঙালী হয়েও বাঙালী চরিত্রের নানা দোষ, অসঙ্গতি এবং অসম্পূর্ণতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। কারণ থাকলে তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবেন, আলাপে ঘরোয়া হয়ে উঠবেন, চটে যেতে পারেন কিংবা ক্ষেপে যেতে পারেন, বিস্ফোরে ফেটেও পড়তে পারেন। এমন মানুষকে ভালোবাসতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

না পারা অসম্ভব, তাঁর লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত বোধ না করা আরো অসম্ভব। তাঁর রচনাগুলোতে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাই ধ্বনিত হয়েছে, স্বদেশ-স্বজাতির ক্ষতি হয় এমন কথা বলেননি, এমন কাজ করেননি। ভয় কিংবা প্রলোভন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি। আয়ুব খানের শাসনকালে অধিকাংশ লেখক যখন জাতীয় সংস্কৃতিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, অনেকটা একাকীই তিনি সবলে জাতির যা স্বার্থ তার সপক্ষে অবিরাম কথা বলেছেন। অথচ তিনি উগ্র স্বদেশপ্রেমিক নন। ডঃ আহমদ শরীফদের মতো মানুষের মন-মুখের একাত্মতা, মানবপ্রেম, জ্ঞানপ্রেম, শোষিত মানুষের প্রতি অপার সহানুভূতি এবং দরাজ বুকের সাহসিকতার শিখায়-শিখায় অগ্নিক চেতনার কাঁথা মুড়ি দেয়া বাংলাদেশের একটা পূর্ণাঙ্গ রেনেসাঁ তথা প্রবুদ্ধ সৃষ্টিশীল চিত্তদোলা ঘোড়সওয়ারের বেগে এগিয়ে আসছিল।

তিনজনের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠতম বদরুদ্দীন উমর। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন। লোকমুখে শোনা যায় এক সময়ে তিনি নাকি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ তিনিই আয়ুব খানের শাসনকালে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাম্প্রদায়িকতা'। এটিই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতারূপ সুপ্রাচীন ব্যাধির বিরুদ্ধে লিখিত সুচিন্তিত প্রথম প্রতিবাদ-গ্রন্থ। তরুণ লেখকের যুক্তির ধারে, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় ও আন্তরিক সততায় বইটি অনবদ্য। গোটা বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের বই দুটি নেই। খুব শীগগির তরুণদের মধ্যে, সমাজের চিন্তাশীল এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন অংশে বিদ্যুতের শিখার মতো তাঁর চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্বিতীয় গ্রন্থ লিখলেন 'সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি'*। এটিও খুব দ্রুত পাঠকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের লেখা বাংলাদেশে এর আগে আর কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। ধর্ম বাংলাদেশের জনজীবনের উপর একটা বর্তমানের বোঝা এবং অতীতের নানা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি পুষিয়ে রাখার শেকল। তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নানা ক্ষেত্রে কিভাবে গোটা জনসমাজের সৃষ্টিশক্তি পঙ্গু করে রেখেছে যুক্তির পারম্পর্যের মাধ্যমে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এই বইয়ের প্রচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসক সম্প্রদায় সচেতন হয়ে ওঠে। শুনেছি তাঁর কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল হয়তো তিনি বইগুলো বাজার থেকে তুলে নেবেন অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষের মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে দেবেন। যুগে-যুগে আদর্শবাদীরা চাপে পড়ে যা করেন, উমরও তাই করেছেন। মন-মগজ-খোঁচানো চিন্তার সঙ্গে জীবনের সংগ্রামের সঙ্গতি বাঁচাবার অভিপ্রায়ে চাকরী ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 'গণশক্তি' বলে একটা সাপ্তাহিক কাগজ সম্পাদনার ভার নেন। বাংলাদেশের শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী মানুষ উমরের কাছে অনেক প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনিও তাঁর

* বইটির নাম আসলে *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*। — সম্পা.

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রাজনৈতিক সংগ্রামের শুরু থেকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে তাঁর সাধনায় সম্ভাবিত করে তুলেছেন। তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' একটি মহৎ গ্রন্থ। এর যে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তার তুলনা নেই। তাছাড়া এর পেছনে অপরিমিত শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। এই শ্রম 'লেবার অব লাভ' অর্থাৎ প্রেমের শ্রম। যে সময়ে, যে পরিস্থিতিতে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা হয়েছে তা উমর ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে দিয়ে সম্ভব হত না। উমরের প্রতিটি বই গণচিত্তে এসিডের মতো কাজ করেছে। মুসলমান-সমাজকে সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদম বিদ্রোহীর ভাবে প্রচণ্ড আঘাত করার হাজারো প্রয়োজন ছিল। এবং এখনো আছে। উমর সে সূচনাটি করে দিলেন। আজকের তরুণ বাঙলার ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টিতে এবং শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস-বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়াতে উমর প্রভূত শ্রম এবং আন্তরিকতা ঢেলে দিয়েছেন। অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ উমরের নাম স্মরণ রাখবে। তাঁর চারটি গ্রন্থের প্রকাশ সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চারটি বই চারটি বোমার মতো প্রবল বিস্ফোরণে সমাজের মধ্যে ফেটে পড়েছে। এসিড যেমন করে খাদ খেয়ে খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উমরের বইও ধাক্কা দিয়ে মানুষের অধিকারের দাবীতে সংগ্রামী বৃত্তিগুলো জাগিয়ে তোলে। ভাষা-আন্দোলনকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিংবা সাংস্কৃতিক ঘটনা বলে চালু করার একটা চেষ্টা কোনো কোনো মহল থেকে হয়। তিনি সংকীর্ণ ভিত্তিটাকে সরিয়ে একটা বৃহৎ পটভূমির উপর ভাষা-আন্দোলনকে দাঁড় করালেন। ভাষার সংগ্রাম এবং জীবনের অন্যান্য দাবীর সংগ্রাম যে মূলত একই জিনিস উমর তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, নানা নেতা-উপনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, এবং তাঁদের বক্তব্যের সারসঙ্কলন করে প্রতিটি ঘটনার নিরিখে যুগ-চেতনা বিন্যাস করে জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এতে করে অনেক ভ্রান্তধারণার নিরসন হয়। উমরের মধ্যেই যুগের ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী সবচেয়ে বেশি অভিব্যক্ত হয়েছে। লেখা পড়তে গিয়ে মনে হবে, লেখক কতক বিশেষ মানবিক মৌলিক সমস্যার সমাধান কামনা করেন। এই কামনার সার্থক ফলশ্রুতি বাংলাদেশের শহীদদের সংগ্রামের সঙ্গে কুলি-মজুরের শ্রম জুড়ে দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন একটা প্রাণসমৃদ্ধ বিপ্লবের তরঙ্গ-সৃষ্টি। বাঙালী এখন সে বিপ্লবের দিকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবমান, তার গতিবেগ ব্যাহত হবে না বলেই বিশ্বাস করি।

আয়ুব খানের রাজত্বের কালো-দশকে বাংলাদেশের সৃষ্টিশক্তি দাবানলের মতো জ্বলে উঠে দিগন্ত রাঙাতে পারেনি। কিন্তু তলায় তলায় সমাজের অন্তঃস্রোতে যুগবেদনার রাঙা বুদবুদগুলো ঢেউ দিয়ে জেগে উঠে পরিসরে বেড়ে উঠতে থাকে। ভাঙনের দিক ছাড়াও কিছু সংস্কৃতিসেবী সুস্থির মানসিকতা দিয়ে গোটা সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ শাখার বিচার-বিশ্লেষণে এগিয়ে আসেন। এঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু নিজের নিজের বিষয়ে মনীষার ছাপ রেখেছেন। এও এক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধরনের চিন্তোৎকর্ষের স্পর্শ পাওয়া মনের অভিব্যক্তি, ভাষাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। প্রথমত অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা এটিই ঐ বিষয়ে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক গ্রন্থ। যে কোনো গবেষণার পেছনে একটা সৃষ্টিশীল সত্যানুসন্ধিৎসা ক্রিয়াশীল না থাকলে এ ধরনের দুরূহ গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। তারপর ডঃ আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' অত্যন্ত মূল্যবান একটি গবেষণা-গ্রন্থ। বাংলাদেশে একনিষ্ঠ গবেষণার নিরপেক্ষ প্রকাশ এ পর্যন্ত যে সকল গ্রন্থে হয়েছে, আমার মতে এটিই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা' বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক সুন্দর নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা। নানাস্থানে প্রকাশভঙ্গী বিষয়ানুগ না হলেও মোটামুটি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কবিতা দাঁড় করিয়ে আধুনিক বাংলাদেশের কবিদের বাঙলার ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এবং বিশ্বের কাব্যান্দোলনের ভাবগ্রাহী হিসেবে ধরে নিয়ে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের কতটুকু সিদ্ধি, কতটুকু ঋদ্ধি তাও তুলে ধরেছেন। শ্রীরণেশ দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা দুটি মনন-সমৃদ্ধ গ্রন্থ। আবদুল হকের 'ক্রান্তিকাল', 'মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার'* এই দুটি গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যুক্তির প্রভাবে বাঙালী-মানসের পরিসর বাড়ানোর আন্তরিক প্রচেষ্টার গহন ছায়াপাত আছে। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে একদিকে যেমন স্বদেশের মানুষের বিশ্বাস এবং চিত্তসম্পদের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা স্ফুরিত হয়েছে তেমনি সাহিত্যের নানা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনাও স্থান পেয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের 'পদ্মাবতী'ও একটি চমৎকার সুলিখিত গ্রন্থ। এই সময়ে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, স্মৃতিকথা, নন্দনতত্ত্ব, শিশুসাহিত্যে এত অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সবগুলোর নাম উল্লেখ করা এ স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। এর সবটা স্থূল প্রয়োজনে লেখা মনে করলে ভুল করা হবে। জাতিকে নানাদিক থেকে দেখার, বিচার করার এবং জাতির শীতল বক্ষে প্রাণাবেগ সঞ্চার করার অন্তরঙ্গ অভিলাষ থেকেই অধিকাংশ গ্রন্থের সৃষ্টি। নতুন ভাবধারা দ্রুতগতিতে সমাজে সংক্রমণ করেছিল। নতুন ভাবধারার রসায়নে তার মানস পরিচ্ছন্ন হয়ে আসছিল।

ভবিষ্যতের আশাবাদী জঙ্গী মনোভাব বর্তমান সম্পর্কে একটা স্থির বাস্তবঘেঁষা ধারণার জন্ম দেয়। তা যত অসুন্দর হোক না কেন গোটা জাতি তার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান সম্পর্কে যথাযথ প্রতীতি চিন্তাশীল মানুষদের অতীত বীক্ষণের দিকে ঠেলে দেয়। পূর্বে ইতিহাসকে নেহায়েতই ইসলামভিত্তিক করে তোলার যে মনোভাব

* *বইটির নাম সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*। — সম্পা.

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে দেখা যেত তা কর্পূরের মতো উবে গেল। এই বোধে প্রতীতি এল যে অতীতের বাঙালী মনীষীরা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, আমরা তার উত্তরাধিকারী। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ধর্মীয় মহাকাব্য অনুবাদ করলেও তার ধর্মীয় উপাদান বাদ দিয়ে মানবিক দিকটি গ্রহণ করার মতো সাবালক আমরা হয়ে উঠতে পেরেছি। বঙ্কিমের রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষ থাকলে তা বিচার করব, কিন্তু অমন সুন্দর শিল্পীকে বাদ দিতে পারিনে। বাঙলার বহুশ্রুত প্রাচীন এবং আধুনিক মনীষীবৃন্দের নাম আবার নতুন করে গনগনে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো, টাকশালের নতুন টাকার মতো তার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যুগের, সমাজ-ব্যবস্থার, ধ্যান-ধারণার এবং জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠলেন। এই বোধের প্রেরণাতেই ডঃ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্ম; বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রামমোহন, দীনবন্ধু মিত্র, ভারতচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীদের রচনার বাংলাদেশে পুনঃপ্রকাশ। এই অতীতপ্রীতির কারণেই সোনারগাঁয়ে ঢাকার সুধী সমাজ 'সত্যাগ্রহী' নাম নিয়ে ঐতিহাসিক প্রকীর্তিমালা দেখার জন্য হাজারে হাজারে ছুটে গিয়েছেন। খুলনার ইতিহাস সম্মেলনে যে উত্তাপ বিকিরিত হয়েছে, যাঁরা যাননি, অংশগ্রাহীদের কাছ থেকে তাঁরাও সে উত্তাপের আঁচ পেয়েছেন। গত বছর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মতিথি উপলক্ষে বিক্রমপুর পরগনায় তাঁর স্বগ্রামে যে স্মৃতি-উৎসব হয় তাতে হাজার হাজার যুবক বিশ-পঞ্চাশ মাইল হেঁটে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের সাফল্য বলার অপেক্ষা রাখে না। কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান যশোরের সাগরদাঁড়িতে মধুমেলার আয়োজন করা হয়। কবিকে স্মরণ করার জন্য, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মানের জন্য, তাঁর কীর্তি অনুভব করার জন্য সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে যে প্রাণতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যাঁরা দেখেছেন ভুলতে সময় লাগবে। রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব বাংলাদেশে আসে এক-একটা সামাজিক উৎসবের মতো। ঈদ কিংবা দুর্গাপূজার চাইতে জাতীয় জীবনে তার গুরুত্ব অনেক গভীর এবং ব্যাপক। এইটা অনুমান করা আশা করি বাতুলতা নয়, অদূর ভবিষ্যতে শহীদ দিবস, পঁচিশে মার্চ দিবস, রবীন্দ্র এবং নজরুল দিবস সামাজিক উৎসব হিসেবে স্থানলাভ করবে। এ তো মান্ধাতার আমলের অর্থহীন উৎসব নয়; একটা জাতি রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম এবং ভালোবাসার মূল্যে এ নতুন জাতীয় পর্বদিন সৃজন করেছেন।

সাধারণত দেখা যায়, সমাজের একদিকে জাগরণ এলে অন্যান্য দিকগুলোতে তার সাড়া জাগে। বাংলাদেশেরও তেমনটি হয়েছে। বাংলাভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালী সাংস্কৃতির মহীরুহে নতুন মুকুল ধরিয়েছে। তা ভাব এবং চেতনার দিক দিয়ে সংকীর্ণ নয়। জনজীবনে তার প্রভাব সঞ্চারিত হতে সময় লাগেনি। রাস্তা থেকে ইংরেজী সাইনবোর্ড বিদায় নিল, ইংরেজীতে লেখা নামফলকের বদল হলো, অফিস-আদালতে বাংলা চালাবার প্রবল দাবী উঠল। দাবী এল বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সব বিদ্যা, সব

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধরনের জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রবল উদ্দীপনা সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতাবোধ নয়। একটা সহজ সত্যের স্বাভাবিক স্বীকৃতি – বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলা ভাষার মাধ্যমেই বিদ্যাচর্চা করবে এটাই স্বাভাবিক। জাপানী তার মাতৃভাষায় সবকিছু শেখে, জার্মান তার মাতৃভাষায়; রুশ, চীন, ইংরেজ সকলের বিদ্যাচর্চা হয় আপন আপন মাতৃভাষায়। বাঙালী ওসব জাতির চাইতে হীন নয়, হেয় নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরেই বাঙালী আপন ভাষাকে ইতিহাসে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় জননীর গৌরবে, স্নেহে-মমতায় আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিল। জনগণের এই তীব্র আন্তরিক চাহিদার প্রতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমীর সুধী-সমাবেশের ভাষণে বলেছিলেন, যেদিনই আমরা ক্ষমতায় যাব তার পরদিন থেকে সরকারী নথিপত্র, অফিস-আদালত সব জায়গায় বাংলা চালু করা হবে। এটা কোনো লোক দেখানো ঘোষণা নয়, দেশের জনগণের তীব্র চাহিদার স্বীকৃতি।

শিল্পকলা এবং চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে দু'কথা বলা প্রয়োজন। আগে শিল্পীরা কেরানীর হাতে একটা বৈঠা দিয়ে নিচে লিখে দিতেন 'নৌকার মাঝি'। কিন্তু আন্দোলনের প্রবল জোয়ার তুলি-শিল্পীদের মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসে। আগের দিনে শৌখিন শিল্পীরা যে ছবি এঁকে বিদঘুটে নাম দিতেন এবং বিদঘুটে ব্যাখ্যা শোনাতেন, তা সম্পূর্ণ অবসিত হয়ে এল। জয়নুল আবেদীন নতুন করে বেঁচে উঠলেন, বেঁচে উঠলেন কামরুল হাসান। তরুণ শিল্পীরা অগ্নিগর্ভ বাঙলাকে নিয়ে হাজার ছবি আঁকলেন। প্রাণস্পন্দন রেখার টানে থমকে আছে। রঙের বিন্যাসে প্রাণ উপচে পড়ছে।

প্রথমে বাংলা ছবি দিয়ে শুরু হলেও পরে উর্দু অপসংস্কৃতির ভূত চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালকদের মাথায় চেপে বসে। অনেক শক্তিমান পরিচালক উর্দুতে ছবি করেছেন। তারপর আয়ুব খানের আমলে সামাজিক সমস্যার উপস্থাপনা পর্দায় নিষিদ্ধ হলে, রূপকথা নিয়ে তাঁরা একসঙ্গে ছবি করতে লেগে যান। সে জায়গাও বেদখল হলো, রূপোলী পর্দা যেখানে হলিউডের অশ্লীলতা এবং লাহোর-মার্কা যৌন-সর্বস্বতার মোহিনী ফাঁদ পেতে রাখা হত, তাও সগ্রামী বাঙলা অধিকার করে নিল। অনেকগুলো অনতিপূর্বের ছবিতে বিধৃত হয়েছে তার প্রমাণ।

আলোচনার প্রারম্ভে একটা বিষয় উল্লেখ করেছি। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে স্থির মনন এবং যুক্তিশীলতার অভাব ছিল ভাষা-আন্দোলনের যুগে। এই অভাবেরও পূরণ হতে থাকে এই সময়ে। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরীর কবিতায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে। রূপ, রস, বুদ্ধি, মনন এবং শারীরিক শক্ত কাঠামো মিলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিশ্ব-সংস্কৃতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এক-একটি দিনে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করছিল এমন তীব্র তার গতিবেগ। সত্যিসত্যি একটা রেনেসাঁবোধ বাংলাদেশের হৃদয় ভেদ করে অজস্র মাছের সোনালী পোনার মতো পরমাণুবেগে ছড়িয়ে পড়ছিল। যে সকল দৃপ্ত তরুণ এই নবযুগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে

My AllGarbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই আলোচনায় কিছুই বলা হয়নি। কেননা তাঁদের সামনে রয়েছে প্রসারিত সময়। অনেক কিছু আমরা করতে পারতাম এই তিন মাস সময়ের মধ্যেও, পশ্চিমা সমরনায়ক ইয়াহিয়া আমাদের কিছু সময় হত্যা করলেন। তা বাঙালীর সৃষ্টি-চেতনায় আরো জোরের সঞ্চার করবে। পৃথিবীর প্রাণের ভাবনায়, ভাবের সম্মেলনে, বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে বাংলাদেশের মানুষ রাখবে তার প্রোজ্জ্বল অবদান। সে দিন সমাগত।

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কি করে রোধিবি সাগর জোয়ার আকাশে যখন উঠছে চাঁদ?

১৯৭১

জাগ্রত বাংলাদেশ
(১৯৭১/১৯৯০)

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

রবীন্দ্রনাথ*

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-সাধনার প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে ক্রমশ মনে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দূরের মানুষ। তাঁকে ধরি-ধরি ছুঁই ছুঁই মনে করলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধরা-ছোঁয়ার অতীতই থেকে যান এবং একই কারণে দুর্বোধ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সাধনা, নিষ্ঠা, শ্রম এবং সর্বোপরি সময়ের প্রয়োজন অপরিহার্য।

রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কড়া আলো কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমধর্মী সূক্ষ্ম, মিহি, সর্বব্যাপ্ত ও সর্বভুক এক ধরনের চেতনায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অবদান। তিনি যে যুগের চৌহদ্দীতে লালিত-পালিত, সংবর্ধিত তার আগের কিংবা পরের যুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনের শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্য-চেতনার এমন সুনিবিড় মিলন কোথাও ঘটেনি। এ অসম্ভব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেই সম্ভব হয়েছে। তা-ই রবীন্দ্রনাথের প্রধান গুণ। আবার প্রকারান্তরে দুর্বলতাও বটে। এই শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্য-চেতনার সহজ স্বাভাবিক মিলন রবীন্দ্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। তা তাঁকে দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বলোকের, সর্বযুগের, সর্বদেশের আপনার জন করে তুলেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে শিল্পের এই অতি গভীর প্রতীতি, অতি প্রসারিত জীবন-দৃষ্টি তাঁর শিল্পকর্মের অনন্যতা কতকাংশে খর্ব করেছে। জীবনের সরু, মোটা, বঙ্কিম, তীর্যক অনেকগুলো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রমানস মথিত করেনি, সেজন্যে তাঁর মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে অনেকটা ঋতু-বৈচিত্র্যের মতো স্বাভাবিক নিয়মে। দুয়েকটা বিস্ফোরণ ছাড়া রবীন্দ্র-মানসে কোনো বিপ্লব কিংবা ব্যাপক পরিবর্তন নেই। উদ্ভিদের সহনশীলতায় তিনি ক্রমাগত আলোর

* প্রথমে আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ* সংকলনে (১৯৬৮) ও পরে লেখকের *বাঙালী মুসলমানের মন* গ্রন্থে (১৯৮১, দ্বি.স. : ১৯৯৬) প্রবন্ধটি *রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা* শিরোনামে ছাপা হয়। কিন্তু ২০০০ সালে স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা প্রকাশিত *আহমদ ছফার প্রবন্ধ* পুস্তকে একই রচনা *রবীন্দ্রনাথ* শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা এখানে শেষোক্ত শিরোনামটিই গ্রহণ করলাম। — সম্পা.

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পানে এগিয়ে গেছেন। নদীর একনিষ্ঠ স্রোতের মতো একটি স্থির লক্ষ্যের পানে আমৃত্যু ধেয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের চেতনা।

এ অন্তঃসলিলা ধারাস্রোতের সঙ্গে নানা ধারার মিলন এর গতিতে দিয়েছে বেগ, কখনো যা এসেছে বন্যা। জল কূল ছাপিয়ে গেছে। প্লাবিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ। বিশ্বেও লেগেছে দোলা। কিন্তু মৌল ধারাটি কোথাও রুদ্ধ কিংবা ব্যাহত হয়নি। এমনকি জীবনের অন্তিমক্ষণেও সূর্যের প্রলম্বিত রশ্মিছটার মতো সুন্দরভাবে অন্তরের সত্য বোধটি কবিতার আকারে তাঁর মুখ থেকে একটি আলো-লাগা শিশিরবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে।

আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দুর্মর প্রচেষ্টারই তো নাম রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিকতা ধর্ম প্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। অত্যন্ত সুকুমার, সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, শ্রদ্ধার ভারে আনত একখানা মন নিয়ে তিনি যেন প্রচারকের ভূমিকায় নেমেছিলেন। কিন্তু প্রচারকের লেবাস তিনি কখনো অঙ্গে ধারণ করেননি। হৃদয়ের সত্যোপলব্ধি প্রকাশের জন্য কবিতা লিখেছেন। কবিতা লিখে তাঁর মনে হয়েছে, যা বলতে চেয়েছেন, কিছুই বলা হয়নি। গল্প লিখেছেন তাই। তার পরেও মনে হয়েছে কালির আখরে প্রাণের সুবর্ণ তরঙ্গমালা যেমনভাবে উচিত তেমনভাবে বেঁধে রাখতে পারেননি। তারপরে লিখেছেন নাটক, হয়তো প্রবন্ধ। এতগুলো মাধ্যমে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার পরেও তৃপ্তি আসেনি। শরণ নিতে হয়েছে সঙ্গীতের। দ্রাক্ষাকুঞ্জের মর্মরিত বিবাগী হওয়ার সমস্ত অন্তর প্রাণ-মেলে ধরেও মনে হয়েছে অস্তিত্বের গোপন-গহন অন্তঃপুরে আরো সৃষ্টির বীজ বুঝি রয়ে গেল। অস্তিত্বের গভীরে যেখানে চাপ-চাপ আঁধারের নিভৃতি, যেখানে মানুষের নিজের অজান্তে আদিমতার ছাপ বয়ে বেড়ায়, সেখানেও পৌঁছেছে সৌন্দর্যের 'গন্ধহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসের' আহবান। সত্যের শুভ্রস্বরূপ লতায়িত জলের মতো চেতনার গভীরতম স্তরকে করেছে রঞ্জিত। সেজন্য তিনি শুধু অলঙ্কার আর আলোর প্রতিমা নির্মাণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। রং, রেখা আর তুলির সাহায্যে আপন হৃদয়ের প্রতিরূপ নির্মাণের জন্য তাঁকে আসতে হয়েছিল চিত্রকলার বর্ণিল জগতে।

অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের শিখা এবং সবল কাণ্ডজ্ঞানের অঙ্কুর তাঁর মধ্যে অতি শৈশবে জেগেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটি বোধ ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো মিশে গেছে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মে মহর্ষির আত্যন্তিক অনুরক্তির কথা স্মরণে না রেখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করলে তা একপেশে হতে বাধ্য।

কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "হে ধ্রুব সত্য সনাতন! কাল সহকারে কত বিষয়ের কত প্রকারের পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার কারুণ্য স্বরূপের কদাচ পরিবর্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষের অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার করুণাস্বরূপের কোনো পরিবর্তন নাই।"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথেরা প্রার্থনায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। কবি-পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপাসনার মন্ত্রকেই দৈনন্দিন জীবনচর্চার একমাত্র নিয়ামক হিসাবে কঠিন-কঠোর আত্মবিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন। ফার্সী সাহিত্যের রসিক পাঠক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মকে বেদ কিংবা বেদান্তের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হয়ে মানুষের 'হৃদয় মন্দিরে' প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করার উপযোগী নির্ভার করার জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা তাঁকে পরবর্তী সময়ে মহর্ষিতে রূপান্তরিত করেছিল।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব এত ব্যাপক, এত সুগভীর যে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠকের মনে হবে গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য, গীতিমাল্য, গীতালী ইত্যাদি আত্মনিবেদনমূলক কাব্যগুচ্ছ তাঁর পিতার মুখের কথাই শুধু ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনেকগুলো গানের বেলাতেও এই একই কথা খাটে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রায় রচনাতেই সৌন্দর্যের বসনে ভূষিত সত্যবোধের যে কারুণ্য স্বরূপকে আপন মহিমায় স্থিত দেখি তাও মহর্ষিরই পরমারাধ্য সত্যের প্রতিরূপ যেন। সত্য এবং সৌন্দর্যের এই সম্মিলিত আহিতাগ্নিতে এই যে নিঃশেষে তিলে তিলে আত্ম-বলিদান এবং তার যে ফলশ্রুতি — তা কবিতা হোক, গল্প হোক, নাটক-নভেল হোক, পত্রসাহিত্য হোক, চিত্রকলা হোক, ভাষণ কিংবা ভ্রমণবৃত্তান্ত অথবা প্রবন্ধ, প্রার্থনা, সমালোচনা, বাদ-প্রতিবাদ যা-ই হোক না কেন —— একযোগে সবকিছুকে বলব রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময়ী সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ।

যা কিছু মনের উপর ভারস্বরূপ হয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, সেই জড়ের ওপর প্রাণের বিজয় ঘোষণাই হলো রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সাধনার মূলমন্ত্র। জীবনের ভোগে, উপভোগে নিষ্প্রাণ জড়কে পোষ মানানোই হলো সত্যিকার বীরের চারিত্র্য-ধর্ম। মানবিক আশা-কম্পিত এবং নৈতিক শ্রেয়োবোধে মণ্ডিত নগ্ন মনুষ্যত্বই প্রকৃত জীবনশিল্পীর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। কবি শেলী তাঁর 'রিভোল্ট অব ইসলাম' কাব্যের ভূমিকায় কথাটিকে আরো সহজ, আরো প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন : Still love is the only thing which shall guide the moral world of human being.

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জীবনের আশ্বাসের মতো বিভিন্নভাবে সহস্রধারায় ঘটেছে এই মানবিক প্রেমের নিঃসরণ। সত্যের স্থির অকম্পিত শিখাকে বুকে ধারণ করেছিলেন যিনি, সৌন্দর্যের স্পর্শমাত্রেই যিনি আন্দোলিত হয়েছেন, মানুষের পাপ, লোভ, রিরংসাকে হত্যা করার জন্য অন্তরস্থিত সত্যের পাষাণে সৌন্দর্যের তলোয়ার শানিয়েছিলেন যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে মূল উৎসের থেকে দূরে গিয়ে বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বহুদেশের চিত্তসম্পদ আত্মস্থ করলেও রবীন্দ্রমানসের মর্মমূলে ভারতীয় জীবনবোধই ছিল সব সময়ে জীয়ন্ত। আর্য-ঋষির চেতনায় তাঁর মানসপট সিঞ্চিত ছিল। সুখী পরিবারের সুস্থ পরিবেশে প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা তাঁর শিল্পী-মনের সমস্ত আয়তন জুড়ে যে অনপণেয় রঙিলা ছাপ ফেলেছিল কোনদিন তার রংছুট হয়নি। অতৃপ্ত শিশুর সঞ্চরণশীল চেতনায় প্রাচীন ঋষির বাণী, ঋষিপ্রতিম পিতৃদেবের মৌন সংযত স্নেহঘন ছোঁয়ার শিহরণ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের শিখা এবং সবল কাণ্ডজ্ঞানের অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছিল। রবীন্দ্র-মানসের সে কঠিন ফ্রেম যার ওপর প্রবল একটি আলোকিত ঝরণার মতো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-চেতনা সমুজ্জ্বল বিশ্বাসে আমৃত্যু উড্ডীন ছিল, ঠাকুরবাড়ির কারখানাতেই তার সৃষ্টি এবং দেবেন্দ্রনাথ তার যাদুকর কারিগর।

নিঃসঙ্গ বালকের মনে অন্তরের তৃষ্ণার বীজরূপী উপনিষদের বোধ কোমল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে তরল সঞ্জীবনী সুধার মতো মিশে গিয়েছে। অস্তিত্বের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া সুপ্রাচীন ফসলীভূত প্রাণের লালিত বাণী সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো অনেককিছুর।

আপন পরিবারেই তিনি ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বেদ, উপনিষদ, গীতার সারসত্য যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে হাফিজ, খৈয়াম প্রমুখ ইরানী সাধকের সাধনার রাঙা স্রোতের ধারাও শৈশবে রঞ্জিত করেছে তাঁর চিত্ততল। প্রাচীন ভারতের মহিমামণ্ডিত প্রতিভা বাল্মীকি, কালিদাস, বেদব্যাস, ভবভূতির সংস্কৃত কাব্য তিনি আগ্রহ সহকারে পড়েননি শুধু, কাব্যধৃত চিত্রাবলীও বালকের সচঞ্চল অনুভূতি দিয়ে আপনার করে নিয়েছিলেন। হাজার বছরের তমসা বিদীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রাচীন ভারতের দেবদেউল, তুষারমণ্ডিত শৈলশিখর, বেত্রবতী, শিপ্রা, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, প্রশান্ত তপোবন, সুকুমার ঋষিকুমার, নিবিড় অরণ্যানী, মহানুভব রাজন্যবর্গ সকলকে চিনে নিয়েছিল। সে যে কত গভীর চেনা, কত নিবিড় আত্মীয়তা, রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক তার মর্মোপলব্ধি করতে পারবেন।

শুধু সংস্কৃত কেন প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহের স্পন্দন তাঁর চেতনায় এক অপরূপভাবে তরঙ্গিত হয়েছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে মেলে তার কিঞ্চিৎ পরিচয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতে রামমোহন-মনীষার আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের যে নব অঙ্কুরোদগম: বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রমুখ সাহিত্য-সাধকের সঞ্চারিত প্রাণাবেগে যার সমৃদ্ধি, একটু-একটু করে তিনি প্রায় তার সবটুকু মর্মমধু আত্মসাৎ করেছিলেন। সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসকের মতো ভার-জীর্ণ অংশ কেটে ফেলে পূর্বসূরী সাহিত্য-সাধকের প্রাণকণা সূর্যশিখার উপকরণ-স্বরূপ সঞ্চয় করেছিলেন।

এতে শেষ নয়, পূর্বপুরুষের জীবনসংগ্রাম, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা নিরুপদ্রব শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনে কেঁপে ওঠা প্রাণের রসময় প্রবাহ — যা উত্তরপুরুষের মুখেমুখে বাড়ির পাশের ছোট্ট নদীটির মতো তিরতিরোনো ধারায় বয়ে গেছে, সমগ্র

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাঙলা দেশের সে লোকায়ত সংস্কৃতিকেও তিনি কোল দিয়েছিলেন, হজম করেছিলেন তার মর্মমধু।

রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণের ব্যাপকতা, মহাভারতের গাম্ভীর্য, কালিদাসের উপমা-অলঙ্কার, বৈষ্ণব কবির ললিত গানের বাণী, ইরানের রসসিক্ত প্রাণের পেলবতা, লোকসংস্কৃতির সাদামাটা চেতনা, ভারতচন্দ্রের নিপুণতা এবং অগ্রজ কবিদের কোনো কোনো পংক্তি, কোনো পদ, কোনো শব্দের অবিকৃত অথবা ঈষৎ ভিন্ন প্রয়োগ দেখে বোঝা যায় তিনি স্বদেশের অতীতের মানস-ফসল কি গভীর আন্তরিকতায় বুকে তুলে নিয়েছিলেন, কি মমতায় অন্তরের সহস্র ব্যগ্র বাহু মেলে দেশের ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

য়ুরোপ প্রবাসকালে অল্পবয়স্ক বালক কি প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা নিয়েই য়ুরোপকে দেখেছিলেন। মনে য়ুরোপ কি তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছিল! 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' আমরা এমন একজন তরুণকে দেখি যাঁর দৃষ্টি কড়া আলোকের বহ্ন্যুৎসবের তলায় নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র, ঘনায়মান অন্ধকারকে স্পর্শ করেছে। এমন একটি মনের অনুরণন আমাদের কানে এসে বাজে যে-মন হাসির ফোয়ারার অন্তরালবর্তী কীটদষ্ট মনের ভাঁজে ভাঁজে থমকে থাকা করুণ ক্রন্দনের সন্ধান পেয়েছে।

য়ুরোপের অহমিকা তাঁকে আহত করেছে কিন্তু গরিমাও মুগ্ধ করেছে। শেকসপীয়রের মানবোপলব্ধি, মিল্টনের কল্পসাঁতার, শেলীর মুক্ত প্রমিথিউস, বায়রনের উদ্দামতা, কীটসের তন্ময়তা, ব্রাউনিংয়ের অধ্যাত্মোপলব্ধি, গ্যায়টের মানবীয়তা, রাসকিনের প্রগাঢ়তা, টলস্টয়ের ব্যাপ্তি এবং ফরাসী সাহিত্যিকদের বাক্‌বৈদগ্ধ তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া আরো নানা প্রাণের স্পর্শ প্রাণে এসে অবশ্যই লেগেছে। তবে তিনি য়ুরোপের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেই সমমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

রেনেসাঁ প্রভাবিত পশ্চিম য়ুরোপের চিন্তন এবং মননপদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক গ্রহণ করেছিলেন। য়ুরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিপ্রেম, নরনারীর সমানাধিকার তাঁর ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ফলেই তিনি সামন্ততন্ত্রের খোলস ভেঙ্গে ব্যক্তিচিন্তার মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রেনেসাঁ-চেতনার সঙ্গে ভারতবোধের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণ মনুষ্যত্বে'র আদর্শ সমুজ্জ্বলভাবে দল মেলেছে।

সদা জাগ্রত মন দিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনি বিশ্ব-সংস্কৃতির মধুভাণ্ডার থেকে এত বেশি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দানের পরিমাণও যে সেখানে বিপুল হবে তাতে অবাক হবার কীই বা আছে।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সাম্রাজ্যবাদের প্রসার এবং তার ফলে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম, পরাধীন দেশসমূহের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তদুপরি পরপর দুটি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রবলের ক্ষোভ-প্রতিহিংসাকে তিনি জলন্তভাবে দেখতে পেয়েছেন। পরাধীন ভারতের বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ তাঁর বুকে অতি শৈশবেই বেজেছিল।

তারপর যতই বয়স বেড়েছে দেশপ্রেম মনে আরো প্রগাঢ়ভাবে ঘনীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম নিকষিত হেম যেন। দেশের প্রতি অন্ধ না হয়ে সত্তার আলোময় স্বরূপ দিয়ে দেশের মাটিকে এমনভাবে কেউ ভালোবেসেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। যাঁদের শতাব্দীব্যাপী দুঃখ-দুর্দশা তিনি চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন, ইতিহাসে পাঠ করেছেন, তাঁদেরকে হিংসার দিকে নয়, ঘৃণার দিকে নয়, শান্তি-লালিত উদার দিগন্তের পানে আপন বাণীর মন্ত্রশক্তিতে আকর্ষণ করার সে কি অনিদ্র প্রচেষ্টা! আপন দেশের হতভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে বিশ্বের হতভাগ্য দেশসমূহকে ভালোবেসেছেন। ফ্যাসীবাদ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, 'নাইট' খেতাব পরিত্যাগ করেছেন, শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরো কত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে সর্বপ্রকারের আত্মশ্লাঘা জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছিলেন। সেজন্য দেখি বৃদ্ধ বয়সের জড়তাকে উপেক্ষা করেও 'ব্রাত্য জাতহারা' রবীন্দ্রনাথ সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশ দর্শন করতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভাষা নদীর স্রোতের মতো, কেউ তাতে নিজের নাম লিখে রাখতে পারে না। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় নিজের নাম লিখে রেখেছেন। ভাষার মতো সংস্কৃতিকেও দেশসীমা, কালসীমার মধ্যে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না। অদল-বদল, রূপান্তরের মাধ্যমে ধাবমান হরিণীর মতো দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কালের বিবর্তনে জীর্ণ অংশ ঝরে যায়। নতুন প্রাণের স্পন্দনে নবাঙ্কুর গজায়। রবীন্দ্রনাথ অতীত বর্তমানের বিশ্ব-সংস্কৃতির স্রোতে অবগাহন করে তার প্রাণের শিখা ছেঁকে পরিশ্রুতভাবে প্রকাশ করেছেন। আপন বীণার মতো করে জীবন রচনা করেছেন। বিশ্বাভিসারী প্রাণের উদার আকুতি কর্মের পাষাণ-গলা স্রোতে ভাষায়িত করেছেন।

আমাদের আনন্দ, আমাদের গৌরব রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে মানুষের উপযোগী ভাষা হিসেবে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাই। রবীন্দ্রনাথের নাম মনে এলেই কিশোর-কবি সুকান্তের সে কয়টি পংক্তি বারবার মনে পড়ে যায় :

এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি
সোনার ফসল তুলে ধরে।

১৯৬৬

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ

একজন সাহিত্যস্রষ্টার সবচাইতে বড় হাতিয়ার তাঁর ভাষা। ভাষার মধ্যেই তাঁর প্রাতিস্বিকতার অনেকখানি নিহিত। একজন লেখক বা কবি যে ভাষারীতিটি প্রকাশমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তাতেই তাঁর সবটকু পরিচয় ফুটে ওঠে। সাহিত্যের প্রাণবস্তুর মধ্যে নতুন কোনো উপাদান যুক্ত হলে ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গীতে অবশ্যই তার ছাপ পড়বে। সাহিত্যের প্রাণ এবং প্রকাশরীতি এ দুটো কোনো আলাদা ব্যাপার নয়। 'পুরনো বোতলে নতুন মদ' পরিবেশন করার প্রচলিত প্রবাদটি সাহিত্যের বেলাতে কোনো অর্থই বহন করে না। নতুন সাহিত্যের নতুন প্রকাশরীতি চাই, নইলে নতুনকে চেনার উপায় থাকে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদী এ সকল ছন্দ তাঁর প্রতিভার প্রকাশমাধ্যম হওয়ার অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। কারণ মাইকেল প্রখর অনুভব শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যে নতুন মূল্যমান-সম্পন্ন কাব্য-ভাবনার বিকাশ ঘটাতে যাচ্ছেন বঙ্গদেশে প্রচলিত কাব্যভাষার মাধ্যমে তা আদৌ সম্ভব নয়। এই ভাষারীতি মাইকেলের জীবনানুভূতির মর্মবেগ ধারণ করার উপযোগী নয়। সেই কারণে মাইকেলকে নতুন একটি কাব্যভাষার কথা ভাবতে হয়েছিল। ভেতরের এই আত্যন্তিক সৃষ্টিশীল চাপ তাঁকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। সেই অপূর্ব ছন্দ-তুরঙ্গম ধারণ করার উপযোগী আনকোরা নতুন কাব্যভাষা তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছিল।

মাইকেল বঙ্গ-সাহিত্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলনারহিত জঙ্গমতার সৃষ্টি করেছিলেন। একেবারে কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে প্রহসন লিখে একটা হুলস্থুল কাণ্ডও ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি একথা বলা বোধকরি অসঙ্গত হবে না, মধুসূদনের যাবতীয় সাফল্য পরবর্তী বাংলা কাব্য বিকাশে খুব একটা ফলপ্রসূ প্রভাব রাখেনি। তবে তাঁর গদ্য রচনার কথা স্বতন্ত্র। মাইকেল প্রচলিত ভাষারীতিকে দুমড়েমুচড়ে ভিন্নরকম প্রকাশক্ষমতা-সম্পন্ন ভাষা-শরীর যে নির্মাণ করা যায় সেরকম একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করলেন। এ কৃতিত্ব মাইকেলের একার। বাংলা কবিতার পরবর্তী বিকাশে মাইকেলের প্রভাব রক্তসূত্রের মতো ক্রিয়াশীল থেকেছে, একথা বোধকরি বলা চলে না। অনন্য কাব্যসৌধ নির্মাণেই মাইকেলের শক্তি এবং মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল। তাঁর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভা কাব্যের যে আদর্শ নির্মাণ করল মাইকেল-পরবর্তী কবিকুল কেউ সে আদর্শ আয়ত্ত করতে পারেনি। তাঁর ভাষাশৈলী অনুকরণ-অনুসরণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মধ্যে এনেছিলেন দ্যুতি। তাঁর সাধনায় বাংলা কবিতার ভাষা বিমূর্ত ভাব এবং চিন্তা ধারণ করার মতো নির্ভারতা অর্জন করেছিল। তিনি বাংলা কবিতার জমিনে এতদূর নিবিড় কর্ষণ করেছিলেন, তার ফলে ভাষার সীমানার বিস্তার এবং সম্প্রসারণ ঘটেছে অনেকদূর। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলেন, যেখানে মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার, পণ্ডিতজনের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতজনের ভাষার, চিন্তার ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষার একটা সেতুবন্ধন রচনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বহুমাত্রিক প্রকাশভঙ্গীর বাহন করার যোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ভাষার মধ্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির সাবলীল স্ফূর্তির যে ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন, সেই বিষয়টা স্মরণে না রাখলে বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পূর্বাপর সম্পর্করহিত একটা খাপছাড়া ঘটনা মনে হবে।

My All Garbage

২

বাংলা কাব্যগগনে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নানা কারণেই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলা কবিতার বিকাশধারায় নজরুল একটা চমৎকার ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে বিষয়ে সাহিত্য-সমালোচকদের অনেকেই একমত। তাঁর সাধনার সিদ্ধির ব্যাপারে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার অবকাশ অল্পই আছে।

সে যা হোক, বর্তমান রচনাটি নজরুলের কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। সমস্ত সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও কবি হিসেবে, মানুষ হিসেবে, যুগনায়ক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই যে একজন অনন্য পুরুষ, এই অনন্যতার একটি পরিচয় তিনি কবিতা, গান, এমনকি গদ্য রচনায়ও যে ভাষারীতিটি ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নজরুলের ব্যবহৃত ভাষারীতিটির একটি ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু করে আধুনিক যে ভাষাটি গিরিগাত্রের সংকীর্ণা স্রোতস্বিনীর মতো বিকশিত হতে হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি এসে ভরা যৌবনা প্রমত্তা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পন্থার আকার ধারণ করেছিল, নজরুল ইসলাম সেই ভাষাতেই গান-কবিতা রচনা করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শুধুমাত্র এটিকেই কাজী নজরুল ইসলামের অনুসৃত ভাষারীতি বলে স্বীকার করে নিলে, আজকের দিনে আমরা নজরুল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলতে যে জিনিশটি বুঝি বা বোঝাতে চাই, তার ওপর সুবিচার করা হবে না।

সচরাচর সাহিত্য-সমালোচকেরা প্রায় সকলেই একটি অভিধা নজরুলের বেলায় প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এসকল বিভাষী শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ব্যাপারে নজরুলের দক্ষতা তাঁর সময়কার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা মোহিতলাল মজুমদার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। তবে এটা নিছকই বাইরের ব্যাপার, তারপরেও কিন্তু অনেক কথা থেকে যায়। নজরুলের আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের বেলায় তাঁর একটা গাঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে, কোনো কোনো সময় সেটা এক ধরনের অনমনীয় জেদ বলেও মনে হয়। মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তের কাছে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছিল এক ধরনের স্বাদ পাল্টানোর মতো ব্যাপার। কবিতার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বৈচিত্র্য এবং ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মোহিতলাল-সত্যেন দত্ত আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। প্রমথ চৌধুরী মশায় ফিরনির মধ্যে কিসমিসের মতো গদ্যের মধ্যে আচমকা দু-একটি আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করে যে ধরনের চমক সৃষ্টির ওস্তাদি দেখাতেন, অনেকটা সেরকম।

নজরুলের আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারেও চমক সৃষ্টি হত বটে, কিন্তু সে সকল শব্দ ব্যবহারের আরো গুরুতর কারণ কবির উপলব্ধির গভীরে প্রোথিত ছিল। যে সকল আরবী-ফার্সী শব্দ নজরুল ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হবে। কতিপয় আরবী-ফার্সী শব্দ তাঁর কবিতা-গানে একেবারে মনের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। আর কতেক শব্দ তিনি ভাষাজ্ঞানের জোরে বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। যে শব্দগুলো একেবারে তাঁর অস্তিত্বের ভেতর থেকে মাতৃভাষার মতো স্বাভাবিকতায় বেরিয়ে এসেছে সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে পড়ে পাওয়া শব্দগুলো এসে পোষ মেনেছে।

তাই মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছিল একটা নিরীক্ষার ব্যাপার মাত্র। কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল একটা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ। নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণে চলতি ভাষারীতির পাশাপাশি গৌণভাবে হলেও মুসলমান লিখিত পুঁথিসাহিত্যের ভাষাশৈলীটির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে পুঁথিসাহিত্যের ভাষার মধ্যে নতুন একটা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র সাহিত্যস্রষ্টার বিশেষ স্টাইল হিসেবে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com
My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চিহ্নিত করলে নজরুলের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হবে বলে মনে করি।

৩

আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা, তার সঙ্গে পুঁথিসাহিত্যের একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অতীতের পুঁথি-লেখকেরা বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার বিদেশী শব্দ মিশিয়ে এক সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সে সাহিত্যের বৃত্ত খুবই সংকুচিত ছিল। যথেষ্ট মৌলিকতার স্ফুরণও সে সাহিত্যে কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা এক কথায় 'বটতলার পুঁথি' আখ্যা দিয়ে সেগুলোর বিশেষ একটা শ্রেণী নির্ণয় করেছেন। সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে সারবান পদার্থ অধিক হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এগুলোর মূল্য যে অপরিসীম, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বপ্রথম হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাংলা কাব্য' গ্রন্থে পুঁথিসাহিত্যের এই বিশেষ দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাঙালী মুসলমান লিখিত পুঁথিসমূহে বাঙালী মুসলমান সমাজের মানস-জগতটির যথার্থ পরিচিতি ধরা পড়েছে। বাঙলার শ্রমজীবী-কৃষিজীবী আর মুসলমান জনগণের জীবন-জিজ্ঞাসা, মূল্যচিন্তা, বিশ্বাস-আচার রস-পিপাসা এসব বিষয় পুঁথিসমূহের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এক সময়ে বাঙলার গ্রাম মুসলিম জনগণের মধ্যে পুঁথিসাহিত্যের চর্চা ব্যাপকভাবে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণের যে প্রক্রিয়াটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শুরু হয়েছিল সেই বিশেষ সময়টিতেও দেখতে পাই, মুসলমান সমাজে পুরনো পুঁথি পঠিত হচ্ছে এবং লেখা হচ্ছে নতুন পুঁথি। তারপরে আধুনিক বাংলা ভাষা যখন সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের বাঙালী জনগণের ওপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, আমরা দেখতে পাই, সেই প্রক্রিয়াটিতে ছেদ পড়ে গেছে।

আবার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে দেখতে পাই কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ঠিক পুঁথি সাহিত্যের মতো অতটা শিথিল ঢালাওভাবে না হলেও আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করার একটা প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এই বিশেষ ঘটনাটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেশিরভাগ সমালোচক এটাকে নজরুল প্রতিভার বিশেষ দিক বলে চিহ্নিত করেছেন। কথাটা মিথ্যাও নয়। তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টির জন্য এটা লাগসই ব্যাখ্যা বটে। কিন্তু তাতে করে নজরুলের ভাষারীতির যে সমাজতত্ত্ব-সম্মত একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়, সে দিকটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নজরুলের সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়নের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পুঁথিসাহিত্যের প্রেক্ষাপটের বিষয়ে ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪

আমরা বাংলা ভাষার যে লেখ্যরূপটি ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে আমাদের জনগণের মুখের ভাষার বিরাট এক ব্যবধান রয়েছে। পৃথিবীর খুব কম ভাষার মধ্যে লেখ্যরূপ এবং মুখের ভাষার মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব বর্তমান। বাংলা ভাষার আদি বিকাশ-প্রক্রিয়ায় এই ফারাক ছিল না। আধুনিক ভাষার যে বিকশিত রূপ আমরা ব্যবহার করে থাকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে এই ভাষার প্রাথমিক রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন। এই ভাষাটিই নানারূপ পরিবর্তন এবং রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথী-তীরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটা সুন্দর সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ-সমন্বয়, মিলন-বিরোধের ইতিহাসই আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস। প্রতিভাধর এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধকদের চেষ্টা-প্রযত্ন এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে এই ভাষাটি ভাব-চিন্তা, অনুভব-বিভব ধারণ করার উপযোগী হয়ে উঠেছিল, তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তথাপি স্বীকার করতেই হবে, তামাম বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে একটি মুখ্য এবং অগ্রগণ্য কারণ বর্তমান ছিল; আর সেটি হলো শহর কলকাতার ভাষাটিই মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালী জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিল। ভাষায় এই বিকশিত রূপটি অগ্রাহ্য করার যেমন কোনো কারণ নেই, তেমনি অভিধান থেকে এই ভাষার জন্ম সে-বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা না থাকলে বাংলা ভাষায় বিকাশ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাই প্রথম আধুনিক ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। অধিকন্তু বাঙালী মনীষীবৃন্দের সৃষ্টিশীলতার ছোঁয়ায় এই ভাষা প্রাণবান, ভাবসমৃদ্ধ এবং অপূর্ব প্রকাশক্ষমতা-সম্পন্ন ভাষা হিসেবে বিশ্বমানবের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা ভাষার জন্য এ কম শ্লাঘার কথা নয়। তারপরেও কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে জনগণের মুখের ভাষার দূরত্ব কখনো ঘোচেনি। প্রাথমিক নির্মিতির পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের যে আত্মা ভাষার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিল তা ঝেড়ে ফেলা কখনো সম্ভব হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হয়ে যে রূপটি পরিগ্রহ করে আসছিল, আরবী-ফার্সী ভাষার শব্দ যেভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল, সে প্রক্রিয়াটি হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলা ভাষার সে রূপটির কিছু কিছু নমুনা এখনো একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। ড. আনিসুজ্জামান সাম্প্রতিককালে কিছু প্রমাণ তুলে ধরেছেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কবি ভারতচন্দ্রের মতো সংস্কৃত জানা লোকের পক্ষেও এই ভাষার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাঁকেও 'যাবনী মিশাল' ভাষায় কাব্য রচনা করতে হয়েছে। বাঙলা দেশে মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পরে, ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতে আরবী-ফার্সী ইত্যাদি শব্দ এসে মিশে যাচ্ছিল এবং ভাষার একটি নতুন চেহারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাষাকে নদীর সঙ্গে যদি তুলনা করতে হয়, মেনে নিতে হবে এটা একটা উল্লেখ করার মতো বাঁক।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার আরেকটা বাঁক সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা আরবী-ফার্সী শব্দাবলী সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত অভিমুখী একটি ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁদের সে প্রয়াস সবটুকু ফলবতী হয়নি। কিন্তু যে ঝোঁক এবং প্রবণতা তাঁরা ভাষার শরীরের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যদি পলাশীর বিপর্যয় না ঘটত, আজকের দিনে বাংলা ভাষার অন্যরকম একটি বিকশিত রূপ হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তবে 'যদি' আর 'কিন্তু' নিয়ে তো আর আলোচনা চলে না, যা ঘটেছে তা-ই সত্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা ভাষা কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঙালী জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারেনি। এই ভাষার বলয়টি ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং সঙ্কুচিত। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, সংখ্যাল্প সাক্ষরতা ইত্যাদি নানা কারণ নতুন নির্দেশিত ভাষাটিকে একটি বিশেষ সীমারেখার বাইরে অনেক দিন পর্যন্ত বিকশিত হতে দেয়নি। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, আধুনিক শিক্ষার দুয়ার যাদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল, তারা পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে যে ভাষাটি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, পুঁথিসাহিত্যের ভাষার মধ্যে তার কিছু প্রমাণ মিলে। ভাষার সামাজিক চর্চার ওপর নির্ভর করেই তো সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে। একেবারে সামাজিক সম্পর্ক বিরহিত সাহিত্যের ভাষার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিম সমাজ যখন আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তারা কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষাটিকে গ্রহণ করেছে। তার পরেও একটি কথা বলা যায়, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজকের দিনেও পুঁথিসাহিত্য আবেদন হারিয়ে ফেলেনি। সুতরাং জনগোষ্ঠীর ভেতর ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি সমান্তরাল ভাষারীতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে শক্তিমান মুসলমান লেখক মশাররফ হোসেন 'শহীদে কারবালা' পুঁথিটির একটি আধুনিক গদ্য-সংস্করণ রচনা করেছিলেন। লেখক নিজে সে গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'বিষাদ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সিন্ধু'। মুসলমান সমাজে পুঁথির প্রভাব যে কতটা ছিল 'বিষাদ সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা থেকে তা অনুমান করা যায়।

মুসলমান সমাজের যে সকল লেখক বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষাটিকে প্রকাশমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মীর মশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, মওলানা আকরম খাঁন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের সকলকেই নগর-লালিত ভাষাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমনকি ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ঘটানোর মানসে যে সকল বই-পুস্তক রচনা করা হয়েছে, তার সবগুলোতেও ঐ ভাষারীতিরই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

পাছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পাঠকেরা উপহাস করতে পারেন, এই হীনম্মন্যতা থেকেই কি মুসলমান লেখকেরা আপন সমাজে, পরিবারে, সংসারে সচরাচর ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দসমূহ তাঁদের রচনায় যতটা সম্ভব পরিহার করতেন? বঙ্কিমচন্দ্র মীর মশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না'। এটাকেই গ্রন্থ রচনার সবচাইতে বড় প্রশংসা বলে মুসলমান লেখকেরা কবুল করে নিয়েছিলেন।

মুসলিম লেখকেরা অবশ্য কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষারীতি গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সব দেশেই ভাষার সর্বাধিক বিকশিত রূপটিকেই তাঁদের লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন লেখকরা। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নেতা বলে স্বীকৃত লেখক-কবিরাও তাই করেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের বেলায় একটা ভিন্ন রকমের ব্যাপার ঘটে গেল। তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী এবং উর্দু শব্দাবলী প্রাণ-পাতালের উত্তাপে যেন ভাপিয়ে উঠতে থাকল। এটা কেন ঘটল, নজরুল ইসলাম এ সকল শব্দ কেন ব্যবহার করতে থাকলেন, জানা মতে কোনো লিখিত কৈফিয়ত তিনি কোথাও দেননি। যদি তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হত সম্ভবত আত্মপক্ষ সমর্থনে এ জাতীয় কথা তিনি বলতেন — মুসলমান সমাজে পেঁয়াজ-রসুনের চল আছে! তাই মুসলমানের রচনায় পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ থাকবেই। সেটা গোপন করা কোনো ভালো কাজ নয়। কারো নাসারন্ধ্রে সেজন্য যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, করার কি আছে! এমনকি সে নাসারন্ধ্র স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও হতে পারে। তারপরেও তো একটি সমাজকে তার আত্মপরিচয় ফুটিয়ে তুলতে হবে। পুঁথিসাহিত্যের ভাষা নিয়ে কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা যতই নাসিকাকুঞ্চন করুন না কেন, এই ভাষাটি কদাপি উর্দু, আরবী এবং ফার্সী ভাষা নয়। এটা বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ ফলিত রূপ। একটি সমাজের মধ্যে তার যথেষ্ট আদর রয়েছে এবং সেই বিশেষ সমাজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাসমূহ এই ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ইসলাম সাহিত্যে নাসিকা-সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ তিনি অধিকহারে ঐ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে থাকলেন। তাঁর দক্ষতা সুফলপ্রসূ হয়েছিল। সর্বশ্রেণীর পাঠক ক্রমে 'যাবনী মিশাল' ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। হিন্দু সমাজের অগ্রণী সাহিত্যিকেরা এই অভিনব ক্ষমতা প্রকাশের জন্য নজরুলকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তাঁরাই ছিলেন তাঁর সাহিত্যের প্রাথমিক সমঝদার। আর মুসলমান সমাজের চেনাজানা মানুষদের অনেকে, যাঁরা ঘরে-সংসারে উচ্চারিত শব্দসমূহ প্রকাশ্যে উচ্চারণের দুঃসাহস কখনো প্রদর্শন করেননি তাঁদেরই একাংশ, মহাসমারোহে নজরুলকে 'কাফের' ফতোয়া দিতে এগিয়ে এলেন। সেই মূঢ়তার আলোচনা অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

৫

নজরুল ইসলামের আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারের মধ্যে অতীতের পুঁথিসাহিত্যের নবজীবন দানের ইশারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নজরুল পুঁথি লেখেননি। আধুনিক যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন। শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াসের ফলে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা ভাষারীতিকে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে বাংলা ভাষাকে জনগোষ্ঠীর সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল ভাষা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এতে তিনি যে সফলতা লাভ করেছিলেন, এক কথায় তাকে অতুলনীয় বললে অধিক বলা হবে না। নজরুল মুসলমানদের ঘরে-সংসারে ব্যবহৃত শব্দসমূহ ব্যবহার করে এমন একটা প্রক্রিয়া সূচনা করলেন, যার ফলে বাংলা ভাষার অভিধান-সংকলকদের প্রতি নতুন সংস্করণে নতুন-নতুন শব্দ সংযোজনের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। এটা নজরুল ইসলামের একটা বড় কৃতিত্ব।

সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে এই ভাষারীতি ব্যবহারে নজরুলের সাফল্যের পিছনে দুটি কারণ বর্তমান। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সময়ে এসে বাংলা ভাষা যে গতিময়তা অর্জন করেছিল নজরুল ইসলাম এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন। বাংলা ভাষা যে সর্বাধিক শব্দসম্ভার সংস্কৃত থেকে ধার করেছে, সে দিকটিতে নজরুল সজাগ এবং ওয়াকেবহাল ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, এমনকি ইচ্ছা করলে অন্য কোনো বিদেশী ভাষার একটি শব্দও ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত-প্রধান বাংলা গান, কবিতা, গদ্য সৃষ্টি করতে পারতেন: নজরুলের সাহিত্য-সঙ্গীতে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। নজরুল যদি পুরোপুরি এই ভাষারীতি অবলম্বন করে সাহিত্য-সঙ্গীত সৃষ্টি করতেন, তাহলে আজকে তাঁর সাহিত্যের রস গ্রহণ করার জন্য ভিন্ন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মানদণ্ড নিরূপণের প্রয়োজন হত।

দ্বিতীয়ত, কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সমাজে আত্মগোপন করে থাকা পুঁথি-সাহিত্যের ভাষারীতির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একটা উল্লেখযোগ্য সময় তাঁকে এই পুঁথিসাহিত্যের পরিমণ্ডলে কাটাতে হয়েছে। এই সাহিত্যের শৈল্পিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা তাঁর গড়ে উঠেছিল। সমাজের যে অংশের মানুষের মধ্যে এই সাহিত্যের চল্ ছিল, সেই মানুষদের মানস-জগৎ এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি জানতেন। সর্বোপরি বোধবুদ্ধিতে পরিপক্কতা অর্জনের পূর্বে এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি একটা অনপনেয় শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোই হল আসল কথা। নিজের সমাজের চর্চার জিনিস কিছুতেই ফেলনা হতে পারে না। বাকরুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে এ বোধ আমরা লালন করতে দেখি।

নজরুল সাহিত্যে বাংলা কাব্যভাষার যেমন সৃষ্টিশীল প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি এই পুঁথিসাহিত্যের ভাষাটিও সৃষ্টিশীল নির্বাচনের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জনের পর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। নজরুল পুঁথিসাহিত্যের প্রাণের আগুনটুকু গ্রহণ করেছেন, তার জীর্ণ কঙ্কাল বহন করেননি। তাই নজরুল সাহিত্যে পুঁথিসাহিত্যের জীবাশ্ম দৃষ্টিগোচর হলেও সেই ভাষা-কাঠামো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁথি-লেখকেরা বাঙালী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা উজ্জ্বল করে দেখার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ভাষারীতি তৈরি করেছিলেন। নজরুল স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী এই মুসলিম সমাজটিকে বাঙালী সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই ঐ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

নজরুল উর্দু ভাষায় গজল ও গান লিখেছেন। রাজা নওয়াব আলী রচিত সঙ্গীত বিষয়ক আকরগ্রন্থ 'মারিফুন্নাগামাতে'র অংশবিশেষের স্বচ্ছন্দ বাংলা তর্জমা করেছিলেন। ভাষার ওপর কিরকম দখল থাকলে এরকম একটি দুরূহ গ্রন্থের এমন সাবলীল অনুবাদ করা যায়, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের গজল-রুবাই-এর মূল ফার্সী থেকে তিনি বাংলায় কাব্যিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং ফার্সীর ওপর নজরুলের পরিপূর্ণ দখল ছিল, এটা অনুমান এবং কল্পনার বিষয় নয়। হিন্দী ভাষায় রচিত নজরুলের ভজন নেহায়েত কম নয়। ভাষাটি না জানলে শুধুমাত্র স্মৃতি এবং শ্রুতির ওপর ভরসা করে ভজন রচনা সম্ভব নয় বলেই ধারণা করি। নজরুল আরবী গানের সুরে বাংলা গান লিখেছেন। আরবী ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছেন। ভাষাটি তিনি কতটা জানতেন, সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে ভাষার ওপর বিশদ অধিকার না থাকলেও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নজরুলের ছিল, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি ভাষা জানতেন, এটা আমাদের কাছে একটা সংবাদ মাত্র। এই ভাষাজ্ঞান দিয়ে তিনি সাহিত্যের কায়া এবং প্রাণের মধ্যে একটা নতুন সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারটি কদাচিৎ আমরা চিন্তা করে দেখি। সে যা হোক, আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে— আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় নজরুলের সমধিক অধিকার ছিল এবং সেই কারণে পুঁথিসাহিত্যের ভাষায় নতুন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তাঁর পক্ষে কোনো অসম্ভব বা কঠিন কর্ম ছিল না।

সেই সময়টার কথাও মনে রাখতে হবে। ইতোমধ্যে সমাজ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। হিন্দুসমাজের ভেতর উদারতা এবং মেনে নেয়ার শক্তি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুসলমান সমাজের ভেতরে একটা জঙ্গমতা সৃষ্টি হতে চলেছে। এই সময়ে নজরুলের আরবী-ফার্সী ভাষার শব্দমিশ্রিত কবিতা-গান যখন প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে, হিন্দুসমাজের প্রাগ্রসর ব্যক্তিবৃন্দ সাহিত্যে নতুন উপাদান সংযোজন করার জন্য নজরুলকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর মুসলমান সমাজের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা নজরুলের কবিতায় তাদের ব্যবহারিক জীবনের নিত্যব্যবহৃত শব্দসমূহের অকুণ্ঠিত, অসংকোচ প্রয়োগের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে আপন ঘরের মানুষ হিসেবে চিনে নিলেন।

নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাহীন পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাঙলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মাণ করেছিলেন।

৬

বাঙালী মুসলমান সমাজের ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতি-চিন্তার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য বর্তমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার হওয়ার পূর্বে এখানকার যে স্থানীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তার স্রোতধারার ভেতরে ধর্ম-ভাবনা পুরোপুরি অবগাহন করতে পারেনি। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মচিন্তার একটা বিরোধ বরাবর থেকে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান সমাজে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। যেমন ইরানে ইসলাম প্রসারের পরেও ইরানী জনগণ প্রাক-ইসলামী যুগের উৎসব-আচার, জাতীয় গর্ববোধ কোনকিছু পরিহার করেনি। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দু-ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম চমৎকার মিলেমিশে সহাবস্থান করছে অদ্যাবধি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নিশানবাহী বিমান সংস্থাটির নাম 'গরুড়'। প্রতি বছর সে দেশে জাতীয়ভাবে রামায়ণ উৎসব পালন করা হয় এবং জনগণ হিন্দু-ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করেন। মুসলিম সন্তানের সংস্কৃত নামকরণ করতে তাঁদের বাধে না। ইরানে দেখা গেছে ইসলাম পাকাপোক্তভাবে চালু হওয়ার পরেও ইরানী মহাকবিরা অগ্নি-উপাসক পারসিক নরপতিদের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করে আরব আগ্রাসনের প্রতিবাদ করছেন।

বাঙলা মুলুকেও ধর্ম-সংস্কৃতিতে এক ধরনের সংশ্লেষ যে ঘটেনি সে কথা সত্যি নয়। কিন্তু তার মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। খুব সম্ভবত মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুদের অনুপাতে কম ছিল বলে এবং গোটা সমাজের অর্ধাংশেরও বেশি মানুষ অমুসলিম থেকে যাওয়ার কারণে ক্ষেত্রজ সংস্কৃতিটিকে সবসময় সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অভিভাবকেরা সকল সময়ে স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে শেরক এবং মূর্তিপূজার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাঙালী মুসলমান সমাজে মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ, দুই ঈদের জামাত, নবীর দরূদ পাঠ, কোরআন খতমের আয়োজন করা — এ সকলই ছিল সংস্কৃতিচর্চার অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রসম্মত বিষয়। শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ আরবী ভাষার মাধ্যমে পালন করা হত, যার এক বর্ণও আম-জনগণ বুঝতে পারত না। এই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জীবনের প্রতি অস্তিবাচক কোনো সৃষ্টির প্রত্যাশা করা একরকম অসম্ভব। সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের আরবী-ফার্সীতে কোনো অধিকার ছিল না। অভিজাত মুসলমানদের সমাজে হয়তো কিছুটা আরবী-ফার্সীর আংশিক অধিকার ছিল। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের পথ সুগম ছিল না। তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন না। আর সাধারণ মুসলমানদের প্রায় শতকরা একশ ভাগই বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতে পারত না।

পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। আপদকালে সামাজিক নেতৃত্ব নির্মাণ করার যে দায়িত্ব অভিজাত নেতৃশ্রেণীর থাকে, ভাষাগত কারণে মুসলমান অভিজাতরা তা করতে পুরোপুরি অসমর্থ ছিলেন। উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজ যেরকম একজন স্যার সৈয়দ আহমদের মতো সংস্কারক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল, কিংবা বাঙালী হিন্দু সমাজ যেমন বিদ্যাসাগর-রামমোহনের আবির্ভাব সম্ভাবিত করেছিল, বাঙালী মুসলমান সমাজে তেমন একজন ব্যক্তিত্বের উত্থান ছিল সামাজিক কারণেই এক রকম অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাঙালী অভিজাত মুসলমান সমাজের পক্ষে একজন সৈয়দ আমির আলীর জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছিল। সৈয়দ আমির আলী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল না। তাঁর সমস্ত রচনা তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ যুক্তিবাদিতা এবং মনীষার প্রকাশ দেখা যায়, যদি তিনি বাংলা ভাষায় লিখতেন বৃক্ষ-সমাজের মতো অনড়-স্থবির মুসলমান সমাজের মোহনিদ্রার অবসান আরো তাড়াতাড়ি ঘটত। কিন্তু তা ঘটতে পারেনি।

বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রাগ্রসর ওহাবী, ফরায়েজী আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এগুলো ভাবগত দিক দিয়ে ছিল চূড়ান্ত পশ্চাদ্মুখী। যেহেতু কখনো রাজা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সামাজিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের জন্ম হয়নি, তার ফলে মুসলমান-সমাজের ভেতরের অন্ধকার কাটেনি। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল লেখক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখালেখি করছিলেন, একদিকে ব্রিটিশ এবং অন্যদিকে নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ, এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তাঁরা রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে অতীত মুসলিম গৌরব রোমন্থন করছিলেন।

মোল্লা এবং পীরেরা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। শরীয়ত পুঙ্খানুরূপে পালন করা হলো কি না সেটাই ছিল মুসলিম সমাজের ধ্যানজ্ঞান। ইসলাম ধর্মের আধুনিক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানববাদী ব্যাখ্যা অনায়াসে তৈরি করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেকালে একজনও সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন কামেল মানুষ ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইউরোপে রেনেসাঁ থেকে রিফরমেশন পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে ধর্মের মানববাদী ব্যাখ্যা নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং সমাজের চিন্তার মধ্যে যে ধরনের সংস্কার আনতে চেষ্টা করেছিলেন সেগুলো যে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ-পুরাণ বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মুখ্য কর্ম। ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার যদি তাঁরা না করতেন তাহলে যেটুকু সাফল্য তাঁদের জুটেছিল, সেটুকু সম্ভব হত না। নবযুগ ইসলাম ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দাবী করছিল। কিন্তু ব্যাখ্যাকার কেউ ছিলেন না। পীরের বাক্য, মোল্লার নসিহত কিংবা পুঁথির উপকথার মধ্যেই মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রথম কোরআন এবং হাদীস শরীফের অনুবাদক ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র।

৭

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মুখ্যত কবি এবং সঙ্গীত-শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে সমাজ-সংস্কারমূলক কোনো সুবলয়িত তত্ত্ব পাওয়া না গেলে আশাভঙ্গের বেদনা ঘটার কারণ নেই। তবু আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয়, এই মুসলিম সমাজটা নিয়ে তিনি খুবই গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। গোটা সমাজের মানসিক কূর্মবৃত্তি এবং আত্ম-অবিশ্বাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে বারংবার তিনি ফুঁসে উঠেছেন। যদি তিনি স্থিত-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতেন, যদি তাঁর বিজ্ঞান-নির্ভর বিশ্লেষণী প্রতিভা থাকত, তবে সামাজিক দায়িত্ব তিনি অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে সমর্থ হতেন। নজরুলের যা ছিল না, অথচ থাকলে ভালো হত, ও নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। তথাপি সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাঁর একক চেষ্টায় মুসলিম সমাজের ভেতরে যে ভাবাবেগ তিনি জাগাতে পেরেছিলেন, যে আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কোনো মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তির তুলনা হয় না। এই সমাজটিকে ভেতর থেকে বিকশিত করে তোলার জন্য এক আত্মভোলা, খেয়ালী, দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামরত কবির পক্ষে যতটুকু দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল, তার চাইতে অনেক গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্দিষ্ট করে কি ছিল বলা মুশকিল। ১৯২০ সালে কলকাতায় ফিরে আসার পর প্রথমদিকে খেলাফত আন্দোলনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর আকর্ষণ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে নজরুল তাঁর লালিত আদর্শের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। জীবনের এই পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ আদর্শের অনুসারী হতে দেখি। আবার, অনতিবিলম্বে গান্ধীর রাজনীতির প্রতি তার যাবতীয়

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শ্রদ্ধাবোধ অবসিত হয়ে আসে। অতঃপর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ একান্তভাবেই 'সাম্যবাদ'। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে তাঁর মনের অনেকখানি মিল হয়েছিল। নজরুল সাহিত্যে গণমানবের মুক্তির উদগ্র যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অনুরাগ না জন্মালে সেটা সম্ভব হত না। কিন্তু এই মিলের পেছনে যতটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল, ততটা সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনার সমর্থন ছিল না। শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখি তিনি নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির প্রার্থী হয়েছেন। আসলে নজরুলের সুচিন্তিত তেমন কোনো রাজনৈতিক মতামত ছিল বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি অন্তরের অপরিমেয় আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

তবে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে নজরুলের দু'ধরনের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্যে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। আর মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতর থেকে একটা জঙ্গমতা সঞ্চার করার জন্য তিনি সদা তৎপর ছিলেন। নজরুল-গবেষক কবি আব্দুল কাদির বলেছেন, মোস্তফা কামালের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ নজরুলের মন কেড়েছিল। তুর্কী সমাজের জন্য মোস্তফা কামাল যা করেছিলেন, নজরুল আন্তরিকভাবে বাঙালী মুসলমানের জন্য অনুরূপ কিছু করার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁর কবিতা, গদ্য রচনা, অভিভাষণ, চিঠিপত্র — এসবের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে।

My All Garbage

কাজী নজরুল ইসলাম যে ইসলামী বিষয় নিয়ে অনেক কবিতা এবং অসংখ্য গান লিখেছিলেন এটা আকস্মিক খাপছাড়া কোনো ব্যাপার নয়। নজরুলের একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। নজরুল ইসলাম, ইসলাম ধর্ম এবং বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক ব্যবধানটুকু যথাসম্ভব কমিয়ে আনার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত বিষয় মুসলমানদের প্রিয়, যেগুলো নিয়ে বাঙলার মুসলমান সংগত কারণে গর্ব করতে পারে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উদ্ভাসন না ঘটালে ভেতরে একটা তাড়না সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাঁর রচিত 'মহররম', 'কোরবানী', 'ফাতেহা-দোয়াজদোহাম', 'কামাল পাশা', 'উমর ফারুক' এ সকল কবিতা তিনি সে কারণে লিখেছেন। কোরআনের আংশিক অনুবাদ এবং মুহম্মদের জীবন নিয়ে কাব্য সেই জন্য তিনি রচনা করেছিলেন। হাফিজ, খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যে হীনম্মন্যতাবোধের শেকড় প্রোথিত ছিল তার সেই মূলে আঘাত করে মুসলিম তরুণদের সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস তিনি করে গেছেন। নজরুলের এই প্রয়াস কতটা সঙ্গত ছিল এবং তা করতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা কিছু পরিমাণে হলেও অপচিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ কেউ নজরুলকে ধর্মীয় আদর্শের লাশ বহন করেছেন বলে অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তার তো কোনো তুলনা হয় না।

ধর্মের যে উদার এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা নজরুল তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপস্থিত করেছিলেন, তার সঙ্গে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার-প্রয়াসের অল্পমাত্রায় হলেও তুলনা করে দেখতে চাই। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের একেকটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল। নজরুলের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ছিল না, থাকার কথা নয়। নজরুল ছিলেন কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর কাজ একটা বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করা, জীবনের প্রতি একটা স্বচ্ছ অঙ্গীকারবোধ জাগিয়ে তোলা। সে কর্মটি নজরুল অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পালন করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কতিপয় বিষয়ে তাঁর স্থিরবুদ্ধি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বাঙালী মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ তার একটি। আমরা জানি, নজরুলের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল। আর তাঁর সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। নতুন কোনো মৌলিক চিন্তা তিনি সমাজের কাছে হাজিরও করতে পারেননি। কিন্তু চিত্তের এমন একটি আবেগ, এমন একটি সহজ-সরল কাণ্ডজ্ঞান তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সদূরপ্রসারী হয়েছে। তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ সংস্কৃতি-চর্চার একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ শিল্প এবং সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মতো আর কারো কাছে অত বিপুল পরিমাণে ঋণী নয়।

১৯৯০

আহমদ ছফার প্রবন্ধ
(২০০০)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চরিত্র

বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির কোনো জুড়ি নেই। এই উপন্যাসের একটি চরিত্রে মানিকবাবু যে সুগভীর ইতিহাসবোধ, জীবন-অভীপ্সা এবং মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, বোধকরি চরিত্র-সৃজন-কুশলতায় তারও কোনো জুড়ি নেই। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির কথা উঠলেই কুবের, মালা, কপিলা, রাসু, গণেশ ইত্যাকার মানুষদের মুখগুলো আপনা-আপনিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মানিকবাবু তেমন শিল্পী (বিশেষ করে 'পদ্মানদীর মাঝিতে') যা স্পর্শ করেছেন, জীবন্ত করে তুলেছেন। ক্ষিপ্রটানে একেকটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রমত্তা পদ্মা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক তাণ্ডব, ঝড়, বন্যা, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর বিস্তার, এমনকি সে আকুরটাকুর গ্রামের শ্যামাদাসের বাড়ির গম্ভীর পাঁঠাটি পর্যন্ত আশ্চর্যরকম জীবন্ত। যে নৈসর্গিক পটভূমিকায় জীবন-সংগ্রামে কাতর মানুষগুলোকে তিনি স্থাপন করেছেন; সেই নিসর্গ যেমন ভীষণে-সুন্দরে জীবন্ত, তেমনি জীবন্ত বিচিত্র আবেগের মানুষগুলো। কেউ বাড়তি নয়, কোনো ঘটনা বাহুল্য নয়, কোনো দৃশ্যপট অতিরিক্ত নয়। তাই উপন্যাসটির কথা উঠলেই সবকিছু মনে পড়ে যায় এবং সব মিলিয়েই উপন্যাসটি। যার যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকু আয়তনের মধ্যেই লাগসই ভাবে বসে গেছে। কুবের-মালা-কপিলা-রাসু এসব চরিত্রের ক্রমিক উন্মোচনের মধ্যে যে হৃদয়-ভাবনার উৎসার হয়েছে, গভীরতম চিন্তাটি পর্যন্ত পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে উপস্থাপনার বাস্তবতা এবং শিল্প-সৌকর্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব।

উপস্থিত মুহূর্তে আমরা তাঁর 'হোসেন মিয়া' চরিত্রটির প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকাবার চেষ্টা করছি। বেবাক বাংলা সাহিত্যে এমন আশ্চর্য চরিত্র আর কোনো শিল্পী সৃষ্টি করেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু অন্তর্দৃষ্টি, শুধু জীবনবোধ কিংবা লেখকসুলভ নির্লিপ্ততা, লেখার রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শন অথবা মানবচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই এরকম একটা চরিত্র সৃষ্টি করা যায় না। আরো অধিক কিছুর প্রয়োজন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সমস্ত উপন্যাসে যদিও 'হোসেন মিয়া'র উপস্থিতি অধিক নয়, তবুও 'হোসেন মিয়া'ই উপন্যাসটির প্রাণ। কিন্তু তাই বলে 'হোসেন' উপন্যাসটির নায়ক নয়। নায়কের যে আবেগ থাকে, দুর্বলতা থাকে, হোসেনের চরিত্রে তাঁর ছিটেফোঁটাও নেই। ইলিয়ড মহাকাব্যে দেবরাজ জিউসের নির্দেশে যেমন সবকিছু একের পর এক ঘটে যাচ্ছে – বিজয়ী-বিজিত, হত এবং হন্তা শুধু নিমিত্ত মাত্র, সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই মহা ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন দেবতার চূড়ান্ত ইচ্ছারই বিজয় সূচিত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তেও পাদপ্রদীপের একটু পেছনে দণ্ডায়মান মিঠেমিঠে বুলি এবং গুছিগুছি দাড়িবিশিষ্ট এই শান্ত ,একেবারে অনুত্তেজিত মানুষটিও সেরকম শক্তির অধিকারী। তার প্রকাণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রবল বাধ্যবাধকতা পদ্মার তীরবর্তী জেলে-সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়, তারা কেউ সে নিগড় ছিন্ন করতে পারে না। এই মহাস্বাপ্নিকের স্বপ্ন সফল করার জন্য আনন্দ-বেদনা-স্পন্দিত প্রেম-ভালোবাসা-কল্লোলিত অন্তর নিয়েই স্বেচ্ছায় হোসেন মিয়ার কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয় অথবা তাঁদের বেঁচে থাকবার গভীর আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে বাধ্য করে হোসেন মিয়ার কাছে যেতে। পদ্মাপারের এই এক টুকরো পৃথিবী, যেখানে জেলে-সমাজের বসবাস, মায়ামমতা, ঝগড়া-বিবাদ এবং প্রাণধারণের সমূহ আর্তি গভীর করুণ সুরে বেজে ওঠে, তা যখন কোনো কারণে দৃষ্টিসীমানা থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়, বিশাল পৃথিবীর অন্য কোনো স্থান, অন্য কোনো জনপদ তাদের দৃষ্টিতে নিবাসভূমি হিসেবে ভেসে ওঠে না; জঙ্গলাকীর্ণ, বাঘ-সিংহে ভরা, লোনাজল-বেষ্টিত উষর-অনুর্বর ময়নাদ্বীপের ছবিই চোখে-চোখে দৃশ্যমান হয়। সেখানে যাবার দুঃস্বপ্ন তাদের পেয়ে বসে এবং শেষপর্যন্ত যেতেও হয়। হোসেন মিয়া এই ময়নাদ্বীপের রাজা এবং আবিষ্কারক দুই-ই।

হোসেন মিয়ার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন লেখক। তার বাড়ি ছিল নোয়াখালী অঞ্চলে। বেশ কয়েক বছর আগে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে সে আসে এবং সে সময়ে জহুর মাঝির বাড়িতে আশ্রিত হিসেবেই ছিল, অন্যান্য মাঝিদের সঙ্গে মাঝিগিরি করেই জীবিকা নির্বাহ করত। এ কয় বছরে সে বেজায় ধনী হয়ে উঠেছে। এখন দাড়িতে মেহেদীর রং লাগায়, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী শরীরে চড়ায়, মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই দু'নম্বরের স্ত্রীকে বিয়ে করে এনেছে। ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে জেলেপাড়ার লোকেদের সঙ্গে আগের মতোই মেলামেশা করে। ধনসম্পদ হাতে এলে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্মত্ত মোহ মানুষকে পেয়ে বসে, হোসেন মিয়ার মধ্যে তার কণামাত্রও নেই। বড়লোকের সঙ্গে সে ব্যবসা করে, সমাজ করে না। আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন লেখক, হোসেন মিয়া একজন স্বভাবকবি। ঘটনাচক্রে যদি হোসেনের জীবনধারা বদলে না যেত তাহলে অনায়াসে কবিত্বশক্তির বলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজন সাধুপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারত। 'লালন শাহ', 'হাসন রাজার' মতো তারও অনেকগুলো রচনা পল্লীগ্রামের গীতিসংগ্রহে স্থান করে নিত। আশেপাশের দশ গ্রামের মানুষ জাগতিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় কবরে ভক্তিভরে মোমের প্রদীপ জ্বালাতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে হোসেনকে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অন্য জীবন বেছে নিতে হয়েছে। তাই বলে তার কবিত্ব শক্তির উৎস একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এখনও সে ইচ্ছে করলে মুখেমুখে চমৎকার গান রচনা করতে পারে। তার আত্মপ্রত্যয়ের জুড়ি নেই। তাই হোসেন যখন বলে, খুশি হলে সে সব করতে পারে, একটুও অস্বাভাবিক শোনায় না। অপরিসীম আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন, নানা গুণে গুণান্বিত হোসেন মিয়ার আত্মসংযমেরও তুলনা নেই। কেউ তার ক্ষতি করলে শাস্তি সে দেয় কিন্তু কখনো কোনো ব্যাপারে তাকে রাগ করতে দেখা যায়নি।

হোসেন মিয়া পাকা মাঝিও বটে। এত নির্ভাবনায় সে গভীর সমুদ্রে নৌকায় হাল ধরে বসে থাকতে পারে, পদ্মাপারের বংশ-পরম্পরা মাঝিও হোসেনের হেকমত দেখে চমকে যায়। সে ম্যাপ দেখে দ্বীপের অবস্থা নির্ণয় করতে জানে। রাতের তারার গতিপথ দেখে সময় কত বলতে পারে। দিক নির্ণয়ের কাজে কম্পাস ব্যবহার করতে জানে নির্ভুলভাবে। চাটগাঁয়ে সাহেব কোম্পানীর জাহাজে চাকুরী করার সময় যন্ত্রপাতি চালনার বিদ্যা এত গভীর অনুরাগ নিয়ে শিক্ষা করেছে যে, ইচ্ছা করলে হোসেন একখানি জাহাজ নিয়ে সমস্ত পৃথিবী একাকীই ঘুরে আসতে পারে।

হোসেন মিয়ার বাড়ি নোয়াখালী। মাঝখানে অনেক বছর জাহাজে সে চাকুরী করেছে এবং বর্তমানে পদ্মাপারের কেতুপুর গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মাঝিদের সঙ্গেই তার সমাজ।

সংকীর্ণ পৃথিবীর এই অধিবাসীরা অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন হোসেন মিয়ার সাথে ঠিক মিশতে পারে না। কিন্তু তাদেরকে তার কাছে যেতেই হয়। হোসেন যদিও বলুক না কেন সে হৃদয়ের মধ্যিখান থেকে তাদের পিয়ার করে, তথাপি মজ্জাগত আদিম অসহায়তার ভীতি তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না। যন্ত্রের মতো নিখুঁত, দেবতার মতো পারঙ্গম এবং জীন-পরীর মতো রহস্যময় হোসেন মিয়ার কথায় সায় দিলে, তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে যে একদিন অমঙ্গল এসে তাড়া করবে তারা বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের নিয়তিই এমন যে তারা যেন হোসেনের কথায় সায় দিতে এবং তার নির্দেশ পালন করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে।

বহিরঙ্গের দিক দিয়ে দেখলে হোসেন নোয়াখালী জেলার মুন্সী-মোল্লা জাতীয় মুসলমান। সে মুন্সী-মোল্লার মতো কথা বলে, পোশাক পরে, দাড়ি রাখে, আবার দাড়িতে নুরে মেহেদীর রংও লাগায়। এ হলো বাইরের ব্যাপার। ভেতরের মানুষটি ঠিক একেবারে অন্যরকম। হোসেনের মধ্যে ধর্মীয় কোনো সংস্কারের সামান্য আঁচড়ও নেই। এ নিয়ে সে কোনো কথাই বলে না। সে শুধু বোঝে তার জন্য কোন্‌টা সুবিধার, কোন্‌টা অসুবিধার। জগৎ এবং জীবনকে সে যে দৃষ্টিতে দেখে তার সঙ্গে অন্য দশজন প্রাচ্য দেশীয় মানুষের দেখার কোনো মিল নেই।

আজিজ সাহেব প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি ময়নাদ্বীপে মসজিদ স্থাপন করে এবং হিন্দুদের জমি দেয়া বন্ধ করে তাহলে বসবাসকারী সংগ্রহের কিছুই অসুবিধা হবে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হোসেন সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। গ্রহণ না করার পেছনে কারণ হলো, মুসলমানদের জন্য যদি মসজিদ বানিয়ে দেয়, তাহলে হিন্দুদের জন্যও মন্দির বানিয়ে দিতে হবে। আর হিন্দুদের যদি সে না নিয়ে যায়, তাহলে এগারো মাইল দীর্ঘ এই দ্বীপ সে কিভাবে মানুষ দিয়ে পূরণ করবে। তাই হোসেনের যুক্তি হলো, মন্দির-মসজিদ ওসব ফ্যাসাদে গিয়ে কাজ নেই। ওসব ছাড়াই চলবে ময়নাদ্বীপ। ময়নাদ্বীপ আবাদ করে বসবাস স্থাপন করার সঙ্গে মন্দির-মসজিদের কোনো ব্যবহারিক সম্পর্ক নেই। তাই পরম নিশ্চিন্তে সেগুলো বাদ দিতে পারে। ময়নাদ্বীপে সে যে নতুন মানবসমাজ সৃষ্টি করতে চায় তারা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হবে, হবে নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান; নতুন মূল্যচেতনায় সমৃদ্ধ হবে তাদের অন্তর্লোক। অতিকষ্টে যে সকল ভাঙাচোরা মানুষকে হোসেন সংগ্রহ করে, পাত্রী ঠিক করে তাদের বিয়ে দেয়, তাদের প্রতিও হোসেনের কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু এই নর-নারীর মিলনে যে নতুন মানুষ-মানুষী আসবে এবং ময়নাদ্বীপে বসবাস করবে, তাদের প্রতি রয়েছে তার প্রকৃত আগ্রহ। যেন হোসেন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণ মানব-সভ্যতার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে একাকী। এই রকম একটি প্রকাণ্ড ঘটনা যার প্রয়াসের মধ্যে থেকে সম্ভাবিত হয়, তাকে বিধাতা-পুরুষের মতো পারঙ্গম, দুর্জ্ঞেয় এবং ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হয়ে উঠতে হয়। স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও নাকি একজন কবি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর কবিতা। মানিকবাবুর হোসেন মিয়াও একজন ক্ষুদে বিধাতা-পুরুষ। সীমিত পরিসরের মধ্যে তার অসাধ্য কোনকিছুই নেই এবং ময়নাদ্বীপ তার একটি কবিতা। একজন ভাবমুগ্ধ কবি যেমন সমস্ত প্রযত্ন-প্রয়াস বিলিয়ে দিয়ে কবিতাটিকে সার্থক করে তুলতে চান, তেমনি হোসেন মিয়াও স্বপ্নের শেষ বিন্দুটি দিয়ে ময়নাদ্বীপকে লোক-কোলাহলে মুখরিত একটি কাব্যিক ভূখণ্ড হিসেবে নির্মাণ করতে চায়।

যৌনাচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও হোসেনের মতামত রীতিমতো কৌতূহলের সঞ্চার করে। বৃদ্ধ বসিরের স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের সম্পর্ক নিয়ে ময়নাদ্বীপের ক্ষুদ্র জনসমাজটির জনমত চঞ্চল হয়ে উঠলে লোক দেখানোর জন্য হোসেন এনায়েতকে তিনদিন অভুক্ত বেঁধে রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাত্রে বসিরের স্ত্রীকে যখন এনায়েতকে স্বহস্তে ভাত খাইয়ে দিতে দেখা যায় সে খবর গোপন রাখার জন্য হোসেন অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করে। হোসেনের ওই একই যুক্তি, বৃদ্ধ বসিরের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। অথচ তার স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের সম্পর্ক নিয়ে দ্বীপবাসীদের মধ্যে কথা উঠলে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করে। কিন্তু রাত্রে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এনায়েতের সঙ্গে বসিরের স্ত্রীর মিলনের বন্দোবস্ত করে দেয়। তার ফলে একটি নতুন মানুষ জন্ম নিতে পারে। হোসেন মিয়ার চোখে একেকটি নতুন মানুষ হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের চাইতেও মূল্যবান।

২

হোসেন মিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কতিপয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। যদিও সে গ্রাম্যভাষায় কথা বলে, মুন্সী-মোল্লাদের মতো জামা-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কাপড় পড়ে, তথাকথিত সমাজের প্রতিষ্ঠাবানদের এড়িয়ে চলে, তথাপি হোসেন মিয়া বিশ্বাস, হৃদয়বৃত্তিতে এবং কল্পনায় একেবারে খাঁটি আধুনিক মানুষ। যন্ত্রবিজ্ঞানে তার বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতিও যে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, সে নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারলে প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানই হোসেন মিয়াকে অকূল সমুদ্রের বুকে এমন অনুত্তেজিত, সাহসী এবং প্রত্যয়সম্পন্ন করেছে। আসলে জ্ঞানই যে শক্তি তা তার টুকরোটুকরো বাক্যালাপের মধ্যে বিরল হীরের দ্যুতির মতো ঝরে পড়েছে। যে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসাদে এবং প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানের সাহায্যে একসময় ইউরোপীয় ভৌগোলিক অভিযাত্রীর দল আমেরিকা থেকে মেরুপ্রদেশ অবধি অভিসার-যাত্রা করেছিল, হোসেন মিয়া সে কলম্বাস, ক্যাপটেন কুকেরই বঙ্গীয় সংস্করণ। অতি চেনা পোশাকে কোনরকম ভণিতা ছাড়াই দেখা দিয়েছে বলে ঠিক সেরকম মনে হয় না। মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে হোসেন মিয়া পুরনো চেতনার স্থলে নতুন মূল্যচেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ধর্ম হোসেন মিয়ার দৃষ্টিতে একেবারে অপ্রয়োজনীয় এবং পুরনো পৃথিবীর স্মারকচিহ্ন। তাই তার নতুন উপনিবেশে নিজের কিংবা অপরের কোনো ধর্মকেই শেকড় প্রসার করতে না দিতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ নিয়ে সে বিশেষ বাক্যালাপ করে না। কারণ সমতলভূমির লোকেরা তার এই চূড়ান্ত মতামত সমূহকে কখনো যথার্থ বলে মেনে নেবে না। একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তাতে করে তার স্বপ্নের অপমৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এত বুদ্ধিমান, এত দক্ষ হোসেন মিয়াও জানে ডাঙার মানুষগুলোর আচার-সংস্কারের বেড়াজালে আটকা পড়লে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। তাই হোসেন মিয়া অজস্র অর্থের মালিক হয়েও কখনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে পা বাড়ায়নি। ইচ্ছা করলে সে সামাজিক সুনাম-সুখ্যাতি কিনে নিতে পারত। কিন্তু তা করতে যেয়ে হোসেনকে আটকা পড়ে থাকতে হত এবং অচরিতার্থ থেকে যেত কবি হোসেনের একটি নির্জন দ্বীপে একটি নতুন উপনিবেশ, একটি নতুন সভ্যতার একক স্রষ্টা হওয়ার স্বপ্ন।

সামাজিক এবং নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক যে মতামত হোসেন পোষণ করে তাতে বেঁচে থাকার বাস্তব দাবীর প্রতিই পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ভুল করেও তার মুখ দিয়ে একবার, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, কল্পনা দিয়ে ধরা যায় না এমন কোনো ভৌতিক বিষয় উচ্চারিত হয়নি। কি সমাজ-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, কি নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে হোসেন মিয়ার যে মতামত তা পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত করলে সেগুলো যে চেহারা পাবে তা দাঁড়াবে অনেকটা ইউরোপীয় প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতামতের অনুরূপ।

৩

আসলে হোসেন মিয়ার চরিত্রটিকে লেখক মানিকবাবু মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অনেকগুলো পর্যায়েরই ঘনীভূত রূপ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যন্ত্রবিজ্ঞানে মানুষের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দীক্ষা, ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযাত্রা এবং সামাজিক মানব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত সন্তর্পণে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে হোসেন মিয়ার চরিত্রে চারিয়ে দিয়েছেন। এই তিনটি জিনিসই ইউরোপে 'এনলাইটেনমেন্ট' আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি। কোনো বাঙালীর মধ্যে এই তিনটি বিষয় সচরাচর সমান পরিমাণে মিলমিশ খায় না। প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের অর্জিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ভিন্নতর একটি ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাণবান করে তোলা প্রায় অসম্ভব, মানিকবাবু শিল্পে তা সম্ভব করে তুলেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে হোসেন মিয়াকে বলতে হয় নব্য মেঘনাদ। একটি মাত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবজাতির অগ্রসর অংশের চিন্তা-চেতনা, জীবন-অভীপ্সা দৃশ্যমান করে তোলার জন্য ভূগোল-ইতিহাসের কি পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা অবাক বিস্ময়ে কল্পনা করার বিষয়। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতিভূ হিসেবে হোসেনকে উপস্থাপন করেছেন বলেই সমস্ত উপন্যাসে হোসেনের মনোবৃত্তি সমূহের কোনো বিকাশ নেই, রূপান্তর নেই — আগাগোড়া একরকম রক্তমাংসের মানুষ হলেও কোনো মানবিক অনুভূতি তার মধ্যে নেই।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সমালোচকেরা হোসেন মিয়ার চরিত্রের যে একটা ঐতিহাসিক দূর-বিস্তৃতি রয়েছে, বলতে গেলে তার মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থই হয়েছেন। কাউকে এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত করতে দেখা যায়নি। যতটা চেনা পোশাকে দেখা দিক না কেন হোসেন মিয়া চরিত্রের কোনো বাস্তবতা নেই। এ সম্পূর্ণভাবেই লেখকের মায়াসৃষ্টি। এই হোসেনকে জামাকাপড় পাল্টে ভিন্নতর পরিবেশে অনায়াসে সায়েন্স ফিকশনের নায়ক করে দেয়া খুবই সহজ। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জীবন্ত নরনারী এবং সজীব প্রাণবান প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তরালে অবাস্তবতাটুকু ঢাকা পড়েছে। সর্বোপরি মানিক বাবুর অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা হোসেন মিয়াকে একান্ত বাস্তবানুগভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

১৯৭৩

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

জীবনানন্দ দাশ : তাঁর কাব্যের লোকজ উপাদান সাম্প্রতিক নিরিখ

উনিশশো তিরিশের যুগের সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথের বাইরে, নজরুল ইসলামের চাইতে দূরে। কল্লোল যুগের বন্ধুদের যখন বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, অসন্তোষ একটি সীমিত বলয়ে বারবার উদাত্ত উদ্‌ঘোষণায় তরঙ্গভঙ্গে ফেটে পড়েছে, সে সময়েও জীবনানন্দ দাশ তাঁর বোধ এবং মননের ব্যথা বুকে নিয়ে আরেকটি আলাদা ভুবনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরে ছিলেন, কিন্তু রাবীন্দ্রিক স্থৈর্যের কিছুটা যেন কোনো কারণে পেয়ে গিয়েছিলেন। এই মিল সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের ভেতরের নয় শুধু, বহিরঙ্গেও তার কিছু ছাপ মেলে। নজরুল ইসলামের বিপরীত অক্ষরেখায় তাঁর অবস্থান। একটুও আশ্চর্য শোনায় না, নজরুল ইসলামের বল্গামুক্ত আবেগের কিছুটা তাঁতেও সঞ্চারিত হয়েছে। এছাড়া ছিলেন তাঁর বন্ধুবর্গ — কি বুদ্ধদেব বসু, কি বিষ্ণু দে কল্লোলীয় প্রমুখ কবিদের সঙ্গে একমাত্র সমকালীনতা ছাড়া কোনো উল্লেখ্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। না ভাবের দিক দিয়ে, না শব্দ-চয়নের দিক দিয়ে, না অন্তর্দৃষ্টি না জীবনদৃষ্টির দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশ কল্লোল যুগের অন্য কোনো কবির সমীপবর্তী নন; না অন্য কোনো কবি জীবনানন্দ দাশের। রাজনীতির সন্ত্রাসবাদের মতো কাব্যের সে সন্ত্রাসের যুগে জীবনানন্দ দাশকে শহর ছাড়িয়ে, কোলাহল ছাড়িয়ে একান্ত আপন মানস-সংগ্রামের বিচ্ছিন্ন নির্জনতায় অবস্থান করতে হয়েছে। একজন মুখ্য কবি যাঁর রচনার মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর চৈতন্য নতুন আভায় মণ্ডিত হয়েছে, কাব্যের পরিধির প্রসারণ ঘটেছে, ভাষার ধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, লোকভাষার শব্দপুঞ্জ চৈতন্যস্রোতে বাহিত হয়ে কাব্যলোকে উঠে এসেছে; সে কবি সংস্কৃতির নানা প্রশ্নে নিজের ভূমিকা যদি পরিচ্ছন্ন না করেন, যুগ-সমাজ-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা কি যদি বুঝতে পারার মতো আভাসে-ইঙ্গিতে হলেও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা না দিতে পারেন, তাহলে সে কবিকে নানা জনের ব্যাখ্যার ওপর, নানা কালের বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে তাঁর বন্ধুরা যে ধারণা দিয়েছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা কাব্যজগতে তাই-ই কবির ব্যক্তিত্ব উদ্‌ঘাটনের একমাত্র চাবিকাঠি বলে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংস্কৃতিবান মহলে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল। তিনি নির্জন বিশুদ্ধ চৈতন্যের কবি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধারণার বিপরীতে কোনো ধারণা কবির সামগ্রিক সৃষ্টিকর্ম ব্যাখ্যা করে কেউ দাঁড় করিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার সম্প্রসারণ না ঘটলে একেকটি যুগ, একেকটি জাতি একেকজন স্রষ্টার বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে রাখে। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃত্রিম 'জেন' আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল মহল একরকম ভাবত, কিন্তু 'জেন' রহস্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই এতাবৎকালের পোষণ করা ধারণা পাল্টে গেল। মানুষ বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুনভাবে, নতুন অনুরাগ নিয়ে চিন্তা করতে লেগে গেল। একেকজন স্রষ্টাকে তখনই মহৎ বলা সম্ভব যখন যুগের পর যুগের নতুন-নতুন চাহিদা মিটিয়ে বিচারে তিনি টিকে যেতে পারছেন।

বাংলাদেশের গণসংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন রমণীমোহন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের চামড়াঘেঁষা হা-হুতাশ-বিষাদ এবং অল্পস্বল্প দীর্ঘশ্বাস মেশা রোমান্টিক কবি। সাধারণ্যে জীবনানন্দের এই ছিল স্বীকৃতি। সমালোচকদের মধ্যে কেউ তাঁর কাব্যের অভিনবত্ব, কেউ ছন্দ-কৌশলের মারপ্যাঁচ, কেউ তাঁর কাব্যে সঙ্গীতের অনির্বচনীয়তা, কেউ আধুনিক জীবনবোধের বেদনাবিদ্ধ হতাশাপাণ্ডুর ম্লান পরিচিতি এবং কেউ কেউ গুহ্য বিষয় অধ্যাত্মতত্ত্ব দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন। কারো কারো আলোচনায় চমৎকার বাহাদুরীও আছে। আবার তাঁদের সকলে যে ভুল একথা যেমন বেঠিক, সকলে সঠিক একথাও সত্য নয়। বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে ভুল-ঠিক এ কথা দুয়ে-দুয়ে চার হয় এমন নিশ্চয়তা সহকারে বলে দেয়া যায় না। যাঁরা বলেন তাঁদের সম্পর্কে সাবধান থাকাই উত্তম। কিন্তু জীবনানন্দের সমালোচকদের সম্বন্ধে একটি কথা অত্যন্ত নির্দ্বিধার বলে দেয়া যায়, তাঁরা এই মহৎ কবির সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনে নন্দনতত্ত্ব, যুগ-চৈতন্যের ধারা বিচার ইত্যাদির কমবেশি সাহায্য-গ্রহণ করলেও বিজ্ঞান এবং দর্শনকে একেবারেই বর্জন করেছেন। যে জনগোষ্ঠীর চিত্তসম্পদের ধারাস্রোত তাঁর মধ্যে নতুন প্রবহমানতা লাভ করেছে তার থেকে কবিকে আলাদা করে রেখেছেন। বিজ্ঞানদৃষ্টি এবং দার্শনিক প্রতীতি যা তাঁর কাব্যে ঋষি-বাক্যের মতো আলোকিত হয়েছে, সে সংযতবাক সিদ্ধপুরুষটির সৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব শুধু অলঙ্কার-জিজ্ঞাসার ওপর ছেড়ে দেয়া একটি ঘোরতর অবিচার বলে মনে করি। আমি সাধারণ পাঠকদের কথা বলছিনে, বলছি তত্ত্বদর্শীদের কথা। যাঁরা শাঁস থেকে আঁটি আলাদা করে দেখাতে পারেন এবং শাঁস-আঁটি উভয়ের সংযোগসূত্রটা কি, জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন। জীবনানন্দ দাশের কাব্য-সাধনায় কাব্যকলার নান্দনিক বোধের বিস্তৃতি ঘটেছে, একথা সত্যি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্যি যে কবি তাঁর কাব্য-সাধনাকে সামগ্রিকভাবে একটা দার্শনিক প্রতীতি এবং একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড় করাবার দুর্মর প্রচেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদ, বের্গসঁর স্বজ্ঞা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তথা ইনটুইশনের ছাপ যে তাঁর কাব্যলোকে আকাশের ছায়াপথ এবং শর্করার দানার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, তা ওসব বিষয়ে আমাদের মতো আনাড়ির চোখেও ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের একজন পারঙ্গম সমালোচক এলেন না এটিই বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য। তেমন একজন বোদ্ধা মনীষীর অভাবে কঠোর নৈয়ায়িক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নেড়ানেড়ীর আখড়ার গাঁজা-চরসের যোগানদার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ কোন্ ছার! মন-পবনের নাও, দিলুয়া বাতাস ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে আমাদের গহন পরিচয়ের কারণে, শুনলেই যেমন মনটা আপনা থেকে ছলছল করে, তেমনি তাঁদের অনেকের কাছে জীবনানন্দ দাশ প্রিয় এ কারণে যে আমাদের পরিচিত অনেকগুলো 'ওম', 'নাড়া' ইত্যাদি কিছু শব্দ, বাংলাদেশের কিছু গহন ধ্বনি, কিছু গভীর চিত্র যার সঙ্গে আমাদের গভীর মানসিক সন্নিহিতি বর্তমান, বাংলার বিদগ্ধ সাহিত্যে অপূর্ব রসাভাসে নিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, 'অসুবিধা' জাতীয় কিছু ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় না, এমন শব্দকেও কাব্যের জগতে সম্মানের টিকিট তিনি দিয়েছেন। শব্দ — শব্দ তো ছড়িয়ে আছে চরাচরের সর্বত্র। সৃষ্টিশীল আবেগের স্পর্শেই তো শব্দ তড়িৎ-শলাকার মতো চৈতন্য-সঞ্চারী হয়। যে কবি চরাচরের সঙ্গে সংগ্রাম করে জড়জগতে অনুভূতি প্রসারিত করেন, টেনে নিয়ে আসেন ভাব বহন করার মতো নতুন-নতুন শব্দপুঞ্জ, কবিকে কি সে শব্দে পাওয়া যায়? ছিন্নমালার ছড়ানো কুসুমের মধ্যে অন্তরালের অদৃশ্য সূত্র এবং অন্তরালবর্তী মালাকার কাউকে পাওয়া যাবে না যেমন, জীবনানন্দ দাশকেও তেমনি তাঁর ব্যবহৃত শব্দমালার মধ্যে আবিষ্কার করতে যাওয়াটা ভুল। তেমনি ভুল হবে তাঁর ভিন্ন ধরনের ছন্দের মধ্যে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা। সমালোচকেরা এ দুয়ের মধ্যেই কবির মহত্ত্বের সন্ধান করেছেন। তাঁদের সিদ্ধি যেটুকু অন্ধের হস্তী দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চরাচরের গহনে প্রাণ-আপ্রাণ বায়ুর মতো শ্বসিত যে বেদনা, যার স্পর্শে ব্যক্তির চেতনার উদ্বোধন ঘটে এবং যা সমাজ-মানসের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে সম্পর্কিত, সেই বেদনার তুল্যমূল্যে স্রষ্টাকে বিচার করতে না পারা দুঃখের, খুবই দুঃখের। জীবনানন্দ এমন কবি যিনি স্থিতধী ঋষির মতো আপন বুকে হাত রেখে বলতে পেরেছেন, এই বুকে যা আছে, যা প্রবাহিত হচ্ছে, সব বেদনা এবং আমরা সকলে বেদনার সন্তান। এই বেদনা কি তাঁর একার? তা কি গোটা সমাজের নয়? যেহেতু তিনি সাহিত্যের দলাদলি করেননি, কোনো রাজনৈতিক দলের টিকিটধারী সদস্য ছিলেন না, সভা-সমিতিতে বিদগ্ধজনোচিত ভাষণ দেননি, কাগজে চমকপ্রদ ইন্টারভ্যু করেননি, সচিত্র পত্রিকায় ছবি প্রকাশিত হয়নি, তাই তাঁর অনুরাগী-গুণমুগ্ধ জনও তাঁর সম্বন্ধে অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন — তিনি নির্জন কবি। তিনি একা এবং আনমনা কবি। এগুলো খুবই একপেশে ধারণা। সমালোচকেরা শুধু কাব্যে ব্যবহৃত চমৎকার ন্যূরালজিয়ার বাধার মতো ইমেজ এবং লোকায়ত শব্দের মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব সন্ধান করেছেন। আনকোরা নতুন শব্দের সার্থক প্রয়োগের জন্য

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একজন কবি মহৎ পদবাচ্য হতে পারেন না, যুতসই ইমেজ নির্মাণের জন্যে নয়, নতুনত্ব আমদানীর জন্যে নয়, সমকালীন হওয়ার জন্যে নয়, সবকিছুকে একসাথে ধারণ করার মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব। ছন্দের যেমন বিকাশের ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি আছে শব্দের। তেমনি দেখা যাবে ইমেজ ইমেজকে প্রসব করেছে মানব-সন্তানের মতো, যাকে সমকাল বলি তাও তো ধাবমান তরঙ্গমালার আরেকটা প্রসারণ মাত্র। যখন একজন কবির সাধনায় সবকিছুর ক্রম প্রবহমানতার যাবতীয় সিদ্ধি সমসূত্রে দণ্ডায়মান হয়, তাঁর মধ্যে জন্ম নেন একজন মহৎ স্রষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে সভা-সমিতিতে গমনাগমন না করলেও গোটা বর্তমান সমাজের সঙ্গে তিনি অদৃশ্যসূত্রে যুক্ত। জীবনের অন্দরমহলে বাদ্যমান যন্ত্রের মতো আন্দোলিত হচ্ছেন তিনি। জীবনানন্দের মতো একজন মহৎ কবির বিচারেও বিষয়গুলো কারো মন-মগজ খোঁচায়নি। সেজন্য কিছুটা দায়ী বুদ্ধির আড়ষ্টতা, কিছুটা সমাজের বাস্তব অবস্থা। তাই তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে, এবং তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। সে কারণেই কিশোর-যুবকের জগৎ ছাড়িয়ে বুদ্ধিমান মানুষের জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সিকি শতাব্দী কিংবা তারও অধিককাল সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর একটা উক্তি এ স্থলে স্মর্তব্য : যা মন দিয়ে গড়া তাকে মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জাতির কাছে যা অকৃত্রিম আবেগে মনের থেকে উচ্চারণ করেছেন, অনেকদিনের পর তা খাড়া রাখার জন্য তার জাতির আরো মনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জন্য তাঁর জাতিকে একটা যুদ্ধ করতে হয়েছে, এই যুদ্ধে বাংলার অন্যান্য স্রষ্টার মানস-সন্তানের মতো তাঁর কোমল সন্তানও অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রমাণ করেছে জীবনানন্দের মানস-সন্তানেরা কোমল বলে দুর্বল নয়। তাই আজ আমাদের এই বাংলাদেশের নতুন একটি রেনেসাঁ-মন্ত্রের সম্মোহনে শিহরিতচিত্ত কাব্যরসিক কবি জীবনানন্দ দাশকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন ভঙ্গীতে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

My All Garbage

২

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি। বাঙলার লোকজ ঐতিহ্যের তিনি কাব্যিক রূপায়ণ সাধন করেছেন। আরেকজন বাঙালী কবি যিনি জীবনানন্দের সমসাময়িক – তিনিও বাঙলার লোকজ ঐতিহ্যের কাব্যিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধিও বড় সামান্য নয়। আমরা কবি জসীম উদ্‌দীনের কথা বলছি। কিন্তু জসীম উদ্‌দীন এবং জীবনানন্দ দাশের মধ্যে তফাৎটা কোথায়, কোন্ বিন্দুতে ভেদরেখা টানব? এ রকমভাবে বোধ হয় কথাটা বলা যায়। জসীম উদ্‌দীন লোক-ঐতিহ্যের মাংস গ্রহণ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ করেছেন হাড়-মাংস ছেনে তারপর প্রাণ। এটি করতে পেরেছেন যেহেতু তিনি আধুনিক বিশ্বের কাব্যিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জানতেন, আনন্দিত বোধ-বুদ্ধি-মনন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিশাল অংশের মধ্যে যার বিস্তৃতি, সে সুন্দরের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জগতে সন্দেহের কীট প্রবেশ করেছে; ভাষা এবং ছন্দের সুরম্য প্রাসাদের লখীন্দরের বাসরঘরে কালীনাগের মতো অবিশ্বাস-সংশয়ের পোকা ঢুকে কল্যাণ-সুন্দর-শিবের জগৎ মানুষের লোভ-রিরংসা নলবনে মত্তহস্তীর মতো তছনছ-লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় যেটুকু আশ্রয় যেটুকু প্রশ্রয়তা তা মনকে চোখঠারা মাত্র। আসলে তা বালিয়াড়ি। জীবনানন্দ দাশের জানাজনা, জ্ঞানগম্যি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা আরেকটি জগতে সংস্থাপিত করেছে। সে জগৎ জীবনানন্দের নিজের ইঁদুর-পেঁচার জগৎ, মর্গের যন্ত্রণাবোধের জগৎ, খয়েরী হয়ে আসা শালিকের বিমর্ষ জগৎ, অতীতের কাহিনীর রসে অবগাহন করা ব্যথিত-শান্ত বেদনাবোধের জগত। অপরদিকে জসীম উদ্‌দীনে দেখা যাবে ঐতিহ্যের কাছ থেকে হাত পেতে যা পেয়েছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে গ্রহণ করেছেন এবং একটি সুঠাম-সরল বিশ্বাসবোধ দিয়ে কাব্যিক রূপায়ণ দান করেছেন। সচেতন মননশক্তি প্রয়োগ করে তার প্রাণের ইশারাটুকু সম্মুখগামিনী কিংবা তাকে বিশ্বব্যাপিতা দান করতে পারেননি। তার কারণ জীবনানন্দের প্রখর ইতিহাসবোধ ছিল, নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি ছিল। জসীম উদ্‌দীনে তা আদৌ ছিল না।

তবু জীবনানন্দ দাশ দেদার লোকজ ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন বললে ঠিক হবে না; লোকজ ঐতিহ্যে আধুনিক চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ করতে পারি। এর সবকিছুই লোকজ : লোকভাষা, লোককৃষ্টি, লোক-ঐতিহ্যের সদ্ব্যবহার এমনভাবে করেছেন পূর্বে কোথাও এমনটি ঘটেনি। কিন্তু যে কাব্যিক চেতনা-স্পর্শে এরা মরণজয়ী প্রাণ পেয়েছে, এমন রস পেয়েছে, তা আধুনিক। তার আবেদন ইন্দ্রিয়ের জগতের দ্বারদেশ পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়ের জগতে শিহরণের সঞ্চার করে। বচনের সীমা অতিক্রম করে অনির্বচনীয়তার স্তর স্পর্শ করে। জীবনানন্দ দাশ কাব্যিক ভাবনা-চিন্তায় সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন, প্রাজ্ঞ ছিলেন। এমন নয় যে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো সমকালীন প্রসঙ্গে মেতে ওঠা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার পরেও তিনি কবিখ্যাতির অধিকারী হতে পারতেন। আমরা জেনেছি তাঁর সে যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি নিসর্গের জগৎ, অস্ফুট ভাবনার অচেনা ধূসর কুয়াশার জগৎ পেরিয়ে চেনা জগতে এলেন না কেন; বরঞ্চ চেনা জগতকেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, নিসর্গের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে প্রসারমানতা দিতে-দিতে একেবারে ধূসর কুয়াশার জগতে নিয়ে গেলেন; তার উত্তর জীবনানন্দ দাশের যুগ এবং ব্যক্তিত্ব দুয়ের মধ্যেই খুঁজতে হবে। সেখানেই রয়েছে তার উত্তর। কোনো প্রচলিত লোকবিশ্বাস অসংশয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না, কোনো হুজুগে মেতে ওঠার যোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো প্রবল সংস্কারের সপক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়াবার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিরিশের যুগের কাব্যিক-চেতনার সাধারণ লক্ষণ কি? সংস্কার ভেঙে নতুন সংস্কার নির্মাণ। স্বভাবজ কারণেই তাতে গা ঢেলে দিতে তিনি অপারগ ছিলেন। এর বিপরীতে একটা পথ ছিল — সেটা বিপ্লবের — শুধু তাহার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নয়, শুধু ছন্দের নয়, যে সমাজের বায়ুমান যন্ত্রের ডাল থেকে জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রতিদিন অহরহ ঝুরঝুর শব্দ ঝরে পড়ছে; নতুন শব্দ টাকশালের নতুন টাকার মতো ঝলসে উঠছে; পুরনো শব্দে নতুন প্রাণ, নতুন ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হচ্ছে মনেপ্রাণে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, সচেতনায় অচেতনকে তুলে আনায় আস্থাশীল হওয়া। হার্বার্ট স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদে মৃদু আস্থাশীল, পারিবারিক কারণে ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং বের্গসর স্বজ্ঞাবাদে বিশ্বাসী জীবনানন্দের জন্য তা মৃত্যুপ্রমাণ অসম্ভব ছিল। তাই তাঁকে লোকজ জগতে আসতে হয়েছে। লোকজ বিশ্বাস-সংস্কার-ঐতিহ্য আর যাই হোক মেকী জিনিস নয়। একটি সুদীর্ঘ আবহমানতার মাধ্যমে তা প্রাণেপ্রাণে স্থান করে নিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন নিসর্গের কাছে। নিসর্গের আর যাই অভাব থাকুক ছলাকলা জানে না। তাই কবি গিয়েছেন অতীত ইতিহাসে। ইতিহাস মানুষের নিজের হাতে সৃষ্টি। অকথিত বেদনার প্রকাশ নয়, জীবনের সলিড এ্যাচিভমেন্ট। ইতিহাসে আস্থা রাখলে ঠকবার সম্ভাবনা স্বল্প। একজন আধুনিক মানুষের চিন্তান্বিত কামনা বা থিঙ্কিং ডিজায়ার তাই সোজাসুজি রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার বদলে একটু দূরে স্থিতি দিয়েছেন। তিনি অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতেন বলে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই বিকশিত হয়ে চলেছে — কবিতা, কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দও তো তার বাইরে নয়। যদি তাঁর সাধনার মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশক্রিয়ার একটা কি দুটো সুরও বাজে একসময় মানুষের কাছে স্থান করে নেবে, এরকম একটা বিশ্বাসে স্থির-নিশ্চিত থাকতে পেরেছিলেন বলেই কবিতার সাফল্য-ব্যর্থতার সম্বন্ধে তিনি একরকম নির্বিকার ছিলেন এবং সর্বক্ষণ জীবনের গভীর অনুভব মসৃণ তুলিতে প্রকাশ করার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর পছন্দ ছাড়িয়ে, লাভ-ক্ষতি বাদ দিয়ে, সংস্কারের সীমানা পেরিয়ে — সৃষ্টির বেদনার ঘরে যে পরিবর্তন চলছে সে শৃঙ্খলাবোধটিকে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন — নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে। তাই তিনি ধূসর, অস্পষ্ট। কবিতা দিয়ে বিজ্ঞানকে ধরা যায় না, অনুভূতি দিয়ে চরাচরে ক্রিয়াশীল নিয়মকে বাধা যায় না; অন্তত জীবনান্দ দাশ সে ক্ষমতার অধিকারী নন — তেমন প্রতিভা তাঁর ছিল না। কিন্তু কবির অনুভূতি মিথ্যে নয় কেননা তা তাঁর অন্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণে আমরা জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্য করতে পেরেছি মনে করি — তিনি অনুভবের কবি।

প্রসঙ্গত আমরা তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ করছি। এই গ্রন্থে কবির অনুভূতি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করেছে। যে নিসর্গ তিনি অনুভবে ধরতে চেয়েছেন কবি স্বয়ং তার মধ্যে বাস করেছেন, যে ইতিহাসবোধ সাহনুভূতির স্পর্শে জীবন্ত করেছেন তা তাঁর আপন মাতৃভূমির ইতিহাস। এই ইতিহাসের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সম্পৃক্তিও অতি নিবিড়, অতি গভীর। যে প্রাচীন সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বেদনার বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন জীবনানন্দ দাশ নিজেও তার অংশ অপহারী। এই গ্রন্থে চেতনা আপনিই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রসারিত হতে পেরেছে সহজ গতিতে। অনুভব যুগের সীমানা ভেদ করে ফেলেছে। কোনরকম কষ্ট-কল্পনা কিংবা দূর-কল্পনার প্রয়োজন হয়নি। রোমান্টিক বোধ নিটোল মুক্তোর দানার মতো ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কবিতার ঝিনুকে ফুটে রয়েছে। কোনো অচেনা পথে কল্পনা অভিসার করেনি। 'রূপসী বাংলা' বাঙলার আবহমান কালের ব্যথার গাঁথা। যে ব্যথা বাঙলার ইতিহাসের, বাঙলার সংস্কৃতির, বাঙলার সঙ্গীতের। কবি তার ওপর আধুনিক চেতনা প্রক্ষেপ করেছেন। তাই-ই মোহন-মূর্তিতে ধরা দিয়েছে — সুরে, চিত্রে ভাবে আরেকটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ ব্যথার কবি নন, তিনি ব্যথাবোধের কবি। এই ব্যথা 'রূপসী বাংলা'য় আরো সংহত হয়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক অনড়-অটল অতীতের কোনো এক সোনার বাংলায় কবির আশা-ভরসা, বিশ্বাস-স্বপ্ন সব প্রোথিত ছিল। তাই অতীতের সবকিছু লষ্ট আর্কেডিয়ার মতো হারানো স্বর্গের দীপ্তিতে প্রকাশমান হয়েছে। জীবনানন্দের সোনার বাংলা সামনে নয়, পেছনে।

মানুষ ইতিহাসে বাঁচে। জীবনানন্দ দাশও এই ইতিহাসবোধকে এড়াতে পারেননি। গৌড়-বাঙলার রাজন্যবর্গ, বল্লাল সেন রায় গুণাকরের সময়কাল থেকে তাঁর অনুভূতি তাঁর স্বকাল স্পর্শ করেছে, এটি যেন ঘটে গেছে কবির অজ্ঞাতে। যেমন :

মধুকূপী ঘাস ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌড়ী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবেনা জানি আমি রায়গুণাকর
আসিবেনা, দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার

রূপসী বাংলা

বেহুলা, খুল্লনা, লহনা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা এসব রূপকথা-উপকথার নায়িকাদের ভিড়ে কখন বঙ্কিমের-রোহিনী অনুরাধা একটেরে স্থান করে নিয়েছে :

... ... রাজ বল্লভের কীর্তি ভাঙ্গে কীর্তিনাশা
তবুও পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
আরো প্রাণ তার আরো ঢের জল — জল আছে
পৃথিবীর পথে নক্ষত্রের পথে তুমি খেলিতেছ পাশা
শঙ্খমালা নয় শুধু অনুরাধা-রোহিনীর কত ভালোবাসা
পৃথিবীর রাঙা রোদ চরিতেছে আকাঙ্ক্ষার চিনিচাঁপা গাছে।

কবি হয়তো চেয়েছেন, হয়তো চাননি; কিন্তু তাঁর অনুভূতি লোকশ্রুত সোনার বাংলার জগৎ থেকে স্বকালের ঘাটে আছড়ে পড়েছে। এই অনুভূতি, এই বোধ তাঁকে বাংলাদেশে নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে। এই অকৃত্রিম অনুভূতির গুণেই তাঁর বেদনার কোমল সন্তান বাংলাদেশের গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

১৯৭৩ *বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে*
(১৯৭৫)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

নতুন করে তিতাস পাঠ

প্রথম পড়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। তারপরে যখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় থাকতে আরম্ভ করলাম, আসল তিতাসের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস মিলিয়ে দেখার জন্য 'তিতাস একটি নদীর নাম' বইটি আরো একবার পড়েছিলাম। মাঝখানে 'নতুন সাহিত্য' নাকি 'চতুষ্কোণ' – এখন মনে নেই – একটি সাহিত্য-সাময়িকীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'রাঙ্গামাটি' নামাঙ্কিত একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস পাঠ করেছিলাম। সম্ভবত ওই উপন্যাসটি অসমাপ্ত ছিল। আমি বলতে পারব না 'রাঙ্গামাটি' রচনাটি আদৌ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা।

অদ্বৈত বাবুর 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়ে গ্রন্থটি সম্বন্ধে আমার একটি ধারণা জন্ম নিয়েছিল। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' কিংবা তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এ দুটি উপন্যাসের কাছাকাছি এই রচনাটি স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে আমার তখন মনে হয়েছিল। আরো একটা তুলনা আমার মনে এসেছিল। নদী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনটি উজ্জ্বল উপন্যাস লিখিত হয়েছে। একটি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', অন্যটি সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'। নদী বিষয়ক উৎকৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের তিন নম্বর বই হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস'কে ধরে নিয়েছিলাম।

তারপর উপন্যাস সম্পর্কিত ভাবনা মনে একটু গাঢ়তা অর্জনের পর আমার মনে 'তিতাস একটি নদীর নাম' বারবার ধাক্কা দিয়েছে। আমি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে সবিস্ময়ে অনুভব করলাম, জীবনানন্দের কাব্যভাষাটি চিরাচরিত বাংলা ভাষার খাত থেকে অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। কবি এমন সব অপ্রচলিত শব্দ কবিতায় ব্যবহার করেছেন, তাঁর পূর্বের কবিদের কেউই শব্দ-চয়নের বেলায় সেসব অপাংক্তেয় গেঁয়ো শব্দ কবিতায় স্থান দেয়ার কথা চিন্তাও করতে পারেননি। কবিতার নিবিষ্ট পাঠকের বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, কবি যে সদ্যজাগা বিস্ময়বোধ মাখানো দৃষ্টি নিয়ে নিসর্গদৃশ্য অবলোকন করেছেন, সেই অনুভবটি অপরের মনে চারিয়ে দেয়ার জন্য এসব অচলিত গেঁয়ো শব্দের ছাড়পত্র দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জীবনানন্দ দাশ বাঙলার প্রকৃতিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। নতুনের আবির্ভাব ছাড়া আবিষ্কার নেই। আমার মনে হয়েছিল, কবিতার ব্যাপারে যেকথা জীবনানন্দের বেলায় প্রযোজ্য, বাংলা গদ্যের বেলায় একই কথা অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেলায়ও সুপ্রযুক্ত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ একটি নতুন রীতির উদ্ভাবন করেছেন। এই ভাষারীতির স্বাদ, গন্ধ এবং মননরীতি সম্পূর্ণ অভিনব। এই নতুন রীতিটি উদ্ভাবন করতে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে কোনো কসরতই করতে হয়নি। বাংলার সারস্বত গদ্যরীতিকে অস্বীকার না করেও এমন সহজ-স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা যাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান গদ্যশিল্পী। এসব কথা মনে দোলা দিয়ে বারবার জেগেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আরো একটি বিষয় নিয়ে ওখানকার কথা-সাহিত্যিকদের চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। পশ্চিম বাংলার লেখকেরা যে ভাষাটি ব্যবহার করেন, বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রকাশরীতিটি তার চাইতে আলাদা হওয়া উচিত। এই ব্যাপারটিতে বিশেষ দ্বিমত ছিল না। কিন্তু গোল বাধলো এক জায়গায় এসে। বাংলা ভাষায় বাংলাদেশী শব্দের প্রাধান্য থাকা এক কথা কিন্তু সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। শব্দ কিংবা ভাষার উপর যতই দখল থাকুক পরিশীলিত কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভার অধিকারী হতে না পারলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

My All Garbage

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য কিরকম হওয়া উচিত তার একটা দৃষ্টান্ত হাজির ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস এবং ছোট গল্পসমূহে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাঙালী মুসলমান সমাজের একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছেন; তাঁর মানস-চৈতন্য, অনুভব, জীবনদৃষ্টি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় একটা অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনন সহকারে বাঙালী মুসলমান সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিভা এবং শৈল্পিক পারঙ্গমতা সম্বন্ধে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম নালিশ আমার মনে জন্ম নিয়েছিল। বাংলাদেশের মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মুসলমান ছাড়া বাংলাদেশে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও বাসবাস করেন। সৈয়দ সাহেবের সাহিত্যকর্ম তন্ন-তন্ন করে দেখলে মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর লেখা মাত্র একটি গল্পে ('একটি তুলসী গাছের কাহিনী') একটি অনুপস্থিত হিন্দু পরিবারের আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প, উপন্যাস, নাটক কোথাও অমুসলিম কোনো চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। উপন্যাস এক ধরনের আধুনিক সমাজ পর্যালোচনা (সোশ্যাল ডিসকোর্স)। পূর্বে হিন্দু লেখকেরা মুসলমানদের তাঁদের পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতেন না, একই নালিশ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে করা যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার আরেকটি ত্রুটি তাঁর রচনা মননশীল এবং মার্জিত, কিন্তু তাতে প্রত্যক্ষতা বড় বেশি অনুপস্থিত। 'লালসালু' ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মননশীলতা যত বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, বাস্তবতা সে তুলনায় অল্প। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রগুলো জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ নয়। তিনি প্রতীক হিসেবে ওই চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পঠন-পাঠন, চিন্তাশীলতার ব্যাপ্তি অনেকদূর প্রসারিত ছিল এবং তিনি ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। তাঁর রচিত সাহিত্য তাই বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পেরেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা সাহিত্যকর্ম হিসেবে মহৎ পদবাচ্য হলেও সাহিত্যের ধারা সৃষ্টিতে এগুলোর বিশেষ ভূমিকা আছে তেমন মনে করার কারণ নেই। সৈয়দ সাহেবের নিজস্ব মননরীতির এবং জাতীয় মননরীতির মধ্যে থেকে গেছে দুস্তর পার্থক্য।

সেই সময়েই মনে হয়েছিল এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে কোনো একক গ্রন্থকে যদি সর্বসাধারণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে হয়, সে গ্রন্থটি অবশ্যই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই গ্রন্থের ভাষারীতিটি একান্তভাবেই এই বঙ্গীয়। অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশী। এই গ্রন্থে খেটে-খাওয়া হিন্দু-মুসলমান নর-নারীদের যে পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ভিন্ন অঞ্চলের কোনো লেখকের পক্ষে অতখানি গভীরে প্রবেশ করা কস্মিনকালেও সম্ভব হত না। বাংলা ভাষার মূল কাঠামোর ওপর ভার না চাপিয়ে জনগণের মুখের ভাষা কত শিল্পিতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, এরকম নজির বাংলা সাহিত্যে অধিক নেই।

My All Garbage

দোকানের শো-কেসে বইটি দেখে লোভ সামলানো সম্ভব হলো না। বইটি কিনলাম। আমার ভ্রাতুস্পুত্র আনোয়ার এবং সহকর্মী রতনের কথা মনে করেই বইটি কিনেছিলাম। আমার জ্বর হয়েছিল। চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছিলাম না। হাতের কাছে পড়ার মতো কিছু ছিল না। অগত্যা বইটি টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল্যাম। একটানা দু'দিন ব্যয় করে বইটি আবার পড়লাম। পড়া শেষ করলাম, আমার মনে হলো নতুন প্রাণ ফিরে পেলাম। একটি গ্রন্থের মধ্যে কি পরিমাণ জীবনীশক্তি থাকতে পারে! আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ হয়ে উঠেছে। মনের গ্লানিরাশি অপসারিত হয়ে গেছে। আমার ভেতরে কোনো রাগ, কোনো ক্ষোভ অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীকে, পৃথিবীর দুঃখ-শোক, জরা-মৃত্যু, আনন্দ-বেদনা সবকিছুকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি; কেননা এগুলো জীবনেরই অংশ।

এ গ্রন্থের ভাষা কোথাও সঙ্গীত, কোথাও ছবি, কোথাও গভীর দর্শন। অথচ কি সরল। অনুচ্চস্বরে তিনি উপাখ্যানটি বিবৃত করেছেন। এই কাহিনী তিতাসের, তিতাসের দু'পাড়ের খেটে-খাওয়া মানুষদের। এটি উপন্যাস কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকবে। একটি গ্রন্থ যখন স্বকীয় মহিমায় অন্তর স্পর্শ করার ক্ষমতা অর্জন করে, একটা ছকে ফেলে কেন বিচার করতে হবে? একজন লেখক নিজের সমগ্র অস্তিত্বের কতখানি অংশ তাঁর রচনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেন এবং গ্রন্থটি লেখকের দ্বিতীয় জীবন হয়ে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

উঠতে পারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' তার প্রমাণ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মারা গেছেন কিন্তু তিতাস অমর। তিতাসের মুদ্রিত রূপ দেখার ভাগ্যও অদ্বৈত মল্লবর্মণের হয়নি। অদ্বৈতবাবু তিতাসপাড়ের এই অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের কতখানি ভালোবেসেছিলেন, সেই অকৃপণ ভালোবাসার দলিল এই গ্রন্থ। মানুষের নানাবিধ ক্ষমতার মধ্যে ভালোবাসার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে অকালে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়েছে। এই বিনয়ী, কুণ্ঠিত, নম্র অথচ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অসামান্য মানুষটি তাঁর আপন মানুষদের ছবি তাদের আপন পারিপার্শ্বিকতাসহ যেভাবে আঁকলেন সমস্ত বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা কোথায়? ভদ্রশ্রেণীর লোকদের মেকি ভণিতা কিংবা দারিদ্র্যবিলাস অথবা রাজনৈতিক তাগিদে বানিয়ে তোলা কোনো কাহিনী অদ্বৈতবাবু রচনা করেননি। তিনি তাঁর জীবনের বেদনার বিনিময়ে ওই বেদনার্ত মানুষদের বেদনার আখ্যান বয়ান করেছেন।

১৯৯৯ *উপলক্ষের লেখা*
(২০০১)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

খোয়াবনামা উপন্যাস

অনেকদিন থেকেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটির ওপর একটি বড়সড় লেখা তৈরি করার চেষ্টা করে আসছি। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আমার যে সকল বক্তব্য রয়েছে, একটি দীর্ঘ রচনা ছাড়া সেগুলো প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের একটি রচনা তৈরি করার জন্য যে সময়, অভিনিবেশ এবং ধৈর্যের প্রয়োজন ইলিয়াস ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সে ধরনের একটি উৎকণ্ঠামুক্ত এবং চাপহীন সময় আমার হয়ে ওঠেনি। তাই বর্তমান রচনাটিতে আমি যেসব কথা লিখছি, সেগুলো আমার সংকল্পিত রচনাটির পূর্বাভাস মাত্র। আর অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে রচনাটি লিখতে হচ্ছে, সে কারণে আমার বক্তব্যগুলো ছাড়াছাড়া এবং খণ্ডখণ্ড থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া আমার আশংকা হয় একটা বড় প্রেক্ষাপটের মধ্যে এই উপন্যাসটিকে স্থাপন করে নানাদিক থেকে আলো ফেলে তার ভেতরের বিষয়গুলো যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার কাজটিও বর্তমান রচনায় ভালোভাবে করা হচ্ছে না। তথাপি আমার রচনাটি এভাবে শুরু করতে চাই। সন-তারিখ মনে আসছে না, বিগত কয়েক বছর আগে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে হাইকমিশন অফিসেই বাংলাদেশের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখকদের অনেকেই ওই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারা কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা আমার এই রচনার জন্যে জরুরি বিষয় নয়। সেমিনারে একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল, বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা কি রকম হবে। ওই সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পশ্চিম বাংলার অত্যন্ত সুপরিচিত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের দেশের লেখকেরা এ বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কে কি বলেছিলেন, সেসব হারানো কথাও আবার ভুল করে জাগিয়ে তুলতে চাইনে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য পরিবেশন করার পালা যখন এল, তিনি ডায়াসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কাটাকাটা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা হবে বাংলাদেশের জনগণের মুখের ভাষার কাছাকাছি,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাতে করে যদি পশ্চিম বাংলার ভাষার চাইতে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা, বিশেষ করে উপন্যাসের ভাষা সম্পূর্ণ একটি আলাদা খাতে প্রবাহিত হয়ে যায়, সেটা সকলের স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া উচিত। ইলিয়াস সাহেবের সোজাসাপটা এই দর্পিত উচ্চারণ পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের মোড়লদের যে ভালো লাগেনি সে সন্ধ্যাবেলাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কলকাতার সর্বাধিক প্রচারিত 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা' গ্রাণ্ড হোটেলে বাংলাদেশের লেখকদের একটি ডিনারের মাধ্যমে আপ্যায়িত করেছিলেন। ওই ডিনারে বাংলাদেশের অন্য সকল অংশগ্রহণকারী লেখককে নিমন্ত্রণ করা হলেও ইলিয়াসকে ডাকা হয়নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আনন্দবাজার পত্রিকার এই ধরনের শালীনতাহীন আচরণে ভয়ংকর ব্যথিত এবং অপমানিত বোধ করলেন। একথা তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমাদের কাছে অত্যন্ত ক্ষোভ এবং বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তিনি এরকম একটা দৃঢ় সংকল্পও আমাদের কাছে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা কিভাবে বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষার অনুবর্তী হয় তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করবেন। আনন্দবাজার এবং আনন্দবাজারের তথাকথিত উচ্ছিষ্টভোজী এপার-ওপারের মোড়লদের দেখিয়ে দেবেন। মুখ্যত এই সংকল্প থেকেই 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি রচনা করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

খোয়াবনামা উপন্যাসটির জন্য যে সময়সীমাটি তিনি ছকিয়ে নিয়েছিলেন, আধুনিক বাঙালী জাতির বিকাশের জন্য এই সময়টির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর ইংরেজরা যখন তৎকালীন সুবে বাঙলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে, তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কে আশ্রয় করে এই উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত।

বাঙলার লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে সেই সময়টা হবে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনের পরবর্তীকাল। সে সময়ে কোম্পানীর দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইংরেজের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার, দেশ শাসনের দায়িত্ব ঠুঁটো জগন্নাথ নবাবের ওপর। সেই সময়ের কথা -- যখন খরা এবং অনাবৃষ্টিতে সারা বাঙলার মাঠের ফসল জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল এবং নেমে এসেছিল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। সেই দুর্ভিক্ষে বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং কোম্পানীর নিযুক্ত দেওয়ান সেতাব রায় এবং রেজা খাঁ বাঙলা থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করেছিল।

বাঙলার প্রথম সার্থক উপন্যাস-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়টাকেই উপজীব্য করে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' রচনা করেছিলেন। উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমের আনন্দমঠ কতটুকু সার্থক সেটা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়। তারপরেও একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, আনন্দমঠ বাঙলার রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে একটি

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম 'সুজলং-সুফলং-মলয়জং শীতলং-বন্দেমাতরম্' যে গানটি সংযোজিত করেছেন, এটি রচনা করেছিলেন মূল উপন্যাস লেখার তিন বছর পূর্বে। বঙ্কিমের মৃত্যুর সত্তর বছর পরে এই বন্দেমাতরম্ গানটিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের দলীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছিল। বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বঙ্কিমের আনন্দমঠকে তাঁদের প্রেরণা-পুস্তক বলে মেনে নিয়েছিলেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের যে ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড একটি হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের উপায় হিসেবে বঙ্কিম চিহ্নিত করেছিলেন, দেখা যাবে পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সে ধরনের সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ডকেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় বলে কবুল করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেহাত একটা মনগড়া কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে আনন্দমঠ রচনা করতে প্রবৃত্ত হননি। আনন্দমঠ উপন্যাসের সত্যিসত্যি একটা বাস্তবভিত্তি ছিল। বাঙালী জাতির প্রতিরোধ-সংগ্রামের ইতিহাসে ফকির এবং সন্ন্যাসীর মিলিত বিদ্রোহ একটা সম্মানজনক অধ্যায় যোগ করেছে। সে সময়ে মুসলিম ফকির মজনু শাহ্ এবং হিন্দু সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক দুজনে মিলেমিশে তাঁদের দলবল নিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উঁচিয়ে তুলেছিলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রূপায়িত করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর কলমের এক খোঁচায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথসংগ্রাম থেকে মুসলমানদের বাদ দিয়ে হিন্দুসন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের একমাত্র নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এটা ছিল বঙ্কিমের সজ্ঞানকৃত একটি অপরাধ। এই অপরাধের ওপর ভিত্তি করেই বাঙলার পরবর্তী রাজনৈতিক জাগরণের স্বরূপ এবং বিকাশ ঘটেছে। প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে মুসলমান ফকিরদের ভূমিকা বাদ দিয়ে বঙ্কিম বাঙলার সমগ্র মুসলিম সমাজকে ইতিহাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক হতেন, তাঁর কল্পনাবৃত্তি যদি যথেষ্ট বেগবান না হত, যদি তিনি তৎকালীন হিন্দু জাগরণের মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে না চাইতেন, যদি তাঁর প্রকৃত ইতিহাস-জ্ঞানের ঘাটতি থাকত, যদি তিনি ব্রিটিশের বিভাজন-নীতি সম্পর্কে অনওয়াকেবহাল থাকতেন, তাহলে আনন্দমঠ উপন্যাসটি হয়তো তিনি এভাবে রচনা করতে পারতেন না। সব জেনে, সব বুঝে ইতিহাসের ধারা-পরম্পরায় বিকৃতি ঘটিয়ে এই উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন। পেছনে কি ঘটে গেছে, তার মধ্যে কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা, সেটা বঙ্কিমের ভাবনার বিষয় ছিল না। আগামীতে তিনি কি প্রতিষ্ঠা করতে চান সে চিন্তাটি তাঁর মনের সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। বঙ্কিমের সময়ের অন্যান্য প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষদের চেয়ে একটা বিষয়ে বঙ্কিম আলাদা ছিলেন। তাঁর মনে একটি রাষ্ট্রচিন্তা জন্ম নিতে পেরেছিল। দুর্ভাগাবশত সেটি ছিল হিন্দুরাষ্ট্র। পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের মধ্যে বঙ্কিম এই হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটি চারিয়ে দিয়েছিলেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও তাঁর খোয়াবনামা উপন্যাসের জন্যে এই সময়টিকে বেছে নিয়েছিলেন। ফকির মজনু শাহ্ এবং সন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের সম্মিলিত সংগ্রামের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে তাঁর উপন্যাসের উন্মোচন প্রক্রিয়াটির সূচনা করেছিলেন। আধুনিক বিশ্লেষণে উপন্যাস একটি সোশ্যাল ডিসকোর্স। যে সমাজে মানুষ বাস করে সে সমাজের মানুষ যে পরস্পরের সঙ্গে চিকন-মোটা নানারকম সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ সেই সম্পর্কগুলোর যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করাই হলো উপন্যাস-লেখকের আসল কাজ। অবশ্য লেখকদের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। কেউ সোশ্যাল ডিসকোর্সটিকে খুন করে উপন্যাস লেখেন। কেউ সোশ্যাল ডিসকোর্সটিকে প্রাণবান এবং গতিশীল করে তোলার জন্য উপন্যাস রচনা করেন। যদি ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে পরখ করে দেখা হয়, দেখা যাবে বঙ্কিম একটি অলীক মনগড়া ফল্স ডিসকোর্সের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর বয়ান এবং বিশ্লেষণ প্রসারিত করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাসের আসল প্রেক্ষাপটটি বিচার করলে অবশ্যই একটি জিনিস পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। বঙ্কিম যে ফল্স ডিসকোর্সটি তৈরি করেছিলেন, সেটি ভেঙে চুরমার করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ডিসকোর্স, যেখানে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে ইতিহাসের অংশ দাবী করে এবং ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় এক অন্যের শরিক সেরকম একটি নতুন ডিসকোর্স নির্মাণ করতে সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এটি একটি মহত্তম ঘটনা। কারণ বঙ্কিম এবং উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য হিন্দু-চিন্তানায়করা চিন্তার মাধ্যমে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে দিয়েছিলেন, ইলিয়াস বাঙলার হিন্দু-মুসলমানকে নিয়ে একটি আধুনিক ডিসকোর্স নির্মাণ করার বেলায় তার ভিত্তিমূলে কামান দেগে অনেকাংশে ধ্বসিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তথাপি পুরোপুরি সফল হয়েছেন একথা বোধকরি বলা যাবে না।

My All Garbage

এখন আমি খোয়াবনামা উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা সকলেই তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। এমনকি তাঁরা যখন পুরনো পুঁথির বিষয় বয়ান করেন, সেগুলো ইলিয়াসকে এন্তার মুসলমানী পুঁথি ঘেঁটে রচনারীতিটি অনেক কষ্ট করে শিখে নিতে হয়েছে। বাঙলা অঞ্চলের মুসলমানী পুঁথিসমূহ বাঙালী মুসলমানের পশ্চাৎপদ মানসিকতার পরিচয়চিহ্ন ধারণ এবং বহন করে। আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সন্তানদের মনেও এই পুঁথিসমূহের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব অতি সহজে লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও একটি কথা সত্য যে, এই পুঁথিসমূহের মধ্যে দিয়েই বাঙালী মুসলমান সমাজের কালেকটিভ মাইণ্ড তথা যুথচারী মানসটির প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালী মুসলমানের শাসন বিশ্লেষণের বেলায় এই পুঁথিসমূহের প্রয়োজন অপরিহার্য সে কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই পুঁথিসমূহে আরবী-ফার্সী-উর্দু এবং মুসলমানদের ঘরোয়া ব্যবহৃত শব্দগুলো অবলীলায়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্থান করে নিয়েছে। কেন স্থান করে নিয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা অনায়াসে দাঁড় করানো যায়। সমাজে এই সকল বিদেশী শব্দের চল্ হয়ে গেছে। তাই সাহিত্যেও সেগুলোর ছাড়পত্র মিলেছে। আরবের মানুষ, ইরানের মানুষ কিংবা পাঞ্জাবের মানুষ, ধর্মীয়ভাবে তাঁরা মুসলমান হলেও তাঁদের কেউ এই পুঁথিগুলো রচনা করেননি। বাঙালী মুসলমানরাই এই পুঁথিগুলোর রচয়িতা। তাঁরা পুঁথি লিখে একটা সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। আরবী-ফার্সী শব্দের আধিক্য সত্ত্বেও এই পুঁথির ভাষাটি নির্ভেজাল বাংলা ভাষা। মুসলমান সমাজকে নিয়ে যখন কোনো সত্যিকার ডিসকোর্স রচিত হয় তাতে এই পুঁথিসমূহ, যেগুলোতে বাঙালী মুসলমানের সামাজিক মনের প্রকাশ ঘটেছে, সেগুলোর উপস্থাপনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সচরাচর আমরা যে বাংলা ভাষাটি ব্যবহার করি, যে ভাষাতে বইপত্র লেখা হয়, সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশন করা হয় — ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরই হলো তার সূতিকাগার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃত অভিধান এবং ব্যাকরণ ঘেঁটে আধুনিক বাংলা ভাষার নামে যে কৃত্রিম ভাষারীতিটি বাঙালী জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, বাঙলার মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সে লেখ্য-ভাষাটির দূরত্ব ছিল যোজন পরিমাণ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের উদ্ভাবিত ভাষারীতিটি এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকেনি, ভাষা কখনো স্থির থাকে না। তাতে অনেক ব্যয়, রূপান্তর, পরিবর্তন এবং ভাঙচুর হয়েছে। তারপরও একটি কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের উদ্ভাবিত ভাষারীতিটির সঙ্গে ভাগিরথী-পাড়ের অঞ্চলসমূহের লোকের ভাষার সংশ্লেষ, সংমিশ্রণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষার কলেবরটি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত অর্থে এটাকে বাঙলার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল ভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার কোনো উপায় নেই।

ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ার পর বাংলা ভাষার একটি নতুন বাঁক সৃষ্টি হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সে জিনিসটি করেছিলেন, এতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের অনুবর্তী করে নির্মাণ করে তোলার সব ধরনের প্রয়াসই চালানো হয়েছে। বাঙলা অঞ্চলে মুসলিম শাসন চালু হওয়ার পর বাংলা ভাষায় এন্তার আরবী-ফার্সী-উর্দু-তুর্কী শব্দ অনুপ্রবেশ করতে থাকে। অনেকগুলো শব্দকে সাহিত্য-রচয়িতারাও ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল / অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।' 'যবন' শব্দের অর্থ যদিও আদিতে গ্রীকদের বোঝানো হত, পরবর্তীকালে মুসলমানদেরই বলা হত যবন। মুসলমানরা আরবী-ফার্সী শব্দ অধিক ব্যবহার করে থাকেন; তার প্রভাব এত ব্যাপক যে, ভারতচন্দ্রের মতো একজন প্রভাবশালী কবির পক্ষেও এই প্রভাব অগ্রাহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা জোর করে যাবনী-মিশাল শব্দ বাংলা ভাষা থেকে খেদিয়ে বিদায় করে সেই ফাঁক সংস্কৃত শব্দ দিয়ে পূরণ করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খোয়াবনামা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের বেলায় সোশ্যাল ডিসকোর্সের মতো একটি ভাষা বিষয়ক ডিসকোর্সেরও অবতারণা করলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত উন্নততর এবং সূক্ষ্মানুপুঙ্খ সোশ্যাল ডিসকোর্স-ল্যাংগুয়েজ ডিসকোর্সের সূত্রপাত ঘটিয়ে চিন্তা এবং অনুভবের ক্ষেত্রে উপলব্ধির দিগন্ত অনেকদূর প্রসারিত করলেন। এই দুটি অভিনব বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের তুলনা হতে পারে না।

খোয়াবনামা উপন্যাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সামাজিক এবং ভাষা বিষয়ক ডিসকোর্স ছাড়া, একটি রাজনৈতিক ডিসকোর্সেরও অবতারণা করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি হালে পানি পেতে শুরু করলে একটা সময়ের মধ্যে তা হিন্দু এবং মুসলিম সমাজের মধ্যবর্তী বিদারণ রেখাটিকে অনেকদূর প্রশস্ত এবং সাঁকো-বন্ধনের অসাধ্য করে তুলেছে। অর্থাৎ বাঙালী জাতিকে বিভক্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীকে দুটোর একটি পছন্দ করতে হচ্ছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অবশ্য তাঁর উপন্যাসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে বাঙলার এবং বাঙালীর ঐক্য অটুট রাখার উপায় হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শোষিত মানুষরা একজোট হয়ে হিন্দু-মুসলিম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শোষিত মানুষের ঐক্যটি যদি জোরদার ও স্থায়ী হতে পারত, হয়তো বাঙলা-বিভাগ ঠেকানো সম্ভব হত। এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত নীতি এবং রাজনৈতিক কৌশলগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করা যায়। বাঙলা দেশের সমাজ-বিকাশের তৎকালীন স্তরসমূহের মধ্যে তেভাগা আন্দোলন এর কৃষকদের বাঙলা তথা ভারতের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কতটুকু ছিল? তারপরেও কথা থেকে যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেছে, তার চেয়ে ভারত-বিভাগের পক্ষে যে ভূমিকা পালন করেছে সেটা একটুও কম নয়।

সামাজিক এবং ভাষাভিত্তিক ডিসকোর্স দুটোর মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমগ্র বাঙালী জাতির নতুন পরিচয় সন্ধান করার মধ্যে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক ডিসকোর্সটি সে তুলনায় অনেকাংশে দুর্বল। এটি একটি প্রকৃত ডিসকোর্স হয়ে উঠতে পেয়েছে কিনা তা নিয়ে আমার মনে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। ইলিয়াস সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ রাজনীতির বিপরীতে স্থাপন করেছেন। এই জায়গাটিতে অবজেকটিভিটির পরিবর্তে তাঁর ইচ্ছাপূরণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি শেষের দিকে ভারত-বিভাজনের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। সুতরাং বাঙলা-বিভাজনের পেছনে কংগ্রেস এবং

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মুসলিম লীগকে যেভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে, কমিউনিষ্ট পার্টির দায়দায়িত্ব তার চেয়ে কম ছিল না। এ কথা ঠিক যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে রাজনৈতিক ডিসকোর্সটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তার বিপরীতে অন্য কি ডিসকোর্স নির্মাণ করা যেত সে ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো মতামত তুলে ধরাও আমার পক্ষে বর্তমান মুহূর্তে সম্ভবপর নয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা অবশ্যই একটি মহাকাব্য। এই রচনার ব্যাপ্তি এবং পরিধি সমস্ত বাঙালী জাতির মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কি ধরনের মহাকাব্য? পরাজয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কি মহাকাব্য রচনা সম্ভব? সবিনয়ে বলব, অবশ্যই সম্ভব। ইলিয়াসের খোয়াবনামা একটি মহাকাব্য।

১৯৯৯ উপলক্ষের লেখা

(২০০১)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

স্মরণ : দীনেশচন্দ্র সেন

কথাটা এভাবে শুরু করি। দীনেশ বাবু একবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনেশ বাবুর মুখের উপর ঠিক দরজা বন্ধ করে দেননি। বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলেন, বসতে দিয়েছিলেন। আপ্যায়ন কিছু করেছিলেন কিনা জানা যায়নি। তারপর বঙ্কিমবাবু যে-বিষয়ে দীনেশ সেনের সঙ্গে আলাপ করতে থাকলেন সেগুলো এরকম : 'তোমাদের ওদিকে সোনামুগের দাম কত? চালের সের কত করে বেচা হয়? কচি লাউ-কুমড়ো কি বাজারে ওঠে?' এক কথায় যাবতীয় কৃষিপণ্যের দরদাম দীনেশ বাবুর কাছ থেকে জানার জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দীনেশ বাবু কোন্ ধরনের মনোভাব নিয়ে বঙ্কিমের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেটাও আমরা জানি না।

বঙ্কিমের গাম্ভীর্য, একরোখামী, পাণ্ডিত্য এবং ঔদ্ধত্য সম্পর্কে যাঁরা অবহিত আছেন, অবশ্যই একমত হবেন যে, তিনি একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করে কিংবা ললাটের সামান্য ভ্রূকুটিতে যে কোনো রথী-মহারথীকে ধ্বসিয়ে দিতে পারতেন। দীনেশ সেনের কাছে ধানচালের দাম জিজ্ঞেস করে বঙ্কিম ভাবে-ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমাকে আমি সাহিত্য বিষয়ে আলাপ করার যোগ্য মনে করি না। তার চাইতে ধানচাল-তরিতরকারি বেচাকেনার দরদাম জানা থাকলে কিছু জানাও, সেগুলো ডেপুটিবাবুর কাজে আসবে। দ্রব্যমূল্যের ওপর একটা রিপোর্ট তিনি সদরে পাঠাতে পারেন। দীনেশ সেন সম্পর্কে বঙ্কিম যে ধারণাটি গঠন করেছিলেন তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের দুটি পংক্তির তুলনা দেওয়া যেতে পারে —

দেড় পয়সার পুঁজি লইয়া
করতে আছ কাল বেপার
ও বাজারের ভাও জানো না
ছুইট্যা দোকানদার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

২

বঙ্কিম-দীনেশের এ সাক্ষাৎকারের সংবাদটি আমাদের কাছে একটি সাহিত্য বিষয়ক রম্যসংবাদ মাত্র। এরকম অনেক সংবাদ শিল্প-সাহিত্যের মহারথীদের নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। তার কোনোটা ঝাল, কোনোটা টক, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা তিক্ততায় ভরা। বঙ্কিম-দীনেশের এই সাক্ষাৎকারটি অন্য দশটা মামুলি সাক্ষাৎকারের পর্যায়ে পড়ে না বলেই আমার ধারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীনেশ সেনকে অপমান করার জন্য তাঁর কাছ থেকে শিল্প-সাহিত্য আলোচনার বদলে ধান-চাল এবং সোনামুগের দাম জানতে চেয়েছিলেন। দীনেশ বাবুকে তিনি ভাবের ভাবুক মনে করতে পারেননি। অথচ দীনেশ সেন একেবারে তুচ্ছ মানুষ ছিলেন না। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমস্ত মানুষকে সুহৃদ মনে করতেন, চিঠিপত্র লিখতেন, বিপদে-আপদে খবরাখবর নিতেন তাঁদের চাইতে দীনেশ বাবু নিকৃষ্ট ছিলেন না। অবশ্য তাঁর গুটিকয় অপরাধ ছিল। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। এই দুটি বিষয় শুধু বঙ্কিমের কাছে নয়, তৎকালীন হিন্দু মধ্যবিত্ত উত্থানের সময় অনেক ঘটি-বাঙালীর কাছে অপরাধ বলে পরিগণিত হয়েছে। এমনকি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি অন্যান্য বিষয়ে অনেক উদার মানুষ ছিলেন, তাঁকেও দেখি দীনেশ সেনকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতে। বঙ্কিম তো ছিলেন নব্যবঙ্গের নেতা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাঙালী জাতির সামনে একটি রাষ্ট্রীয় রূপরেখা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমকে কেউ কেউ 'ঋষি বঙ্কিম' বলেন, কেউ সাধক মনে করেন। কেউ সাহিত্য-সম্রাট অভিধায় চিহ্নিত করেন, কেউ মনে করেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক। এ সমস্ত কথা কমবেশি সত্য। কোনোটা অল্প, কোনোটা বেশি। আমি মনে করি গোটা বাঙালীর চেতনায় বঙ্কিম যে অবস্থানটিতে এখনও আসীন রয়েছেন সেটার কারণ বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা। মুসলমান সমাজের কৃতবিদ্য লোকদের একাংশ ভয়ঙ্কর বঙ্কিম-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। তারও কারণ বঙ্কিমের রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়তার খণ্ডিত চিন্তা। বঙ্কিম আদর্শগত দিক দিয়ে বাঙালীর মস্ত ক্ষতি করে গেছেন। বর্তমান মুহূর্তে সে বিষয়ে কিছু বলার অবকাশ নেই।

বঙ্কিম শিল্প-সাহিত্যে এবং জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সমুন্নত আদর্শ তৈরি করেছিলেন সেটাকে পাশকাটানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁর সর্বজনীন মানবতার আদর্শ শিল্প-সাহিত্যের স্তর থেকে সামাজিক স্তরে কখনো নামতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রামমোহন, কেশব সেন, প্যারীচরণ এঁদের অন্যবিধ যোগ্যতা এবং পারঙ্গমতা যাই থাকুক না কেন, কারো মধ্যে ছিটেফোঁটা রাষ্ট্রচিন্তার বালাইও ছিল না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। বঙ্কিমই একটি রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা খাড়া করে তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। সেটা অন্য সকলকে নির্বিবাদে মেনে নিতে হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ীর হিন্দু মেলায় ব্রাহ্মসমাজের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেতা রাজনারায়ণ বসু 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' শীর্ষক যে রচনাটি পাঠ করেছিলেন, আমার ধারণা, তার প্রেরণাও তিনি বঙ্কিম থেকে পেয়েছিলেন। একটুখানি অনিশ্চিত থেকে গেলাম, রাজনারায়ণ বসু এবং বঙ্কিম বয়সে কে বড় কে ছোট, এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। বঙ্কিমের মৃত্যুর সত্তর বছর পরে তাঁর লেখা 'বন্দেমাতরম' গানটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। এটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার দাবীও উঠেছিল। মুসলমানদের প্রতিবাদের মুখে দাবীটি টেকেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বঙ্কিম বাঙলা নয় শুধু গোটা ভারতের রাজনৈতিক উত্থানপটে একটা মস্ত ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'আনন্দমঠ' সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বাইবেলের মতো প্রেরণাপুস্তক ছিল। বঙ্কিমের কল্পিত সন্তান সম্প্রদায়ের আদর্শে বাঙালী হিন্দু সমাজে 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' এইসব সন্ত্রাসবাদী দল জন্ম নিয়েছিল। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে চিন্তানায়ক বঙ্কিমের যে সমুন্নত অবস্থান ছিল, সেদিক দিয়ে বঙ্কিমকে চ্যালেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবু, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তাবাদের যে আদর্শটি বঙ্কিম খাড়া করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটি নাকচ করা কোনদিনই সম্ভব হয়নি। এমনকি ব্রাহ্ম মতবাদে তাঁর পূর্ণবিশ্বাস সত্ত্বেও। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের প্রধান চেলা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তানায়ক শঙ্করাচার্যের আদর্শে রামকৃষ্ণ-আশ্রম তৈরি করতে লেগে গিয়েছিলেন। এটাকেও বঙ্কিমের মূল্যচিন্তার ভিন্ন একটি মাত্রা ছাড়া বিচার করার উপায় নেই।

My All Garbage

৩

গুছিয়ে বলতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু অবকাশ অল্প। আমরা সরাসরি দীনেশ সেনের প্রসঙ্গে চলে আসি। দীনেশ সেনের প্রধান কীর্তি কি, সে বিষয়ে এখনো মীমাংসা হয়নি। কেউ বলবেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা', কেউ বলবেন 'বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য', আবার কেউ কেউ 'বৃহৎবঙ্গ' দুই খণ্ডের কথা বলতে পারেন। বর্তমান আলোচনায় ইংরেজীতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলাম না। বঙ্কিম যে সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তাকে তাঁর রচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সরাসরি বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে দীনেশচন্দ্র তার একটা বিপরীত যুক্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমার ধারণা দীনেস সেনের এই নীরব এবং কর্মিষ্ঠ প্রতিবাদ বঙ্কিমের লেগেছিল এবং তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে খানিকটা হলেও আউলা-ঝাউলা করে দিয়েছিল। এ কারণে দীনেশ সেনকে বঙ্কিম প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পারেননি।

সাম্প্রতিককালে দীনেশ বাবুর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থটি নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, দীনেশ বাবুর চিন্তা-চেতনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার একটা সময়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এসেছে। পশ্চিম বাংলার সুধী সমাজের একটা অংশ সেটা অনুভব করতে পেরেছেন। এটা আশার সংবাদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিবাদে আরেকটি রাষ্ট্রচিন্তার যে বীজ দীনেশ সেনের রচনার মধ্যে ভ্রূণাকারে ছিল, সেটা আমরা বাংলাদেশে অনেক বেশি পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারি। বাঙলা যে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টি, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব যে অত্যন্ত ক্ষীণ, একথা তাঁর মতো কেউ বলতে পারেননি। আমার তো মনে হয়, মুখ্যত এ কারণে দীনেশ সেনের যে মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল, কেউ তাঁকে সেটা দেয়নি।

আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলব। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় ছিলাম। সে সময়ে মটলেনে 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে গিয়ে আমি কবি সমর সেনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সমর সেন দীনেশ সেনের নাতী। কথাবার্তার এক পর্যায়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে দীনেশ সেনের কীর্তির কথা বলেছিলাম। সমর সেন স্বল্পভাষী ব্যক্তি। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমার কথা মোটেও বিশ্বাস করেননি। পরে সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' পাঠ করে এ ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয়েছে, দাদা মশাইয়ের যোগ্যতা বিষয়ে তাঁর অধিক পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল না। সমর সেনের স্মৃতিকথায় দীনেশ সেন সম্পর্কে আমরা মাত্র দুটি প্রধান তথ্য জানতে পারি। সেটা হল, দীনেশ সেন একবার সমর সেনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'নাতী তোমার সঙ্গে একটা বড়লোকের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। তারা তোমার বিলেতে যাওয়ার খরচ দেবে।' নাতী জবাব দিয়েছিলেন, 'দাদামশাই, কাজটা আপনি ঠিকই করেছেন; কিন্তু আমি পুরুষাঙ্গ বন্ধক দিয়ে বিলেত যাব না।' দীনেশ সেনের দ্বিতীয় গুণের কথা সমর সেন যেভাবে বলেছেন সেটা এরকম : চোগা-চাপকান পরা ত্রিপুরার মহারাজকে সামান্য টাকার জন্য বুড়ো দীনেশ সেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। এ দৃশ্যটা দেখে সমর সেনের দাদা মশাইয়ের উপর খুবই ঘৃণা জন্মেছিল।

আমার তো ধারণা, সমর সেনের মতো মেধাবী এবং পরিচ্ছন্ন লেখক বাংলা সাহিত্যে দুজন খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে তিনি বাংলা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপরে যতদিন বেঁচে ছিলেন বাংলাতে কোনকিছু লেখেননি। সমর সেনের বাইশ-তেইশ বছরের লেখার তুলনা করলে ধারণা করা সম্ভব হবে ঐ বয়সের সমর সেনের রচনার তীক্ষ্ণতা রবীন্দ্রনাথের চাইতে কত বেশি। বাকি পঞ্চাশ বছর যদি তিনি বাংলা ভাষায় লিখতেন, বাংলা সাহিত্য কি বিশাল এক মনীষার সৃষ্টি করতে পারত! কিন্তু বড় বেদনার কথা, সমর সেনের ক্ষেত্রে সেটি ঘটেনি। সমর সেনের মতো তীক্ষ্ণ বিচারশীল মেধাবী মানুষের পক্ষেও দীনেশ সেনের সারাজীবনের সাধারণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। আমি মনে করি তার কারণ একটাই, সমর বাবু সমাজের সবরকম অসুখের দাওয়াই সন্ধান করেছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বে। জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বের মধ্যেও অর্থতত্ত্বের মতো কতিপয় গুরুত্বসম্পন্ন সত্য নিহিত রয়েছে, সে বিষয়টা চিন্তা করার অবকাশ কখনো সমর বাবুদের হয়নি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কথা বাড়াব না। বঙ্কিম যে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তাটি খাড়া করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে দৃঢ় একটা অবস্থান নিয়ে দীনেশ সেন সারাজীবন সাধনা এবং সংগ্রাম দুই-ই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভর করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্যবাদ, গীতা, বেদ এ সমস্ত জিনিসের ওপর। এগুলোর ভেতর থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উপাদান তিনি বের করে এনেছিলেন। কিন্তু দীনেশ বাবুর সন্ধানের প্রক্রিয়াটি ছিল ভিন্নরকম। তিনি শাস্ত্র নয়, সন্ধান করেছিলেন সমাজ। ধর্ম নয়, তাঁর উপজীব্য ছিল মানুষ। সে মানুষ হিন্দু না মুসলমান এটা তাঁর ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। লোকায়ত জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে যে মর্মমধু তিনি আহরণ করেছিলেন, তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বঙ্কিমের মতো অত দার্ঢ্য নিয়ে দাঁড়াতে না পারলেও, গভীরতা অনেক অনেক গুণে বেশি। বাঙলার পল্লীসমাজ, বাঙলার লোকসাহিত্য, বাঙলার লোকসংস্কৃতি — এ সমস্ত জিনিসকে তাঁর মতো এত হৃদয় দিয়ে কেউ গ্রহণ করেনি। তাঁর এই যে অনিদ্র অন্বেষণ, এর পেছনে একটা বিশ্বাসের আগুন ছিল। বঙ্কিম তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভার প্রভাবে হিন্দু সমাজকে যে গোটা বাঙালী জাতীয়তার প্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি উল্টো ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন, তার প্রতিবাদ করাই ছিল দীনেশ সেনের মূল লক্ষ্য।

অল্পের মধ্যে শেষ করতে হচ্ছে। দুজনের চিন্তাধারার ফারাক কতদূর, দেখবার জন্য আমরা একটা কি দুটো বিষয় উল্লেখ করব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে দেখিয়েছেন শিশুপাল, জরাসন্ধ এ সমস্ত রাজাদের হত্যা করে কৃষ্ণ ধর্মসম্মত কাজ করেছেন। কারণ বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক মনে করতেন। পক্ষান্তরে দীনেশ সেন শিশুপালবধ এবং জরাসন্ধবধকে শ্রীকৃষ্ণের অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু তৎকালীন প্রাচীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে এঁরা স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাইছিলেন, বঙ্কিম সেটা মেনে নিতে পারেননি। সেই জন্যে যে কোনো ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন তাকে কোনো না কোনোভাবে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হতে হয়েছে। বঙ্কিমের মতে এঁরা পাপী বলে নিহত হয়েছেন। কিন্তু দীনেশ বাবু এঁদের সকলকে দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাপ্রেমিক, বীর চরিত্রের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তার যে ধারাটি বঙ্কিম তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে আবিষ্কার করে সমস্ত জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, দীনেশ বাবু কোনরকম হৈ-চৈ না করে তাঁর সারাজীবনের কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখানেই দীনেশ বাবুর মহত্ত্ব।

আমি বিশ্বাস করি বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মরা জন্তুর দাঁতের মতো সেটা পড়ে থাকবে। যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান এবং দার্শনিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বঙ্কিম তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, তার পেছনে হাতুড়েপনা ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি নেই। দীনেশ বাবু যে পথে একটি রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কামনা করেছিলেন সে-পন্থাটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক, অনেক বেশি মানবিক। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের সেটা মেনে নেওয়ার মতো উদারতা ছিল না। বাঙলার ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার এই পর্যায়ে দীনেশ সেন ছাড়া আর কোনো মনীষার প্রতি আস্থা সহকারে তাকাতে পারব, তেমন কাউকে দেখি না। আমি অনেক কালের ব্যবধান থেকে এই কর্মীপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত সালাম নিবেদন করছি।

১৯৯৫

নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ
(১৯৯৫)

My All Garbage

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথকেই জিজ্ঞেস করতাম

কথাটা সহজভাবেই বলে ফেলি। রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আমার মতো একজন তুচ্ছ মানুষকে দর্শন দিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু পড়েছি, যেটুকু জেনেছি তা থেকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ সত্যিসত্যি একজন বড় মানুষ। হিমালয় পর্বতকে যদি আরো পাঁচ মাইল উঁচু করে দেয়া হয়, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা স্পর্শ করতে পারবে না। বড় মানুষদের একটি বড় গুণ তাঁরা খুব সহজেই বুঝতে পারেন ছোট মানুষদের একটা মূল্য আছে। অত্যন্ত তুচ্ছ মানুষটিও অন্তরের দিক দিয়ে অত্যন্ত মহান। একমাত্র সত্যিকারের বড় মানুষরা সেটা অনুধাবন করতে পারেন।

ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের একজন বড় মানুষ। রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধের মাঝখানে আমি হয়রত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর নাম করতে পারলে খুশি হতাম। কে কিভাবে নেন এই ভয়ে খাজা মঈনুদ্দীনের গুণগ্রাম ব্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকলাম।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানব-মনীষার যে উৎসারণ ঘটেছে এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে বিষয়েও কিছু বলব না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার প্রকৃতি যেভাবে আবিষ্কার করেছেন, যেভাবে গল্প-কবিতা এবং গানে প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে সৃজন করেছেন, কোন্ বাঙালী তার আবেদন অস্বীকার করবে?

গ্যোতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার জীবনের মহত্তম মানুষ। জীবনের সমস্তরকম সমস্যা-সংকটে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেছি। আমার বোধবুদ্ধি যখন একটু সেয়ানা হয়ে উঠল একটা প্রশ্ন নিজের মধ্যেই জন্ম নিল। আমি মুসলমান চাষা-সম্প্রদায় থেকে আগত একজন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কিছু লিখেননি কেন? এ প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগলেও প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস করিনি। আমাদের দেশের গোঁড়া মুসলমানেরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে সকল অপপ্রচার করে থাকে আমার প্রশ্নটিকেও তাদের সঙ্গে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গুলিয়ে ফেলে আমাকে রবীন্দ্র-বিরোধীদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করায় সেই ভয়ে অনেকদিন চুপচাপ ছিলাম। এখন আমার একটা উপলব্ধি এসেছে, যে যেভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করুক, আমার মন যেভাবে বলছে আমি প্রশ্নটা সেভাবে উচ্চারণ করব। এখানকার রবীন্দ্রভক্তরা হয়তো একটু রুষ্ট হবেন। তবে আমি নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথের রুহ্-মোবারক আমার প্রশ্নে কষ্ট পাবে না। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি ফুলের গন্ধ, পাখির গান, এমনকি গোধূলীর আলোর কাছেও নিজেকে ঋণী ভাবতেন। সম্প্রতি 'ফায়ার অব বেঙ্গল' শীর্ষক এক হাঙ্গেরীয়ান মহিলার একটি চমৎকার উপন্যাস আমি পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। ঐ উপন্যাসের এক চরিত্রের উক্তি : 'রবীন্দ্রনাথ যখন ধ্যানে বসতেন ঘাসের অঙ্কুর গজানোর শব্দও তিনি শুনতে পেতেন।' এই কথাটা আমার আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আমার প্রশ্নটিতে আসি। অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রশ্ন। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুসলমান প্রজাদের নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প কিংবা উপন্যাস কেন লিখলেন না? এই মুসলমান প্রজারাই তো রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বের ঠাকুর জমিদারদের অন্নসংস্থান করত। এই মুসলমান প্রজাদের জীবনের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যত বেশি জানতেন, গোটা ভারতবর্ষে সেরকম আর একজন মানুষও ছিলেন কিনা সন্দেহ। এই প্রজাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চারণ করেছেন। কিসে তাদের মঙ্গল হয় সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং নানা বাস্তব কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছেন। এ প্রজাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে এনেছিলেন। তারপরেও রবীন্দ্রনাথ মুসলমান চাষাদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প লিখতে পারলেন না কেন?

হ্যাঁ, কথা উঠতে পারে তিনি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে জানতেন না তাই লিখেননি। যদি সঠিকভাবে মুসলিম চরিত্রকে উপস্থিত করতে না পারেন হিতে বিপরীত ঘটে যাবার সম্ভাবনা ছিল বেশি। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ কোন ঝুঁকি গ্রহণ করেননি। সেক্ষেত্রে আমার কথা হলো রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে তাঁর অনভিজ্ঞতা এবং মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞতা কি কাটিয়ে উঠতে পারতেন না? আমার তো মনে হয় না এটা রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল। তাই, যদি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হত, পদধূলি নেয়ার পর খুব বিনীত ভাষায় আমার বক্তব্য তাঁকে শোনাতাম। আমি বলতাম, 'আপনাকে আমি পুরোপুরি আমার আপন করতে চাই কিন্তু পারি না। আপনি আমার সমাজ, মানে বাঙালী মুসলমান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প লেখার উদারতা প্রদর্শন করতে পারেননি। হে অপূর্ব প্রতিভাশালী কবি, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন। এই মুসলমান চাষারাই উদয়াস্ত মেহনত করে আপনাদের পরিবারের সকলের অন্ন সংস্থান করেছে? আপনি কি একটি গল্প লিখে তাদের স্বীকৃতি দিতে পারতেন না?

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমি রবীন্দ্রনাথকে করতাম সেটি এরকম : 'রামমোহন রায়ের ঘরানা থেকেই আপনার উৎপত্তি। রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ইসলামের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্মের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটি তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যদিও পরে ব্রাহ্ম মতামতের সঙ্গে বেদ-উপনিষদের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। অনেক কীর্তিমান গবেষক এখনো তো মনে করে থাকেন আসলে ব্রাহ্মধর্ম ইসলামের প্রভাবসঞ্জাত একটি রূপান্তরিত মতবাদ। আপনার মহর্ষি পিতা দেবেন্দ্রনাথও এই সত্য একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই ধ্যানের নির্জনে তিনি ইরানী কবি হাফিজের বয়াত উচ্চারণ করতেন। ব্রাহ্মধর্মের যে ঘরানা ইসলামের সঙ্গে তার দূরত্ব খুব অধিক নয়। সারাজীবন আপনি অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। ইসলাম এবং ইসলামের ঋষিদের সম্পর্কে এমন মৌন থেকে গেলেন কেন? আপনি মনেমনে নিজেকে হিন্দু ভেবেছেন তাতে তো দোষের কিছু নেই। সমস্ত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হিন্দু ভাবতে পারে — পরবর্তীকালে নানারকম রাজনৈতিক প্রশ্ন এসে বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষ আপনাকে হিন্দু কবি মানে, হিন্দুস্থানের কবি বলে সম্মান করেছে, কিন্তু গড়পড়তা হিন্দু আপনাকে কি তাঁদের একজন হিসাবে গ্রহণ করেছেন? আপনি যখন পারস্যে গেলেন, হাফিজের মাজার জেয়ারত করলেন, তখন এই প্রশ্নটা হঠাৎ করে আপনার মনে কেন জেগেছিল? যেভাবে আপনি সম্মানের সঙ্গে হাফিজের মাজার দর্শন করতে পারলেন একইভাবে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন কিনা? হিন্দু মন্দিরের দুয়ার বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি অর্জনের পরও আপনার জন্য কতটুকু উন্মুক্ত হয়েছিল?'

আনুপূর্বিক তসলিমা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ

(১৯৯৪)

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

Download 1000+ PDF Book
https://tori.top/pdfbk

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বলে কথিত সারা পাকিস্তান প্রসারিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলটি তখনো দ্বিখণ্ডিত হয়নি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবীর প্রতি এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিই ছিল সর্বাধিক দরাজকণ্ঠ এবং সোচ্চার। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নামকরণ পূর্ব বাঙলার স্থলে সরকারীভাবে পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা করা হলেও এই দলের অনুসারী তরুণ ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীবৃন্দ আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি এমনকি কাগজে-পত্রে সরকারী আইন ফাঁকি দিয়ে 'পূর্ব বাঙলা' নামটি ব্যবহার করতেন। পাকিস্তান সরকারের হোমরচোমরা মন্ত্রী থেকে শুরু করে, সরকারী আমলা এবং দক্ষিণপন্থী সমস্ত রাজনৈতিক দল এই সংগঠনটিকে ভারতবর্ষের চর, 'নেহেরু-এইডেড পার্টি' এবং ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকাশ্যে ধিকৃত করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

এই দলটির ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, সমাজতন্ত্র অভিমুখী অর্থনীতি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন, এই তিনটিই ছিল প্রধান দাবী। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবী তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রদেশসমূহেরও স্বায়ত্বশাসনের দাবী করতেন। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করতেন পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের আলাদা আর্থিক জীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতির বাধাহীন বিকাশের মধ্যেই গোটা পাকিস্তানী জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বেলুচিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় নেতা এবং প্রাগ্রসর রাজনৈতিক দর্শনের অনুরাগী কতিপয় কর্মী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ক্রমপ্রসারমান আমলাতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কতিপয় নেতার সঙ্গে মিলেমিশে একটি রাজনৈতিক সংগঠন খাড়া করেন।

ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের উত্থানপর্বে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা জনগণের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কানে অনেকটাই হেঁয়ালির মতো শোনাত। ধর্মহীন কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে যাঁরা বাস করেন, তাঁরাও যে হাত-পা-চোখ-কান বিশিষ্ট মানুষ, তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকারবার, লেনদেন এমনকি রাজনৈতিক গাঁটছড়া পর্যন্ত রচনা করা যায়, তা ছিল গোটা পাকিস্তানের সংখ্যাধিক জনগণের কাছে স্বপ্নেরও অগোচর। সুতরাং জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি এবং সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কথা যাঁরা বলতেন, তাঁদেরকে ইসলাম এবং পাকিস্তানের দুশমন, জাতীয় সংহতির মারাত্মক শত্রু ইত্যাকার নানা অভিধায় চিহ্নিত করা হত। সরকারী প্রচারযন্ত্র এবং নানা দলীয় পত্রপত্রিকাসমূহ এই 'জাতীয় শত্রু'দের প্রতি অতিশয় ক্ষমাহীন এবং সদা-সতর্ক ভূমিকা পালন করতেন। জনসাধারণের যে মুষ্টিমেয় অংশ জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ছিলেন, সমগ্র জনগণের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল সাগরে গোস্পদের মতো। মুষ্টিমেয়কে দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের চলে না। সব সময়ে সর্বসাধারণের মন কাড়ার দিকেই রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। সেই কারণে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের অধিকাংশের সমর্থন আদায় করার মানসে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরতেন। অবশ্য একই সঙ্গে অন্যান্য পাকিস্তানী প্রদেশগুলোর নামও যোগ করে দিয়ে তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী অপবাদটা ঠেকাতে চেষ্টা করতেন। আসলেও পশ্চিম পাকিস্তানী প্রদেশগুলো ছিল সামন্ত-শাসনে লাঞ্ছিত এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া। উপজাতীয় এবং প্রায় উপজাতীয় সমাজের জনগণের মধ্যে তাঁদের আন্দোলন অধিক প্রসারিত হতে পারেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণায় পশ্চিম পাকিস্তানী প্রদেশগুলোর তুলনায় ছিল অনেক অগ্রসর এবং নিজেদের প্রাদেশিক দাবীদাওয়ার প্রতিও বেশ সজাগ। বাস্তবেও এই অঞ্চলে শুরু থেকেই স্বায়ত্তশাসনের বেশ কিছু সমর্থক ছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা দিনেদিনে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

সেই সময়ে গোটা পাকিস্তানে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মোটামুটি সংগঠন ছিল এবং পিছনে জনসমর্থন ছিল, সেগুলোর নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কুৎসা-কীর্তন করতেন। ভারতের চর, নাস্তিক্যবাদের প্রবক্তা এবং পাকিস্তানের সংহতির শত্রু ইত্যাদি অপবিশেষণে চিহ্নিত করতেন। অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়ে বাঙালী জনগণের কাছে অধিকতর সুপরিচিত এবং বাঙালী জনগণের অত্যন্ত প্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর কথা উল্লেখ করার মতো। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যখন স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নটির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছিল সেই সময়ে তিনি একাধিকবার বলতে কুণ্ঠিত হননি, পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ নামে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়-দফা আন্দোলনকে ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর আন্দোলন জোরদার করেছে, যার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জন্ম, গোড়ার দিকে সেই একই আওয়ামী লীগ দলগতভাবে পাকিস্তানের মসনদে আসীন থাকার সময়ে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধিতাই করেছিল।

২

উনিশশো আটান্ন সাল থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানের ইতিহাসে যেমন তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসেও কতিপয় উল্লেখ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান ক্ষমতায় চড়ে বসলেন। ভারত-চীন এবং পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ লাগল। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হলো। জাতীয়-আন্তর্জাতিক এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্যভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওপর পড়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তির কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট আন্দোলনও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ছিল। তাই পার্টির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে থেকেই কাজ করতেন। কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যেও অনতিবিলম্বে এই ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং অচিরেই পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মস্কো ও পিকিং সমর্থক দুটি উপদল হিসাবে আপনাপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মস্কো-পিকিংয়ের অনুগত দুটি অংশই সংশ্লিষ্ট দু'দেশের রাজনৈতিক মন্ত্র-গুরুদের নির্দেশে পার্টিগত রণনীতি নির্ধারণ করলেন এবং আলাদা আলাদাভাবে সারা পাকিস্তানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবী তুলতে থাকলেন। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতীতে যা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উৎসস্থল ছিল, তার থেকে সরে গিয়ে দুই উপদলের নেতৃবৃন্দ গোটা পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। উপমহাদেশের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আয়ুব খান গণচীনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। আসলেও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে পাকিস্তানে চীনের পক্ষে একটা অনুকূল জনমতও গড়ে উঠছিল। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিং-সমর্থক অংশ, যেহেতু আয়ুব খান চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মতো অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে তুলছেন, তাই একনায়ক আয়ুব খানকেই সমাজতান্ত্রিক চীনের বন্ধু বলে ভাবতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দাবীতে ভারতকে ঠেকানো এবং আমেরিকা-রাশিয়া এই দুই দিককার মিলিত চাপ কিছুটা হাল্কা করার জন্য এই উপমহাদেশে পাকিস্তানকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজনকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিং-সমর্থক অংশ ক্রমশ আয়ুব খানের প্রতি অপ্রকাশ্যভাবে ঝুঁকে পড়ে। সারা পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সমাজ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক বলে আয়ুব খানকেই গণ্য করতে শুরু করেন এবং তলায়-তলায় আয়ুব খানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

ভারত-পাকিস্তানের সতেরো দিনব্যাপী পঁয়ষট্টির যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সোভিয়েত রাশিয়ারও নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী রণকৌশলের অংশ হিসেবে ভারত-পাকিস্তানকে একলগ্ন একটি ব্লক হিসেবে দাঁড় করিয়ে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খাটো করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই রাশিয়া চাইল অখণ্ড পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে চীন-বিরোধী সোভিয়েত-সমর্থক একটি ব্লক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াক। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার দরকষাকষি করার অভিপ্রায়ে এই দুই বিবদমান সমাজতান্ত্রিক দেশকে প্রয়োজন মতো সুযোগ দিয়ে পাকিস্তানের সিংহাসনে দীর্ঘকাল অটুট থাকার পথটিই প্রসারিত করলেন না শুধু, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী থেকেও উপদল দুটির দাবী অন্যত্র সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কো-সমর্থক অংশ তাঁদের গুরুদের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পাশ কাটিয়ে টেকনাফ থেকে খাইবার পাস অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃজনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী জনগণ যে স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তার অধিকারী, শুরুতে যে কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলে আসছিলেন এবং সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে যখন তখন বিচ্ছিন্নবাদিতার অভিযোগ আনা হত, সেসব কথা একরকম বিস্মৃত হয়েছিলেন সেই সময়ে। অবশ্য এজন্য ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে উভয় দলের নেতা-উপনেতাদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে। মস্কো-সমর্থক অংশের নেতা-উপনেতাবৃন্দ সমাজতন্ত্রের মস্কো ঘুরে আসতে পেরেছেন। পিকিং সমর্থকেরা পিকিং। দু'দেশের পুস্তক অবাধে আমদানীর সুযোগ দিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কর্মীদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং দাবীর কথা ভুলিয়ে একেবারে বিপ্লবের স্বপ্নে মজিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এইভাবে আয়ুব খান তাঁর সবচেয়ে প্রতিস্পর্ধী শত্রুর ধনু থেকে সবচেয়ে অব্যর্থ তূণটি চুরি করে নিয়েছিলেন। অঞ্চল-বহির্ভূত রাজনৈতিক অন্ধ-আনুগত্যের এমন বেদনাদায়ক নজির বোধকরি দুনিয়ার ইতিহাস সন্ধান করলেও অধিক পাওয়া যাবে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবীদার দুটি দলই যখন পরস্পর আত্মকলহে রত এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মোহে বিভোর সেই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবী নিয়ে জাতির সামনে আবির্ভূত হলেন। উভয় দল তাঁকে ছি-ছি করল এবং অভিহিত করল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর অনুচর হিসেবে। কিন্তু এরই মধ্যে দুটি দলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। গোটা পাকিস্তানকে ভিত্তি করেই তাঁরা নীতি নির্ধারণ করেছেন, রণকৌশল নির্ণয় করেছেন, কিন্তু সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটার যায়-যায় দশা। বাঙালীর যে একটি আলাদা জাতিসত্তা রয়েছে, যার কথা শুরু থেকেই তাঁরা বলে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আসছিলেন, অথচ আশানুরূপ সমর্থন লাভ করতে পারেননি, সেটি যে কখন জেগে উঠেছে তাঁরা টেরও পাননি। দুটি উপদলই যখন আদি অবস্থানে ফিরে আসতে চেষ্টা করল ততদিনে ঘাটের জল অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাঁদের ভালো কথাও কে শোনে! ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কো-সমর্থক অংশ যখন শেখ সাহেবকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনি কিংবা আপনার দল এককভাবে এ কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবেন না, আমাদেরকেও গ্রহণ করুন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান জবাব দিলেন, 'আপনাদের মতের সঙ্গে আমার মতের এতই মিল যখন, ভালো কথা, দলের নাম এবং সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে একেবারে আমার দলেই চলে আসুন।' জনগণের মনোভাব আঁচ করতে পেরে পিকিংপন্থী ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টনে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। মওলানা সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন মওলানার পিছনে কে যায়? আর গেলেও কি লাভ হত?

৩

আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই ছিল তৎকালীন বিকাশমান পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংগঠন। নিজের স্থিতি ও সংবর্ধনের জন্য যতদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় ছিল ততদিন পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃশ্রেণীর সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে সহঅবস্থান করেছেন। এমনকি নিজেদের দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা তারা করেছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে তাঁদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব নয় যখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তারপর থেকেই আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীদাওয়াসমূহকে নিজেদের দলীয় দাবীতে রূপায়িত করে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আওয়ামী নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবীদাওয়াসমূহের অনুকূলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটা অনুকূল জনমত গঠনের সুযোগও পেয়েছিলেন। মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবী যাঁরা প্রথমে উচ্চারণ করেছিলেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে দ্বিধাবিভক্তির কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটি অংশের এলাকা-বহির্ভূত আদর্শবাদী অন্ধ আনুগত্যের দরুন এবং জেনারেল আয়ুব এই বৈপরীত্যসমূহ সার্থকভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলাতে পেরেছিলেন বলেই সামগ্রিকভাবে বামপন্থীদের মধ্যে এক ধরনের মিথ্যা আশাবাদ, এক ধরনের দিকচিহ্নহীনতা ও এক ধরনের সূক্ষ্ম সুবিধাবাদ জন্ম নিয়েছিল এবং তাঁরা মূল দাবী থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগ এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক জনগণের সামনে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে একমাত্র তাঁরাই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পাহারাদার। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঘটনাস্রোতকে প্রভাবিত করার মতো বামপন্থীদের তেমন কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থা রইল না।

দশ বছরের একটানা স্বৈরশাসনে সারা পাকিস্তানের মানুষ আয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সে বিষয়েও আওয়ামী লীগের অনেকগুলো প্রত্যক্ষ বক্তব্য ছিল এবং তা সে সময়ে এতদূর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা পাল্টা কোনো বক্তব্যে কর্ণপাত করতে মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিল না। বাঙালী অর্থনীতিবিদেরা পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে যে দুই-অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা দীর্ঘকাল ধরে বক্তৃতা-সেমিনার-আলোচনা-সমালোচনায় বিবৃত করে আসছিলেন, ছয় দফা কর্মসূচীতে আওয়ামী লীগ তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কথাটা ঘুরিয়ে বললে এভাবে বলা যায় যে, দুই-অর্থনীতি তত্ত্বকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় কর্মসূচী ছয়-দফা প্রণয়ন করেন।

যে পদ্ধতিতে অখণ্ড ভারতের বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে একটি অনতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান হারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুসলমান জনগণের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন; সেই একই পদ্ধতি বাংলাদেশ সৃজনের পেছনেও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক যুক্তিসমূহ সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘাত-প্রতিঘাতে একেবারে চোখা হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাছাড়া ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে স্যার সৈয়দ আহমেদ থেকে আরম্ভ করে সৈয়দ আমীর আলী পর্যন্ত অনেক মুসলিম মনীষীর চিন্তা-চেতনার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় একটা মুসলিম রাষ্ট্রের অঙ্কুর সুপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম মধ্যবিত্ত তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনেই সে যুক্তিসমূহকে সুবিন্যস্ত করে পাকিস্তান দাবী আকারে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারটি ঘটেছে একেবারে হঠাৎ। বাঙালী জনগণ যে আলাদা একটি জাতিসত্তা, এখানকার ডান-বাম কোনো রাজনৈতিক দলের ঘোষণাতেই তার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি মেলে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙালী জাতিসত্তা নিজেকে উন্মোচিত করেছে। মনীষা ও প্রজ্ঞার বলে সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে এই জাতিসত্তার অস্তিত্ব কেউ আবিষ্কার করেনি। না কোন দল, না কোন নেতা। বাংলাদেশ বর্তমানে যে কঠিন সংকটে নিপতিত, তাও জাতিসত্তাকে চিনতে না পারারই সংকট মূলত।

আওয়ামী লীগের পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে দাঁড়িয়েছিল। তারা মনে করেছিল, বাংলাদেশ যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয় দফা দাবী আদায় করতে সক্ষম হয় তা হলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য,কারবার-তেজারতি, চাকরী-বাকরীতে পশ্চিম পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। তাছাড়া

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশ এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে একেবারেই অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছিল এ কারণে যে, এছাড়া তাঁদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। কারণ বামপন্থী উপদল দুটোই তাঁদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন কোনো কিছু তুলে ধরতে পারেনি। তাছাড়া পশ্চিম বাঙলার নকশাল নেতা চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখের রাজনৈতিক প্রভাবে ন্যাপের পিকিং-সমর্থক অংশ ও পিকিংপন্থী কমিউনিষ্টদের মধ্যে অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলের জন্ম হয়েছিল, যাঁদের নিজেদের মধ্যে না ছিল কোনো ঐক্য-সংহতি কিংবা সুদূরপ্রসারী কোনো রাজনৈতিক দর্শন।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম এবং আয়ুব খানের এককালীন তরুণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে সদ্য-সংগঠিত পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি ইত্যাদি ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের প্রণিধানযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন। ভুট্টোর রাজনৈতিক দলটি ছিল একেবারে আনকোরা নতুন এবং পূর্বাঞ্চলে তার কোনো সংগঠন ছিল না বললেই চলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ছিল হয়তো একেবারে দক্ষিণপন্থী নয়তো দক্ষিণ-ঘেঁষা। গোড়া থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দাবীর প্রতি তাদের মধ্যে কোনরকম সচেতনতা ছিল না। বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন ন্যায়সংগত দাবীকেই তাঁরা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সংহতি বিনাশ করার ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করতেন।

বামপন্থী বলে কথিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটো উপদলই আওয়ামী লীগের সাথে পাল্লা দিয়ে হালে পানি পায়নি। তাঁরা নিজেদের কৃত রাজনৈতিক প্রমাদের জন্য জনগণ থেকে একরকম বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে একটানা শোষণের জোর প্রচারণা চালিয়েছিল। তাছাড়া জেনারেল আয়ুবের একটানা দশ বছরের স্বৈর-শাসনামলে আমলাতন্ত্রের উৎপাতে, মৌলিক গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্যে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা যে কোনো রকমের একটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেই ভাবী আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। জনগণের এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আওয়ামী লীগ প্রচারাভিযান, সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে করে যেতে থাকে। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এই অঞ্চলের মুসলিম জনগণের চোখে 'সব পেয়েছির দেশ' হিসেবে স্বপ্নের অঞ্জন মাখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবীর অনবচ্ছিন্ন প্রচারণা এই একই জনগণের দৃষ্টিতে একটি কল্পস্বর্গ খাড়া করে তুলেছিল।

বাঙালী বিকাশমান মধ্যবিত্তের সংগঠন আওয়ামী লীগের মূল দাবী ছিল ছয়-দফা আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। নেতৃবৃন্দ একেবারে চূড়ান্ত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মুহূর্তেও শ্রেণীগত দোদুল্যমানতা ত্যাগ করতে পারেননি। নেতৃবৃন্দ কখনো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি যে বাংলাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রসত্তার জন্ম হতে চলেছে এবং তাঁরা সে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের উত্থানের চূড়ান্ত উত্তাল মুহূর্তেও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা পরিহার করে তাঁরা বাঙালী জাতিসত্তার সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেননি। অবশ্য একথাও মিথ্যা নয় যে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন, শ্রমিকদের আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙলার জাতিসত্তা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল এবং সেই বিকশিত জাতিসত্তার চাপে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ভূমিকার চাইতে একটু অধিক যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জনমতের প্রবল চাপ তাঁদেরকে ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টো কারো সঙ্গে কোনরকমের আপোস-নিষ্পত্তিতে আসতে দেয়নি। একতলা ভিতের ওপর যেমন তিনতলা বাড়ী নির্মাণ করা যায় না, তেমনি স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটিয়ে হঠাৎ করে তাকে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপায়িত করা যায় না।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁরা সত্যিসত্যি পাকিস্তানী ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে স্বচ্ছ থাকত তাহলে সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রস্তুতিও গ্রহণ করতেন। বাঁশের লাঠি দিয়ে ঘরে-ঘরে দুর্গ তৈরির 'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা' ঘোষণার বদলে অন্য কোনরকমের কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতেন। বাংলাদেশের প্রায় কোটিখানেক লোক ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারত পুরোপুরি তার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল। সেই ভারতের সঙ্গেও যদি পূর্বাহ্নে চুক্তি ইত্যাদি করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এনে একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা রচনা করতেন, তাহলেও পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করত।

অবশেষে পালে সত্যিসত্যি বাঘ পড়ল। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তানী সৈন্য নগরে-জনপদে প্রচণ্ড হিংস্রতা সহকারে ফেটে পড়ল। শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। জেলায়-জেলায়, মহকুমায়-মহকুমায় প্রতিরোধ ব্যূহগুলো ভেঙ্গে পড়তে লাগল। গোটা বাংলাদেশে নির্মমতার, নিষ্ঠুরতার, হৃদয়হীনতার মর্মন্তুদ স্রোতাধারা প্রবাহিত হলো। ভারত সীমান্ত খুলে দিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাঙালী জনগণের একাংশের ভারতে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। দলেদলে লোক একটু আশ্রয়ের আশায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতে পাড়ি দিলেন। ভারত সরকার নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতা-উপনেতাদের খুঁজেপেতে বের করে একটা অস্থায়ী আশ্রিত সরকারের নাম ঘোষণা করলেন। সুতরাং 'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার' পরিণতি স্বরূপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করতে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হল। এতে কারো পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না, ঘটনার নিয়মে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে।

৪

ভারতের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ার পেছনেও যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। এই কারণগুলো উপমহাদেশের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে উৎসারিত। কোনটার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার প্রশ্নও সম্পর্কিত ছিল।

আদি থেকেই পাকিস্তানের ওপর ভারতের শাসক নেতৃশ্রেণীর একটা বিজাতীয় ঘৃণা প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল। এই ঘৃণা ভারতের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত জটিলতা থেকেই উদ্ভূত। যদিও এই ঘৃণা ভারতীয়দের পুরোপুরি একতরফা বিষয় ছিল না, তথাপি একথা বোধকরি বলা অসঙ্গত হবে না, তা ইতিহাসের গর্ভগুহা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে কোনকিছুই তার কৃষ্ণস্পর্শের প্রভাব এড়াতে পারেনি। হিন্দুসুলভ ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণা এবং মুসলমানসুলভ একই রকমের ধ্যান-ধারণার চৌপাশে অন্যান্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে আবর্তিত হতে-হতে শেষপর্যন্ত দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সাময়িক পরিণতি লাভ করে।

যে-সকল দার্শনিক, চিন্তানায়ক, কবি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তা এবং কর্মের মধ্য থেকে আধুনিক ভারত সম্ভাবিত হয়ে উঠেছিল, প্রায় তাঁদের সকলেরই দৃষ্টি স্থির ছিল প্রাচীন ভারতের প্রতি। প্রাচীন ভারত বলতে তাঁরা অনেক সময় আর্য-ভারত এবং আর্য-ভারত বলতে হিন্দু-ভারত ধরে নিতেন। ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যিখানের যে ব্যয়-রূপান্তর এবং নানা সময়ে যে সংশ্লেষ-সমন্বয় ঘটেছে, স্বীকার করে নেয়ার মতো মানসিকতা অনেক উদারনৈতিক চিন্তাচেতনা-সম্পন্ন মনীষীরও ছিল না।

মানুষ সচেতনভাবে যখন অতীতে অবগাহন করে, তখন সে অবচেতনে ভবিষ্যতকেই নির্মাণ করে যায়। এই ভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের কবি, শিল্পী এবং দার্শনিকবৃন্দ প্রাচীন গ্রীককে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে অজান্তে আধুনিক ইউরোপের জন্মদান করেছিলেন। পোপের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মার্টিন লুথারের শিষ্যবৃন্দ আদি খ্রীষ্টধর্মের নবজীবন দান করতে যেয়ে নতুন একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেমনি ভারতীয় হিন্দু মনীষীরাও সচেতনভাবে প্রাচীন ভারতের পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখে আধুনিক ভারতকেই সৃজন করেছিলেন। আধুনিক ভারতের সৃজন-প্রক্রিয়াতে প্রাচীনের প্রাচীনত্বটুকু সর্বাংশে কাটতে পারেনি। অতিকায় যুক্তিবাদী মনীষীদের চিন্তার মধ্যেও বারেবারে প্রাচীন ভারতের হিন্দু মিথ ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠেছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তা অনেকটা অর্থবহ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার ফলশ্রুতিতে এই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঘটেছে যে অভিঘাতে মুসলিম মিথসমূহও নতুন করে প্রাণ পেয়েছে এবং মুসলিম জাতীয়তার রূপায়ণের সংগ্রামে সেগুলোও সমান ব্যবহারিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ, দয়ানন্দ স্বরস্বতী, লালা লাজপত রায়, বিবেকানন্দ, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যখনই ভারতের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছেন, প্রাচীনের প্রতি মোহমুগ্ধ শ্রদ্ধাবোধ কদাচিৎ বর্জন করতে পেরেছিলেন। হয়তো শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু তা একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে উঠে এসে যদি গোটা জাতীয় মানসকেই অতীতচারী করে তোলে, তার ফলাফল বড় মারাত্মক হতে বাধ্য। আধুনিক ভারতে তাই ঘটেছে। ব্রিটিশ ভারতকে কেটে দুটি টুকরা করতে হয়েছে। প্রকাশ্য ঘোষণা যাই হোক না কেন, দু'দেশেই দুটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মিথই নতুন জীবন লাভ করেছে।

যা বলেছিলাম, শুরু থেকেই ভারতীয় শাসকবর্গ পাকিস্তানের প্রতি কখনো সম্প্রীতির দৃষ্টিতে তাকাতে পারেননি। কারণ তাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। অনেক ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ভারত-বিভাগকে মাতৃঅঙ্গ ব্যবচ্ছেদ মনে করতেন এবং তারা এও বিশ্বাস করতেন যে পাকিস্তানটি দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে না। তার কারণও ছিল। ভৌগোলিক অসংলগ্নতার জন্য প্রতীচ্যের অনেক নিরপেক্ষ দর্শকও মনে করতেন পাকিস্তান ঠিক রাষ্ট্র নয়, নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্রের এক্সপেরিমেন্ট মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে তার সাফল্যের চাইতে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই অধিক। জওহরলাল নেহেরু মনেপ্রাণে আসমুদ্র হিমাচল প্রসারিত একটি বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন দেখতেন এবং এই স্বপ্নকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃশ্রেণীর মনে ভালো করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জার্মানদের ফাদারল্যান্ড এবং ইহুদীদের হোলিল্যান্ডের মতো বৃহত্তর ভারতের স্বপ্নও ভারতীয় নেতৃশ্রেণীর মর্মের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন বহত্তর ভারতের স্বপ্ন মিথ্যা হওয়ার নয়, প্রশ্নটা শুধু সময়ের।

My All Garbage

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তানের অবস্থিতিই ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে পুরোপুরি একটা বিসংগত রাষ্ট্র, একটি অংশের পর্যায়ক্রমিক শোষণের ওপর অপর অংশের সমৃদ্ধি। দু' অংশের সংযোগের মধ্যবর্তী নিবিড়তার অভাবের কথা পাকিস্তানের শাসক নেতৃশ্রেণী ওয়াকেবহাল ছিলেন। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটা আতঙ্কের পরিস্থিতি সব সময়ে সৃষ্টি করে রাখতেন। জনগণকে সব সময় বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে ভারত যে কোনো সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা এবং সংহতি বিনাশ করতে পারে। এটা ছিল পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধকে বাইরের দিক দিয়ে সব সময়ের জন্য চাঙ্গা করে রাখার একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। শাসকদের কাছে এটা ধরতাই বুলি হলেও মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম অনুসারে জনগণের কাছে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কাছে তার প্রভাব বেশিদিন সক্রিয় ছিল না। পাকিস্তান সবসময়ে যুদ্ধাতঙ্কে ভুগত এবং পাকিস্তানের এই মনোভাবকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে জিইয়ে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পাকিস্তানের বন্ধুর অভাব ছিল না।

যতকাল গণচীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব অটুট ছিল ভারত পাকিস্তানের তর্জন-গর্জনকে আমল দেয়ার বিশেষ একটা প্রয়োজন বোধ করেনি। ভারত-চীন যুদ্ধের পূর্ব থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যখন উত্তরোত্তর খারাপ হতে আরম্ভ করে, পাকিস্তান সত্যিসত্যি ভারতের কাছে একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াল। চীন এবং পাকিস্তান দুই সীমান্তের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় চারগুণ বেড়ে গেল। ভারত বৃহৎ দেশ এবং দরিদ্র দেশ। এই প্রতিরক্ষা ব্যয় ফি-বছর মেটাতে যেয়ে তার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বন্ধ হয়ে গেল, দেশে অভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, প্রতিটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকল, উগ্র এবং চরমপন্থীদের দৌরাত্ম্যে শাসন যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ার অবস্থা। এই ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কার্যকর একটা কিছু করা শাসক কংগ্রেসের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্ব এমনভাবে পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করছিল যে, জনগণের চিন্তা-চেতনাকে সংঘাতরত প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রসমূহ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশেষত সেই সময়ে ভারতের রাজ্যসমূহে কংগ্রেসের প্রভাব ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। একটা যুদ্ধ লাগলে সেই দ্বন্দ্বসমূহ সাময়িকভাবে নিরসন করা যায়। এই যুদ্ধ চীন কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গেই লাগাতে হয়। এর আগেও দু' দুবার এ দুটি দেশের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার ফলাফল ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে। তাছাড়া একটি সরাসরি যুদ্ধ ভারতের মতো বৃহৎ একটি দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। আন্তর্জাতিক দিকটিও ভেবে দেখার মতো। নিজের দেশের জনমত এবং বিশ্ব জনমতের প্রশ্নটি ভালো করে না দেখার উপায় নেই। পাকিস্তানের শাসকবর্গ যেমন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠলে যে কোনো অছিলা করে ভারতের সঙ্গে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতেন, ভারতও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের দাবীদাওয়ার প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে তুলবে তাতে এমন বিচিত্র কি!

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে পাকিস্তান একটি কৃত্রিম এবং বিসংগত রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হিসেবে এখানেই ছিল পাকিস্তানের দুর্বলতার আসল উৎস। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক কোনো সংযোগ নেই। ধর্ম ছাড়া উভয় অংশের মধ্যে স্থায়ী কোনো বন্ধনের সূত্র অনুপস্থিত। পূর্বাঞ্চলের পর্যায়ক্রমিক শোষণের ওপর পশ্চিমাঞ্চলের সমৃদ্ধি। পাকিস্তানের এই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করে আভ্যন্তরীণ প্রবল দ্বন্দ্বটি শাণিত করার কাজে ভারতীয় শাসকবর্গ সব সময়ে তৎপর ছিলেন। সরাসরি

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

যুদ্ধে না গিয়ে, দু'অংশের দ্বন্দ্বটা আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষণা না করেও, একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব এবং তাতে জয়লাভের সম্ভাবনা অত্যধিক। ভারতীয় শাসকবর্গ প্রচার মাধ্যমগুলো একই লক্ষ্যে ব্যবহার করতেন।

উনিশশো বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন এবং উনিশশো চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে ফলাও করে প্রচার করেছিল ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকাসমূহ। এই প্রচারণার মধ্যে একটি অবহেলিত অঞ্চলের জনগণ যে সংগ্রাম করে আপন ভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন এবং আরও নানা দাবীদাওয়া আদায় করে নিচ্ছেন, তার চাইতে অধিক কিছু ছিল। পাকিস্তানের ভাঙনের বীজটি অঙ্কুরিত হতে দেখে তাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন। সেই মনোভঙ্গীটুকুও প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। উলঙ্গ হুঙ্কার এবং হম্বিতম্বির চাইতে ধীরেধীরে সময় বুঝে কাজ করাই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ মূলত পশ্চিম রণাঙ্গনেই সীমিত রেখেছিল। আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব বিগড়ে যাবে এ আশঙ্কা করেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বলতে গেলে একেবারে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে স্থলপথে, জলপথে কিংবা বিমানপথে কোনো আক্রমণ করেনি। কোনরকমের সামরিক হামলা না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে জয় করার ইচ্ছাই ছিল তার মূলে, এ কথা স্বয়ং ভারতীয় জেনারেল কাউলও তাঁর আত্মকথায় স্বীকার করেছেন। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয় এবং ছয়দফা আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে যে ছড়িয়ে পড়ে তা নিশ্চয় ভারতীয় শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। ছয়দফার অন্তর্ভুক্ত দফাসমূহের একটি ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের লোক দিয়ে একটা প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করতে হবে এবং অন্য একটি দফায় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ-সুবিধা মতো যে কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করার অধিকার। ভারত এই ছয়দফার মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। পাকিস্তানের দু'অংশ যদি শ্লথভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ভারতের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসবে। পাকিস্তান যখন-তখন আর যুদ্ধের হুঙ্কার দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ সংহত পাকিস্তানকে যেভাবে অস্ত্র সাহায্য করে, অর্থ যোগান দিয়ে ভারতের সমপর্যায়ের একটি শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখত; শিথিল পাকিস্তান বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে সেরকম গুরুত্ব বহন করবে না। পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়লে তার যুদ্ধংদেহী মনোভাব আপনা থেকেই প্রশমিত হয়ে আসবে। তখন বৃহৎ শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে ভারত-ঘেঁষা নীতি প্রণয়ন করতে বাধ্য হবে। ছয়দফার একটা দফায় পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তাতেও ভারত নিজের স্বার্থটি খুব বড়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করে দেখতে পেয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গে হুগলির পাটকলগুলো কাঁচামালের অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বিদেশে অঢেল পাট রপ্তানী করে এবং তাকে বিদেশ থেকে প্রচুর কয়লা আমদানী করতে হয়। ভারতের কয়লার বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট আমদানী করতে পারলে চটকল শিল্পের মতো ভারতের একটি বুনিয়াদি শিল্পের সংকটের সহজ সমাধান হয়ে যায়। ইত্যাকার বিষয় বিবেচনা করে শুরু থেকেই ভারতের শাসক কংগ্রেস আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি একটি অনুকূল মনোভাব তৈরি করে রেখেছিল। ছয়দফা আন্দোলন যখন ধাপেধাপে বেগ ও আবেগ সঞ্চয় করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি উৎক্রান্তিতে আওয়ামী লীগ যে কৌশল এবং প্রচারপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, ভারতের শাসক কংগ্রেস পত্রপত্রিকা এবং প্রচার-মাধ্যমগুলোতে যে ঢালাও প্রচার করেছিল, তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আন্দোলনের প্রতি একটি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ জন্মলাভ করতে সহায়ক হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ কখনো সুভাষচন্দ্র বসুর মতো তেজোদ্দীপ্ত অনাপোসী ভঙ্গীতে বক্তব্য হাজির করেছেন, কখনো চিত্তরঞ্জন দাশের মতো উদার বাঙালীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কখনো বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতো সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়দফা আন্দোলনের শেষপর্বে অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণার পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় জনগণের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র হিসেবে দেখা দিলেন। অহিংসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ। সর্বকাজে সর্বচিন্তায় নিজেকে হিংসামুক্ত রাখাই হলো গান্ধী-দর্শনের মূলকথা। চৌরিচৌরার সংঘর্ষে মাত্র ক'জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে জেনে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্যে তাঁকে কম জবাবদিহি করতে হয়নি। তথাপি তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়েননি। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসামন্ত্রে বিশ্বাসী বলার কোনো উপায় নেই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত সন্ধান করলে এমন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তিনি অহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তিনি অহিংস আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ট্যাক্টিকস হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। আর বাংলাদেশ আন্দোলন সত্যিকার অহিংস ছিল না। বিস্তর হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে। জ্বালানো, পোড়ানো, লুঠতরাজ এবং খুন-জখমের অনুষ্ঠানও হয়েছে বিস্তর। আওয়ামী লীগ হাই-কম্যাণ্ড এসবের বিরুদ্ধে মৌখিক বক্তব্য রাখলেও থামানোর জন্যে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তার ফলশ্রুতিতে বিহারী এলাকাগুলোতে নানারকম নৃশংস কার্যকলাপের অনুষ্ঠান ঘটে। এই নৃশংসতা দমনের অছিলা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পঁচিশে মার্চের রাতের অন্ধকারে ঢাকা শহরের ঘুমন্ত নগরবাসীর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতীয় জনগণের পক্ষে বাংলাদেশী অহিংসা চোখে দেখার উপায় ছিল না। তাঁরা কাগজে দেখেছেন, বেতারে শুনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। শেখ মুজিবের মধ্যে ভারতীয় জনগণ একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রতি ভারতীয় জনগণের যে একটি সুপ্ত শ্রদ্ধাবোধ মনের ভিতরে লুক্কায়িত ছিল, শাসক কংগ্রেসের প্রচারণায় শেখ মুজিবকে আশ্রয় করেই তা পল্লবিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সামনে একেবারে নব্য-দেবতার বেশে দেখা দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি এবং আওয়ামী লীগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী ইমেজগুলো অতীতের গর্ভ থেকে তুলে এনে সেগুলো ঝালিয়ে, রঙ চড়িয়ে কিংবা ঈষৎ পরিবর্তন করে নতুনভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এই কারণেও ভারতীয় জনগণ তাঁকে চোখে দেখার আগেই একেবারে অতিমানব বলে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন। তাঁর দলের পক্ষ থেকে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শব্দের সঙ্গে দেশবন্ধুর একটা শব্দগত সামঞ্জস্য রয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের একটা পর্বে গুণমুগ্ধ দেশবাসী আইনজীবী-রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশকে 'দেশবন্ধু' খেতাব প্রদান করেছিলেন। তাঁর দলের পোশাক হিসেবে 'মুজিব কোট' নামে যে জ্যাকেটটি চালু করেছিলেন, ওটা ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক উদ্ভাবিত জহর কোটের বাংলাদেশী সংস্করণ। জওহরলাল শৌর্যবান পাঠান উপজাতীয়দের গায়ের ফতুয়াকে পছন্দমতো অদলবদল করে নিজের পোশাক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দলীয় কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য যে ধরনের টুপি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা ছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের টুপির অনুকরণ মাত্র। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পুরোপুরি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রম সংশোধন ছিল না, এর মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা এবং প্রাগ্রসর সমাজদর্শন সমাজতন্ত্রের প্রচুর উপাদান ছিল। কংগ্রেসের সুচতুর প্রচারণার দরুন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ভারতীয় জনগণ এভাবে বুঝেছেন যে, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের ভাঙন আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশী জনগণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তা মূলত কংগ্রেসেরই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের অসমাপ্ত পর্যায়। তাই সেখানে ভারতের কংগ্রেসের নায়কদের ইমেজসমূহ বাংলাদেশে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠছে। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় জনগণের একটি মুখ্য অংশ পঁচিশে মার্চের পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ এই তিনটি বিষয় ছিল কংগ্রেস সরকারের ভারতীয় জনগণের চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার মোক্ষম হাতিয়ার। কেননা তখন ভারতের রাজ্যে-রাজ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল। কেরালাতে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি, আসামে ভাষা-দাঙ্গা, বিহারে খরা, উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ, তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন এবং পশ্চিম বাঙলায় চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী ও কানু সান্যালের দলের উত্থান জনজীবনকে প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে শাসক কংগ্রেসের প্রভাব দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছিল। দুর্নীতি, স্বজনতোষণ, গণপীড়নের এমন দৃষ্টান্ত শাসক কংগ্রেস স্থাপন করেছিল যে জনসাধারণের হৃত আস্থা ফিরিয়ে আনার দৃশ্যত কোনো পথ খোলা ছিল না। ভারতীয় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁরা আইনশৃঙ্খলা মেনে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, রাজনৈতিক নৈরাজ্যের পীড়নে তারা একেবারে আশাহত হয়ে পড়েছিলেন। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র তাঁদের জীবনধারায় নিরাপত্তা প্রদান করতে একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁদের দৃষ্টিতে ভরসার সাম্পান হয়ে দেখা দেয়। পঁচিশে মার্চের পরে দলেদলে বাংলাদেশের লোক যখন ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে, এই মধ্যবিত্ত লোকেরাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সভা-সমিতি করে বলতে আরম্ভ করলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণেরা দেশ-মাতৃকার মুক্তি সাধনের জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করে সমর-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর পশ্চিম বাংলার যুবকেরা রাজনীতির নামে দিকভ্রান্ত হয়ে খুন, জখম, ডাকাতি, বোমাবাজি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে অনর্থক ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করছে। সামাজিক হিংসাকে রুখে দাঁড়াবার বিরুদ্ধে তাঁরা সম্মিলিত আওয়াজ তুললেন। অতি শীগগিরই এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সপক্ষে একটা জনমত গড়ে ওঠে এবং শাসক কংগ্রেস এই অনুকূল জনমতকে কাজে খাটাতে ভুল করেননি।

পশ্চিম বাংলার জনগণের একটি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের প্রতি অতিশয় সশ্রদ্ধ এবং আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তাঁরা শেখ মুজিবের আন্দোলনের মধ্যে বাঙালীর একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি জলন্ত সম্ভাবনাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে বাঙলা দিয়েছে সব চাইতে বেশি, পেয়েছে সব চাইতে কম। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে কলকাতার গুরুত্ব যে ব্রিটিশ সরকার খর্ব করেছে এ ক্ষতি বাঙালী কোনদিন পুষিয়ে নিতে পারেনি। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারত বিভাগের সময়েও বাঙলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কতক গণনায়ক গোটা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে আলাদা একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, সে কথা তখনও তাঁদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে স্বাধীনতার পর বাঙালীর ভাগ্যে বঞ্চনা নেমে এসেছে, সেজন্যে তাঁরা দুঃখ বোধ করতেন এবং তাঁর সম্ভাব্য প্রতিকারের কথাও চিন্তা করতেন। অন্তত বাঙলার অপরাংশে একজন বাঙালীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে তার প্রতি সমর্থন দান এবং সাধ্যমত সহায়তা দান করা প্রতিটি বাঙালীর নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পঁচিশে মার্চের পর স্রোতের মতো বাংলাদেশের মানুষ যখন ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন ভারতীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। সর্বশ্রেণীর মানুষ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে রাজপথে নেমে এলেন। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার জনমতের এই শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করলেন যে বিরোধী দলসমূহেরও সরকারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বাংলাদেশের কথা বলতে হলো। এক বাংলাদেশ সমস্যা সমস্ত ভারতীয় সমস্যা চাপা দিল। জনগণ যেমন তেমনি বিরোধী দলগুলোও বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে কে কার চাইতে বেশি যেতে পারে এ নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। সামান্য জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জেতার জন্যও বাংলাদেশ একটা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াল। জনমত এমন সুকৌশলে আগুন ধরানো হলো যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করলে ভারতীয় রাজনীতিতে তার পরাজয় অবধারিত হয়ে দেখা দিল। বাংলাদেশে একটি নতুন জাতি জন্মলাভ করার সংগ্রাম ছিল, কিন্তু তার ধাত্রীর কাজ করছিল ভারতের শাসক কংগ্রেস। শেক্‌স্‌পীয়র সরণীতে প্রায় অন্তরীণ আওয়ামী লীগের তাজুদ্দীন মন্ত্রীসভা একটা উপলক্ষ মাত্র ছিল।

My All Garbage

৫

ঊনিশশো একাত্তুর সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বাঙালীর জাতীয় সত্তা পাকিস্তানের ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার জন্য যে প্রচণ্ড আবেগে উন্মথিত হচ্ছিল, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গোড়া থেকেই তার প্রতিবিধান কি করে করতে হবে ঠিক করে রেখেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক নেতৃশ্রেণীর একটি বদ্ধমূল ধারণা এই ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবীদাওয়া সম্পর্কিত যে কোনো আন্দোলনই হিন্দুদের নেপথ্য কারসাজি। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীদাওয়ার প্রশ্নে কোনো না কোনো আন্দোলন হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির তৎপরতা এবং ভারতীয় চরদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিধায় ঐ সমস্ত আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে কখনো কসুর করেননি। রাজনৈতিক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার মধ্যে এ মনোভাব সীমিত ছিল না। অনেকে মনেপ্রাণে তা সত্য বলেও বিশ্বাস করতেন। দেশের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ইত্যাদির বৈপরীত্যই তার কারণ। পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মনের গতিবিধি যখনই তাঁদের কাছে অবোধগম্য প্রতীয়মান হয়েছে, এ অবোধগম্যতাকে হিন্দুয়ানী কাজ-কারবার বলে অভিহিত করতে তারা কখনো কুণ্ঠিত হননি। অতীতের বাংলা ভাষা আন্দোলন, হরফ বর্জন, রবীন্দ্র সাহিত্য পঠন-পাঠন ইত্যাদি প্রশ্নের প্রত্যেকটিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাতে একটি বিষয়ই সম্যক প্রমাণিত হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং জনগণের ভাষা সংস্কৃতিকে হিন্দুয়ানী প্রভাবমুক্ত করে একটি খাঁটি পাকিস্তানী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করার জন্যেই ঐ সব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের যুক্তি ছিল অত্যন্ত সহজ। উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই মাতৃভাষা নয়, তবু তাঁরা অম্লান বদনে উর্দুকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের উর্দুকে গ্রহণ করতে বাধাটা কোথায়? উর্দু বর্জন করতে যেয়ে যাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে পারেন তাঁদের মুসলমানিত্বের খাঁটিত্বের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে একটা সন্দেহ প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। আয়ুব খান তাঁর আত্মকথায় এই সন্দেহ চেপে রাখতে পারেননি। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে যখনই কোনো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা অনুসারেই স্থির করে নিতেন, এর পিছনে নিশ্চয় হিন্দুদের হাত রয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের সে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। তাঁরা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ হিন্দুদের প্ররোচনায় পাকিস্তান ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সে কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছিল। জনগণের এক বিশিষ্টাংশের মনে এই ধারণা গেঁথে গিয়েছিল যে একটা সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানকে কিছুতেই হিন্দুদের কারসাজি থেকে উদ্ধার করা যাবে না। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে সঙ্গে শাসক নেতৃশ্রেণীর অধিকাংশ এই একটি প্রশ্নে একমত ছিলেন।

প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ছল করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র এবং সৈন্য আমদানী করে সেনানিবাসগুলো ভর্তি করে ফেললেন। অবশেষে পঁচিশে মার্চের রাতে আঘাত হানার চূড়ান্ত সংকল্প নিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দান করলেন। প্রথমে আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা শহর হেস্তনেস্ত-লণ্ডভণ্ড করে দূরবর্তী শিরা -উপশিরাসমূহ কেটে দেয়ার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেনাবাহিনী। বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলো মিসমার করে দিয়ে সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু জনগণ, আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল। গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে ক্রমাগত হামলা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করল যে তারা ঘরদোর-জমিজিরাত সব কিছু ফেলে সীমান্তের অপর পাড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। হিন্দু জনসাধারণকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমত পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর মধ্যে ঘনতম বসতিপূর্ণ এলাকা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন থেকেই বলে আসছিলেন যে জনসংখ্যার আধিক্যই এখানকার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ। সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর মধ্যে সংখ্যালঘু জনগণের সংখ্যা এককোটি কিংবা সামান্য কিছু কম। তাদের কিছুকে হত্যা করে বাকি সবাইয়ের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারলে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হবেন এবং তাঁদের ঘরবাড়ী, জমিজিরাত, কারবার-তেজারতি সব অবশিষ্টাংশের হাতে পড়বে। এভাবে প্রায় এককোটি মানুষকে চলে যেতে বাধ্য করা হলে বাকিরা একটু নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবেন। তাঁদের ঘরবাড়ী, জমিজমা অন্যদের হাতে পড়লে তাঁদের দারিদ্র্যজনিত রুদ্ররোষটা অল্পস্বল্প প্রশমিত হবে। দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু এবং মুসলমান একই সঙ্গে বসবাস করার দরুণ মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যেও অনিবার্যভাবে হিন্দুদের প্রভাব এসে পড়ে। কেননা যৌথ জীবনপদ্ধতি চিন্তাপদ্ধতিকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই সুযোগে যদি অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘুদের সীমান্তের অপর পারে চালান করে দেয়া যায়, তাহলে এই অঞ্চলে পাকিস্তানী নাগরিকেরা খাঁটি পাকিস্তানী হিসেবে গড়ে উঠবেন। ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তা চেতনায় পরিশুদ্ধি আসবে। তৃতীয়ত প্রায় কোটিখানেকের মতো সংখ্যালঘুকে ঠেলে যদি ওপারে প্রেরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে ভারতের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। যে ভারত গোড়া থেকে পাকিস্তানকে ভাঙার স্বপ্ন দেখে আসছিল, তার বদলে নিজের কলে নিজে আটকা পড়ে ভারতের ভাঙার সম্ভাবনাটি আসন্ন করে তুলবে। পশ্চিম বাংলা এমনিতে অধিক বসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে-সকল বাস্তুত্যাগী আগেই এসেছেন, এখনো তাঁরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারেননি। অদ্যাবধি ভারত সরকার তাঁদের বেঁচে থাকার সবগুলো দাবী পূরণ করতে পারেননি। এই বাস্তুহারারাই রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থী হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনে। পশ্চিম বঙ্গে বাস্তুহারার আধিক্যের কারণেই এখানে চারু মজুমদার, কানু সান্যালদের দলের সমর্থকের সংখ্যা অধিক। তাঁরা তিন-চার বছর তাঁদের দলের এত কর্মসূচী পালন এবং এত আন্দোলন করেছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কাঠামো প্রায় ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা। তার ওপর আরো কোটিখানেক মানব-সন্তানকে যদি গলা ধাক্কা দিয়ে বন্দুক দেখিয়ে সীমান্ত পার করে পশ্চিম বঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলে পশ্চিম বঙ্গের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। প্রায় কোটিখানেক মানুষকে তো ভারত সরকার মেরে ফেলতে পারবে না। তাঁদের থাকবার ঘর দিতে হবে, খাবার জোগান দিতে হবে। যদি এঁদের দাবীতে সরকার কর্ণপাত না করে তাহলে বিরোধী দলগুলো এঁদের সমর্থন আদায় করে শক্তিবৃদ্ধি করে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটাবে। আর যদি সমস্যার প্রতি যত্নবানও হয়, তবে কতদূর আর কি করতে পারবে! এক একখানি করে ঘর দিতে হলে একসঙ্গে ভারতের বাজেটের চার-পাঁচ বছরের সমপরিমাণ অর্থ কাবার হয়ে যাবে। তারপরেও তো তাঁদের দাবী মিটবে না। উদ্বাস্তু মানসিকতার কারণেই তাঁরা চরমপন্থী দলসমূহের শক্তি বৃদ্ধি করবে। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অন্ধ্র প্রদেশের লোকেরা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লড়াই করছেন, লড়াই করছেন নাগারা। তাঁদের সঙ্গে এঁদের সংগ্রামও যদি যুক্ত হয়, দেখা যাবে একদিন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য ভারত চেষ্টা করে আসছে অনেক দিন থেকে। তার প্রতিবাদে পাকিস্তানও এমন কিছু করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল যা পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে পারলে ভারতের সোজা হয়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন চিরতরে স্বপ্নই থেকে যেত এবং ভারত ভাঙার সম্ভাবনাটি অত্যাসন্ন হয়ে উঠত।

পাকিস্তানী শাসকেরা এটাও জানতেন যে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আওয়ামী লীগ পন্থী ও অন্যান্য দলের লোকজন ভারতে চলে যাবেন। তাঁদের বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে পাকিস্তান রাজি ছিল না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে ভারতে কিছুদিন অবস্থান করার পর তাঁদের কেউ হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসবেন। কেউ নেপালে আশ্রয়প্রার্থী ১৭৫৭-র সিপাহীদের মতো ঘুরে ঘুরে বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কেউ কেউ একেবারে হারিয়ে যাবেন। যাঁরা ফেরত আসবেন তাঁদের কাউকে ফাঁসীতে লটকানো হবে, কাউকে সাধারণ ক্ষমা প্রদান করে বেঁচে থাকতে দেবেন। এভাবে জনগণের মধ্য থেকে ভারতীয় প্রভাব একেবারে উপড়ে ফেলা হবে। পাকিস্তানের শাসকেরা স্থির করে নিয়েছিলেন যে স্বায়ত্তশাসনের নামে পূর্ব পাকিস্তানে যখন-তখন আন্দোলন হয়, তারও কিছু অংশ দিয়ে দেয়া হবে। পশ্চিমারা ভেবে নিয়েছিলেন এভাবে এগিয়ে তাঁরা জগতকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী যে সমস্যা তা একান্তই পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা। তৃতীয় একটি দেশের তাতে মাথা গলানোর কোনো অধিকার নেই। যাঁরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, ভারত সরকার পাকিস্তান ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্ররোচিত করে নিজের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতেরই অনুচর। যাঁরা একটি পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে মিলেমিশে নিজেদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাঁরা ষড়যন্ত্রী, তাঁদেরকে পাকিস্তান আপন ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য নয়। ভারত আপন কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য এই সমস্ত ষড়যন্ত্রীদের নিজের দেশে ডেকে নিয়েছে, সুতরাং তাদের খাওয়া-পরা এবং নানাবিধ সব দায়িত্ব গ্রহণ করা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার। যেহেতু ভারত সুস্থ অঙ্গ চুলকে ঘা প্রস্তুত করেছে, পূর্ণ খেসারত ভারতকেই বইতে হবে। ভারতে আগত শরণার্থীদের নিয়ে ভারত যত হৈ-চৈ করুক না কেন পাকিস্তান একই উত্তর দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, যাঁরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাঁদের অপরাধ মারাত্মক। আর যে-সকল সরল নাগরিক কুচক্রীদের পাল্লায় পড়ে ভারতে চলে গেছেন, তাঁরা যদি ফিরে এসে মার্জনা ভিক্ষে করেন এবং অপরাধ স্বীকার করেন, তাহলে চলে আসতে পারেন। বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করার জন্য পাকিস্তান আরো প্রচার করে যাচ্ছিল যে কুচক্রীদের চক্রান্তে যে-সকল সরল নাগরিক ভারতে চলে গেছেন, ভারত সরকার তাদের জোর করে আপন ভূখণ্ডে আটকে রেখেছে, দেশে ফিরতে দিচ্ছে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারত এই এককোটি বাড়তি মানুষের ভার সব সময়ের জন্য বইতে রাজি হবে না। তাকে পাকিস্তানের শর্তে রাজি হয়ে একটা আপোস করতেই হবে। নতুবা একটি যুদ্ধ করতে হবে। ভারত যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেই বসে, পাকিস্তান তার মিত্রদের আহবান করবে। হয়তো পঁয়ষট্টির মতো সতেরো-আঠারো দিন যুদ্ধ চলবে। একটা সময় আসবে যখন বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে হবে। এরকমও যদি ঘটে পাকিস্তান দু'ভাবে লাভবান হবে, এক কোটির মতো জনসংখ্যাকে ভারতে পাচার করে দিতে পারল এবং তা করে ভারতে একটি স্থায়ী গোলমাল সৃষ্টির বিষবৃক্ষ রোপণ করে দিল। অন্যদিকে এই অঞ্চলকে একেবারে নিহিন্দু করে ফেলতে পারল। ফলে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক শান্তি সহজে ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকবে অল্প।

৬

পাকিস্তানকে দুর্বল করা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভেঙে একেবারে দু'টুকরা করা হয়তো ভারতের অভিপ্রায় ছিল না। স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখলে এই বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি সবল সংহত পাকিস্তানের বদলে একটি দুর্বল শৃঙ্খলবদ্ধ পাকিস্তান ভারতের জন্যে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যদি ছয় দফা আদায় করতে পারে, তাহলে ভারতের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। কেননা কেন্দ্রীয় সম্মতি ব্যতিরেকে যদি পূর্ব পাকিস্তান পছন্দমত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করতে পারে, তাহলে ভারতের সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। প্রথমত একটি শৃঙ্খলবদ্ধ পাকিস্তান ভারতের জন্য মোটেই ভয়ের কারণ ছিল না। কেননা শৃঙ্খলবদ্ধ পাকিস্তানের যুদ্ধ করার মনোভাব থাকতে পারে না। কারণ বৃহৎ শক্তিবর্গ তখন পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বলীয়ান করে রাখা খুব একটা লাভজনক মনে করবে না। দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি কাঁচাপাট যদি আমদানী করতে পারে, তাহলে কাঁচামালের অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলোকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে এবং অনতিভবিষ্যতে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের একটা বাজার গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও হেলায় উড়িয়ে দেয়া যায়। না।

কিন্তু ভারত কখনো কামনা করতে পারেনি, তার এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভাষাভিত্তিক একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। বহুভাষী এবং বহুজাতিক ভারত রাষ্ট্রের একেবারে প্রান্তসীমায় একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র ভারতের ঐক্যের পক্ষে যে একটা মূর্তিমান হুমকি তা ভারত সরকারের অবিদিত থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের প্রতি যতই আক্রোশ থাকুক না কেন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতিও তাঁরা কম সজাগ ছিলেন, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। যে কারণে পকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামো ভেদ করে পূর্বাঞ্চল বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে, সেই সকল কারণ তো ভারত ইউনিয়নের শরীরেও সংগুপ্ত রয়েছে। ভারতেও তো বলবৎ রয়েছে অঞ্চল বিশেষের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এবং জাতি বিশেষের শোষণ। হিন্দী ভাষার ঔদ্ধত্য অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের পথ অনেকটা পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে। অঞ্চল বিশেষের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অহিন্দী প্রদেশসমূহের বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ ভাষা-সংস্কৃতি নানা প্রশ্নে মুখিয়ে উঠে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ওপর আঘাত হেনেছে। ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের দাবী সরলরেখায় প্রবাহিত হতে পারলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ঊর্ধ্বে উঠে আসতে বাধ্য। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশ এবং পুঁজির পরিমাণের দিক দিয়ে এশিয়াতে জাপানের পরেই ভারতের স্থান। সুতরাং যে নেতৃশ্রেণী ভারতকে শাসন করে এবং যে ধনিক-বণিকেরা সর্ব রকমের মদদ যুগিয়ে এই শাসক নেতৃশ্রেণীকে লালন করে থাকে, তাঁরা সচেনতভাবে এই পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থই পাহারা দিয়ে থাকেন। ভারতের গোটা প্রশাসনযন্ত্র এবং সামরিক ব্যবস্থাপনা এই লক্ষ্যেই নিবেদিত। ভারত ঠিক একটি দেশ নয়, অনেকগুলো দেশের পাশাপাশি সমাহার। ভারতের যেই ঐক্য তা ভারতীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে গড়ে ওঠেনি। হিন্দু, মোঘল এবং ইংরেজ সমস্ত শাসনামালে চাপিয়ে দেয়া ঐক্যের ওপর অন্যে জুড়ে এসে বসেছে। ইংরেজরা মোঘল থেকে যে প্রশাসন-যন্ত্রটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অনুরূপ আরেকটা সামরিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনযন্ত্র ভারতের আধুনিক শাসকেরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছেন। এই আধুনিক ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রকে হিন্দী ভাষা, ভারতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি কতিপয় কৃত্রিম প্রতীতির ওপর দাঁড় করিয়ে মূলত পুঁজিবাদী হিন্দীভাষীরা গোটা ভারতকে শাসন এবং শোষণ দুইই করে থাকেন। বস্তুত ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে তেমন কোনো সোনার পাথর বাটি নেই। একবার যদি ভারতের জাতি এবং ভাষাসমূহ জেগে ওঠে এবং নিজেদের আর্থিক জীবনের নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে লেগে যায়, বর্তমান ভারতের যে কৃত্রিম ঐক্য তা ভেঙ্গে পড়বে এবং ভারতীয় ঐক্যের জোড়াগুলো খুলে পড়তে আরম্ভ করবে। ভারতের প্রান্তদেশে যদি একটি জাতীয় রাষ্ট্র জন্মলাভ করে তাহলে শিগগির কিংবা বিলম্বে ভারতের অন্যান্য শোষিত জাতিসমূহও ঐ একই পথ অবলম্বন করবে। বিশেষত বাঙালীর একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা একেবারে আনকোরা নতুন নয়। উনিশশো সাতচল্লিশের ভারত-বিভাগের পূর্বে শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম জননায়ক এরকম একটা খসড়া পরিকল্পনা করেছিলেন। যেহেতু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন অবাঙালী হিন্দু-মুসলিম পুঁজিপতিরা, মূলত অর্থনৈতিক সমর্থনের অভাবেই সে জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গোড়াতে বানচাল হয়ে যায়।

কেঁচো খুড়তে গেলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম অনুসারে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে, এই আশঙ্কা করেই ভারত প্রথমে সরাসরি একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে নিজে চাপ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রয়োগ করে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গকে দিয়ে চাপ প্রয়োগ করিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। ভারতের দাবী ছিল, পাকিস্তান বাস্তুত্যাগী অধিবাসীদের ফেরত গ্রহণ করুক, তাদের নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্ন জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হোক, পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়া হোক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হোক। পাকিস্তান ভারতের প্রচারণায় দৃশ্যত কোনো কান না দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে চেয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্যা তা পাকিস্তানেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যা। ভারত একটি তৃতীয় দেশ। সুতরাং ভারতের কোনো কথা বলার অধিকার নেই। বরং ভারতই অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে এবং কতিপয় কুচক্রী বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে ঘোলা জলে মৎস্য শিকার করার উদ্দেশ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। ইয়াহিয়া খানেরা ভেবেছিলেন, ভারতকে স্বখাত-সলিলে ফেলে দিয়ে মজা দেখবেন। যে অস্ত্র ভারত পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্যে শাণিয়ে তুলছে, তা তারই বুকে বজ্রশেলের মতো এসে বাজবে। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-শৃঙ্খলা কোনরকমে কিছুদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলেই একটা সময় আসবে, যখন ভারতকে পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্বেও স্বদেশে কিংবা বিদেশে ভারত কোথাও যুদ্ধের কথা উচ্চারণ করেনি। যুদ্ধের কথা বলার মধ্যে যে বিপদ আছে সে বিষয়ে ভারত পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল। বাংলাদেশের সমস্যা যে একটি মানবিক সমস্যা এবং এর একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি ভারত। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর রাজধানীসমূহে বিরামহীনভাবে সফর করেছেন এবং পৃথিবীর নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে এর একটা রাজনৈতিক সমাধান হওয়া খুবই প্রয়োজন। এইভাবে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও পৃথিবী সফর করেছেন এবং তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে বাংলাদেশ ব্যাপারটি একান্তভাবেই পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা। মাঝখানে ভারত অহেতুক নাক গলিয়ে গায়ে পড়ে শত্রুতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের ব্যাপারটি ছিল ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের তুরুপের তাস। বাংলাদেশের প্রশ্নটির ওপর দাঁড়িয়েই শাসক কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোকে নাজেহাল, কিছুটা পুরানো ঐতিহাসিক প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সাধন, কিছুটা সুবিধা অর্জন এবং সর্বোপরি আগামীতে ক্ষমতা দখল করার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। এই জন্যে সূচনাপর্ব থেকেই কংগ্রেস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টাকে আগাগোড়া একটি লক্ষ্যে চালিত করার জন্যে দলীয় ক্যাডারদের নিয়োজিত রেখেছিল। মস্কো সমর্থক ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিই কংগ্রেস সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে অন্ধ আনুগত্য প্রদান করেছে। এছাড়া বাকি রাজনৈতিক দলগুলো প্রথম থেকেই কংগ্রেস বাংলাদেশ প্রশ্নটি মূলধন করে কেল্লা জয় করে ফেলবে তা খুব একটা সুনজরে দেখেনি। অথচ কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারটি জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে এমনভাবে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তেলেসমাতি করে জড়িয়ে ফেলেছিল যে সরাসরি কংগ্রেসের, কিংবা বাংলাদেশের বিরোধিতা করার সাহস বিরোধী দলগুলোরও ছিল না। দেখতে না দেখতেই সংগ্রেসের নতুন একটা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ভারতীয় জনগণ কংগ্রেসের ভূমিকার প্রতি ঐক্যবদ্ধ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যক্ষভাবে জনমত জখম না করে বিরোধী দলগুলো কিভাবে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ম্লান করা যায় বিরামহীনভাবে সে প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকল।

যেহেতু ভারত সরকার ভেবেছিল যুদ্ধে না গিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধান পাকিস্তানকে দিয়ে গ্রহণ করানো সম্ভব হবে, সেই দিকে লক্ষ্য স্থির করে কংগ্রেস সরকার সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছিল, যদিও যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে উঁড়িয়ে দিতে পারেনি। এদিকে ভারতীয় জনগণও প্রায় কোটিখানেক বাড়তি মানুষের চাপে দিনে দিনে বিরক্ত হয়ে উঠল। বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, শিলং ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিদিনই কামনা করছিলেন, সরকার যা হোক কিছু একটা করে এদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুক। প্রথম দিকের সমর্থন এবং সহানুভূতি দিনে দিনে শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সরকার তড়িঘড়ি কিছু করছে না দেখে, তাঁদের সরকারের ওপর আস্থা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে আসছিল। এই সুযোগে ভারতের বিরোধী দলের লোকেরা সভা-সমিতি করে সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল যে, ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণকে প্রতারিত করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে পেছন দিক দিয়ে ছুরিকাহত করে খুনী জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটি আপোসরফা করার ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। এ নিয়ে কাগজপত্রে লেখালেখি হতে লাগল বিস্তর। এমনকি স্বয়ং কংগ্রেস সমর্থক কিছু কিছু কাগজও সরকারের নিষ্ক্রিয় আপোসকামী ভূমিকার নিন্দা করতে লাগল জোরালো ভাষায়। তার ফলে সরকারকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। প্রথমত বিরোধী দলগুলোর প্রশ্নটি। দ্বিতীয়ত ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের জনমত। তৃতীয়ত পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমাধানে রাজি করানোর প্রশ্ন। চতুর্থত আওয়ামী লীগের কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের মনোবল ও আস্থা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটি। সূচনার দিকে আওয়ামী লীগের লোকজন একরকম নিঃসন্দেহই ছিলেন যে ভারত অচিরেই একটা সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। সেদিকে না গিয়ে ভারত যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তাঁরা মনে মনে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে বাংলাদেশের জনগণ একটি মাত্র দাবী ছাড়া আর কোনো দাবী মেনে নেবেন না। সেটি স্বাধীনতা। বাংলাদেশ যদি তাঁদের নেতৃত্বে যে কোনভাবেই হোক স্বাধীনতা লাভ না করে, তাঁদের দেশে প্রত্যাগমন করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে আলাপ-আলোচনায় আহ্বান করছে, সেটি তো তাঁরা পঁচিশে মার্চের পূর্বেই করতে পারতেন। আর যদি আলাপ-আলোচনা করতেই হয়, তাহলে তাঁরাই তো পারেন, মাঝখানে ভারত কেন। আলাপ-আলোচনা মানে তো স্বাধীনতা নয়। স্মরণকালের নিষ্ঠুরতম বলি হওয়ার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরেও তাঁদেব নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব মেনে নেবে? এইসব প্রশ্ন আওয়ামী লীগারদের মনে সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানকভাবে তোলপাড় করছিল এবং তাঁরা কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। পঞ্চমত যে-সকল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সপরিবারে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শতকরা আশিভাগই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। তাঁদের অধিকাংশই মনে করতেন, যেহেতু উনিশশো সাতচল্লিশ সালে মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা সেই ভারত বিভাগেরই বলি। তাঁদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব বর্তমান ভারত সরকারের। যত আলাপ-আলোচনাই হোক না কেন বাংলাদেশ যতকাল পাকিস্তানের অংশ হিসেবে টিকে থাকবে, ততকাল তাঁরা কিছুতেই ফেরত যাবেন না। ষষ্ঠত যে-সকল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের নানা স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাতে কোনো ভারী অস্ত্রশস্ত্র প্রাদান করতেন না। কংগ্রেস সরকার সর্ব ব্যাপারে একটা সংযম রক্ষা করে আসছিল, যাতে করে আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোস-নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়ে না যায়। হাল্কা অস্ত্রপাতি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গামছা বাঁধা কয়েকটা গ্রেনেড এবং রাইফেল জাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি সম্বল করে এপারে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতিই তাঁরা করতে পারতেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হত ও যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদেরও বিপদে ফেলতেন। এই অবস্থা পৌনঃপুনিকভাবে চলতে থাকলে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ তাঁদের ছেঁকে ধরে, হয়তো ভারত সরকারের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনোই অভিপ্রায় নেই। মাঝখানে তাঁদের প্রাণগুলো বলতে গেলে একরকম অকারণেই খোয়া যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যেও হতাশার হিমেল হাওয়া সঞ্চারিত হচ্ছিল। সপ্তমত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারে এবং স্বাধীনতার প্রতি দুর্দমনীয় স্পৃহায় ছোট ছোট প্রতিরোধ বাহিনী জন্মলাভ করছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যথেষ্ট রকমে মুষ্টিমেয়। চরিত্রে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয় সমৃদ্ধ এবং সমাজদর্শনের দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তাঁরা নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওপর ছোটোখাটো হামলা পরিচালনা করছিলেন। দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যের বর্ণনাতীত অত্যাচারের মুখে তাঁদের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি লাভ করার যথেষ্ট পরিমাণ সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে যেমন তেমনি ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিরোধিতা করতেন। অনেকগুলো স্থানে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ততই তাঁদের সংখ্যা বাড়ছিল। এভাবে যুদ্ধটি যদি গণযুদ্ধের আকারে ভিয়েতনামের মতো ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ভারতের সমূহ সর্বনাশ। জনগণের অন্তর থেকে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি একেবারে মুছে যাবে। এমনকি এক সময়ে চীন তাঁদের পিছনে মদদ নিয়ে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দাঁড়াতে পারে। আওয়ামী লীগারদের যদি বাংলাদেশে আসীন করতে না পারে তাহলে ঘরে বাইরে দু'দিক দিয়েই কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটবে এবং বাংলাদেশ চিরদিনের জন্যে হাতের বাইরে চলে যাবে। কংগ্রেস সরকার আশা করেছিল অন্তত ইয়াহিয়া খানেরা ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা রাজনৈতিক ফয়সালা করে যে কোনো ভাবেই হোক, পাকিস্তানের অস্তিত্বটি টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানেরা চিন্তা করলেন, তাঁদের অবস্থান সুবিধাজনক। ভারতকেই পাকিস্তানের শর্ত মেনে নিতে হবে। অতএব ভেতর-বাইরের অসংখ্য দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে ভারতের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো খোলা পথ রইল না। ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। একে একে সোভিয়েত প্রভাবাধীন সরকার সমূহকে দিয়ে ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশের আইনানুগ সরকার বলে স্বীকার করিয়ে নিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাজধানী সফর করে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে এলেন, যদি ভারত-পাকিস্তানে সত্যিসত্যি যুদ্ধ লাগে অন্তত তাঁরা যেন পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন এবং জনগণকে বোঝাতে চাইলেন যে ভারত যদি যুদ্ধও করে, তাহলে করবে একান্ত বাধ্য হয়ে।

My All Garbage

৭

পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিসমূহ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত না করলে এ আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ে যে ভূমিকা পালন করেছে এবং তার সার্বিক প্রভাব যেভাবে মুক্তিসংগ্রামের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ সামাজিক শক্তিগুলোকে সামনে টেনে এনেছে এবং পশ্চাতে ঠেলে দিয়েছে সে কথা একটু আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে। যে সমস্ত দেশ সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা দান করেছে, তার পিছনে তাদের নিজেদের আন্তর্জাতিক প্রভুত্ব বিস্তারের বাসনা কতদূর ছিল, সে কথাও একটু নির্মোহভাবে দেখা প্রয়োজন।

শুরু থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সক্রিয় সহায়তা দান করেছে। ভারতের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া ব্যগ্র সমর্থন দান করেছে। সোভিয়েত প্রভাবাধীন দেশসমূহও সূচনাপর্ব থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। প্রধানত সোভিয়েত রাশিয়ার মুরুব্বীয়ানার কারণেই পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই ভারতের তত্ত্বাবধানে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশের বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এসবই হওয়া সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবের কারণেই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তারপর ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র থেকে শুরু করে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে। যুদ্ধে যাতে ভারতীয় সৈন্যের হাতে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। সুতরাং এ কথা বলা বোধকরি অসমীচীন হবে না – পরোক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না থাকলে বর্তমান আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে সশস্ত্র সামরিক হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে ভাঙার মতো একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হত না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পূর্ব থেকে চীনা হুমকির মুখে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি একটি সমঝোতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজের আসন অটুট রাখার জন্যে ভারতের মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর থেকে ভারতের শাসক কংগ্রেস এবং মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরকে সহায়তা করতে থাকে। শাসক কংগ্রেসের স্বার্থ ছিল অন্যান্য বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে পরাজিত করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করা। বিশেষত সেই সময়ে যখন মূল কংগ্রেস আদি সংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস এই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির স্বার্থ ছিল, যেহেতু ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সোভিয়েত ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছেন এবং লালচীনের প্রতি একেবারে ক্ষমাহীন ও খড়্গহস্ত, তাই তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের প্রতি সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। আসলেও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দুঁদে কংগ্রেসের ক্ষুদে সহযাত্রী হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলে মনে করত।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে বন্ধুত্ব তার মৌল উৎস হলো, ভারতে-চীনে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সে অবধি চীনের সঙ্গে ভারতের প্রখর শত্রুতা চলছে। এটা হলো ভারতীয় দিক। আর রাশিয়ার দিকটি হলো, বাহ্যত আদর্শগত কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে গণচীনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব সময়ের বিবর্তনে ঐতিহাসিক শত্রুতার রূপ নিয়েছে। চীন সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারত উভয়ের শত্রু। সুতরাং ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেও পরস্পর শত্রুতার সম্বন্ধ। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে ঠেকা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে একদিকে গণচীনের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক প্রতিটি বৃহৎ রাষ্ট্রই আপনাপন রাষ্ট্রাদর্শ প্রচার করে পৃথিবীর জনগণের মনে স্থান করে নেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তারা আপনাপন স্বার্থকেই সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয় সেকথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া দু'রকমে লাভবান হতে চেয়েছিল।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রথমত এশিয়া-আফ্রিকার দেশসমূহে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে আটকানো। সে কাজটি একমাত্র সম্ভব এশিয়ার অপর বৃহত্তম দেশ ভারতকে প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে যদি ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ গণচীনের প্রভাব এই অঞ্চলে চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। এর পরবর্তীকালে ভারতের সাহায্যেই পাকিস্তানের অপরাপর প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বসমূহও শাণিত করে ধীরে ধীরে গোটা উপমহাদেশকে ভারতের তত্ত্বাবধানে একটি চীন-বিরোধী ব্লক হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে। সোভিয়েত রাশিয়ার দু'নম্বর লাভ হলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা উষ্ণ প্রতিযোগিতা চলছে। প্রথমে পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরা করে, পরে পাকিস্তানের মূল অংশের মধ্যে ভাঙনের প্রক্রিয়াটি দ্রুত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরও তারা কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের স্বার্থ সমসূত্রে অবস্থানের দরুন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কোপন্থী অংশ এবং মস্কো সমর্থক বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি বলতে গেলে একরকম হঠাৎ করে পুরোভাগে চলে আসে। উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে বোধকরি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একটি কি দু'টি আসনে বিজয়ী হতে পেরেছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি তো পাকিস্তানে নিষিদ্ধই ছিল, সুতরাং নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তা সত্ত্বেও এরকম একটি সংখ্যালঘু দল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের অভিভাবক হয়ে দাঁড়াল কেমন করে, তা রীতিমত কৌতূহলের বিষয়।

আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে যখন থেকে ভারতমুখিনতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক দলগুলো এবং দলের অধীন উপদলগুলো আওয়ামী লীগের কাছে ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। যেহেতু আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ে এত বেশি আস্থাশীল ছিল যে এরকম একটি অপ্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। এছাড়াও আরেকটি কারণ ছিল। আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ লোকই ছিল উঠতি বাঙালী মধ্যবিত্ত। তাঁরা সরাসরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধিতা করতেন। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়ে, স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানও পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা অনুবর্তী ছিলেন। মস্কোপন্থী দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যাই হোক না কেন, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণেও দুটি দল ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তাও বাধা দু'দিক থেকেই ছিল। আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে মস্কোপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, কিন্তু কর্মীদের তাঁরা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ অনুসারী দল কি করে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রাদর্শ অনুসারী দলের সঙ্গে এক হয়ে যায়!

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আর আওয়ামী লীগের মধ্যে যে ছাত্র-যুবকদল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তনের কথা বলতেন, ঠিক মস্কোর তাঁবেদার দলগুলোর সঙ্গে আপোস করে শুধুমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য-সমর্থনের ওপর নির্ভর করে কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ বিষয়ে তাঁদের কোনো আস্থাই ছিল না। পঁচিশে মার্চের ঘটনার পরে আওয়ামী লীগের লোকেরা ভারতে চলে আসেন এবং ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে তাঁরা জড়ো হতে থাকলেন ও একটি আশ্রিত সরকার গঠন করলেন। পঁচিশে মার্চের পূর্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্ররূপটি কি হবে আওয়ামী লীগ সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কারণ আওয়ামী লীগ দলটি বাঙালী মধ্যবিত্তের দ্বারা গঠিত এবং তাঁরাই এর মুখ্য উপাদান। সুতরাং নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কবুল করতে পারে না। অন্যদিকে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের দাবী এমন চরমে উঠেছিল যে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরাসরি তা অস্বীকার করার উপায়ও ছিল না। আর আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত যে যুবক এবং ছাত্র অংশটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সপক্ষে ছিলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তাঁদের হাত ছিল না। বর্তমান পর্যালোচনার একটি পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, তাঁরা আর আওয়ামী লীগের সঙ্গে অবস্থান করতে পারেননি। সম্পূর্ণ আলাদা একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ দল থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সে বা হোক, মধ্যবিত্ত শাসিত আওয়ামী লীগ দলকেও সেই সময়ে আন্দোলনের বেগ অপ্রতিহত রাখার জন্যে এই অংশকে হাতে রাখতে হয়েছে। বিশেষত আন্দোলন যতই জঙ্গী হয়ে উঠছিল ততই এই অংশের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি লাভ করছিল।

বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করার সময় যে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করে নেয়নি, ভারতে যেয়ে বিমুখী চাপের মুখে সেই সমাজতন্ত্রের কথাই বলতে হলো। প্রথমত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ দেশের বাইরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের যুদ্ধে তাঁদের শুধু মুখে কথা বলা ছাড়া পালনীয় কোনো ভূমিকা বর্তমান রইল না। দেশের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষেও যুদ্ধে জয়লাভ করা অত সহজসাধ্য নয়। তাই জনগণের অংশগ্রহণের জন্যে তাদেরকে গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাও বলতে হলো। অন্যদিকে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের প্রধান সহায় ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। এ দেশের রুশ-সমর্থকেরা ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দকে বুঝিয়েছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজ সামনে রেখেই, ভারত রাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই রাশিয়াও চাপ প্রয়োগ করে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র শব্দটি যোগ করে দিয়েছিলেন। ভারতের মতো পুঁজিবাদী একটি দেশের একেবারে উপান্তে পুঁজিবাদ ক্ষমতায় আসীন থাকার সময়ে কি করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই ধারণা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হাস্যকর কিনা, সেই সময়ে আওয়ামী লীগারদের তা ভেবে দেখার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। ভারত থেকে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মস্কোর পুরো সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমর্থনের পথ বেয়ে ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অঘোষিতভাবে আওয়ামী লীগের ঘাড়ের ওপর সিন্দবাদের বুড়ার মতো চেপে বসে। আওয়ামী লীগ ঝেড়ে ফেলার জন্যে যতই কাঁধ ঝাড়া দিয়েছে, ততই শক্ত হয়ে বসেছে। বারবার ভারত-রাশিয়ার মিলিত চাপের কাছে আওয়ামী লীগকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত একটি দল হওয়া সত্ত্বেও মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অভিভাবকদের স্নেহে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। স্বাধীনতার পরে তাঁদের প্রভাব খর্ব না হয়ে আওয়ামী লীগের ওপর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করেছে। এমনকি তাঁদেরই পরামর্শে এবং সক্রিয় সমর্থনে আওয়ামী লীগ দলটিকে ভেঙে বাকশাল বলে তিন দলের একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করতে হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পরে আসে চীনের কথা। চীন বিশ্বের সর্বাধিক জনগণ অধ্যুষিত সমাজতান্ত্রিক দেশ। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রকাশ্যত আদর্শবাদের বিরোধ এবং মূলত প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব উলঙ্গভাবে প্রকটিত হবার পরে দুটি দেশ পরস্পর পরস্পরের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার লক্ষ্যে সবসময়ে সর্ব প্রকার প্রয়াস-প্রযত্ন নিয়োজিত করে আসছে। এশিয়ার অপর বৃহৎ দেশটি ভারত। আর ভারতে-চীনে একটি যুদ্ধ অতি সম্প্রতিককালে সংঘটিত হয়েছে। ভারতের চীন-বৈরিতার সুযোগ নিয়ে এই বিশাল ভূখণ্ডে সোভিয়েত রাশিয়া চীন বিরোধী একটি শক্তিশালী অর্গল রচনা করতে চেয়েছিল। চীন এই উপমহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব আঁচ করতে পেরে ভারতের জন্মশত্রু উপমহাদেশের অপর দেশটির সঙ্গে মৈত্রী রচনা করেছিল এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে প্রভূত সহায়তা করে সেই মৈত্রীর প্রমাণও দিয়েছিল। উনিশশো একাত্তুর সালের পরে উদ্ভূত বাংলাদেশের পরিস্থিতি চীনা নেতৃবৃন্দকে সত্যিসত্যি নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য ভারত যখন উঠে-পড়ে লেগেছে এবং রাশিয়া ক্রমাগত মদদ যুগিয়ে চলেছে, গোটা বাংলাদেশের ব্যাপারটিই রুশ-ভারতের ষড়যন্ত্র বলে তাঁরা ধরে নিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে না বললেও ঢোক গিলে স্বীকার করে নিতে হলো যে সত্যিসত্যি ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে অযথা গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। বাংলাদেশের ব্যাপারটি পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। বাংলাদেশে যে একটি নির্যাতিত জাতিসত্তা ইতিহাসের হিংস্রতম হত্যাকাণ্ডের মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে জেগে উঠেছে চীনারা প্রথম দিকে তার স্বরূপ পুরোপুরি চিনতে বেশি ভুল করেছেন, একথা বলতেই হবে। এই ভুল যতটা চীনের, তারও চাইতে বেশি চীনাপন্থীদের। তাঁরা তাঁদের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে অতীতে কখনো বাংলাদেশের জাতিসত্তার সংগ্রামকে একীভূত করে নেননি। বরঞ্চ বাংলাদেশের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে আয়ুব খানের প্রতি সমর্থন দান করে সমাজতন্ত্র আনতে পারবেন, এই রকম একটি বিশ্বাস তাঁদের আশ্রয় করেছিল।

শেষপর্যন্ত গণচীনকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আরো একটু খোলাচোখে তাকাতে হলো। পাকিস্তানী সৈন্যদের বাংলাদেশে কৃত নৃশংসতা, নির্মমতা এবং তদুপরি বাঙালী জনগণের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনমনীয় সংগ্রাম তাঁদের মনে দ্বিতীয় চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশের ব্যাপারটি বাংলাদেশের জনগণই ঠিক করবেন, এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে কৃত চুক্তিসমূহের সম্মানও রক্ষা করতে হলো। পাকিস্তানের যে সকল রাজনৈতিক অতিথি চীনে গমন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভোজসভায় বলতে হলো বিপদে-আপদে চীনের জনগণ সব সময়ে পাকিস্তানের পক্ষে থাকবেন। আর চীনের রাষ্ট্রীয় অতিথিরা পাকিস্তানে এসেও একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। পাকিস্তান সরকার সমস্ত প্রচারযন্ত্রের মারফত প্রচার করলেন যে চীন ভারতের এই আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সর্বাত্মক রকমের সাহায্য দেবে। আবার ভারতীয় প্রচার যন্ত্রসমূহেও ফলাও করে প্রচার করা হলো যে বাংলাদেশের নির্বিচারে গণহত্যার বিরুদ্ধে চীনের কোনো বক্তব্য নেই। বরঞ্চ তারা পাকিস্তানী হত্যাকারীদের অর্থ এবং অস্ত্রের মদদ যুগিয়ে চলেছে। চীনের নেতৃবৃন্দ এক মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। বাংলাদেশের প্রশ্নে তাঁদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরস্পর পরস্পরের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্রদর্শ এবং জাতিগত নিপীড়নের বক্তব্যের মুখোমুখী যখন আন্তর্জাতিক কূটনীতি এসে দাঁড়ায়, তখন অনিবার্যভাবেই আন্তর্জাতিক কূটনীতিরই জয় হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

চীনের এই ভূমিকা চীনপন্থীদেরই সব চাইতে বেকায়দায় ফেলে দিল। চীনের আসল মনোভাব যাই থাকুক না কেন, ভারত-পাকিস্তানের প্রচারে এদেশের জনগণের সামনে প্রতিভাত হলো যে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে চীনের কোনো বক্তব্য নেই এবং অধিকন্তু চীন পাকিস্তানকে সহায়তা করে যাচ্ছে। এ কারণে চীনপন্থী রাজনৈতিক দল এবং উপদলগুলো পূর্ব থেকেই যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কি করবেন বুঝতে পারলেন না। চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সহ চীন সমর্থক বামপন্থী নেতৃবৃন্দের একাংশও প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার যে চতুঃসদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, মাওলানা ভাসানীর নামও তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আর এমনভাবে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা করতে লাগলেন, যার ভিত্তিতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জনগণও মনে করতে অনেকটা বাধ্য হলেন যে স্বয়ং মওলানা ভাসানীও চীনের ভূমিকার নিন্দা করেছেন। তার ফলে চীনপন্থী নানা উপদলের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিল। কেউ মনে করলেন যে তাঁদের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত এবং ভারত যে-সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা পাঠাচ্ছে তাদেরও বাধা দেয়া প্রয়োজন। কোনো কোনো উপদল সুচিন্তিত এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য হাজির করলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানকে ধ্বংস করে রুশ সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ কায়েম করেছে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়া তাঁদের নৈতিক কর্তব্য। চীন সমর্থক বামপন্থী উপদলসমূহের সঙ্গে অনেক স্থানে ভারত থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষও হয়েছে।

যেহেতু চীন সমর্থন করে না বাংলাদেশকে, সেই জন্যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরেও চীনপন্থী নানা উপদল তাঁদের আদর্শগত অন্ধ আনুগত্যের দরুন বাংলাদেশের মূর্তিমান অস্তিত্বটি মেনে নিতে পারেনি। জনগণ থেকে তাঁরা একরকম বিচ্যুতই হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যে একটি নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হতে যাচ্ছিল তাতে তাঁরা কোনরকমের অংশগ্রহণই করতে পারেননি। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্যে খুন, জখম, হত্যা ইত্যাদি নানা হিংসাত্মক কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান রাজাকার আলবদরদের মতো তাঁদেরও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নিলেন, কাউকে জেলে ভরলেন, কাউকে একাবারে সোজাসুজি হত্যা করলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মায় তাবত বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রভুত্ববিস্তারী এক বৃহৎ শক্তি। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের বিপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থনে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেই সমরানল জ্বালিয়ে রেখেছে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ বাধার পূর্বে চীনসহ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশের সমবায়ে গঠিত ছিল ধনতান্ত্রিক শিবির। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্ব বিস্তারের প্রশ্নে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ অনেকটা স্পষ্ট, সোজাসুজি এবং জটিলতামুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটা পর্যায়ে রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করল। ভিতরের ব্যাপার জানার উপায় নেই, এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে উপলক্ষ করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মধ্যে বিরোধ। চীন ঘোষণা দিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সামজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সংশোধনবাদের পথে পা বাড়িয়েছে। অতএব সোভিয়েতের বিশ্বের সর্বহারার সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করার নৈতিক অধিকার নেই, কেননা যারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করবে, তারা কি করে জগতের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেতৃত্ব দান করতে পারে! এই বিরোধকেই কেন্দ্র করে তাবৎ দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক শিবির দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কাগজেপত্রে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় একদল আরেক দলের ভীষণ কুৎসা করতে থাকলেন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙন ধরার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ম্যাকার্থি এবং বৈদেশিক মন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস যে নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের কর্মকাণ্ড সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন একটি আঙ্গিকে বিন্যাস করে নিল। তার ফল দাঁড়াল এই যে, চীন কর্তৃক বহু নিন্দিত, বহু ধিকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেবিল টেনিস কূটনীতির মাধ্যমে চীনও রাশিয়ার মতো একটি সম্পর্ক গড়ে নিল। এই সম্পর্কের মর্মবস্তু চীন-রাশিয়া উভয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা এরকম, সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে সঙ্গে চীনের প্রভাবকে খর্ব করবে। রাশিয়া যেমন চীনের প্রভাব ঠেকাবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থান করতে রাজি, তেমনি চীনও সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব করার জন্যে মার্কিনের সঙ্গে সহাবস্থানে গররাজি নয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনার বেলায় চীন-সোভিয়েতের দ্বন্দ্বের এই প্রকৃতিটি বোঝার এবং উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে।

লিয়াকত আলী খানের আমলে পাকিস্তান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভারত সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধনতান্ত্রিক কোনো দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়েই উভয় শিবির থেকে সাহায্য-সহযোগিতা আদায় করতে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কোনো জোটে না গিয়ে উভয় জোট থেকে সাহায্য-সহানুভূতির ব্যাপারে দরকষাকষির সুযোগ পেলেন যেমন, তেমনি জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহকে একটি আন্তরাষ্ট্রিক মোর্চার মধ্যেও নিয়ে এলেন। এতে করে ভারত একদিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হলো যেমন, তেমনি বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জনগণের কাছে ভারতের মর্যাদাও অনেকগুণে বৃদ্ধি পেল। সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ পর্যন্ত পাকিস্তান সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকল। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল পাকিস্তান সামরিক জোটের আওতাভুক্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে যে পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে, ভারত পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালেই সামরিক চুক্তির অসারতা পাকিস্তানী শাসককুলের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অবশ্য তার কিয়ৎকাল পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতার প্রশ্নে একটু মৃদু রকমের অবনিবনা চলছিল। পাকিস্তানী শাসকবর্গ বারবার আবদার করেছে, অনুযোগ করেছে, কখনো কখনো আক্ষেপও করেছে, পাকিস্তান চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকেই অধিক অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। এসব কাকুতি-মিনতি হোয়াইট হাউজের কর্তা ব্যক্তিদের এক কান দিয়ে ঢুকেছে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই মান-অভিমান, অভাব-অভিযোগের সময়ের মধ্যেই চীন-ভারত এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে এটা স্থির হয়ে যায় যে ভারতে সোভিয়েত-মার্কিন সহাবস্থান করবে পাকিস্তানে চীন-মার্কিন সহাবস্থান করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারত-পাকিস্তানও স্বল্পোন্নত দেশ। দু'দেশেরই নির্যাতিত জনগণ অন্তত তাঁদের মুখ্য অংশ সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়াসী। চীন-সোভিয়েতে যে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে একই রকম পরিবর্তনে আগ্রহী। মুশকিল হলো এই সমস্ত দেশের সমাজগুলো প্রাচীন এবং রাষ্ট্রগুলো নবীন। যাঁরা এই নবীন রাষ্ট্র কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের ক্ষমতায় অবস্থানের জন্যে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের গলগ্রহ না হয়ে উপায় থাকে না। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ এই শ্রেণীকে কিছু সংস্কার, কিছু উন্নয়ন সাধন করার মতো অর্থ সাহায্য দিয়ে হাতে রাখে যেমন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে তাদের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে গড়ে ওঠার পদ্ধতিও প্রতিরোধ করে। এইভাবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যবিত্তদের অর্থ সাহায্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখছিল। এই উপমহাদেশের নেতৃশ্রেণীর মধ্যে তাদের সমর্থকের কখনো অভাব হয়নি। এক মধ্যবিত্ত সরকারের আচার-আচরণ তাদের কাছে অসুবিধাজনক মনে হলে, অন্য এক মধ্যবিত্ত সরকারকেই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাকিস্তানে এমনটি ঘটেছে বারবার। এই পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্ত দেশসমূহে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখে। এই উপমহাদেশেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

বাংলাদেশের ব্যাপারটি যখন ঘোরাল হয়ে দেখা দিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গ প্রশ্নটিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে। প্রথমত ভারত-পাকিস্তান মিলিয়ে এই উপমহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ে একখণ্ড ব্লক হিসেবে দেখত। এখানে কমিউনিজম ঠেকানই তার লক্ষ্য। কোন্ নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিল, কিংবা মারা গেল তাদের অত মাথা ব্যথার কারণ নেই, যদি না তা তাদের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু অতীতে এই চুক্তি সত্ত্বেও ভারতকে আর্থিক সাহায্য করতে তাদের আটকায়নি। যতই চুক্তি থাকুক না কেন ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর অসন্তোষের কারণ ঘটে সেরকম কোনো কিছু করতে যুক্তরাষ্ট্র কখনো প্রস্তুত ছিল না। আবার পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীকেও একেবারে নিরাশ করেনি। চুক্তির শর্ত অনুসারে কিছু অস্ত্র সরবরাহও করেছে। পাকিস্তান যখন আরো অধিক অস্ত্র চেয়েছে, স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেনি যে, পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী যে চুক্তি তা কমিউনিষ্ট শক্তিকে ঠেকানোর চুক্তি। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশ সংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে একটা মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করে আসছিল। মোদ্দা কথায় বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারত। প্রথমত সরাসরি পাকিস্তানের সাহায্যার্থে আসতে পারত — কিন্তু তা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করলে তাকে ভারতের শাসকবর্গের অধিকতর বিরাগভাজন হতে হত এবং ভারতের মার্কিন সমর্থক মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির ওপর চিত্তরে প্রভাব হারাতে হত, এক কথায় ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হাত গুটাতে হত। সরাসরি একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তাদের আতঙ্ক ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে স্বদেশে-বিদেশে যে অখ্যাতি রটেছে, সে বিষয়ে মার্কিন শাসকেরা অতিশয় সজাগ ছিলেন। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সপক্ষে অধিকতর একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারত। একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জেনারেল ফার্লাণ্ডের এরকম একটি বোঝাপড়া হয়েছিল জানা যায়। বাংলাদেশের সপক্ষেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে শরণার্থীদের প্রতিপালন করার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য দেয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেনি। তার কারণ আমেরিকা সামাজিক অবস্থানের দিকে না তাকিয়ে কোনো আর্থিক সাহায্য করে না। বাংলাদেশে সেই শ্রেণীটি ছিল না। বাংলাদেশের যে মধ্যশ্রেণীটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেটি ততদিন ভারতবর্ষ, অধিকতর বিশদ করে বলতে গেলে, সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে বাধ্য হয়ে। তাই এ কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান যে যুদ্ধ হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারসাম্য রক্ষা করার নীতিই মেনে চলেছে।

আর বাকি রইল মুসলিম দেশসমূহ। আয়ুব খান ক্ষমতায় থাকার সময়েই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার চুক্তি গড়ে তুলেছিলেন। পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরকে সামরিক সহযোগিতা দান করবে বলেও প্রতিশ্রুতি ছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই আরসিডিভুক্ত দেশসমূহের সেনাপতি এবং নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান সফর করেছেন, সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রেখেছেন : পাকিস্তানের মতো ইসলামী দেশের প্রয়োজনে তাঁরা পাশে এসে দাঁড়াবেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দও ঐ সকল দেশ সফর করেছেন। সমস্ত মুসলিম জাহান এবং আরব বিশ্ব পাকিস্তানের পক্ষে রয়েছে একথা পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ দিনে-রাতে প্রচার করতে লাগলেন।

বাংলাদেশের তিন শ্রেণীভুক্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে পাকিস্তান তিন ধরনের প্রচারণা চালাতে লাগল। প্রথমত জনসংখ্যার যে অংশটি শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থের খাতিরেই পাকিস্তানের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখতে চাইতেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রচার করত পাকিস্তানের পেছনে আরব-বিশ্ব, মুসলিম জনগণ রয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে করত প্রচার পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি রয়েছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর হুস্ করে ভেসে উঠবে। যাঁরা রুশ-ভারত চক্রের বিরোধী তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হলো, অতি শিগগিরই পাকিস্তানের মিত্র জনগণতান্ত্রিক চীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সকলের মধ্যে এমন একটি আশা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল যে এই তিন দল মিত্র একই সঙ্গে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ছুটে আসছে। কিন্তু ইরান কিংবা তুর্কী দেশের কোনো সিপাহ্সালার ইসলামের খাতিরেও পাকিস্তানের রণক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করলেন না। ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহরের টিকিটিও দেখা দিল না। কারাকোরাম সড়ক বেয়ে চীনের ড্রাগনের মতো অপরাজেয় কোনো চীনা মিলিশিয়া দেখা দিল না। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হলো। কার যুদ্ধ কে করে? মুসলমান কিংবা কমিউনিষ্ট সকলকেই নিজের লড়াই নিজেকে করতে হয়। পাকিস্তানটি ভেঙে গেল।

৮

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানী সৈন্যের কবলমুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে সকল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তার মূল নিহিত ছিল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংগঠনটির অভ্যন্তরে। উনিশশো একাত্তর সালের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ছয়দফা আদায় করা। আওয়ামী লীগের মুখ্য অংশ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপের সমর্থক ছিল। এই আদর্শগত বৈপরীত্যের কারণেই মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে কোনরকম ঐক্যমতে পৌছাতে পারেনি। উনিশশো একাত্তর সালে প্রধানত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের নির্দেশ মাফিক রচিত আন্দোলন এবং প্রচারণার ফলে গোটা বাংলাদেশের জাতিসত্তাটি যখন জেগে উঠেছে, দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তাকে আর ধারণ করা সম্ভব নয়, সত্যি তখনই আওয়ামী লীগ অন্য কোনো বিকল্প না দেখে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ ছয়দফা দাবী উত্থাপন করে জনগণের দাবীর যখন স্বাধীনতার স্তরে উত্তরণ ঘটেছে, দলীয় নেতৃত্ব অটুট রাখার জন্যে তা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। কিন্তু শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের আন্দোলন ছিল স্বায়ত্বশাসন ভিত্তিক। বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত লোকেরা এ কারণেই আওয়ামী লীগের পেছনে জড়ো হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে ছয়দফা সংগ্রাম বিজয়ী করতে পারলে, পাকিস্তানী নেতৃশ্রেণীর প্রভাবমুক্ত একটি নতুন নেতৃশ্রেণীর উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনাই রয়েছে। একাত্তরের নির্বাচনে 'আওয়ামী লীগের টিকিটে যে সকল প্রার্থী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মুখ্য অংশ ছিলেন হয়তো নতুন উন্মেষিত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ একেবারে নবাগত নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নয়তো সুযোগসুবিধা প্রত্যাশী অন্যান্য রাজনৈতিক দলত্যাগী সদস্যবৃন্দ। তাঁরাই ছিলেন আওয়ামী লীগের মূল সিদ্ধান্তপ্রণেতা। উনিশশো পঁয়ষট্টির পূর্বে যাঁরা আওয়ামী লীগ করতেন এবং পরে যাঁরা আওয়ামী লীগার হয়েছিলেন, দু'ধরনের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আওয়ামী লীগারদের মধ্যে চিন্তা-চেতনার আকাশ-পাতাল ফারাক বর্তমান। এই দুই শ্রেণীভুক্ত লোক ছাড়া জনসংখ্যার তৃতীয় একটি বিশাল অংশ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র এবং তরুণ। বামপন্থী সংগঠনগুলো যদি সঠিক পদ্ধতিতে বাঙালী রাজনৈতিক গন্তব্যটি স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন, শুরু থেকে তাঁদের অধিকাংশই সেদিকে ঝুঁকে পড়তেন। তাঁরা চিন্তা-ধারণায় ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তুলনায় অনেক অগ্রসর। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো অতিশয় কুণ্ঠাহীনভাবে দাবী করতেনই, সঙ্গে সঙ্গে এও দাবী করতেন যে এই অঞ্চলে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের প্রাণসম্পদ এঁরাই যুগিয়েছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বকে এঁদের ওপরই ভরসা করতে হত। তাই এঁরা স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবী উত্থাপন করলেও সরাসরি বিরোধিতা করে এঁদের চটিয়ে দিতে সাহসী হতে পারেননি। এসব কারণেও স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবীটি বাংলাদেশের ভেতর থেকে স্ফুরিত হয়ে সংগ্রামের ঠিক অগ্রভাগে না হলেও একপাশে স্থান করে নিতে পেরেছে। আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব যে অংশের ওপর অর্পিত ছিল তাঁরা স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ নয়, ভৌগলিক সীমারেখার চৌহদ্দির মধ্যে গণতান্ত্রিক একটি স্বাধীন বাংলাদেশেরও পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন, একথা মনে করার কোনো উপায় নেই। সত্য বটে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবীর প্রতি উত্তাল মুহূর্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন মৌখিকভাবে, কিন্তু আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপরেখার মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের দাবীর অতিরিক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের কোনো পরিকল্পনা সেই সময়ে অনুপস্থিত ছিল।

পঁচিশে মার্চ তারিখের পর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যখন ভারতে চলে গেলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের সংগ্রামটি পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করল এবং পেছনে সোভিয়েত রাশিয়া এসে জুটল। এ যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্যে স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র শব্দ দু'টি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে হলো। দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা দলে দলে ভারত গমন করেন। ভারতে অবস্থানকালেও আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-তরুণদের মধ্যে দুরকমের চিন্তা, দুরকমের জীবনদৃষ্টি স্পষ্টত লক্ষ্যগোচর ছিল।

উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বরের পরবর্তী সময়ে অনেকটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার এই নতুন ক্ষমতা নিয়ে কি করবে তা নিয়ে মস্ত ফাঁফড়ে পড়ে গেল। অর্থনৈতিক পদ্ধতি যে কোনো রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। মারাত্মকভাবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এবং অর্থনৈতিক অন্তর্দাহে জর্জরিত বাংলাদেশে অবিলম্বে একটি আর্থিক পদ্ধতির সূচনা করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কাজ শুরু করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু কোন্ অর্থনৈতিক পদ্ধতিটি তাঁরা চালু করবেন? যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁরা ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দু'ধরনের অর্থনৈতিক বিনির্মাণেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি তাঁরা বলেন যে বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই গোড়াপত্তন করবেন, তাহলে আওয়ামী লীগের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজতান্ত্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠার মানসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। অন্যদিকে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে নানাবিধ গাটছড়ায় আবদ্ধ এবং তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন বাংলাদেশের আর্থিক পুর্নগঠনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে পশ্চিমের কোন্ ধনতান্ত্রিক দেশটি এগিয়ে আসবে? পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ যদি আর্থিক সাহায্য দিয়েও থাকে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক স্বার্থটিও ভালোভাবে হাসিল করে নেয়। যদি তাঁরা বলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করবেন, তাহলে তাঁদের নিজেদের পায়ের তলায় মাটি সরে যায়। ধরতাই বুলি হিসেবে শব্দটি উচ্চারণ করতে বাধ্য হলেও মনেপ্রাণে তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ধনতান্ত্রিক। সেই অনুসারে দলীয় কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-চেতনাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের পেছনে জড়ো হয়েছিলেন শ্রেণীগত লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করার জন্যে। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি অর্থনৈতিভাবে সুগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি বলেই যেমন সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেনি, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ধনতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র কোনো একটি শক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। ধরে নেয়া যেতে পারে, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ যেভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে এ ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, এখানেও সোভিয়েত অনুরাগী দলগুলোর দৌত্যে তাঁদের মাধ্যমে সেই ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় ধনী বণিকশ্রেণী বাংলাদেশে তাঁদের একটা বাজার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেস সরকার ছিল তাঁদেরই সরকার। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত, ভারতীয় শাসকদের চটিয়ে বাংলাদেশে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই তাঁরা সহ্য করতেন না।

এইরকম অনিশ্চয়তা এবং দোদুল্যমানতার মধ্যে আওয়ামী লীগারদের দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিতে হয়েছে। এই সময়ে তাঁদের লোভ-লালসার প্রবৃত্তিসমূহ গুটিবসন্তের বীজাণুর মতো ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। অবাঙালীদের ঘরবাড়ী দখল করা, দোকান ব্যবসা আত্মসাৎ করা এবং যে-সকল লোক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠতরাজ করাই আওয়ামী লীগের একটি উল্লেখ্য অংশের পেশা হয়ে দাঁড়াল।

তাঁরা লুঠপাট এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে এত তন্ময় এবং নিবিষ্ট ছিলেন যে এরই মধ্যে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রপাতি, কলকারখানার নানা যন্ত্রাংশ, মিলের মজুত সামগ্রী ভারতে পাচার করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই সময়ে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে এলেন। তাঁর বড় বড় হুঙ্কার দেয়া ছাড়া করারও কিছু ছিল না। যে রাজনৈতিক দলটির তিনি সর্বাধিনায়ক, সেই দলটির ধারণা, তাঁরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপাতত দেশে কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করতে অপারগ হওয়ায়, তাঁরা মনের আনন্দে লুঠপাটের ব্যাবসাটি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পাকিস্তানের শত্রু-সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ মাড়োয়ারীদের কাছে বেচে দু'পয়সা কামাই করছেন। এই কর্মের সঙ্গে কর্মী এবং নেতা এত অধিকহারে জড়িয়ে ছিলেন যে দলীয় কোনো শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে তাঁর পক্ষে রাশ টেনে ধরা অসম্ভব ছিল। বরঞ্চ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এই পঙ্কিল আবর্তে নিপতিত হয়ে তিনি নিজেও খেই হারিয়ে এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাটির সিংহভাগ ছিল অবাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের পরিচালনাধীন। যুদ্ধ শেষের পূর্বাহ্নে শিল্পমালিকেরা পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন এবং এই সকল কলকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হয়। আওয়ামী লীগ সরকার নিজ দলীয় লোকদের এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে তাঁদের হাতে শিল্প-কলকারখানার প্রশাসনভার ছেড়ে দেন। তাঁদের না ছিল দক্ষতা, না ছিল অভিজ্ঞতা। সুতরাং তাঁদের পক্ষে যে কাজটি করা স্বভাবতই যুক্তিসঙ্গত তাই-ই করেছেন, যন্ত্রাংশ এবং মজুদ দ্রব্যসামগ্রী উপাচার-উপকরণসমূহ সমমনাদের সহযোগিতায় পাচার করে দিয়েছেন। এই অসৎকর্মের ফলে মিলগুলোর উৎপাদন অনেকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিল। কারখানাতে কোনো উৎপাদন নেই অথচ ব্যাঙ্ক থেকে আগাম টাকা ঋণ দিয়ে শ্রমিকদের মাইনে পুষিয়ে দিতে হলো। যেহেতু কলকারখানায় কোনো কাজ নেই আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-উপনেতাদের সম্বর্ধনার আয়োজন করতে থাকলেন। বিরোধী দলগুলো যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্যে শ্রমিকদের সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রাখলেন। এইভাবে উৎপাদনের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলা হলো। সরকার-সমর্থক শ্রমিক নেতাদের উৎপাতে সরকারী শিল্প-কারখানার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনও শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াল। উৎপাদনের এই নৈরাজ্য দেশের জনজীবনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি।

বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের জনগণের তরফ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা পুনর্নির্মাণের জন্যে রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক করণে যে অঢেল সাহায্য এসেছিল তার সিকিভাগও উপদ্রুত মানুষের হাতে পৌঁছাতে পারেনি। রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতা এবং সহায়তায় অতি-খাওয়া মানুষগুলোই সব সাবাড় করে দিয়েছিল। একশ্রেণীর মানুষের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ এত অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে কোনো কিছুই তার গতিরোধ করতে পারেনি। রাষ্ট্রশক্তি কোনরকম প্রতিবন্ধকতা রচনা করার কথা দূরে থাকুক, নিজে আগ্রহী হয়েই তাঁদের সে সুযোগসুবিধে করে দিয়েছে। অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ধনিকশ্রেণী গড়ে উঠেছে কিন্তু তারা সমাজকেও কল-কারখানায়, শিল্প-বাণিজ্যে নানাদিক দিয়ে ধনী হিসেবে গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্র এবং সমাজকে একেবারে দরিদ্র-দিগম্বর রেখে একা একটি শ্রেণী অনর্জিত অর্থে ধনী হতে চেষ্টা করলে সমাজজীবনে যে বিষক্রিয়া হয়, বাংলাদেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে।

উৎপাদনের নৈরাজ্য সামাজিক নৈরাজ্যকে হাজারগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই নৈরাজ্য রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরোপুরি নৈরাজ্য যখন একটি সমাজকে শাসন করে, ক্ষমতাসীন দলকেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নৈরাজ্যের সব চাইতে বড় এজেন্ট হয়ে বসতে হয়। আওয়ামী লীগকেও তাই হতে হয়েছিল। যে সকল তরুণ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যখন তারা দেখলেন, বাংলাদেশে তাঁরা রক্ত দিয়ে আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বার্থপর সুবিধেভোগীদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁরা এতই নৈতিকতাবোধ বিবর্জিত যে গোলায় আগুন দিয়ে খই খেতেও আটকায় না, তখন আর তাঁদের হতাশার সীমা রইল না। তাঁরা ভয়ঙ্কররকম দমে গেলেন। আবার অন্যদিকে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণ মুক্তিযোদ্ধার নাম ভাঙ্গিয়ে লুঠতরাজ এবং রাহাজানির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নির্মম বেকারত্ব, অভাব এবং দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে কেউ কেউ একেবারে মুষড়ে পড়লেন। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবল দুর্বলের গলায় পা দিয়ে নিজের প্রবল অস্তিত্ব ঘোষণা করল। সামাজিক মূল্যসচেতনাসমূহ ধুলায় গড়াগড়ি খেতে থাকল এবং নতুন করে মূল্যচেতনার উন্মেষের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

পাকিস্তানী সৈন্যদের সশস্ত্র অত্যাচারের মুখে যাঁদের ঘরবাড়ী-কারবার-তেজারতি ছেড়ে দিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, তাঁদের মুখ্য অংশ ছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু জনসাধারণ। পাকিস্তানী শাসকেরা কেন তাঁদেরকে এমন নৃশংসভাবে ভারতে যেতে বাধ্য করেছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু আলোপাত করা হয়েছে। শুধু সংখ্যালঘু এই অপরাধজনিত কারণে তাঁদের এই বাড়তি অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। ভারত সরকার পরিচালিত আশ্রয় শিবিরসমূহে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। তাঁরা আশা করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাঁদের কোন দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না। পাকিস্তান আমলে তাঁদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে তাঁদের আর নিগৃহীত হতে হবে না। কিন্তু তাঁরা ফিরে এসে সম্পূর্ণরকম ভিন্ন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসাপত্র, পুঁজিপাট্টা আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পাকিস্তানী শাসকেরা বুঝিয়েছিলেন যে যাঁরা চলে গেছেন তাদের কেউ ফিরে আসতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারবেন না। তাঁদের স্থাবর সম্পদ মুসলমান জনসাধারণের হাতে এনে দিয়ে তাদের দাবীর কথঞ্চিৎ খাই মিটাবার জন্যে ইয়াহিয়া খান তাঁদের বলপূর্বক বিতাড়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের সম্প্রদায় হিসেবে চলে যেতে হয়েছিল এবং সম্প্রদায় হিসেবেই ফিরে আসতে হলো। তাঁদের পুনর্বাসনের কোনো পথ রইল না। সরকার কিংবা অন্য কেউ তাদের সাহায্য সহায়তা দেয়ার জন্যে বিশেষ এগিয়ে এল না। তদুপরি তাঁদের অধিকাংশই এই বোধ নিয়ে ফিরে এসেছেন যে বিগত পঁচিশ বছর তারা যে রকম দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিলেন, এখন তাদের অবস্থা সেরকম নয়। তাঁরা দুর্বল সম্প্রদায় হলেও সর্বক্ষেত্রে প্রবল সম্প্রদায়ের লোকদের মতো তাঁদের সমান সমান অধিকার। কিন্তু প্রবল সম্প্রদায়ের লোকেরা আওয়ামী লীগের আন্দোলনে এই কারণে সমর্থন দিয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি মেনে নিয়ে তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে পশ্চিমাদের তাড়াতে পারলে তাঁরা সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবেন। একইভাবে সুখ-শান্তির লোভ দেখিয়ে একবার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ বাঙলাকে বিভাগ করেছিলেন। একবার ফজলুল হক হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে ভোট আদায় করেছিলেন। একবার জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার যুক্তফ্রন্ট একুশ দফার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। একবার ভাসানী 'জ্বালাও-পোড়াও' অভিযানে নামিয়ে দিয়েছিলেন। একবার শেখ সাহেব ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের ডাক দিয়ে পাগল করেছিলেন। মূলত সলিমুল্লাহ্র বাঙলা বিভাগ, হক সাহেবের জমিদার-মহাজন বিরোধী আন্দোলন, জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন সবগুলো তাঁরা একেকটা পর্যায়ে সমর্থন করেছিলেন এ কারণে যে, তাঁদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল প্রতিটি পর্যায়ে — যুক্ত বাঙলার আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন সমর্থন করলে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে।

স্যার সলিমুল্লাহ্, ফজলুল হক, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং একুশ দফার এই আন্দোলনের মধ্যে কোনোটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, কোনোটা ছিল ধর্মভিত্তিক, কোনোটা স্বায়ত্বশাসনের। তাঁরা সে আন্দোলনসমূহ সমর্থন করেছিলেন এ কারণে যে, তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, তা করলে দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। শেখ মুজিবুর রহমানের পশ্চিমাদের তাড়ানোর আন্দোলনে সর্বান্তকরণে অংশ নিয়েছিলেন তা-ও এজন্যে যে, তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, যদি তাঁরা সংখ্যালঘু জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে পশ্চিমাদের বিতাড়িত করতে পারেন, তাহলে অতিশয় লাভবান হবেন। তাঁরা খেতে-পরতে পারবেন এবং অধিকতর সুখ-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে তাঁরা বিপরীতরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সারা দেশের পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে পূর্বের তুলনায় অনেকগুণে খারাপ হয়ে গেল। সবচেয়ে যেটা

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সত্য কথা, তিন-চার বছরের মধ্যে একেবারে সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকে শাসক নেতৃশ্রেণীটি আওয়ামী লীগের রাজনীতির বদৌলতে দুধের সরের মতো ভেসে উঠেছিল, জনগণের দুঃখ-কষ্ট ভোগের প্রতি তাঁদের কোনো সহানুভূতি নেই। তাঁরা বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ ভারতে পাচার করে দিলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগসাজশে দেশের মানুষের দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন একথা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়ল। জনগণ সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করে বসলেন যে. ভারতই তাঁদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ। ভারতে জিনিসপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে সেজন্যে তাঁদের এ ভোগান্তি। যদি আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীবৃন্দ জনগণের দুঃখ-কষ্টের অংশ গ্রহণ করতেন এবং প্রখরভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাহলে তাঁদের ভিন্নরকম মনোভাবের উদয় হত। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে যে অভাব, যে দুর্ভিক্ষ, প্রবলের যে উৎপীড়ন, জনগণের মুখ্য অংশ সবকিছুর জন্যেই ভারতকে দোষারোপ করতে থাকলেন। ভারত হিন্দু-প্রধান দেশ, অনেক সাম্প্রদায়িক দল এই সুযোগে হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়তাকে এক করে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে তুলে ধরলেন।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও সমানে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সহযাত্রীদ্বয় মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি এবং তারা যে শক্তির সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া অনেকদূরের দেশ. সুতরাং বিদ্বেষটা একা ভারতের ওপরই পড়ল। মস্কোপন্থী দল দুটোতে এবং আওয়ামী লীগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অধিক হওয়ার দরুনও, ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকার না থাকায়, গোপনে তারা বুভুক্ষ অশিক্ষিত জনগণকে এরকম বিশ্বাসই করিয়ে ফেললেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকারী দল দুটি সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে দিনদিন তাঁদের সর্বনাশের পথটি প্রশস্ত করে চলেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে কোনো ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জনমনে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ সে সময়ে একটা কঠিন নৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের বেশিরভাগই কোনো ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ করতে পারেননি এবং জনগণকে তাদের পেছনে সংগঠিত হওয়ার ডাক দিয়ে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মানসিক নিশ্চয়তা অনেকেরই ছিল না, তাই বেশ ক'টি উপদলই কৌশল হিসেবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে ভারত এবং ভারতমুখী রাজনৈতিক দল তিনটিকে অপ্রিয় করার চেষ্টায় মেতে রইলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রচারিত 'হক কথা' এবং এ জাতীয় আরো নানা পত্রপত্রিকা জনগণের ভারত-বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিপোষণ করেছে।

আওয়ামী লীগ এবং অন্য দল দুটির এর বিরুদ্ধে করার কিছুই ছিল না। ইংরেজী 'সিকিউলারিজম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যদি ধর্মনিরপেক্ষতা ধরে নেয়া হয়. আওয়ামী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লীগ দলটি প্রথম থেকেই ধর্মীয় ভাব-বাষ্পের অন্তরাল থেকে জনগণের মন-মানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো কর্মসূচীই গ্রহণ করেনি। তার ফলে আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মকাণ্ড অসাম্প্রদায়িক হলেও ওটিকে ঠিক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন কিছুতেই বলার উপায় নেই। বরঞ্চ একথা বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের গর্ভ থেকেই আওয়ামী লীগের উদ্ভব। আর আওয়ামী লীগের সহযোগী দল দুটিতে সংখ্যালঘু জনগণের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা অধিক ছিল এবং তারাও ছিলেন ভারত-রাশিয়ার খয়ের খাঁ। আওয়ামী লীগের যাবতীয় অপকর্মের সমালোচকদের চীন-পাকিস্তানের এজেন্ট একথা তাঁরা গলা চড়িয়ে বলতেন। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির গোড়ায় আঘাত দেয়ার মতো কোনো কর্মসূচী তাঁদের পক্ষেও গ্রহণ করা একরকম অসম্ভব ছিল। তাঁদের সে উপায়ও ছিল না। সাধারণ মুসলিম জনগণের চোখে এই দল দু'টি বিশেষ কোনো আস্থা কোনদিন অর্জন করতে পারেনি। ফল হয়েছে এই, আওয়ামী লীগ দল অসাম্প্রদায়িকতা করতে যেয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তুলেছে, নিষিদ্ধ ধর্মীয় দলগুলো সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার উসকানি দিয়েছে এবং কোনো কোনো বামপন্থী উপদল ভারতের আগ্রাসী মনোভাবকে ঠেকানো আর ক্ষমতাসীন শক্তিকে অপ্রিয় করার জন্যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তদুপরি অনেক মুসলিম লীগার এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি যুদ্ধের পর নিজেদের ধনপ্রাণ এবং সামাজিক নিরপত্তার জন্যে টাকা পয়সা দিয়ে আওয়ামী লীগে ঢুকে পড়েছিলেন, এ কারণে অঘোষিতভাবে আওয়ামী লীগারদেরও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে অল্পবিস্তর জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছে।

যুদ্ধের পর নানা সম্প্রদায়ে মিলেমিশে এখানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার যে সুস্থ বিকাশ ক্ষেত্র রচিত হওয়ার কথা ছিল, তার সঠিক সূচনাটিও হতে পারেনি। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং বিভেদ রেখাসমূহ না কমে আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সর্বস্বান্ত। তাঁরা আশা করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হবেন না। সব ব্যাপারে সমান সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেক বেশি বিষিয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের দিকে অধিকতর সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁরা ভারতে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ঘরবাড়ী সবকিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের হাত পড়েছে। সেগুলো দাবী করতে যেয়ে অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ভারত ছিল বলে তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন, ভারত সরকার নয় মাস তাঁদের খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপে তাঁরা দেশে ফিরে আসতে পেরেছেন, এবং এত কষ্ট ভোগ করেও তাঁদের দশা পূর্বের চাইতে ভালো নয়, বরঞ্চ অনেক গুণে খারাপ। এই অবস্থায় তাঁদের একটি মুখ্য অংশের ভারতমুখী হয়ে পড়া খুবই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্বাভাবিক। যে-সমস্ত রাজনৈতিক দল ভারতকে সমর্থন করত, তাঁদের প্রতি অন্ধ সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রাখাকেই মনে করতেন তাঁদের নিরাপত্তার সর্বোত্তম গ্যারান্টি।

৯

আওয়ামী লীগ প্রথম শাসনভার হাতে নিয়েই ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। পেছনে জনসমর্থনও ছিল তাঁদের। ধর্মীয় দল এবং আরো ক'টি রাজনৈতিক দল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যের সহায়তা করেছিল। আরো গোড়া থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় ছিল তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোনো উপায় রইল না। মন-মানসের যে নৈতিক পরিচ্ছন্নতা থাকলে অল্প হয়েও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায়, তা এই দলগুলোর থাকার কথা নয়।

ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহকেও আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কেননা বামপন্থী সংগঠনসমূহ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল-উপদলে যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বিভক্ত হয়ে ছিল। তাঁদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি কিংবা তার কোনরকম প্রয়াসও ছিল না। অথবা তাঁরা চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ভারত, আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস ইত্যাদির ভূমিকার প্রশ্নে এতদূর দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যে, কোনো সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা তাঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। অঞ্চল-বহির্ভূত রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে অনেক পূর্বে আয়ুব খানের আমলে যে ভুল তাঁরা করেছিলেন সেই কারণের ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁদের একাংশকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আঁতাত করতে হয়েছে এবং অন্যান্য অংশকে রাজনীতির নামে খুন-জখমের কাজে লিপ্ত হতে হয়েছে।

আসলে ক্ষমতাসীন উদ্ধত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে আপাতত তাঁদের সপক্ষে নয় এমন একটি জনগণের মধ্যে টিকে থাকার অনমনীয় মনোভাব থেকেই এই ধরনের কার্যকলাপের উদ্ভব। তার পেছনে কোনো সুস্পষ্ট সমাজ দর্শনের প্রভাব লক্ষ্যগোচর নয়। দর্শনের দারিদ্র্যই বামপন্থীদের একাংশকে দিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়েছে। এটা খুবই দুঃখের কথা যে, সিরাজ সিকদারের মতো একজন প্রাণবান তরুণ দক্ষ সংগঠক এবং প্রখর দেশপ্রেমিক, যাঁর কর্মধারার মধ্যে একটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল, আর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে ভেঙে-ভেঙে যে-সমস্ত কমিউনিষ্ট চক্র-উপচক্র এখানে সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁদের সংগঠনের শরীরে মূল কমিউনিষ্ট পার্টির দূষিত জীবাণু প্রবাহিত হয়ে আসছিল, তার সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত একটি সংগঠন খাড়া করেও তিনি কিছু করতে পারলেন না। নিজের কর্মচক্রে নিজে আটকা পড়ে অকালে শেখ মুজিবের হাতে নিহত হলেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বামপন্থীদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি সংগঠনের ওপর নিশ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগকে আন্দোলনে বেগ-আবেগ সঞ্চারের জন্যে যাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং যাঁদের প্রবল চাপের মুখে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার কথা বলতে হয়েছে, তাঁরা ছিলেন তরুণতর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বদেশের শোষিত শ্রেণীসমূহ থেকে আগত। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের জীবনদৃষ্টিগত ফারাক ছিল, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চলেও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোও উল্লেখ্যভাবে লক্ষ্যগোচর ছিল। জাতীয়-আন্তর্জাতিক এই বিদঘুটে পরিস্থিতিতে তাঁদের শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে এই ভূখণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে থাকলে কালক্রমে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বিচার- বিশ্লেষণ ছাড়া অনেকটা সহজাত প্রবণতার তাগিদেই স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের ধ্বনি তাঁরা তুলেছিলেন।

মূল আওয়ামী লীগ দলের সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন না। এঁরা পারতেন আওয়ামী লীগকে নিজেদের ওপর নির্ভরশীল করে তুলে প্রভাবিত করতে। কিছুদূর করেছিলেনও। আর পারতেন বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করতে। তাও করেছিলেন। এই উভয়বিধ চাপ প্রয়োগ করে তাঁরা আওয়ামী লীগকে ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা অবধি ধাবিত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক যুক্তিসমূহ ঝালিয়ে তুলে পঁচিশে মার্চের পরে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁদেরও ভারতে যেতে হয়। আওয়ামী লীগের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই তরুণেরাই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁদের গরমিল বাড়তে থাকে। এবং একটা সময় আসে যখন তাঁদের সম্পূর্ণভাবে নতুন একটি কার্যক্রম রচনা করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে আলাদা একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। আদর্শগত গভীরতা এবং স্বচ্ছতার চাইতে আগ্রহাতিসয্য এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল। তথাপি তাঁদের সম্বন্ধে একটি কথা সত্য যে মুসলিম লীগের ভেতর থেকে নতুন একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ যেমন বেরিয়েছিল তেমনি আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে নতুন একটি সমাজিক শক্তি হিসেবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সমাজের একেবারে জেগে ওঠা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ এই সংগঠনটির দিকে অনেকেই আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁরা অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হলেন। প্রথমত আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের জন্ম। দ্বিতীয়ত বামপন্থী নানা উপদলসমূহ এই নতুন দলটির আবির্ভাবকে কিছুটা ঈর্ষা এবং সন্দেহের চোখে দেখতে বাধ্য হয়েছে। তৃতীয়ত নানামুখী

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে দেশে তখন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তার ফলে নতুনভাবে জেগে ওঠা সামাজিক রক্ষণশীলতা দেশের মাটিতে তাঁদের গভীর শিকড় প্রবিষ্ট করতে বাধা দিয়েছে। চতুর্থত ভারত-বিরোধী বক্তব্য রাখার জন্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এই দলটির অসম্প্রদায়িক বক্তব্যে পুরাপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। কেননা ভারত-বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা সেই সময়ে তাঁদের কাছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পঞ্চমত মুক্তিসংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগবিহীন তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীবৃন্দ যাঁদের মুখ্য অংশ মধ্য শ্রেণীভুক্ত এবং দোদুল্যমান, তাঁদের প্রতি সমর্থন দান করতে পারেননি। সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে সিরাজ সিকদারের দলটির সঙ্গে এঁদের অন্তরাবেগের দিকে কিছুটা মিল ছিল। দুটিই ছিল সামাজিক প্রয়োজনে উদ্ভূত বিশ্বাস এবং কর্মপদ্ধতিতে নবীন বামপন্থী সংগঠন। যদি দেশের বামপন্থী আন্দোলন পূর্ব থেকে সঠিকভাবে পরিচালিত হত, তাহলে খুব সম্ভবত এই দু'সংগঠনের লোকেরা একটি পতাকার তলে সমবেত হতে পারতেন।

সদস্য সংখ্যা এবং সাংগঠনিকভাবে বেশ খানিকটা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এই দলটি শেখ মুজিবুর রহমানের রুদ্ররোষ সহ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যে তাঁদের ভুল-ত্রুটিকে কম দায়ী করা যায় না। সে যা হোক, শেখ মুজিবুর রহমান সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন বন্ধ করে দিলেন। আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি এই তিনটি দলকে ভেঙে এক দলে পরিণত করে দেশের তাবৎ শাসনব্যবস্থা ঢেলে নতুনভাবে সাজিয়ে কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হলেন এবং সপরিবারে নিহত হলেন।

এটা সত্যই আশ্চর্যের যে, দেশের ডান-বাম প্রবীণ-নবীন কোনো নেতা, কোনো লেখক, কোনো শিল্পী প্রকাশ্যে এগিয়ে এসে প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। শেখ মুজিবের জন্যে নয়, এই জাতির জন্যে। কারণ একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ডান-বাম সমস্ত শক্তি যখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে, সেই সময়ে তিনি একটা নেতৃত্ব রচনা করেছিলেন। অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও অন্তত বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও কাজটা করতে পারতেন। কেননা তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করতে কসুর করেননি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইতিহাস এ নিয়ে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং পরবর্তী বংশধর সকলকে সমানভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন।

১৯৭৮

বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র
(২০০১)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com
My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শেখ মুজিবুর রহমান

কথা উঠেছে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে। এক দল বলছেন, শেখ মুজিব সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম বাঙালী, অন্তত বাঙলার শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের একজন। তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা' এবং বাঙালী জাতির মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত মহানায়ক। তাঁরই সংগ্রামের উত্তাপ উপমহাদেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটিতে হাজার বছরের পরবশ্যতার সমূহ গ্লানি মুছিয়ে দিয়ে একটি নবীন রাষ্ট্র সম্ভাবিত করেছে।

অন্যরা বলছেন — না। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙলার জাতীয় ইতিহাসের একজন মস্ত বড় 'ভিলেন' বা 'খলনায়ক'। তিনি বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। মুক্তি এবং স্বাধীনতার নামে তিনি বাঙলার জনগণকে তাড়িত করে হতাশা এবং অন্ধকারের গোলকধাঁধার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

নায়ক-পুরুষ, বীর এবং ভিলেন এই দুটি প্রবল মত অদ্যাবধি শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান কি ছিলেন? বাঙালী জাতির মুক্তিদাতা বীর? নাকি মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে প্রতারণাকারী বাগাড়ম্বর-সর্বস্ব, ক্ষমতাদর্পী একজন মানুষ? বাঙলার ইতিহাসে শেখ মুজিব কোন্ ভূমিকা পালন করে গেছেন?

আচ্ছা, শেখ মুজিব কি বাঙালী জাতি, বাঙলার জনগণের কাছে একজন মহান শহীদ? যিনি সপরিবারে ঘৃণ্য গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন বটে, কিন্তু বাঙলার ইতিহাস পরম আদরে এই মহান সন্তানের রুধির-রঞ্জিত স্মৃতি লাল নিশানের মতো ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নিরবধিকাল এই জাতির সামনে চলার প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে বিরাজ করবে? জাতির সংকট-মুহূর্তে বিমূর্ততার অন্তরাল ভেদ করে তেজীয়ান প্রাণবান মুজিব আবির্ভূত হয়ে করাঙ্গুল প্রসারিত করে সংকট-ত্রাণের পথ নির্দেশ করবেন?

নাকি শেখ মুজিব ইতিহাসের সেসব ঘৃণিত ভিলেনদের একজন, যারা জনগণকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার নামে জাগায় বটে, কিন্তু সামনে যাওয়ার নাম করে পেছন দিকে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চালনা করে। একটা সময় পর্যন্ত জনগণ ভিলেনদের কথা শোনে, তাদের নির্দেশ শিরোধার্য করে মেনে নেয়। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে ফুল-ফসলে ঘেরা সবুজ উপকূলের আশায় পা বাড়িয়ে ভ্রান্ত স্বপ্নের ছলনায় ভ্রান্ত গন্তব্যে এসে উপনীত হয়েছে; তাদের আশা করার, বাসা করার, ভরসা করার কিছুই নেই; আছে শুধু পথ চলার ক্লান্তি, অনিশ্চয়তার হতাশা এবং প্রখর মরুভূমিতে মরীচিকার নিত্য-নতুন ছলনা, তখন তারা তাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়, অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারণ করে সেই বহুরূপী সঙ-নেতার নামে, যার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার পতাকাকে নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, খেটে-খাওয়া জনগণ তাদের মুক্তিসনদ বলে ভুল করেছিল। শেখ মুজিবও কি একজন তেমন মানুষ? লক্ষ প্রদীপ-জ্বালা, স্তুতি-নিনাদিত উৎসবমঞ্চের বেদীতলে সপরিবারে যার মৃতদেহ ঢাকা পড়ে রইল রাজপথে, শোকের মাতম উঠল না, ক্রন্দনধ্বনি আকাশে গিয়ে বিঁধল না, কোথাও বিদ্রোহ-বিক্ষোভের ঢেউ জলস্তম্ভের মতো ফুলেফুলে জেগে উঠল না! এ কেমন মৃত্যু, এ কেমন পরিণতি শেখ মুজিবের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের! সব চুপচাপ নিস্তব্ধ! তাহলে কি ধরে নিতে হবে বাংলাদেশের মানুষ যারা তাঁর কথায় হাত ওঠাত, দর্শন মাত্রই জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করত, তাঁর এমন করুণ, এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেখেও 'বাঁচা গেল' বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? ইতিহাসের অন্যান্য প্রতারক ভিলেনদের ভাগ্যে সচরাচর যা ঘটে থাকে শেখ মুজিবের ভাগ্যেও তাই কি ঘটেছে?

একটি সদুত্তর প্রয়োজন। কি ছিলেন শেখ মুজিব — বীর? প্রতারক? অনমনীয় একগুঁয়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, চরম ক্ষমতালোভী একজন একনায়ক? একটা জবাব টেনে বের করে আনতে না পারলে বাঙলার ভাবী ইতিহাসের গতিরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। বারংবার শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি অনির্ণীত থেকে যাচ্ছে বলেই বাঙলার, বাঙালী জাতির ইতিহাসের পরিক্রমণ-পথটি ক্রমাগত ঝাপসা, অস্পষ্ট এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এই ঐতিহাসিক অলাতচক্র যার মধ্যে দিনের আলোতে সবাই পথ হারায়, রাতে রাতকানা হয়ে থাকে, তার ভেতর থেকে কেটেচিরে সামনে চলার পাথেয় স্বরূপ একটা অবলম্বন অবশ্যই খাড়া করতে হবে।

শুধু শেখ মুজিব নয়, উনিশশো একাত্তর সালে যে মুক্তিযুদ্ধটি সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যার গর্ভ থেকে বর্তমানের স্বাধীন বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার চরিত্রটিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান এ দুটো জমজ শব্দ একটা আরেকটার পরিপূরক এবং দুটো মিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল এক অচিন্তিত পূর্ব — কালান্তরের সূচনা করেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে দুর্বার গণআন্দোলনটি সৃজিত হয়েছিল তার লক্ষ্যের অস্পষ্টতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, এ সমস্ত বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার নয়। তদুপরি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন রাতারাতি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপলাভ করে এশিয়ার একটি সেরা দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিপক্ষে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে বলির পাঁঠার মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ কারোরই এ প্রচণ্ড পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষমতা ছিল না। ফল যা হবার হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিরোধযুদ্ধ এবং মুক্তিসংগ্রাম পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় বাঞ্ছা করতে গেল, আর তেজোদ্দীপ্ত মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে চলে গেলেন। এই হলো নিরেট সত্য কথা। যদি আর কিন্তু দিয়ে ইতিহাস রচিত হয় না। যা ঘটেছে তাই-ই ইতিহাস।

ভারতবর্ষের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং যুদ্ধে পাকিস্তানের চূড়ান্ত পরাজয়ের কারণে বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যুদয় এসকল সত্য যদি সবাই অম্লানবদনে বিনাদ্বিধায় মেনে নিতে পারে, তাহলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল সেটুকু মেনে নিতে বাধাটা কোথায়? বাংলাদেশের জন্ম-প্রক্রিয়ায় ভারত তার স্বার্থ ছিল বলেই ধাত্রীর কাজ করেছে একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ দেশটি ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে এক ধরনের না এক ধরনের স্বার্থ ছাড়া অন্য দেশের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে? ভারত পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য আওয়ামী লীগকে সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে এবং রাশিয়া তার দুনিয়াজোড়া সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখার জন্য পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তো স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সকল শ্রেণীর জনগণ মরণপণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উনিশশো একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের নানান শ্রেণীর মানুষ নানান দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছে, বাঙলার ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে এমন সর্বাত্মক সার্বজনীন জাতীয় যুদ্ধ এবং গণযুদ্ধের সন্ধান কেউ দিতে পারবেন কি?

মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করেছে তা মেনে নিতে কারো আপত্তি নেই। এমনকি যে সকল শ্রেণী, গোষ্ঠী ও স্বার্থবাদীচক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে সরাসরি অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছে তাদেরও বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিতে বাধছে না। কিন্তু মুজিবের অস্তিবাচক ভূমিকাটুকু মেনে নিতে তাদের ঘোরতর আপত্তি। এ এক মর্বিড মানসিকতা। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অভিযাত্রার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক না থাকার যে লজ্জা, যে গ্লানি সেটুকু ঢাকার অপকৌশল হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তারা অক্ষম।

অবশ্য কথা উঠতে পারে, উঠতে পারে কেন অবশ্যই উঠবে। বাঙালীর জাতিসত্তার বিকাশের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন শেখ মুজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি মধ্যশ্রেণী গড়ে না উঠছে ততদিন শেখ মুজিব পশ্চিমা

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধনিকদের লেজুড়বৃত্তি করেছেন, বাঙালী স্বার্থের বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত হননি। অনেককাল পর্যন্ত পশ্চিমা ধনিকদের মতাদর্শই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। তাঁর মতো ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এমন একনিষ্ঠ সেবক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ আছে। তিনি তখনই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি নিয়ে মাঠে নেমেছেন যখন এদেশে একটি মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি হয়ে গেছে। পশ্চিমাদের দ্বারা ক্রমাগত নিগৃহীত হয়ে এই শ্রেণীটি যখন সোচ্চার হতে শিখেছে সেই সময়েই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দল আওয়ামী লীগকে মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে দাঁড় করান। সুতরাং শেখ মুজিবের বাঙালী জাতীয়তাবাদ জাতীয় মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ, যেটি সমাজের শোষিত শ্রেণী নয় — ক্ষুদে শোষক শ্রেণী; বড় শোষক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংযোগ তার প্রত্যক্ষ নয়। পাকিস্তানী শোষকদের মাধ্যমেই তার লেনদেন চলছিল। অর্থনৈতিক এবং শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতেই হবে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করাই ছিল বাঙালী মধ্যশ্রেণীর মূল অভিষ্ট।

শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর দাবীদাওয়ার মোড়ক, যা চিহ্নিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ নামে, তাই নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে গোটা বাংলাদেশের জনমত তাঁর সপক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, এটা একমাত্র বক্তব্য নয় — বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো তার পেছনে আরো বক্তব্য রয়েছে। গোড়া থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি মূলত পুঁজিবাদী রাজনীতি এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করাই ছিল আওয়ামী লীগ দলটির অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি।

যে সকল বামপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথা বলত, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী উচ্চারণ করত, আওয়ামী লীগ বরাবর তাদের বিরোধিতা করে এসেছে। পাকিস্তানের ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক জোটে অংশগ্রহণের প্রশ্নে সুহ্রাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে সেই যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নাম নিয়ে দ্বিখণ্ডিত হলো তারপর থেকে বলতে গেলে ঊনিশশো আটষট্টি-ঊনসত্তর সাল পর্যন্তও আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে এসেছে। এমনকি ছয়-দফা যখন বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে তখনো আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছে।

তৎকালীন পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে যে সকল বামপন্থী রাজনৈতিক দল প্রথমেই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাঁদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা শেখ মুজিবুর রহমানের অভূতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম কারণ বললে খুব বেশি বলা হবে না। তাঁরা জাতিসত্তার মুক্তির প্রশ্নটি উচ্চারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু জাতি যখন ভেতর থেকে জাগ্রত হয়ে দাবী আদায়ের পথে প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হচ্ছিল, তাঁরা কোনো হাল ধরতে পারেননি। এই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরিস্থিতির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ। এটা কেন ঘটল, কেমন করে ঘটল, অনেকে অনেক কথা বলবেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দ্বিধা-বিভক্তি, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিতে তার প্রতিক্রিয়া — এক অংশের মস্কোর প্রতি অনবচ্ছিন্ন আনুগত্য এবং অন্য অংশের পিকিংয়ের নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি — এসব বিষয় অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আসবে। তাছাড়া পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে মস্কোর মধ্যস্থতা এবং তার মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান মিলিয়ে এশিয়ায় চীন-বিরোধী একটা ব্লক তৈরি করার সোভিয়েত অভিপ্রায় এবং অন্যদিকে যুদ্ধে সরাসরি চীনের পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন, চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক, মওলানা ভাসানী এবং চীনপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির আয়ুব খানের প্রতি দুর্বলতা, তাছাড়া পশ্চিম বাংলার নকশাল নেতা চারু মজুমদারের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মড়কের মতো প্রভাব বামপন্থী দলগুলোকে জাতিসত্তার মুক্তির দাবী থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। সত্য বটে ঊনিশশো সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে ন্যাপ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির মস্কো সমর্থক অংশ জাতিসত্তার মুক্তির দাবীতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একমত পোষণ করে মাঠে নেমেছিলেন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। নির্বাচনের সময় থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত এমনকি তার পরেও শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন জীবিত ছিলেন আওয়ামী লীগের তল্পিবহন করে মস্কোর নামে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করা ছাড়া আমাদের রাজনীতিতে সত্যিকার অর্থে পালনীয় কোনো ভূমিকা তাঁদের ছিল না। বড় তরফের কাছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অম্লানবদনে আত্মসমর্পণ — এটাকে যথার্থ যুক্তফ্রন্ট বলা যাবে কিনা তা সত্যিসত্যি বিতর্কের বিষয়।

সে যা হোক, বামপন্থী রাজনীতির অন্যান্য অংশসমূহ সেই যে জাতীয় রাজনীতির প্রধান স্রোতধারা থেকে, মূল শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল; সেই খাতে অদ্যাবধি আর ফিরে আসতে পারেনি। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তিনি তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর নিজস্ব শ্রেণীটির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মুক্তিসংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। এই জাতীয় মধ্যশ্রেণীটি দুধের সরের মতো সবেমাত্র ভাসতে আরম্ভ করেছে। আপন মেরুদণ্ডের ওপর থিতু হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। মধ্যশ্রেণীর দাবীর সঙ্গে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে বাংলাদেশের শোষিত মানুষের দাবী সমসূত্রে এসে মেশার ফলে স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন নতুন বেগ এবং আবেগ সঞ্চয় করে রাতারাতি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ অগ্নিতে পতঙ্গের মতো এই মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ব্যাপ্তি এবং গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে ঊনিশশো একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের মতো এমন ঘটনা বাঙলার আবহমান ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

শেখ মুজিবুর রহমান মধ্যশ্রেণীভুক্ত মানুষ — মধ্যশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই হলো তাঁর আনুপূর্বিক রাজনৈতিক জীবনের সারকথা। এই মুক্তিসংগ্রামের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষার নিরিখে যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা শিক্ষা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কোনটাই তাঁর ছিল না। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মাটি থেকে নির্বাসিত হয়ে ভারতে আশ্রয়ভিক্ষা করতে গেল।

এ তো হলো চিত্রের একদিক। অপরদিকে দৃষ্টিপাত করলে কি দেখতে পাই? শেখ মুজিবের সুবিধাবাদী দোদুল্যমান নেতৃত্ব নেগেট করতে পারার মতো বিকল্প নেতৃত্বের অস্তিত্ব সেদিন বাংলাদেশে কোথায়? শেখ মুজিবুর রহমানের দোদুল্যমান নেতৃত্ব এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হলো, এর জন্য অনেকে শেখ মুজিবকে দায়ী করেন এবং অনেকে তাকে 'জাতীয় বেঈমান' ইত্যাদিও আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু একটার পর একটা ভুলের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেতৃত্ব নির্মাণের সুযোগ হেলায় অপব্যয় করে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে সাক্ষীগোপালের ভূমিকা পালন করেছেন কিংবা স্থলবিশেষে জাতির শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাঁরাই বা জাতির প্রতি এমন কি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন? শেখ মুজিব কি ভূমিকা পালন করেছেন, অন্য দশটা রাজনৈতিক দল এবং নেতা কি ভূমিকা পালন করেছেন সেই মানদণ্ডেই তা নির্ণয় করতে হবে। সেদিন যদি শেখ মুজিব তাঁর শ্রেণীগত ভূমিকাটি পালন না করতেন তাহলে কি খুব ভালো করতেন?

একটা প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাস্য। শেখ মুজিব সময়ের সন্তান না সময়ের পিতা? সেই সময়ের বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বাস্তবতা বিরাজ করছিল তাতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে তিনি তার কতদূর গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন? নাকি সময়ের স্রোতে বাহিত হয়ে কেবলমাত্র তাঁর ভাবমূর্তিটাই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতররূপে ক্রমাগত অভ্রভেদী হয়ে উঠেছিল। এ প্রশ্নে আমাদের স্পষ্ট উত্তর, শেখ মুজিব সময়ের সন্তান, সময়ের পিতা নন। সে সময়ের বাংলাদেশের সামন্তবাদী মুসলিম লীগ রাজনীতির ক্ষীণতম প্রভাবটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। বামপন্থী রাজনীতি দিশেহারা, বিপথগামী, শতধা বিচ্ছিন্ন এবং পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। মাঠে শেখ মুজিব ছাড়া আর কেউ নেই। আর জাতির অন্তরের মুক্তিপিপাসা সমুদ্রের কোটাল জোয়ারের তরঙ্গের মতো ফেটে ফেটে পড়ছে। শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময়ে জাতিকে অঙ্গুলি হেলনে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে যে দিক ইচ্ছে পরিচালিত করতে পারতেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ প্লাবনে গোটা দেশ ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু এ কোন্ বাঙালী জাতীয়তাবাদ? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত পচেগলে একাকার; ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার শেষ শেকড়টাও উপড়ে ফেলে, দশ কোটি মানুষের সামনে যে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা মূর্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বললে ভুল করা হয় না। কিন্তু একটি লাগসই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষ হিন্দু-জাতীয়তা এবং মুসলিম-জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা স্বীকার করেননি যে হিন্দু-জাতীয়তাই হলো ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তি। সেই

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মুসলিম-জাতীয়তার ভিত ভেঙ্গে বাংলাদেশে যখন একটি নতুনতর জাতীয় সংগ্রাম দাবানলের মতো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে তখন ভারতের ক্ষমতাসীন শাসক কংগ্রেসের তাত্ত্বিকেরা বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল সংশোধন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মতামত আওয়ামী লীগের চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে যে প্রভাবিত করেছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। জাতীয় সংগ্রাম যখন তুঙ্গে সেই সময় মুজিবের ভক্তরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যা দিচ্ছেন, নতুন ধরনের মুজিব কোট, মুজিব টুপি চালু করছেন। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির সঙ্গে 'দেশবন্ধু'র একটি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। মুজিব কোটের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর ব্যবহৃত জ্যাকেট এবং মুজিব টুপির সঙ্গে সুভাষ বসুর আজাদ-হিন্দ ফৌজের টুপির ঈষৎ পরিবর্তিত মিল দেখলে অতি সহজেই বোধগম্য হয়, যে সকল প্রতীক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয় কংগ্রেস অনুসৃত ভারতীয় জাতীয়তার স্মারকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোই সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নতুনভাবে জেগে উঠতে শুরু করেছে। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে আবার মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের নবউত্থান লক্ষ্য করে অনেক ভারতীয়ই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, এ কারণে যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অনতিবিলম্বে তা পূর্ণ হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়ছে এবং খণ্ডিত ভারত আবার জোড়া লেগে অখণ্ডরূপে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। উনিশশো একাত্তুর সালের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বের রূপটি দর্শন করে ভারতের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর এ মনোভাব জাগ্রত হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয় যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে না যাক, অন্তত ভারতের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। সে কারণে অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হননি।

অথচ বাংলাদেশের উনিশশো বাহান্ন সালের 'ভাষা আন্দোলন' থেকে শুরু করে উনিশশো আটষট্টি-উনসত্তুরের 'স্বাধিকার আন্দোলন' এবং উনিশশো একাত্তুরের 'মুক্তিসংগ্রাম' পর্যন্ত সংগ্রামের ধারাটি এবং ভারতের অবহেলিত রাজ্যগুলোতে তার যে প্রভাব পড়েছে, বিশ্লেষণ করে দেখলে, ভারতের শোষিত অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীর শোষণমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে একটা সাযুজ্য, একটা মিল, একটা প্রবাহমানতা অনায়াসে আবিষ্কার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের কথা ধরা যেতে পারে। এ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই হিন্দী ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে ভাষা এবং সংস্কৃতির অবাধ বিকাশের দাবীতে আন্দোলন এবং বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলেও কমবেশি এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতের রাজ্যসমূহের অনেকগুলোতে যে নতুন করে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং তুমুল গণসংগ্রাম ভারতীয় ইউনিয়নের ঐক্যের ভিতটিকে একরকম কাঁপিয়ে তুলেছে তার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

স্বরূপটি উপলব্ধি করলেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামের চরিত্রটি অনায়াসে উদঘাটন করা সম্ভব হবে। আসলে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান দু'জাতির দেশ নয়। ভারত বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দেশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিদায়কালে অবহেলিত অঞ্চল, জনগোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে সোচ্চার এবং মারমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। অবহেলিত অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সংগঠিত হয়ে বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ করতে পরেনি এবং আপোষে হিন্দু এবং মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী দেশবিভাগে ঐক্যমতে পৌঁছে। মোটামুটি হিসেবে দশকোটি মুসলমান এবং ত্রিশকোটি হিন্দু ধরে নিয়ে ভারতকে বিভক্ত করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির বেলায় দু'অঞ্চলের ভৌগলিক দূরত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কোনো গুরুত্বই দেয়া হয়নি। শুধু মুসলমান পরিচয়টাকে একমাত্র পরিচয় বলে ধরা হয়েছে। তেমনি হিন্দু পরিচয়ের ক্ষেত্রেও অনেকগুলো পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য ধর্তব্যের বিষয় বলেই গণ্য করা হয়নি। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু এবং হরিজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে ব্যবধান, যে দূরত্ব, যে বৈষম্য বিরাজমান তা হিন্দু-মুসলমানদের দূরত্বের চাইতে কম নয়। এছাড়াও রয়েছে আদিবাসী এবং শিখ। এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের, এক অঞ্চল কর্তৃক অন্য অঞ্চলের শোষণ এবং এক জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিপীড়ন সমানে চলে আসছে। সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে ভারত বহু জাতি, বহু ভাষা এবং বহু সংস্কৃতির দেশ। এখানে সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা চীনের মতো একটা বিপ্লব ঘটে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই দ্বন্দ্বসমূহের হয়তো নির্বাসন করা সম্ভব হত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া তাদের শ্রেণীগত কারণে একটা বিপ্লবের পথরোধ করার উদ্দেশ্যেই ভারত-বিভাগকে কবুল করে নিয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে ভারত উপমহাদেশের সমস্ত অঞ্চল দীর্ঘকাল একসঙ্গে অবস্থান করার কারণে রাষ্ট্রীয় সীমানা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একের প্রভাব অন্যের উপর পড়তে বাধ্য। এখন আসা যাক বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামের স্বরূপটি নিরূপণের প্রশ্নে। ভারত বহুভাষিক, বহুজাতিক দেশ। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সেই সত্যকে আরো প্রোজ্জ্বল এবং আরো বাস্তবভাবে তুলে ধরেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাংলাদেশের সামনে কতিপয় সুযোগ ছিল। তাই প্রথম চোটেই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। অপরপক্ষে ভারতের রাজ্যসমূহের সে সুযোগ ছিল না। ক্রমাগত যতই দিন এগিয়ে যাচ্ছে এই দ্বন্দ্বসমূহ একসার অগ্নিগিরির মতো একটার পর একটা জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্রবিরোধী এই দুটি ধারা মূলত গোষ্ঠীবিশেষের শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে শোষিত অঞ্চল এবং গণগোষ্ঠীসমূহের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মিলেই গড়ে উঠেছে। শোষিত জাতিসত্তাসমূহের জাতীয়তার দাবী রাষ্ট্রের সহায়তায় আরোপিত ভারতীয় জাতীয়তার জগদ্দল পাথরের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। অতি সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাব, আসাম, কাশ্মীর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলে প্রবল ঝঞ্ঝার বেগ নিয়ে জাগ্রত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

বাংলাদেশের জাতীয়তার যে সংগ্রাম, শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের নির্যাতিত জাতিসমূহের সংগ্রামের সঙ্গে তার অনেক বেশি সাযুজ্য। তাই বাংলাদেশের জাতীয়তাকে কিছুতেই মুহম্মদ আলি জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল সংশোধন বলা যাবে না। বরঞ্চ একথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে বাংলাদেশের জাতীয়তার সংগ্রাম ভারতবর্ষের বহু জাতীয়তার সংগ্রামের পূর্বাভাস মাত্র। বাঙালী জাতীয়তার এই দুটি পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে শেখ মুজিব প্রথমটাকেই মেনে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি এবং তাঁর দল রাজনীতির ভিত্তিস্বরূপ দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতাকেই আসল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যাচার-নির্যাতন এবং অবদমনের কংস-কারায় ভারতীয় রাজ্যসমূহে জাতীয়তার যে নতুন অভিধা তৈরি হচ্ছিল, তার সবটুকু দৃষ্টিগোচর নয়, প্রবল প্রক্ষোভে কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, কোথাও একেবারে ভ্রূণাবস্থায় সংগুপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ নিজের মুক্তির সংগ্রাম করতে যেয়ে এই জাতিসত্তাসমূহের সংগ্রামে নেতৃত্বদান করছে এই সত্য মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগ কখনো উপলব্ধি করেননি। ব্রিটিশ-বিরোধী টুটাফাটা ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদকেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের উপজীব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণী যাদের অধিকাংশই শুরুতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পর্যন্ত বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাই শেখ মুজিবের চারপাশে জুটে সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতীয়তার আসল প্রেক্ষিতটাই নির্ণয় করেননি। গোটা জাতি যখন চূড়ান্ত সংগ্রাম কাঁধে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত, তিনি জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরি না করে তাদেরকে একটার পর একটা তামাশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে অনাবশ্যক সময় হরণ করেছেন। আর ইত্যবসরে পাকিস্তানীরা জাহাজে-প্লেনে বোঝাই করে পশ্চিমাঞ্চল থেকে সৈন্য এবং মারণাস্ত্র এনে সেনা-ছাউনিগুলি বোঝাই করে ফেলছে। সেই সম্ভাবনাময় সময়ের কোনো সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তার ভয় ছিল, তা করতে গেলে মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্ব কাচের ঘরের মতো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। তথাপি জনমতের প্রবল ঝড়ের ঠেলায় তাঁকে স্বাধীনতার নামটি উচ্চারণ করতে হয়েছিল। ব্যাস ওইটুকুই। বস্তুত বাঙালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গীতাঞ্জলি নয়, বলাকা নয়, সোনার তরী নয়, 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না'। সহস্রাধিক বছরের পরাধীন জীবনের অস্তিত্বের প্রতি সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়ে এই উচ্চারণের মাধ্যমে গোটা জাতির চিত্তলোকে তিনি এমন একটা অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিলেন যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরাট এক প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই গৌরব শেখ মুজিবকে অবশ্যই দিতে হবে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

যা বলছিলাম, শেখ মুজিব সময়ের সন্তান; পিতা নন। ঘটনার গতি তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রণ করে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। সময় শেখ মুজিবকে সৃষ্টি করেছে। অভিনব সম্ভাবনা-সম্পন্ন সময়ের স্রষ্টা তিনি নন। তাঁর জাতীয়তার বোধ অতীতের, ভবিষ্যতের নয়। অতীতচারী জাতীয়তার মোহে আবিষ্ট শেখ মুজিব মধ্যযুগীয় 'নাইটের' মতো বীরত্ব সহকারে পাকিস্তানের কারাগারে চলে গেলেন। প্রতিরোধ সংগ্রাম লণ্ডভণ্ড-ছত্রখান হয়ে পড়ল। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিল। ভারত সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের দোদুল্যমান এই নেতৃত্ব জাতিকে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জনের পুরোপুরি গৌরব থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করেছে এবং ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জনের মাশুল অনেকদিন পর্যন্ত শোধ করতে হলো বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে ভারতের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হলো তার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় তা হলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন মধ্যশ্রেণীভুক্ত আওয়ামী লীগের শ্রেণীচরিত্র। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধিতল মথিত করে নতুন ভূখণ্ড জেগে ওঠার মতো প্রতিরোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের নীচের দিকের সামাজিক স্তরসমূহ ঠেলে উপরের দিকে উঠে এসেছে। এই জাগরিত জনসংখ্যা, এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা দর্শন করে শেখ মুজিব আশান্বিত হওয়ার চেয়ে অধিক আতঙ্কিতই হয়েছিলেন। কারণ শেখ মুজিব তাঁর শ্রেণীর দম কতদূর, লক্ষ্য কোথায়, এদের নিয়ে কতখানি যেতে পারবেন, জানতেন। এই সংকটপূর্ণ সময়ে একচুল এদিকওদিক হলে কাচের তৈজসপত্রের মতো নেতৃত্ব খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। তিনি সে বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা অর্থাৎ যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে জেগে ওঠা জাতিকে যুদ্ধ করার প্রস্তুতির দিকে চালিত না করে, তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার পথ বেছে নিলেন। আলোচনার ছল করে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান থেকে নৌপথে, আকাশ-পথে সৈন্য এনে ব্যারাক ভর্তি করে চরম মুহূর্তটির অপেক্ষা করছেন। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিস্তব্ধ নগরীর নিরস্ত্র জনগণের উপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল কি? তথাপি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম নির্মূল করা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনগণ হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে। কামান, বন্দুক, স্যাভর জেটের সামনে বলতে গেলে খালি হাতে কতদূর! খুনী, জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে মারের পর মার খেয়ে উলঙ্গ অসহায় রিক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের যুদ্ধ করার কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা থাকলে, ভারত থেকে আগেভাগে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে রাখতেন। বাংলাদেশের একটা

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অঞ্চল যদি মুক্তিসেনাদের দখলে থাকত এবং সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ চালানো হত, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের চরিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারত। আমাদের মুক্তিসেনাদের সাহসের অভাব ছিল না, আত্মত্যাগের বেলায় তাঁরা কখনো পরাঙ্মুখ হননি। কিন্তু অভাব ছিল অস্ত্রের। একমাত্র উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবেলায় টিকতে না পেরে আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম বারবার পিছু হটে শেষযাত্রায় ভারতে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতে আশ্রয় নেয়ার কারণে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে পাকিস্তানীদের ভ্রান্ত প্রচারণা আন্তর্জাতিক মহলে অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। বলতে হবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ইচ্ছে করে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন অথবা একটি সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো পরিপূর্ণ ধারণাই তাঁদের ছিল না। আশা করি সকলে একমত হবেন, বিমান এবং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কিছু অস্ত্রসহ অন্তত শুরুতে দু'তিনটি জেলায় যদি ঘাঁটি গেড়ে বসা যেত, বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই ওই যুদ্ধ সম্পন্ন করা যেত। পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধটা সরাসরি বাঙালীদের সঙ্গে বাংলাদেশের মাটিতে হলে বাংলাদেশী জনগণের মনেও ভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া হত। মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের আগ্রাসী যুদ্ধ মনে করে অনেক দেশপ্রেমিক নাগরিকও এ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। সেটি ঘটতে পারত না।

'গলদ আমাদের চরিত্রের মধ্যে, গ্রহ-নক্ষত্র সে জন্যে দায়ী নয়।' শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে পর্যালোচনাকালে শেকস্‌পীয়রের উল্লিখিত পংক্তিটি খুবই সারগর্ভ এবং তাৎপর্যবহ বলে প্রতীয়মান হবে। মানুষ জীবন দিয়েই তো সবকিছু করে। তার কোনো কর্মই জীবন থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন নয়। শেখ সাহেব তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু লেখেননি বা অন্য কেউ এ পর্যন্ত অনুসন্ধান বা গবেষণা ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর জীবনকথা রচনা করেননি। তাঁর ওপর আজতক যে-সমস্ত পুস্তক আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর মানস-গঠনের চিত্রটি কেউ তুলে ধরেননি। শেখ মুজিবের পোশাকী জীবন এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যক্তি-মুজিবকে সেখান থেকে খুঁজে বের করা অনেকটা খড়ের গাদায় সূঁচের তালাশ করার মতোই দুরূহ ব্যাপার।

সে যা হোক, শেখ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে কলকাতা শহরে। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে আনুমানিক চল্লিশের দশকের একেবারে শেষ এবং পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসেবে কলকাতা শহরে আসেন। তখন অবিভক্ত বাঙলায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাল। মুসলিম লীগের দাবীতে পাকিস্তান আন্দোলনের হাওয়া জোরেসোরে বইতে শুরু করেছে। কংগ্রেস রাজনীতি গান্ধী এবং সুভাষ বসুর মতাদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে দুই মেরুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যুবক মুজিবের কলকাতা আগমনের অনতিকাল পূর্বে সুভাষ বসু জাপান-জার্মানীর সহায়তায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ব্রত নিয়ে ভারত থেকে অন্তর্ধান করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয়। কমিউনিষ্ট পার্টি কলে-মিলে, কারখানায়, কৃষক-সমাজে এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অনেকখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শেখ মুজিবের মতো আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন একজন যুবক কলকাতা শহরে এসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে অঙ্গীকার করে মুসলিম লীগে নাম লেখালেন। তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে এটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু মুজিবের পরবর্তী কর্মকাণ্ড বিবেচনার মধ্যে ধরলে তা খানিকটা বিস্মিতই করে। হুমায়ুন কবিরও ফরিদপুর জেলার মানুষ। তৎকালীন মুসলিম ছাত্রসমাজে তিনি ছিলেন একটা দৃষ্টান্ত। হুমায়ুন কবির কংগ্রেস রাজনীতিতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কৃষক-সমাজ থেকে আগত কমরেড মুজফফর আহমদ কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাপর্বে এ দুজনের কেউই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। মুজিবের মতো একজন প্রাণবান তেজোদ্দীপ্ত যুবক অতি সহজে নেতাজী সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করতে পারতেন, এটা আশা করা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিকে কবুল করলেন। বাঙলার মুসলিম লীগের মধ্যে আবার তিনটি উপদল। একটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। সামন্ত-ভূস্বামী গোষ্ঠীর লোকেরাই ছিল এই উপদলের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক। অন্য অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হাসিম। রাজনীতি সচেতন, বামপন্থী চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত মুসলিম ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই অংশের ঘোরতর সমর্থক ছিল। এ দুটি ছাড়া তৃতীয় উপদলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী। শেখ সাহেব সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের উপদলে গিয়ে জুটলেন। সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব শহর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন ডাকসাইটে লড়াকু কর্মীবাহিনী সহযোগে আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করে সেরকম সংগঠন গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর কাছে উদ্দেশ্যই হলো প্রধান, উপায় নির্ধারণের বেলায় তাঁর মধ্যে নৈতিকতা বোধের বিশেষ বালাই ছিল না বলে মনে করার কারণে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের' সময় শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী দাঙ্গাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

এই সময়ে হোসেন সুহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় ঘটা এবং তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মীতে পরিণত হওয়া সবকিছুকে একটা কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এই ধরনের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ শেখ মুজিবের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। রাজনীতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ধরনটার মূল পরিচয়ও এতে পাওয়া যাবে। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, দৃঢ়তা ছিল, আর ছিল তীব্র গতিশীলতা। কোনো পর্যায়ে রাজনৈতিক আদর্শবাদ তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা কিংবা দূরদর্শিতা কখনো তার মধ্যে অধিক দেখা যায়নি। রাজনীতি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বলতে ক্ষমতা, ক্ষমতা দখলের উপায়, এটুকু তালিম তিনি শহীদ সুহ্রাওয়ার্দী সাহেবের কাছ থেকে ভালভাবে পেয়েছেন। চোখের সামনে যা দেখা যায়, যা স্পর্শ করা যায়, তার বাইরে কোনকিছুকে তলিয়ে দেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি এ দুটোই ছিল শেখ মুজিবের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ দুটো পরিহার করতে পারেননি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'পলিটিকস্ অব এক্সিজেনসি', তিনি গোটা জীবনভর সেই ধরনের রাজনীতিই করে গেছেন। সুযোগ যখন তাঁকে যতদূর নিয়ে গেছে, তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা করেছেন। মওলানা ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সুহ্রাওয়ার্দীর মধ্যে যখন ইঙ্গ-মার্কিন জোটে যোগদান এবং স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে বিভেদ দেখা দেয় শেখ মুজিব অবলীলায় সুহ্রাওয়ার্দীকে সমর্থন দিয়েছেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আবার যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সুহ্রাওয়ার্দীর সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তার জবাবে সুহ্রাওয়ার্দী বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন এরই মধ্যে দেয়া হয়েছে। সেদিন শেখ মুজিব তাঁর নেতার বিরুদ্ধে বলার মতো কোনকিছুই খুঁজে পাননি বরং সুহ্রাওয়ার্দী যা বলেছেন ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে কাজ করে গেছেন। এটা সত্যি খুব আশ্চর্যের যে, যে মানুষটিকে বাঙালির 'জাতির পিতা' বলে অভিহিত করা হয়, সেই একই মানুষটি উনিশশো পঁয়ষট্টি সনের পূর্বে কখনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক গন্তব্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিয়েছেন, এমন কোনো প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না। এমনকি সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে যারা পূর্ব বাংলা বলত, তাদেরকে তারাও, পাকিস্তান-ভিত্তিক দক্ষিণপন্থী অন্যান্য দলের মতো, বিদেশের বিশেষ করে ভারত-রাশিয়ার চর বলে সম্বোধন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি।

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের সংখ্যাধিক জনগণ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে যে, তাদের আসল বিপদের সময়ে পাকিস্তান সত্যিসত্যি পাশে এসে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। অথচ পাকিস্তানের প্রতি জনগণের যেটুকু নাড়ির যোগ ছিল তার আবেদন একেবারে অবদমিত হয়ে যায়। সেই সময়ে বাঙালী মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ 'ছয় দফা' দাবী নিয়ে জনগণের সামনে এসে হাজির হয়। এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ছয় দফা দাবী ব্যাপক সাড়ার সঞ্চার করে এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন ভাবমূর্তি জাগ্রত হয়। এই সময়েও একটা কথা সত্যি যে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠনসমূহ বিশ্বাসে, আচরণে ছিল চূড়ান্তভাবে সমাজতন্ত্র বিরোধী। উনিশশো সত্তরের নির্বাচনের পরে ছাত্ররা যখন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনীতির স্পিরিট এবং বাহন দুইই হয়ে দাঁড়ায় এবং 'এগারো দফা' কর্মসূচী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রণয়ন করে, বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ হাইকমাণ্ডকে এক ধরনের আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করতে হয়। ছয়-দফার সংকীর্ণ মধ্যশ্রেণী-ভিত্তিক রাজনীতি এবং এগারো দফার অধিকতর প্রগতিশীল রাজনীতি একই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলাদা আলাদা খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। তেল-জলের মতো দুটো মিশ খায়নি। মুক্তিযুদ্ধ যদি সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠতে পারত, এই দুই রাজনীতির মধ্যে সংশ্লেষ সাধিত হয়ে বৃহত্তর একটা জাতীয় জঙ্গী-ঐক্যের ভিত রচনা করতে পারত। কিন্তু পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আক্রমণ করে বসল। শেখ মুজিব কারারুদ্ধ হলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ভারতে পলায়ন করল, প্রতিরোধ আন্দোলন চুরমার হয়ে গেল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের নিজস্ব যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। ভারতবর্ষ আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে নেমে পড়ল কারণ বিলম্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। পেছন থেকে রাশিয়া এসে জুটল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পরাজিত হলো। আর উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে এলেন। যে 'উইল টু পাওয়ার' তিনি অন্তরে লালন করেছেন সেই আশ্চর্য ক্ষমতামনস্কতা তাঁকে বাংলাদেশের সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাল। কিন্তু এ কোন্ বাংলাদেশ? চারিদিকে ধ্বংসের স্তূপ। বাতাসে রোদন-ধ্বনি, হত্যা-লুঠপাট সমানে চলছে। আওয়ামী লীগের লোকেরা শবভুক শকুনের মতো সর্বত্র চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করবেন শেখ মুজিব? তাঁর কি করার আছে? যে অনমনীয় আকাঙ্ক্ষার আগুন তাঁকে ঠেলে এতদূরে নিয়ে এসেছে, সেই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে পাকেপাকে বেঁধে ফেলেছে। পুরাতন বাংলাদেশ নেই, পুরাতন মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাঁর পেছনে নেই। তথাপি তাঁকে ঘোষণা দিতে হলো তিনি সমাজতন্ত্র করবেন। আওয়ামী লীগের লোকজন মাথা নেড়ে সায় দিল, তিনি তিনদল ভেঙ্গে একদল করলেন। ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে অসহায় বন্দী শেখ মুজিব নিজেও ভালো করে জানতেন না, তিনি কি করতে যাচ্ছেন। পেছনে তিনি ফেরত যেতে পারবেন না, সামনে উত্তাল সমুদ্র, সাঁতার দেয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর থাকলেও অভ্যেস নেই, তাঁর লোকজন এতদূর তাঁর সঙ্গে এসেছে, আর যেতে রাজী হবে না। ভেতর থেকে ভরসা না পেয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছেন। মস্কোপন্থী দলগুলো বুদ্ধিপরামর্শ এবং মন্ত্রণা দিতে এগিয়ে এল। শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবনের রাজনীতিতে যা করেননি তাই করতে বাধ্য হলেন। মস্কোর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তিনি মনে করেছেন রশি তাঁর হাতে আছে, কেননা এখনো মানুষ তাঁকে দর্শনমাত্রই জয়ধ্বনি করে, তাঁর কথায় হাত ওঠায়। উচ্চহৃদয় মুজিব চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বিরোধী দলের নেতার মতো বক্তৃতা দিতে পারেন এবং হয়তো মনে করেন, এখনো পর্যন্ত ভুখানাঙ্গা মানুষের মনে কণ্ঠস্বরের যাদুমন্ত্রে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলতে পারেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষমতার উঁচুমঞ্চে অবস্থান করে এখনো মনে করেন বাংলাদেশের জন্য তিনি অনিবার্য। এদিকে ঘটনার নিজস্ব নিয়মে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। গোটা জীবন ঘটনাটা ঘটে যেতে দিয়ে তিনি অপেক্ষা করেছেন এবং প্রতিবারই ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হাসি হেসেছে।

কিন্তু তিনি না পারলেন পুরনো পুঁজিবাদী অবস্থায় ফিরে যেতে, না পারলেন একটা প্রগতিশীল অর্থনীতির ভিত প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি পাকিস্তানীদের বিচার করতে পারলেন না যেমন, স্বাধীনতা-বিরোধীদের প্রতিও তেমন রূঢ় হতে পারলেন না। আবার আপন দলের মানুষ এমনকি আপন পরিবারের লোকজনদেরও স্বেচ্ছাচারিতা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হলেন। ত্রিশ লাখ, না হয় ধরে নিলাম দশ লাখ, মানুষের রক্তের দরিয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড-প্রচণ্ড হুঙ্কার দেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারছেন না। লুঠপাট, অত্যাচার, নির্যাতন, খুন, গুমখুন, পাল্টাখুন সমানে চলছে। ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতই হস্ত প্রসারিত করেন ততই আউলা হয়ে পড়ে। জনগণ তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যামিলনের জাদুকরের মতো পেছনে পেছনে অনুসরণ করেছে। জনগণের তাঁকে অনুসরণ করার অভ্যেস বহুদিনের, ভেড়ার পালের মতো তাদের তাড়িত করার স্বভাবটিও তাঁর বহু পুরনো। তাই তিনি তখনো মনে করতেন তিনি বাঙলার মানুষকে ভালোবাসেন, আর বাঙলার মানুষও তাঁকে ভালোবাসেন। এরই মধ্যে অন্তিম ঘটনাটি দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। অবশেষে দেখা গেল চৌদ্দই আগস্টের রাত্রে সপরিবারে গুলীবিদ্ধ মুজিবের দীর্ঘদেহী শরীর চাপচাপ জমাটবাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে নিস্তব্ধ-নিথর। হায়রে শেখ মুজিব, তোমার জন্য অশ্রু, তোমার জন্য বেদনা।

উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব কি বলবে? শেখ মুজিব কি একজন প্রকৃত বীর না একজন ভিলেন? তাও-না। বীরত্বের উপাদান তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু ইতিহাসের আসল প্রেক্ষিতের সঙ্গে তার মিলন ঘটেনি। তাই তিনি একজন প্রকৃত বীর হয়ে উঠতে পারেননি। খুব সম্ভবত শেখ মুজিব একজন করুণ বীর, তাঁর চরিত্র অবলম্বন করে ভবিষ্যতে সার্থক বিয়োগান্ত নাটক লেখা হবে — কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে বাঙলার ইতিহাসের মুক্তি ঘটানো যাবে না।

১৯৮৪

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ
(১৯৮৯)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান*

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।" এই সত্য যারা অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোনরকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজী হব না। একটি জাতি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে যে সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবকে দিতে হবে। আর একই সঙ্গে এই জাতির বিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের পথে যে মেঘ-কুয়াশা সঞ্চিত হয়েছে যার ফলে জাতির টিকে থাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তার জন্যেও আমরা কিছুটা হলেও শেখ মুজিবকে দায়ী করব।

বস্তুত শেখ মুজিব সমালোচনার উর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি নন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাবাদী কৌশল এতবেশি ক্রিয়াশীল ছিল যে, তা আখেরে তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতি নানাভাবে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। এমনকি সপরিবারে নিহত হওয়ার পরেও এই সমস্ত প্রশ্ন তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে এবং হবে। একজন বড় মানুষ যখন ইতিহাসে দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেন, তাঁকে নিয়ে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর এই ধরনের বিতর্ক চলতে থাকে।

'যদি' কিংবা 'কিন্তু' দিয়ে ইতিহাস হয় না। সত্যিকার ইতিহাস হলো যা ঘটে গেছে তার সঠিক বিবরণ। ঘটনা পবিত্র কিন্তু তার ব্যাখ্যা নানারকম হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যত পণ্ডিত হোন না কেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিপুণতা এবং যুক্তির যায়প্যাচ দেখিয়ে কোনো ব্যক্তি একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করতে পারবেন না।

* *রাজনীতির লেখা* (১৯৯৩) এবং *রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০০০) গ্রন্থ দুটিতে এই একই প্রবন্ধ, শেখ মুজিব বিষয়ক লেখকের পূর্ববর্তী রচনাটির সঙ্গে মিল রেখে, 'শেখ মুজিবুর রহমান — দুই' এই শিরোনামে ছাপা হয়েছে। আমরা অবশ্য এখানে প্রথম শিরোনামটিই গ্রহণ করলাম। — সম্পা.

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভূমিকাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কালীন অন্য দশটা রাজনৈতিক দলের ভূমিকার সঙ্গে অবশ্যই তুলনামূলক মানদণ্ড প্রয়োগ করে বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের চাইতে প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা হয়তো ছিলেন, তাঁর চাইতে মেধাবী রাজনৈতিক নেতারও হয়তো অভাব ছিল না, জাতির সবচাইতে নির্যাতিত অংশের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নেতাও এদেশে ছিল না, এই কথা বললে সত্য বলা হবে না।

কিন্তু একটি জাতির অন্তস্থ সত্তা প্রাণ-পাতালের উত্তাপে আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করার তাগিদে বাঙলার ইতিহাসের স্মরণকালের সবচাইতে মহত্তম ও ব্যাপক জনযুদ্ধটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার বেগ-আবেগ সবটুকু ধারণ করেছিলেন শেখ মুজিব, অন্য কোনো নেতা নন। নিঃসন্দেহে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছু উর্বরা উপাদান ছিল, যা শেখ মুজিবকে এই জাতির স্রষ্টা হতে সহায়তা করেছিল। ঘটনা এবং সময়ের উত্তাপের মধ্যে আশ্চর্য সারবান কিছু উপাদান যেমন ছিল, এই মানুষটির মধ্যেও সেইসব ধারণ করার একটা ক্ষমতা ছিল। একটা পচা ডিমকে ইনকুয়েবেটর যন্ত্রের মধ্যে রাখলে কোনো বাচ্চা হবে না, আবার তেমনি একটি তাজা ডিমকে ঐ যন্ত্রের মধ্যে রাখলে একটা বাচ্চা তৈরি হতে পারে। তা না করে ডিমটিকে এমনি রেখে দিলে সময়ের ব্যবধানে আপনা-আপনিই পচে যাবে। সুতরাং ১৯৬৫ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটা মৌলিক উপাদান বিরাজমান ছিল। আন্দোলনের নানা স্তর এবং সংগ্রামের নানা ধাপ পেরিয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তা একটি সলিড আকার ধারণ করেছিল। ঐ মৌলিক উপাদানটি হলো বাঙালী জাতির স্বাধীনতার দাবী। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের যত কঠোর সমালোচনাই করা হোক না কেন, তিনি যে এ সংগ্রামটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবাহিত করে নিয়েছিলেন সেটা একটা তর্কাতীত সত্য।

একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটা রাজনৈতিক মিশনকে হত্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু আদর্শের মরণ নেই। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বাংলাদেশে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল? তখন আওয়ামী লীগ দেশের সবচাইতে বড় দল। তাছাড়া সহায়ক শক্তি ছিল ন্যাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি। এছাড়াও ছিল অনেক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী। সেদিন একটি কণ্ঠও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেনি। পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত রাষ্ট্রাদর্শটি সম্পূর্ণ অকেজো ঘোষণা করে নতুন একটি রাষ্ট্রদর্শন এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা আমাদের জনগণের অধিকাংশের কখনো কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সবচাইতে পরিতাপের বিষয় এই যে, শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত ভক্ত এবং রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই কথাও সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর যে-ব্যক্তিটি ক্ষমতার আসনে আসীন হয়েছিলেন তিনি তাঁর বিরোধী বা বিপক্ষ দলের কেউ নন। তাঁরই মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী। এইভাবে ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৮

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শটি নস্যাৎ করার কাজে তাঁর দল বুঝে না বুঝে যে ভূমিকা পালন করেছিল এবং করে যাচ্ছে তার তুলনায় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির ভূমিকা বোধকরি বেশি নয়। কারণ স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি তো ঐ আদর্শের বিরোধিতা আগাগোড়াই করে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একবার আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয় এবং জাসদের সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের পর আবার আওয়ামী লীগ ভাঙ্গে এবং মিজান-আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। তারপরে আবার আওয়ামী লীগ দু'টুকরো হয় এবং আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশালের সৃষ্টি হয়। এখন শোনা যাচ্ছে আবার আওয়ামী লীগ ভাঙবে এবং ব্যারিষ্টার কামাল হোসেনসহ কতিপয় নেতা বেরিয়ে নতুন দল করবেন। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভেতরের এই ভাঙ্গন প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব বারবার আওয়ামী লীগ থেকে নেতা এবং কর্মী বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলোর হাত সুদৃঢ় করেছে। রব, মিজান, মোয়াজ্জেম, ইউসুফ আলী, কোরবান আলী সকলের সম্পর্কেই একথা কম-বেশি প্রযোজ্য। এখনও আওয়ামী লীগ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু কিছু করতে পারছে না। তার বিবেক এক ধরনের অপরাধবোধের ভারে জর্জরিত।

আমরা বলেছি ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের মৃত্যু ঘটে না। ভবিষ্যতে কি ঘটবে ভবিষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর বারো / তেরো বছর সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবের বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিজয়ী হতে পারেনি এবং সেই কারণে তার মরদেহের অবশিষ্টাংশ টুঙ্গিপাড়ায় আটকা পড়ে আছে, রাজনীতির কেন্দ্রে আসতে পারেনি। এখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। তিনি দেশ এবং জাতিকে জাগিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনো পরিণতির দিকে দিকনির্দেশ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দলও সে আদর্শটিকে সহস্র-শিখায় জ্বালিয়ে তুলে স্বাধীনতার অঙ্গীকারসমূহ বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এইখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের পরাজয়। কেন এই পরাজয়, কি কারণে এই পরাজয়, বিস্তৃত করে বলার অবকাশ এই নিবন্ধে নেই। তথাপি শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতির মহান স্থপতি এবং একজন মহান পুরুষ। সমস্ত দোষত্রুটি, রাজনৈতিক প্রমাদ এবং সীমাবদ্ধতাসহ বিচার করলেও তিনি অনন্য। শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান।

কোনো কোনো মহল শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা-দিবস ১৫ই আগষ্টকে জাতির 'নাজাত' অর্থাৎ 'মুক্তিদিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। শেখ মুজিবের হত্যাকারীরা যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকে তারা শেখ মুজিবকে হত্যা করে একজন স্বৈরাচারীর হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করেছে। দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীও তাতে সমর্থন দিয়ে থাকেন।

এইখানে কার্ল মার্কসের একটা কথা উদ্ধৃত না করে পারছি না। 'কোনো ডাকাত-সর্দার কোনো সুযোগে রাজাকে হত্যা করে রাণীর শয়নকক্ষে ঢুকে রাত্রিযাপন করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারে। তাতে ঐ ডাকাত সর্দারের উপর রাজ্য-শাসনের অধিকার বর্তায় না।' ১৫ই আগস্টের শেখ মুজিব হত্যাকারীদের যুক্তিও অনেকটা ঐ কথিত ডাকাত-সর্দারের অনুরূপ। শেখ মুজিব যদি জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করতেন জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিবাদ করত। জাতিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার নিশ্চয়ই সে আততায়ীদের নেই এবং ছিল না। আর একটা মানদণ্ড প্রয়োগ করে আমরা শেখ মুজিব হত্যার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। মেনে নিলাম শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশি একথাটিও ভুলে গেলে চলবে না শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদর্শনের রূপকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে, জনগণের মধ্যে কোনো উত্থানশক্তি নেই, স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল্যবোধগুলো একে একে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। জনজীবন এবং সমাজজীবন অপরাধের ভারে জর্জরিত এবং কলুষিত। জাতিকে ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে দিয়ে এমন একটা বিপরীত মেরুতে ঠেলে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে উদ্ধারের আশা একেবারেই অসম্ভব না হলেও সুদূরপরাহত হয়ে উঠেছে।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা, সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত ভ্রান্তি সত্ত্বেও হৃদয়ের উত্তাপ এবং ভালোবাসার গুণে এই মানুষটি বাঙালী জাতির আত্মবিকাশের সংগ্রামের পথে যে সমস্ত শক্তি বাধা দিয়ে এসেছিল সে সকল শক্তি আজ কাপালিক উল্লাসে এইখানে একটি নতুন পাকিস্তান সৃষ্টি করার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা তাদের কাছে মুক্তি-দিবস হতে পারে, কিন্তু বাঙলার মানুষের কাছে নয়। বাংলার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষ শেখ মুজিবকে এই জাতির মহান স্রষ্টা হিসেবে জ্ঞান করবে। দিনের পর দিন যাবে জনগণের অন্তর্লালিত এই শ্রদ্ধা ঘণীভূত হয়ে নিকষিত সোনার রূপ ধারণ করবে। হৃদয়ে চেপে বসবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আজ থেকে অনেক অনেক দিন পরে হয়তো কোনো পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে বলবেন, 'জানো, খোকা! আমাদের দেশে একজন মানুষ জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁর দৃঢ়তা ছিল, তেজ ছিল, আর ছিল অসংখ্য দুর্বলতা। কিন্তু মানুষটির হৃদয় ছিল, ভালোবাসতে জানতেন। দিবসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে যে বস্তু চিকচিক করে জ্বলে তা হলো মানুষটির সাহস। আর জ্যোৎস্নারাতে রূপালী কিরণধারায় মায়ের স্নেহের মতো যে বস্তু আমাদের অন্তরে শান্তি এবং নিশ্চয়তার বোধ জাগিয়ে তোলে তা হলো তার ভালোবাসা। জানো খোকা তাঁর নাম? শেখ মুজিবুর রহমান।'

১৯৮৮

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ

(১৯৮৯)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মওলানা ভাসানী

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকই প্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'বাঙলার রাজনীতি বাঙলার অর্থনীতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল'। বাঙলার অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর এবং কৃষক যে একটা সামাজিক শক্তি কেবল সেটা উপলব্ধি করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, রাজনীতিতে কৃষকদের সেই শক্তিকে তিনি অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। বস্তুত শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক অবিভক্ত ভারতের 'সর্বপ্রথম আধুনিক রাজনীতিবিদ' জনৈক সমাজবিজ্ঞানীর এই উক্তি অনেকাংশে সত্য মনে হয়। অর্থনীতি রাজনৈতিক শক্তিকে লালন করে এটা বুঝতে সক্ষম হওয়া এবং কাজে রূপদান করা এক কথা নয়। ফজলুল হক তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি-বলে কৃষক সমাজের সুপ্ত শক্তির বিষয়ে একটি সঠিক ধারণা গঠন করতে পেরেছিলেন। যেহেতু তিনি সবসময় ক্ষমতায় আরোহণ করার এবং টিকে থাকার রাজনীতি করতেন, সেই কারণে তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য কৃষক সমাজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অধিপতি শ্রেণীসমূহের সঙ্গে আপোসরফা করতে একটুও দ্বিধা করতেন না। তথাপি একথা একটুও মিথ্যা নয় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তাঁর চরিত্রের রাজনৈতিক দোলাচলবৃত্তি সত্ত্বেও কৃষক সমাজের এক মহান বন্ধু। কমিউনিস্টদের বহু পূর্বে তিনি কৃষক-সমাজের দাবী, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাঙলার রাজনীতির মুখ্য উপাদান হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে ফেলেছিলেন।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কৃষক সমাজকে তাঁর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি যথার্থ অর্থে তাঁদের নেতা ছিলেন একথা বোধ করি বলা চলে না। অনুকম্পাসম্পন্ন চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে যে সম্পর্ক, ফজলুল হকের সঙ্গে কৃষক সমাজেরও সম্পর্ক ছিল সেরকম। তিনি কৃষক সমাজের স্বার্থ দেখতে চেষ্টা করতেন, আর কৃষকেরা তাঁকে ক্ষমতায় পাঠাত। কোথাও হক সাহেবের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে কৃষক সমাজের শত্রুশ্রেণীর সঙ্গে নির্বিবাদে আপোসরফা করে ক্ষমতার আসনে চড়ে বসতে কোনো বিবেক-দংশন অনুভব করতেন না। তারপরেও কিন্তু ফজলুল হক সম্বন্ধে একটা সত্য কথা হলো, তাঁর চিন্তা-চেতনা অনুক্ষণ কৃষক সমাজের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সুখ-দুঃখের প্রতি কম্পাসের কাঁটার মতো হেলে থাকত। তিনি কৃষকদের সঙ্গে সুন্দর প্রতারণা করেও যেটুকু উপকার করেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী এমনকি পরবর্তী কোনো ক্ষমতাসীন নেতার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এ শ্রেণী ততটুকু উপকৃত হয়নি।

বাঙলার কৃষক সমাজের সত্যিকার নেতা ছিলেন মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা সাহেব কৃষক সমাজের একেবারে ভেতরে গাছের মতো বেড়ে উঠেছিলেন। গাছের বেড়ে ওঠার জন্য যেটুকু আলো, জল, হাওয়ার প্রয়োজন কৃষক সমাজের দাবীগুলোকে অনেকটা সেই চোখেই দেখতেন তিনি। পড়ে পাওয়া কোনো কেতাবী উপলব্ধি দ্বারা তাড়িত হয়ে মওলানা রাজনীতি করতে আসেননি। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাঁকে রাজনীতির দিকে ধাবিত করেছে। তাঁর ছিল এক অনন্য সংবেদনশীল সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিই তাঁকে 'জীবনে জীবন যোগ' করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক, সাধারণত অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই কৃষক সমাজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী ছিলেন হাড়ে-মাংসে-অস্থিমজ্জায় কৃষক সম্প্রদায়ের নেতা। স্বভাবে, আচরণে, জীবনযাপন পদ্ধতিতে তিনি নিজেও ছিলেন এক মহান কৃষক। হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার-নির্যাতন করার পরও যে কৃষক বেঁচে থাকে মারী, মড়ক-মন্বন্তর-প্লাবন-খরার আক্রমণ অগ্রাহ্য করেও যুগযুগান্তকাল-ব্যাপী যে কৃষকের জীবন-সংগ্রামে ভাঁটা নামে না; মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রামে এই বলিষ্ঠ আশাবাদের প্রেরণা, মুক্তির দিগন্তে উপনীত হওয়ার নিরন্তর উদ্যোগ এই কৃষক সমাজ থেকেই লাভ করেছিলেন। জলে যেমন মাছ সাঁতার কাটে, তেমনি কৃষক সমাজের ভেতরে তাঁর অবস্থান ছিল সহজ অবারিত। যাঁদের তিনি নেতৃত্ব দিতেন, তাঁরা তাঁকে বুঝতেন এবং মওলানা সাহেবও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা এমনকি ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবন-জিজ্ঞাসা সম্পর্কেও সতত জাগ্রত এবং সচেতন ছিলেন। সুতরাং এটা একটুও আশ্চর্যের নয় যে তাঁর অনুগামীদের একাংশ তাঁকে পীর বা ধর্মগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর প্রত্যয়দীপ্ত আশাবাদ, কৃষক সমাজেরই আশাবাদ। সবকিছু ভেঙ্গেচুরে একাকার করে ফেলার যে ক্ষোভ তাঁর বাক্যের মধ্যে গণগণে আগুনের শিখার মতো নির্গত হত তা যুগ-যুগ ধরে বঞ্চিত কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই প্রকাশ। মওলানা ভাসানী কৃষকের সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন না শুধু, তাঁদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গেও অনেকাংশে তাঁর জীবনদৃষ্টির সম্মিলন ঘটেছিল। একজন বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, প্রবীণ কৃষক যেমন চোখের পলকপাতে লাভক্ষতি বিচার করতে সক্ষম, মওলানা ভাসানীরও সেই আশ্চর্য ইনট্যুইটিভ ক্ষমতা ছিল যা সারাজীবন তিনি রাজনীতিতে প্রয়োগ করে এসেছেন।

মওলানা ভাসানী কৃষকনেতা, ধর্মগুরু, বিপ্লবী নেতা, জাতীয় নেতা, সংস্কারক এই সবগুলো পরিচয়ে কমবেশি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ্য পরিচয় তিনি কৃষক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সম্প্রদায়ের নেতা। অন্যান্য পরিচয়গুলো তাঁর এই রাজনৈতিক পরিচয়কেই পুষ্ট করেছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে বাঙলা-আসামের এই স্থবির সমাজে যখন অল্পস্বল্প জঙ্গমতার সৃষ্টি হতে থাকে তার অব্যবহিত পরের সময়টিতেই মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে আসেন। অবশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো প্রেক্ষাপটটি স্মরণে না রাখলে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক চরিত্রটি বুঝে ওঠা একটু কষ্টসাধ্য হবে বৈকি।

মওলানার জীবনী পাঠকের অজানা থাকার কথা নয়, তিনি পর্যায়ক্রমে খেলাফত আন্দোলন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। এসব তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং সুহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে মিলে 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে নবগঠিত রাজনৈতিক দলের নাম রেখেছিলেন শুধু 'আওয়ামী লীগ'। তারও পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সুহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে একজোট হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছেন। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রশ্নে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে মওলানার মতান্তর ঘটে। তার ফলে জন্ম নেয় 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে আয়ুব খানের সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংক্ষেপে এই হলো মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা খতিয়ান।

রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতা দখল করার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষমতার প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন কিন্তু ক্ষমতার মোহ তাঁকে কখনো ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষক সমাজ। যখনই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছেন, তিনি যোগ দিয়েছেন এ কারণে যে তিনি মনে করেছেন, এই দলটির সঙ্গে কাজ করলে কৃষক সমাজের দাবী-দাওয়া এগিয়ে নিতে পারবেন। পরক্ষণে যখনই তাঁর মনে হয়েছে এই দলটি কৃষক সমাজের স্বার্থবিরোধী কায়েমীস্বার্থের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছে, দল ছাড়তে তাঁর এক মুহূর্ত সময়ও ব্যয় করতে হয়নি। এই কারণে তাঁর জীবদ্দশাতেই মওলানা ভাসানীকে সমাজের একাংশের মানুষ 'অস্থিরচিত্ত রাজনীতিবিদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কৃষকসমাজের স্বার্থের অতন্দ্র পাহারাদার এই মুখ্য অঙ্গীকারটি বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর চরিত্রের নানা পরিচয় নানা সময়ে সামনে এসেছে। কখনো তাঁকে মনে হয়েছে উগ্র ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল, কখনো মনে হয়েছে কোনরকমের বিচার-বিবেচনাহীন হঠকারী রাজনৈতিক এ্যাকটিভিস্ট, কখনো ধর্মীয় সংস্কারক, কখনো বা পুরাদস্তুর শ্রেণীসংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ বিপ্লবী। মওলানা ভাসানীর সম্পর্কে একটা সত্য এই যে কৃষক সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জীবন্ত রাখার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রয়োজনে যখন যে মতবাদ সামনে এসেছে এবং গ্রহণ করলে কৃষক সমাজের কল্যাণ হবে বলে মনে করেছেন, দক্ষ প্রয়োগবাদীর মতো সে মতবাদটিই গ্রহণ করেছেন। কোনো মতবাদ সামাজিক আবেদন হারিয়ে ফেললে মওলানা সাহেবকেও সেই মতবাদ থেকে দূরে সরে যেতে দেখা গেছে। কৃষক সমাজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে তিনি ক্রমাগত সাপের মতো খোলস বদলাতে পারতেন। সময়ের প্রয়োজনে নতুনভাবে জ্বলে ওঠার ক্ষমতা মওলানা ভাসানীর চরিত্রের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটিই তাঁর চরিত্রে দান করেছে এক তুলনারহিত চলমানতা। এত দীর্ঘকাল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং সৃজনশীল জীবনযাপন করা খান আবদুল গাফফার খান ছাড়া এই উপমহাদেশের কোনো রাজনীতিবিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ঘটনার নিরিখে বিচার করলে মওলানাকে মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত নায়ক বলে মনে হয়।

মওলানা সাহেব কৃষক সমাজের নেতা ছিলেন একথা সত্য। তারপরেও তাঁকে অনেকবার জাতীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তার কারণ এই যে, এই দেশটি কৃষিপ্রধান এবং জনসংখ্যার অন্তত শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষের জীবনধারণের অবলম্বন কৃষিকর্ম। সরকার এবং রাষ্ট্রের নানা জটিল পরিস্থিতিতে সংখ্যাগুরু কৃষক সমাজের একমাত্র নেতাকে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে জাতীয় নেতা হিসেবে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। সরকারের পরিবর্তনে কৃষক সমাজের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কৃষক সমাজ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যয় পরিবর্তনে কৃষক সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং আখেরে পরাজিত হয়েছে। কৃষক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে মওলানা ভাসানীও পরাজিত হয়েছেন। মওলানা ভাসানীর তাবৎ জীবনের ইতিহাস এই পরাজয়েরই ইতিহাস — কিন্তু এগুলো মহান পরাজয়। মামুলি যে কোনো জয়ের চাইতে এই সকল পরাজয় অনেক মহিমামণ্ডিত।

অবশ্য কেউ কেউ কথা তুলতে পারেন, তুলতে পারেন কেন, অবশ্যই তুলবেন। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের সমরনায়ক আয়ুব খানের সঙ্গে মওলানার মাখামাখি উত্তরকালে এই দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই অভিযোগটা অনেকাংশে সত্য। সারাজীবনের সুকৃতির সমাহার এই কলঙ্কচিহ্নটি মুছে ফেলতে পারবে না। তার জন্য সেই সময় এবং পরিস্থিতির বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন একটু একটু করে শক্তিসঞ্চয় করে ডাটো হয়ে উঠেছে। আমরা তো মনে করি কার্যকারণ সম্পর্ক মিলিয়ে সমস্ত অবস্থাটা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বুড়ো মওলানার ছিল না। তিনি সময়কে নিয়ন্ত্রণ না করে সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে রাজনৈতিকভাবে বিপথগামী করেছিলেন,

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একটা সময়ে অবশ্য মওলানা তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু বেশি দেরী হওয়ার পূর্বেই মওলানা সাহেব পল্টন ময়দানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'সালামালাইকুম' দেয়ার মাধ্যমে সেই গলদ শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন। সামরিক শাসকের সঙ্গে বাঙলার প্রাণপ্রিয়, কৃষকনেতার মাখামাখির ফলে যে ভুল করেছিলেন, আমাদের জাতি তার জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে এবং এখনো মাশুল গুনে যাচ্ছে। মওলানা সাহেবের কথিত অনুগামীদের একাংশ আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছেন এবং অপর একটি উল্লেখ্য অংশ অদ্যাবধি সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বৈরাচারের দাসত্ব করে যাচ্ছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

সঙ্গত কারণেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতবাদ কি ছিল? তাঁর সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ছিল, একথা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সমকালীন নানা রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে কিন্তু তিনি কোনোটা গ্রহণ করেননি। এটা একটুও অস্বাভাবিক নয় যে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা তাঁকে অল্পস্বল্প প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদকে কখনো অন্তর থেকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি সারাজীবন এমন একটা মতবাদ সন্ধান করে বেড়িয়েছেন, যার মাধ্যমে কৃষক সমাজের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারবেন। সামনে খোলা পথ ছিল দুটি। এক ইসলাম, অন্যটি মার্কসবাদ। সম্ভব হলে মওলানা ইসলামী বিপ্লবই করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর আবাল্যের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, জীবনদৃষ্টি তার অনুকূলে ছিল। কিন্তু মওলানাকে মর্মান্তিক মর্মবেদনায় অনুভব করতে হয়েছে সে পথে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার অবকাশ নেই। ইসলামের ধ্বজাধারীরা তাঁকে কাফের মনে করে। সুতরাং মওলানা সাহেবকে নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও মার্কসবাদের অনুসারীদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। বাস্তব রাজনৈতিক প্রয়োজনে কমিউনিষ্ট পার্টিসহ নানা বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে বটে, কখনো প্রাণের থেকে ঐ বিপ্লবী মতবাদ গ্রহণ করতে পারেননি। রাজনৈতিক দোলাচলবৃত্তির মধ্যে মওলানার সারাজীবন কেটেছে। ইসলামকে তিনি বিশ্বাস করতেন কিন্তু মার্কসবাদকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করতেন। এ দুয়ের মধ্যে একটা সার্থক মেরুকরণ তিনি ঘটাতে পারেননি। তাঁর সেই মনীষা এবং প্রজ্ঞা ছিল না আর মানুষ হিসেবেও তিনি আধুনিক ছিলেন না। দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কিত সুগঠিত কোনো রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর ছিল না।

আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর অনুসারীদের একটি মূল অংশের যে সম্পর্ক তাকে কিছুতেই রাজনৈতিক সম্পর্ক বলা চলে না। বরঞ্চ এই সম্পর্কের ধরনটি ছিল আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা মওলানার কাছে আসত, নির্দেশ মেনে চলত, এমনকি রাজনৈতিক

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণও করত। চূড়ান্ত বিচারে প্রমাণিত হবে এটি প্রতিক্রিয়াশীল সম্পর্ক। মওলানার সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের বিচার করলে দেখা যাবে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতিশীলতা পরস্পর গায়েগায়ে হেলান দিয়ে অবস্থান করছে। মওলানার মৃত্যুর পরও দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা বিরাট অংশ তাঁকে তাদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে। হতে পারে, এতে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা গূঢ় প্রয়াস আছে। কিন্তু তার অঙ্কুরটা মওলানার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

কোনো মানুষ, তিনি যতই বড় হোন না কেন, খুব কম ক্ষেত্রেই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে থাকতে পারেন। মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতেও যথেষ্ট পরিমাণ বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওগুলো ছিল সামাজিক বিচ্যুতির রাজনৈতিক রূপায়ণ। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যথেষ্টরকম অগ্রসর না হলে ওগুলো কাটিয়ে ওঠা একরকম অসম্ভব।

মওলানা ভাসানী কি ছিলেন না, তাঁর কর্মকাণ্ডের বিচারে সেটাকে মুখ্য বিবেচনা করা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সুস্থতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু কি ছিলেন মওলানা? দয়া, মমতা, সংবেদনশীলতা এবং চরিত্রের আপোষহীনতায় মওলানা ছিলেন এমন একজন মানুষ, এমন একজন নেতা বাঙলার ইতিহাসে রাজনৈতিক উচ্চতার বিচারে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া অন্য কোনো নেতা তাঁর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেন না।

১৯৮৫ *শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*

(১৯৮৯)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : একটি সেন্টিমেন্টাল মূল্যায়ন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের যখন সমালোচনা করি, মনে হয় নিজের শরীরে ছুরি চালাচ্ছি। এক সময়ে আমি ওই দলটির প্রেমে পড়েছিলাম। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি ওই দলটির সঙ্গে যুক্ত থেকেছি। এগুলো আমার জীবনের অন্ধতা এবং মুগ্ধতার বছর। অন্ধ করতে পারা, মুগ্ধ করতে পারা একটা ক্ষমতা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের তারুণ্যের সম্মোহনমন্ত্রে মোহিত হয়ে আমার মতো অনেকেই এই দলটির পতাকার তলে সমবেত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমাজ-শরীর থেকে ফেটেপড়া অফুরন্ত প্রাণশক্তির এই দুর্বার যৌবনতরঙ্গের কথা যখন চিন্তা করি, একটা অপরূপ বিস্ময়বোধ আমার মনকে চঞ্চল এবং উতলা করে তোলে। সেই অপচিত তারুণ্যের কথা যখন স্মরণে উদিত হয় একটা সুগভীর বেদনাবোধ আমার সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনেক সমালোচক আছেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্রের পাতায় জাসদের গোষ্ঠী উদ্ধার করতে পারলে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। আমি তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলব না, বলতে চাইনে। বাংলাদেশের উষ্ণ নিঃশ্বাসস্বরূপ হাজার হাজার প্রাণদীপ্ত তরুণের নির্মম এবং শোচনীয় পরাজয় দেখে যে সকল ঝুনোমাথার পণ্ডিত পরম আত্মপ্রসাদ সহকারে অজস্র বক্রোক্তি সম্বলিত আট কলামের প্রবন্ধ ফেঁদে বাজারখরচ সংগ্রহ করেন, তাঁদের তো সৃষ্টির শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রতিদিন কাউকে না কাউকে গালাগাল দিয়ে পণ্ডিত পরিচয় টিকিয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু এমন একটা সময়ও ছিল, যখন এই পণ্ডিতদের অনেকেই সেজেগুজে আগ বাড়িয়ে দলের সাধারণ কর্মীদের কাছে বিপ্লবের তালিম দিতে আসতেন। নেতাদের সাথে তো পণ্ডিতদের যোগাযোগই হত না। আজকে তাঁদেরই অনেকে ব্যঙ্গবিদ্রুপের থলি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু নিন্দা করছেন কাকে, নিজেদের কলঙ্কিত অতীতকে নয়তো! সকলেই জানেন জাসদের যৌবন-জলতরঙ্গ থেমে গেছে। এ কথাটা শতমুখে প্রচার করার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। দলটি যে মরে যাচ্ছে, দেশের জনগণই তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ডেথ-সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছুটে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আসছেন। প্রশ্ন, তাঁদের সে যোগ্যতা এবং নৈতিক অধিকার আছে কি? থাকুক তত্ত্ববিচারের, ভালো-মন্দের ঝগড়াঝাটি। আমি আমার কথা বলব।

আমি এই দলটির ওপর অকপট বিশ্বাস স্থাপন করেছি, ওদের হয়ে লিখেছি, কথা বলেছি। আজকের দিনে জাসদ দলটির এই পরিণতি প্রতিষ্ঠাতারাও অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের ভাবখানা এই রকম, এই চ্যাংড়া ছোঁড়াদের এই পরিণতি হবে শুরুতেই তাঁরা জানতেন। বাংলাদেশের জনগণের গা-গরম করার জন্য 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নামের নাটকটি অভিনয়ের আয়োজন করে তাঁরা রাজা-উজিরের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। নাটকের তিন অঙ্কের অভিনয়ের পালা সাঙ্গ। তাঁরা পাকা অভিনয় শিখে ফেলেছেন। অন্য যে কোনো যাত্রাদলের অধিকারী ইচ্ছা করলে ভাড়াটে অভিনেতা হিসেবে এঁদের বায়না করতে পারেন।

কিন্তু আমার তো মানসজগতের সতীত্ব লঙ্ঘিত হবে গেছে। আমি ভুল প্রেমিকের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলাম। যাক সে সব কথা। প্রেমেপড়া অন্তরের একটা বিশেষ ধরনের ক্ষমতা। জগতে তো নিষ্ফল প্রেমের দৃষ্টান্ত অল্প নয়। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। বোধকরি রাজনীতির প্রেমেপড়ার হিসেব চুকেবুকে গেছে। তবু বলব, মানুষের মন তো আরেক জিনিস। কখন আবার বন্ধ দুয়ারে টোকা পড়বে কে জানে! সে কথা আগাম বলি কি করে! জাসদ করে আমার জীবনের অনেকগুলো বছর গেছে। সেজন্য আমার কোনো আফশোস, কোনো বেদনাবোধ নেই। এটা এমন এক ধরনের ক্ষতি, কারো কাছে নালিশ করা যায় না। আমার তো কলম আছে এবং আছে আরো নানা অঙ্গীকার ও পারঙ্গমতা। একটাই তো জীবন। সুতরাং কাটিয়ে দিতে অসুবিধে হবে না। যে মহিলা স্বামী হারিয়েছেন, যার বাবা ফাঁসিকাষ্ঠে চড়েছে হাসিমুখে, যার পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে, যে তরুণ আশা-ভরসা সব হারিয়ে, দিন-যাপনের কণ্টক মস্তকে ধারণ করে বেঁচে আছে, তারা নালিশ জানাবে কোথায়? কোন্ আদালতে? সেদিক দিয়ে দেখলে আমার যা ক্ষতি নিতান্তই সামান্য ক্ষতি। তাই আমার মনে কোনো আফশোস এবং বেদনা নেই। বরং এক ধরনের গরিমা-মাখানো অনুভূতি আছে। একটা সময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে তো পেরেছিলাম। জীবনে তো মানুষ একবারই জন্মায়। আনন্দ-বেদনার এই নাটক দেখার ভাগ্য তো হয়েছে। তাও বা কম কিসে! এসবের পরেও একটা বিষয়ে অপরাধবোধ এখনো আমার মনে পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেটা চিন্তা করলে শিরার রক্ত উজান যেতে চায়, উন্মাদ হয়ে উঠতে ইচ্ছা জাগে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সম্বন্ধে মনের সে অভিব্যক্তিটি প্রকাশ করার জন্য আমি কলম ধরেছি।

ব্যাপারটা কিভাবে প্রকাশ করব ভাবনায় পড়েছি। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভক্ষতির কথা অবলীলায় প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু চরমতম আশাভঙ্গের কথাটি সহজে প্রকাশ করতে পারে না, তবু চেষ্টা করে দেখি না কেন।

নিজের প্রতিক্রিয়াটির কথা বলি। এক সঙ্গে জাসদের অগ্রসারির এই তিনজন তরুণ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেতার কথা মনে হলেই আমার মন জুড়ে একটা প্রতিকূলতা স্বতঃই মনে আসে। এককালের সেরা তিনজন মসলিন-শিল্পী কারো কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট নিয়ে অবিরাম ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করার কাজটি করে যাচ্ছেন। আমি যদি উনিশশো আশি সালের পূর্বে এই তিনজন ব্যক্তিকে খুন করে ফেলতে পারতাম, তাহলে বাঙলার তারুণ্যের ইতিহাসে তিনটি অক্ষয় প্রতীক স্থায়ী করে রাখতে পারতাম। শুধু তিনজন মানুষকে হত্যা করে বিপ্লবের তিনটি স্মারকচিহ্ন আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। অন্তর্গত দুর্বলতার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি বলে আজকে এই খেদ করতে হচ্ছে। আর সুযোগ পেয়েও সম্ভাব্য বিপ্লবের স্মারকস্তম্ভ আমি নির্মাণ করিনি, এই আফসোসের কারণে আমার আত্মহননের সাধ জাগে। এই তিনজনকে হত্যা করলে আমাকেও হত হতে হতো। একথা তো একরকম অবধারিত। কিন্তু সংসারে অমর কে, বাঙলার ইতিহাসে বাঙালীর ইতিহাসে একটা জায়গা তো পেয়ে যেতাম। যদিও আমার পরিচয়টি হত বিশ্বাসঘাতক জুডাসের। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কারণে দেশের রাজনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা গুরুতর শূন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়েছে একথা অনেকেই বলছেন। কথাটি সিরাজ সিকদারের পার্টি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে ক্ষতিসাধন করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি দু'দলের দু'রকম। সে কথায় পরে আসছি।

একটি রাজনৈতিক দল যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে ভুল কিংবা হঠকারী পন্থা গ্রহণ করার কারণে কিংবা সমাজের সঠিক বিশ্লেষণের অভাবে যখন একের পর এক উলটা-সিধা কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকে, সেই ধরনের পরিস্থিতিতে ওই দল বা দলগুলো পরাজিত হয়। তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করে এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন যোগায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষারও পরাজয় ঘটে। সমাজের সমর্থনকারী অংশের মধ্যে নেমে আসে হতাশা এবং অপরিমিত শূন্যতাবোধ। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং সিরাজ সিকদারের পার্টির ভরাডুবি বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথমত সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দক্ষিণ দুয়ার খুলে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত মৌলবাদের উত্থানকে সম্ভাবিত করেছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির তরুণেরাই ছিলেন বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের সবচাইতে সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতিশীল শক্তি। এই দুটি দলের উদ্ভব স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। জাসদের সিংহভাগ নেতা এবং কর্মী এসেছে আওয়ামী লীগ থেকে। অন্যদিকে সিরাজ সিকদারের দলটির জন্ম হয়েছিল এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন, ক্রমপরিবর্তন এবং ক্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে। দল দুটির কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার অস্থিরতার মর্মবেগ উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এক কথায় সমাজের সবচাইতে স্ফুটন্ত আবেগ ধারণ করার দুর্দমনীয় স্পৃহা কর্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া পুরনো সংসদীয় ধরনের গণতান্ত্রিক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আন্দোলনের অর্থহীনতা এবং সাবেক ধাঁচের কমিউনিষ্ট সংগঠন কাঠামোর অকার্যকারিতা বুদ্ধি দিয়ে না হলেও অন্তত আবেগ দিয়ে তাঁরা অনুভব করতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের হঠকারী কার্যপদ্ধতি ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক গতিধারা কি হওয়া উচিত তার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কখনো কখনো তাঁদের কাজকর্মের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা অন্যায় হবে না, এই দল দুটির পেছনে কোনো সুস্থির রাজনৈতিক দর্শন ক্রিয়াশীল ছিল না। কার্যক্ষেত্রে জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে এবং সিরাজ সিকদারের দল চীনের মাও সে তুংয়ের রাজনীতির অন্ধ অনুকরণ করেছে। এই সকল নিষ্ফল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো, সিরাজ সিকদারের দল রাজনৈতিক গগনে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। এখন গ্রাম-গঞ্জে ডাকাতেরা লুটতরাজ-রাহাজানির আয়োজন করে 'জয় সিরাজ সিকদার' এবং 'জয় সর্বহারা পার্টি' শ্লোগানধ্বনি উচ্চারণ করে। সিরাজ সিকদারের রাজনীতির কি শোচনীয় পরিণতি! আর জাসদ নাম এখনো টিকে আছে বটে। তবে এক শরীরে নয়। তার অনেক শরীর, অনেক শরীক। এই শরীকগুলো প্রেতচ্ছায়া মাত্র। অন্য কোনো শরীরের ওপর ভর করতে না পারলে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করার ক্ষমতাও কোনো অংশের থাকার কথা নয়। এক সময়ে চাঁদ পৃথিবীর অংশ ছিল। তখনো পৃথিবী আজকের দিনের মতো কঠিন হয়নি। কঠিন হওয়ার প্রক্রিয়াটি সবে শুরু হয়েছে মাত্র। একটি বিরাট জ্যোতিষ্ক অকল্পনীয় দ্রুতবেগে আকাশে পৃথিবীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যায়। ওই বিরাট জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে পৃথিবীর টগবগে ফুটন্ত অংশের কিছু ছিটকে গিয়ে আলাদা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। যেহেতু পরিমাণে অল্প ছিল তাই ঘুরতে-ঘুরতে অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ওই অংশটিকে এখন চাঁদ হিসেবে আকাশে আমরা দেখে থাকি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক প্রবাহের থেকে দুটি ধারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্ন অংশটির নাম 'জাসদ' এবং চীনপন্থী কমিউনিষ্ট রাজনীতির ছিটকে বেরিয়ে আসা অংশ 'সর্বহারা পার্টি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

জাসদ পার্টিটি কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে জন্মলাভ করেছিল, সে কথায় আসা যাক। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত সরকার তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রবাসী-সরকার গঠনের উদ্যোগ নিল। তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে। তাজুদ্দীনের সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছিল বটে কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারছিল না। শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ফেরত আসতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে ভারত সরকারের দ্বিধা ছিল। মুজিবহীন বাংলাদেশে তাজুদ্দীন টালমাটাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন সে বিষয়েও ভারত সরকারের যথেষ্ট সংশয় ছিল। আওয়ামী লীগের আয়েশী নেতৃত্ব বাংলাদেশে ফিরে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব বহন করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারবে না এ ব্যাপারে ভারত সরকার একরকম নিশ্চিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, সে জন্য সেকেণ্ড-লাইন-অব-ডিফেন্স হিসেবে জনাব সিরাজুল আলম খান এবং মরহুম ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে ট্রেনিং দিতে থাকে। মুজিব বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকার তাজুদ্দীন সরকারের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত বোধ করেনি। এই মুজিব বাহিনীর নের্তৃবৃন্দ বহুবার খোলাখুলিভাবে তাজুদ্দীনের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত করেছিলেন। মঈদুল হাসান রচিত 'মূলধারা-৭১' বইটি যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে এ বিষয় অজানা নয়।

স্বাধীনতার পর তাজুদ্দীনের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর লোকজন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সিরাজুল আলম খান এবং ফজলুল হক মনির মধ্যে নানা ব্যাপারে মতান্তর ঘটে যায়। শেখ ফজলুল হক মনি তাজুদ্দীনের সরকারকে ভারতের মাটিতে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কিন্তু শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন, শেখ মনি মামার সরকারকে সমর্থন করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। কথাটা সহজভাবে বললাম, অত সহজে কিন্তু মনি-সিরাজ দ্বন্দ্বটি প্রশমিত হয়নি। আওয়ামী লীগ মধ্যশ্রেণী, নিয়ন্ত্রিত মালটিক্লাস রাজনৈতিক সংগঠন। আওয়ামী লীগভুক্ত সমস্ত অংশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও এই ভাঙনের প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত ভূমিকা পালন করেছে। সে-সব সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

মূলত আওয়ামী লীগেরই লড়াকু অংশটি স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেদের জাসদ হিসেবে পরিচিত করে। আরো একটা সত্যের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। জাসদের জন্মের প্রক্রিয়ায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম তাজুদ্দীন আহমদ এই পার্টিটিকে টাকাকড়ি এবং আরো নানা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সময়ে অনেকেই এ ধারণা পোষণ করতেন মুজিব-তাজুদ্দীনের মধ্যে ভবিষ্যতে যদি মতান্তর ঘটে সে কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতের আশ্রয় হিসেবে তাজুদ্দীন নতুন পার্টিটিকে জন্মাতে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে তাজুদ্দীন-মুজিবের অবশ্যই মতান্তর ঘটেছিল। কিন্তু জাসদে যোগদান করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। আর জাসদের তরুণ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের কোনো নেতার নির্দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আরো একটা বিষয় চিন্তা করার আছে। জাসদ গঠনে হয়তো প্রথমদিকে শেখ মুজিবুর রহমানেরও গোপন সায় ছিল। আওয়ামী লীগের অন্তঃকলহ এবং আওয়ামী লীগের বন্ধু ন্যাপ এবং সিপিবি-এর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মুখে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে জাসদকে ব্যবহার করার চিন্তা তাঁর একেবারে ছিল না, সে কথা মনে করাও অন্যায় হবে। সাম্প্রতিককালে জাসদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শেখের ঘনঘন গোপন বৈঠকের যে সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে সে কথাই তো প্রমাণিত হয়।

এখন আমরা জাসদ রাজনৈতিক দলটির কথায় আসি। মুখ্যত, আওয়ামী লীগের একটা অংশই পরবর্তীকালে জাসদ সৃষ্টি করেছে। জাসদের পতাকাতলে আওয়ামী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লীগের তরুণদের একটা অংশ ওই দলটিতে যোগ দেয়. শ্রেণীগতভাবে যাদের অনেকেই ছিলেন নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পর্যায়ের আওতাভুক্ত। কমিউনিষ্ট পার্টির মস্কো-পিকিং লাইনে বিভক্তি এবং শুরু থেকে বাঙালী জাতিসত্তার স্বীকৃতি জ্ঞাপনের অক্ষমতার কারণে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ তরুণ আওয়ামী লীগে যোগদান করে। গোড়া থেকেই কমিউনিষ্টরা এই বিভ্রান্তি যদি পরিহার করতে পারতেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হত। যা ঘটেনি, সে সম্ভাবনা আলোচনা করে ফায়দা নেই। আমাদের যা বলার বিষয় জাসদ আওয়ামী লীগেরই অংশ। যে জাতীয়তাবাদী কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছিল, তার পাটাতনটি বিস্তৃত না হওয়ায়, জাতীয়তার আদর্শের বোধ-উপলব্ধি তীক্ষ্ণ না হওয়ায়, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি না থাকায়, মহান উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার বদলে লুঠপাটের রাজনীতিকে উৎসাহিত করার কারণে এবং জাতীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হওয়ার শরীক হতে না পারায়, একটা অংশ প্রচণ্ড আবেগে ছিটকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। একটু গভীরভাবে তলিয়ে বিচার করলে ধরা পড়বে, যেদিন আওয়ামী লীগ থেকে সবচাইতে লড়াকু এবং জঙ্গী অংশ বেরিয়ে এসে জাসদের জন্ম দিয়েছে, বলতে গেলে সেই বিশেষ দিনটিতেই জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা খুইয়ে বসেছিল। তারপরেও আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যায়নি, তার কারণ তার শরীরটি বিরাট। কিন্তু সে শরীর ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকার, সামনে ধাবিত হবার, পলিটিক্যাল সে উইল আওয়ামী লীগের জন্মায়নি। বস্তুত উনিশশো পঁচাত্তর সালের পর থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ইতিহাস তাদের পলিটিক্যাল ডিমরালাইজেশনের ইতিহাস। এই ডিমরাইলাইজেশন প্রক্রিয়া কতটুকু গভীরে পৌঁছেছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগষ্টের রাতে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে এই দেশে তাৎক্ষণিকভাবে একটিও প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। দুনিয়ার কোথাও এরকম একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি? আওয়ামী লীগের নৈতিক অপরাধবোধের বোঝা এত ভারী ছিল যে সাম্প্রতিক বছরগুলো ছাড়া সে ভার হাল্কা করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

জাসদ তো প্রতিষ্ঠিত হলো। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার গালভরা ঘোষণা দেয়া হলো। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণ করে সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মাঠে নামল। লক্ষ-লক্ষ তরুণ আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝড়ের মতো তাদের উচ্ছ্বাস-আবেগে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ধ্বনিত হতে থাকল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসবের পরিণতি কি দাঁড়াল!

জাসদের নেতারা সদর্পে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলতে থাকলেন, শ্লোগানে-মিছিলে রাজপথ মুখর হয়ে উঠল, দেয়াল অজস্র চিকায় ভরে গেল। কিন্তু তাদের স্বভাবে থেকে গেল আওয়ামী লীগের অপকৃষ্ট অংশ। জাসদ শ্রেণীসংগ্রাম

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল, কিন্তু দেশে অবস্থান নিশ্চিত করতে পারল না। তাঁদের স্বভাবে, আচরণে এত অধিক ক্ষমতামনস্কতা প্রকাশ পেতে থাকল, জাসদের তৎকালীন কর্মকাণ্ডকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পুত্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে ভালো মানায়। জাসদ নেতৃবৃন্দ কর্মীদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার তাদের সঙ্গত অধিকার আছে। জাসদের নেতা এবং কর্মীদের অনেকেই সচেতনভাবে মনে করতেন এবং প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না, তাঁরাই শেখ মুজিবকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছেন। তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এমন কি খুন করেও সে ক্ষমতা দখল করার যুক্তিসঙ্গত অধিকার তাঁদের আছে।

তাঁদের বিপ্লবের ঘোষণা, মার্কসবাদের দীক্ষা, সামাজিক বিপ্লব ঘটানো এসব তো কথার কথা। আসল কথাটি তাদের ক্ষমতার অংশ চাই। ক্ষমতায় যাওয়ার পথটি যতই সুদূরপরাহত হয়ে উঠল, ততই তাদের লোভ এবং আশাভঙ্গের বেদনা বৃদ্ধি পেতে থাকল। অজস্র তরুণের মৃত্যু, অত্যাচার-অনাচার সহ্য করা এ সবতো সেই আশাভঙ্গেরই প্রত্যক্ষ লক্ষণ।

ব্যক্তিক আত্মত্যাগ, আত্মদান, ব্যক্তিকভাবে বিপ্লবের প্রতি প্রগাঢ় অঙ্গীকার এগুলোকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না, তাকে আমরা পাষণ্ড বলব। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারের দাবীনামার অক্ষরগুলো রক্তের প্লাবনে মুছে গেল। বাপকে সিংহাসনচ্যুত করে ভিন্ন লোক যখন সিংহাসনে আসীন হয় পুত্র তাতে চড়ে বসার তাকত পাবে কোথায়? তবু জাসদের একাংশের মনে যে করেই হোক, যার সঙ্গেই হোক, ক্ষমতা দখলের কথাটি বিদ্যুতের অক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। সিরাজুল আলম খান এবং রব সাহেবদের কর্মকাণ্ড কি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়? শেখ মুজিব বাঘের বাচ্চা জন্ম দিয়েছিলেন, আজ সে বাচ্চাগুলো নিয়ে অন্য লোক সার্কাস দেখাচ্ছে।

এই পর্যালোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা এসে গেছি। আওয়ামী লীগ থেকে জাসদের বেরিয়ে আসার কারণে আওয়ামী লীগ শক্তিহীন হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে জাসদের আসল মৃত্যু ঘটে গেছে। একই আঁতুর ঘরে মা এবং বেটা উভয়েই মারা গেল। এ আমাদের জাতীয়তাবাদের পরাজয়ের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়।

১৯৮৫

রাজনীতির লেখা
(১৯৯৩)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শোভাযাত্রা

বর্তমান বিশ্বপরিসরে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প কোনো পদ্ধতি চিন্তা করার অবকাশ নেই। কমিউনিজমের পতনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমের শক্তিমান দেশগুলো পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগের একচ্ছত্র অভিভাবক হয়ে বসেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত লঙ্ঘন করতে গেলে পশ্চিমা দেশগুলো সাহায্য বন্ধ করে নানারকম হুমকি দেয় এবং প্রয়োজনে সৈন্য পাঠাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কমিউনিজমের পতনের আগে পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাত, এখন তার বদলে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পৃথিবীর দেশে-দেশে তাদের অনুসৃত ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তৎপর রয়েছে।

সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র কখনো স্থায়ী রূপ লাভ করে না। গভীরে শেকড় বিস্তার করতে পারে না। গণতন্ত্র মূলত মধ্যবিত্তদের দ্বারা উদ্ভাবিত মধ্যবিত্তদের দ্বারা অনুসৃত একটা পদ্ধতি। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রতাপের অবসানের মুখে সেখানকার মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমাগত সামাজিক সংগ্রামের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে ধীরেধীরে এই ব্যবস্থাটি সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন দুর্বার রূপ ধারণ করে। ব্রিটিশ, ফরাসী এবং পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ এশিয়া আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার একগুচ্ছ দেশের জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এই দেশগুলো স্বাধীনতা পেল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কবুল করে নিল। কিছুদিন না যেতেই দেখা গেল পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র এই সমস্ত সমাজে সঠিকভাবে কাজ করছে না। এমনকি রাষ্ট্রবেত্তাদের মনেও সন্দেহ দেখা দিতে থাকল যে পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সমাজসমূহের যে চাহিদা তার কোনো সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশগুলোর সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের দিকে তাকালে দুটি লক্ষণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। এ সমস্ত দেশে পশ্চিমা গণতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করছে না। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই সকল দেশে ব্যাপক আকারে জন্ম নিতে থাকে। আবার এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন শক্তিগুলো যাতে ক্ষমতায় চড়ে না বসে সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো এই সকল দেশে ক্রমাগত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গেছে। একদিকে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং অন্যদিকে জনগণের অনবচ্ছিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন এই সমস্ত দেশে ক্রমাগত ঘটে আসছে। কমিউনিজমের সমূহ সর্বনাশের পর পশ্চিমা শক্তিবর্গ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, এতকাল সামরিক বাহিনীকে মদত দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং বজায় রাখার যে খেলাটি তারা খেলে আসছে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গ গণতান্ত্রিক আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাত। এখন তাদের খেলার কৌশলটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। তারা বর্তমানে গণতন্ত্র রক্ষার নামে এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

My All Garbage

২

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের বিষয়টি একটু অন্যরকম। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানই এমন যে সেখানে সামরিক শাসন চালিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারত নানা জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং বর্ণের আবাসভূমি। সামরিক শাসন কার্যকর করার জন্য যে একটি কোহেসনের প্রয়োজন ভারতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ভারতের সামরিক বাহিনীতেও নানা জাতি, গোষ্ঠী এবং বর্ণের উপস্থিতি বর্তমান। তাছাড়া ভারত হলো ব্রিটিশ বুর্জোয়ার ঘনিষ্ঠ অংশীদার। সেখানে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বেশ দীর্ঘ সময়-পরিসরে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন অপরিহার্য সেগুলোর জন্ম দিয়েছে, বিকাশ-সাধন করেছে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে সামরিক শাসনের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে খুব ভালোভাবে কাজ করছে একথা সত্য নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যে অনেক ত্রুটি, অনেক গলদ, অনেক অপূর্ণতা রয়েছে। কিন্তু ভারতীয়রা এই ব্যবস্থাটির বদলে অন্য কোনো শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেকথা কেউ কখনো চিন্তাও করতে পারে না। এমনকি কমিউনিষ্টরাও (গণভোটের প্রতি যাদের আস্থা নেই, সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে যারা খুবই সন্দিহান) সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নানা সময়ে অন্তত ভারতের তিনটা রাজ্যে — কেরালা, পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরায় সরকার গঠন করেছে। কমিউনিস্টরা বারবার কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখানোর পরও কখনো সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেনি। ভারতবর্ষে বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ, ভাষা এবং অনুন্নত জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রশ্নে নানাসময়ে নানারকম সংকট দেখা দিয়েছিল এবং সব বিপত্তি ভারত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তথাপি একথা বলা বোধকরি অন্যায় হবে না, ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র একটা স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র ব্যতিক্রমি দেশ যেখানে জঙ্গী লাটেরা কখনো কামান দাগিয়ে ক্ষমতার আসনে চড়ে বসতে পারেনি। ভবিষ্যতেও বসবে না। তবে একটা প্রশ্ন আছে, ভবিষ্যতে ভারতীয় ঐক্য এই আকৃতি নিয়ে টিকে থাকতে পারবে কিনা। ভারতীয় শাসকদের একাংশের মনেও সে ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটেনি। কিন্তু সার কথা হলো এই যে, ঐক্যবদ্ধ ভারত যদি টিকে থাকতে পারে, ধরে নিতে হবে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র একটা স্থায়ীরূপ লাভ করে নিতে পারবে।

৩

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিস্থিতিটা কি সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা গঠন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকু করা হলো। বাংলাদেশ ১৯৪৭ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অংশ ছিল। অবিভক্ত পাকিস্তানে পাঁচ-ছ'বছরের বেশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। তারপর ক্রমাগত সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে এ দেশটিকে চলতে হয়েছে। আয়ুবের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসেন। তার আমলে গোটা পাকিস্তানব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে আওয়ামী লীগ সব ক'টিতে বিজয়ী হয় এবং সমস্ত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পাকিস্তান রাজি না হওয়ায় গোটা বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত্রির অন্ধকারে নিরীহ জনপদবাসীর জানমালের উপর হামলা করে বসে। তারপরে ন'মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার সমর্থন ও সাহায্যে স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ সরকার নতুনভাবে নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেন এবং সেখানেও তারা দুই-তৃতীয়াংশের অনেক বেশি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় দ্বিতীয়বার আরোহণ করে সংসদ বাতিল ঘোষণা করলেন*, সংবিধান সংশোধন করলেন

* লেখকের বক্তব্যের এই অংশটি তথ্য হিসেবে সঠিক নয়, বাকশাল গঠন পর্বে সংসদ বাতিল করা হয়নি। — সম্পা.

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এবং একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের জন্য সুদীর্ঘ তিরিশ বছরব্যাপী যে সংগ্রাম করে আসছিল নিজেরা ক্ষমতায় বসার পর সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি অচল ঘোষণা করলেন। তারপরেও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট অভ্যুত্থানকারীদের হাতে মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। আওয়ামী লীগের অপর চার নেতাকে কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। ক্ষমতায় এলেন মোশতাক। কয়েক মাস তাঁর স্থায়িত্ব হয়েছিল। তারপর মোশতাককে সরিয়ে এলেন জিয়া। জিয়া সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতা দখল করলেন বটে, কিন্তু তাঁর বোধোদয় ঘটতে বাকি রইল না সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করা অসম্ভব। তাই তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরে আসার একটা পন্থা অনুসন্ধান করছিলেন। একটা পদ্ধতি চালু করতে সচেষ্টও হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়া যে গণতন্ত্রটি চালু করেছিলেন তার জন্য সহায়ক ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশে তিনি একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ যে অধিকারের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল তার থেকে সরে তিনি স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিসমূহের সঙ্গে আপোসরফা করলেন এবং তাঁর আরাধ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি সফল করার জন্য পুনরায় সংবিধান পাল্টালেন। কিছুদিন না যেতেই সামরিক বাহিনীর একাংশের হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়া নির্মমভাবে নিহত হলেন। জিয়ার মৃত্যুর পর আবদুস সাত্তার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে এলেন। সাত্তার সাহেবের শাসনকাল দু'বছর না যেতেই জেনারেল এরশাদ এসে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। তিনিও তাঁর নিজের পদ্ধতিতে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করতে চেষ্টা কম করেননি। সেজন্য তাঁকে আবার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন।

জিয়া কিংবা মুজিবের তুলনায় এরশাদ অনেক বেশি সময় পেয়েছিলেন। প্রায় দশ বছর তিনি এই দেশটিকে শাসন করেছিলেন। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিল একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু গড়পড়তা বেশি ভোট পায় অপর দল আওয়ামী লীগ। তৃতীয় দল জামাতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়ার শাসন তিন বছর অতীত না হতেই আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল দাবী করেছে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আবার সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এতকাল যাবত বলে আসছিলেন জনগণ আমাদের নির্বাচন করেছে, মেয়াদপূর্তির আগে আমরা ক্ষমতা ছাড়ব না। এই অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রশ্নে একটা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অচল অবস্থা গ্রাম তৈরি হয়ে আসছিল। এ সময়ের মধ্যে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। ব্যবসায়ী শ্রেণী (পূর্ববর্তী যে-কোনো সময়ের চাইতে অনেকদূর সুগঠিত এবং তাদের সাহায্য এবং সমর্থনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল) ক্রমাগত পত্রপত্রিকায় মতামত প্রকাশ করে আসছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে একটা আপোস করে নিতে হবে। আবার যদি একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দেশের আর্থিক জীবন ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত হবে এবং সাহায্যদাতা দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। এ রচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীর অপর দুটি দল জামায়াতে ইসলামী এবং ক্ষমতাচ্যুত কারাবন্দী প্রেসিডেন্ট এরশাদের জাতীয় পার্টির কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তাতে করে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে কোনো হেরফের ঘটছে না। দেশের ভেতরকার দাবীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহল থেকেও একটা চাপ সরকার এবং বিরোধী দলের ওপর আসছে, আপনারা নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে নিন। আপনাদের অবিবেচনার কারণে দেশে যদি আবার নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার জন্য আপনাদের দায়ী থাকতে হবে। বস্তুত বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে অন্য সময় হলে এত দিনে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিত। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করছে না তার কারণ এই যে ভেতর-বাইরের কোনদিক থেকে তারা কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাবে না। যা হোক, ভেতর-বাইরের চাপ সরকার এবং বিরোধী দল সমানে অনুভব করছেন। শেষপর্যন্ত তাদেরকে আলোচনার টেবিলে আসতে হয়েছে। ফল কি ঘটে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এবং একটা কথা সত্য, কারো পক্ষে দায়িত্বহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অল্পই অবকাশ আছে।

My All Garbage

৪

বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস বেরিয়ে আসবে। এখানে একটা গণতান্ত্রিক অবস্থা সর্বাঙ্গে না হলেও অনেকাংশে কার্যকর রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের নাগরিকেরা সৃষ্টি করেনি। বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে প্রসার ঘটেছে বাংলাদেশ তার ফলটুকু মাত্র ভোগ করছে। আমরা এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের কথা বলতে পারি। এই আন্দোলন শহরে মূলত ছাত্রদের মধ্যে সীমিত ছিল। গ্রাম-গঞ্জে তার বিস্তার ঘটেনি। এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে আন্দোলন তৈরি হয় তাতে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। তারপরও এরশাদকে যেতে হয়েছে। কারণ এরশাদ যে সেনাবাহিনীটির সাহায্যে দেশটি শাসন করে আসছিলেন সে বাহিনীটি এরশাদকে রক্ষা করার জন্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। এরশাদের বদলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে খাড়া করে যে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেনি তার কারণ এই যে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

[illegible] [illegible], ঢাকা।

বৃহৎ শক্তিবর্গ চায়নি এখানে পুনরায় সামরিক শাসন কায়েম হোক। বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র অদ্যাবধি কার্যকর রয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম থেকে উঠে আসেনি। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক। কৃষকদের কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজভিত্তিক কোনো দাবীদাওয়ার প্রশ্নে কৃষকদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত সেখানকার গণতন্ত্র কখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে পারে না। শ্রমিকরা রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার প্রশ্নে অনেক সংগঠিত হলেও তারা শেষপর্যন্ত সুবিধাভোগী থেকে যায়। অনেক সময় যে দল ক্ষমতায় আসে অথবা যে দল ক্ষমতায় আসবে তার বাইরে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো আদর্শগত অবস্থান নেই। যে দলই হোক না কেন রাজনীতি হলো একশ্রেণীর শহরবাসী মানুষের ক্রিয়া বিশেষ। এই শ্রেণীটি দল বদলাতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য, ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর থাকতে হয়। গ্রামে-গঞ্জে রাজনৈতিক দলের আদর্শভিত্তিক সংগঠন শেকড় প্রসারিত করেনি।

এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর দেশ এবং সমাজ গঠন করার কোনো আদর্শভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বক্তব্য নেই। খুবই নিকৃষ্ট অর্থে ক্ষমতা দখলই হলো রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। কোনো আদর্শ এবং মানবিক দায়িত্ববোধ-সমাজবোধ বাদ দিয়ে রাজনীতি যখন শুধুমাত্র ক্ষমতার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, সমাজে হাজারো রকমের অত্যাচার-অনাচার বাসা বাঁধতে থাকে। সেগুলো বাংলাদেশের সমাজেও ঘটেছে এবং ঘটছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাস এখন রাজনীতির একটা মস্তবড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যে রাজনীতি করবে তাকে সন্ত্রাস করতে হবে। সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোস করতে হবে। সন্ত্রাসীদের ভাড়া করতে হবে। ক্ষমতাসীনেরা সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকে। সন্ত্রাস গলগণ্ডের মতো একটি রাজনৈতিক ব্যাধি। প্রকৃত নাগরিকদের অধিকার বঞ্চিত করা হয় বলেই এখানে সন্ত্রাস জন্ম নেয়। এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রকৃত নাগরিকের নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়।

গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচন গণতন্ত্রের চর্চার একটি মুখ্য শর্ত। আমাদের দেশেও ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত গণপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন সেটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সর্বত্র নির্বাচনে তারাই জয়ী হয় যারা অর্থ ব্যয় করতে পারে এবং অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যালট-বুথ দখল করতে পারে। নিতান্ত শান্তিপূর্ণ সময়েও যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় তাতেও সন্ত্রাস এবং টাকার খেলা সমানে চলতে থাকে। বাংলাদেশে যেভাবে একজন লোক হাট কিংবা বাজার ইজারা নিয়ে থাকে সেভাবে নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। একজন ধনবান মানুষ একলাখ টাকার বিনিময়ে এ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কারণে হাট বা বাজার ইজারা নেন যে তিন বছর পর ওখান থেকে তিনি পাঁচ লাখ টাকা আয় করবেন। ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সর্বত্র যে সকল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাদেরকে টাকা এবং সন্ত্রাসের উপর নির্ভর করেই জিততে হয়। এই পদ্ধতিটি এখানে স্থায়ী হয়ে বসেছে। বাইরের দিক দিয়ে দেখলে মনে হবে এখানে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু আছে। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দৃষ্টিতে না পড়ার কথা নয়, গণতন্ত্রের নামে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড চলে সেগুলো আসলে স্বেচ্ছাচার। প্রকৃত জনগণ কখনো গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করতে পারেনি।

আগুনের ছবি যেমন আগুন নয় গণতন্ত্রের প্রহসনও গণতন্ত্র নয়। একজন সাংসদ নির্বাচিত হতে বিশ লাখ টাকা খরচ করল, নির্বাচিত হওয়ার পর তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় এই বিশ লাখ টাকা খরচ করে কি করে অন্তত এককোটি টাকা তিনি আয় করবেন। এক কোটির বদলে দু'কোটি টাকার মালিক হতে পারলে সেটাকেই মনে করেন জাতির প্রতি তার মস্ত সেবা।

জাতি এবং দেশ সম্বন্ধে যাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে, যাঁরা জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ চান; দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য সবকিছু সুন্দরভাবে পুনর্গঠিত করে দেশের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে চান, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই সমস্ত ভালো মানুষদের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যাঁদের জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা এবং কৃৎ কৌশলবিষয়ক জ্ঞান আছে এগুলো দিয়ে দেশের উন্নতি করার কোনো সুযোগ তাঁরা পান না। রাজনীতির গোটা অঙ্গনটা বেশিরভাগ দুষ্টলোকদের একচ্ছত্র মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্ররা যে কোনো দেশের জনগণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। এই ভারত উপমহাদেশে শুরু থেকে আন্দোলনের একটা গৌরবান্বিত ভূমিকা তাঁদের রয়েছে। কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবিদের পাশাপাশি ছাত্রসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা রয়েছে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ছ'দফা এবং এগারো দফা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে তা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রসমাজের অবস্থা কি এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত চেহারাটি কি রকম? এক কথায় করুণ বললে যথেষ্ট বলা হবে না। ছাত্রসমাজকে যদি রাজনীতির শিশু-শ্রমিক বলে অভিহিত করা হয় একটুও অন্যায় করা হবে না। বর্তমানে পরিস্থিতি এরকম দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বছরে ন'মাস বন্ধ রাখতে হয়। শিক্ষাঙ্গনে খুন এবং সন্ত্রাস নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাঙ্গনসমূহ গুণ্ডা, বদমায়েশ এবং খুনীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। নোংরা দলবাজি থেকে এখন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরাও মুক্ত নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করেও

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রতিদিন ছাত্র খুন হচ্ছে। পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে কলুষিত হয়ে উঠেছে। মা-বাপেরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে আর ভরসা করতে পারছেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরের দলীয় সংঘাত এবং অন্তর্দলীয় সংঘাতের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। এক কথায় শিক্ষাব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়েছে। একটি দেশ, রাজনৈতিক দলবাজির কারণে যার শিক্ষাব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম, সেখানে গণতান্ত্রিক নীতি এবং পন্থার কতটুকু অগ্রগতি হতে পারে অনুমান করা সম্ভব নয়।

আমরা বক্তব্যের শেষাংশে চলে এসেছি। বাংলাদেশের রাজনীতির দিকে তাকালে দুটি জিনিস স্পষ্টভাবে চোখে পড়বে। এখানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং স্বেচ্ছাচার সব সময় এ-ওর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। পশ্চিমা দেশসমূহ এখানে উপর থেকে গণতন্ত্র আরোপ করেছে বটে কিন্তু তার মূল সমাজের গভীরে প্রবেশ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলো দলীয়ভাবে স্বেচ্ছাচারের চর্চা করে থাকে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলের নেতা নির্বাচিত হয় না। স্বৈরাচার যারা লালন করে এবং যারা স্বৈরাচরের চর্চা করে যেতে পারে তারাই দলের শিরোভাগে চলে আসে। বাংলাদেশের সমাজ সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার যে সংগ্রাম করছে সেটাকে প্রকারান্তরে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার বললে বেশি বলা হবে না।

নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ
(১৯৯৫)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র

পৃথিবীর নানা দেশে বাঙালী আছে। বাংলাদেশ তো মুখ্যত বাঙালীদেরই দেশ। বাঙালী ছাড়া এখানে কিছু সংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে থাকেন। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিম বাংলায়, আসামের শিলচর, কাছাড় এ সকল অঞ্চলে বাঙালী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট সংখ্যক মানুষ বসবাস করে। বাঙালীদের পরিচিত জায়গাগুলো ছাড়াও কাশীতে দিল্লীতে অনেক বাঙালী পরিবার পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। তাছাড়া উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অন্তত দশ লাখের মতো মানুষ বাস করেন। ইংল্যাণ্ডেও উত্তর আমেরিকা মহাদেশে বসবাসরত বাঙালীদের প্রায় সমান মানুষ বাস করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর অনেক দেশেই বাঙালী জনগোষ্ঠীর মানুষ, বাংলাভাষী মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্র এ পৃথিবীতে একটিই আছে। সে হলো আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ। এই দেশটিকে পুরোপুরি বাঙালীদের রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হলে এর সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। এখানে বাঙালী ছাড়া অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষও বসবাস করেন। এটা তাদেরও রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয়ভাবে এখানে বাঙালী এবং অবাঙালী সকলের অধিকার সমান। বড় জোর আমরা এ কথা বলতে পারি, জাতিগত পরিচয়ে আমরা বাঙালী হলেও রাষ্ট্রিক পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী।

ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে কুর্দিরা একটি পরাক্রমশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আপনারা অনেকেই ক্রুসেড যুদ্ধে বিজয়ী গাজী সালাহ্উদ্দীনের কথা জানেন। যিনি রিচার্ডকে পরাজিত করেছিলেন। সালাহ্উদ্দীনের উদারতা, বীরত্ব এবং মহানুভবতার কথা তাঁর শত্রুপক্ষের লোকেরাও উচ্চারণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। অদ্যাবধি ইউরোপ ভূখণ্ডে গাজী সালাহউদ্দীন বহুল প্রশংসিত এক মহানায়ক। যে জাতি এরকম একজন মহানায়কের জন্ম সম্ভাবিত করেছিল সে কুর্দিদের বর্তমান অবস্থা কি? হাল আমলে কুর্দিরা ইরাক, ইরান, তুরস্ক এবং রাশিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের নিজেদের কোনো রাষ্ট্র নেই, যদিও তাঁরা অতীতের গৌরবমণ্ডিত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঐতিহ্যের কথা অত্যন্ত শ্লাঘা সহকারে উচ্চারণ করে থাকেন। তাঁরা একই ভাষায় কথা বলেন। সকলে একই ধর্মের অনুসারী এবং কুর্দিরা তাদের জাতীয় সঙ্গীত অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে গেয়ে থাকেন। সে সঙ্গীতের মর্ম সরল বাংলায় প্রকাশ করলে এরকম দাঁড়ায়, 'তোমরা কেউ বলবে না কুর্দি তরুণের রক্তের তেজ ফুরিয়ে গেছে। সে এখনো অনন্ত সম্ভাবনা বক্ষে ধারণ করে বেঁচে রয়েছে। তোমরা বলবে না কুর্দিরা একটি মৃত জাতি। আসলে কুর্দিরা সদা-প্রাণবন্ত সদা-জাগ্রত একটি মহান জাতি।' কিন্তু আসল ব্যাপার হলো কুর্দিদের কোনো রাষ্ট্র নেই। তাদের যে সংকট সেটা হলো ইরান, ইরাক, তুরস্ক এবং রাশিয়ার সংখ্যালঘুদের সংকট। কুর্দিদের উদাহরণটা দিলাম তার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। একটা জাতির মধ্যে জাতিগত রাষ্ট্র গঠনের সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও কুর্দিদের কোনো জাতীয় রাষ্ট্র নেই। এ কথাটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ এগারোশো গোরা সৈন্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পলাশীর প্রান্তরে ছুটে এসেছিলেন। পঞ্চান্ন হাজার নবাব সৈন্যের সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্লাইভ ভয়ঙ্কর শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। যে আমগাছটির তলায় বসে তিনি নবাবের সৈন্য-সমুদ্র প্রত্যক্ষ করছিলেন, সেখানে সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আড়াই ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। কেউ একজন তাঁকে যখন চিৎকার করে জানাল মীরজাফরের সৈন্যরা যুদ্ধ করছে না এবং নবাবের সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, সে সময়ে নীরদ চৌধুরীর ভাষায়, 'ক্লাইভের শরীরে যুদ্ধ জয়ের দেবতা ভর করল।' পলাশী যুদ্ধের পুরো ঘটনাটির ব্যাপ্তি ছিল মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি জাতির ভাগ্য দুশো বছরের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। ক্লাইভ লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের কাছে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'যত মানুষ এই যুদ্ধ খেলার তামাশা দেখতে এসেছিল তারা যদি একটি করে ঢিল ছুঁড়ে মারত আমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতাম না।' অনুগ্রহ করে এ কথাটি মনে রাখবেন। আমি আরো একটি দৃষ্টান্ত হাজির করব। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'এ্যানাল্‌স্‌ অব দ্য রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে একটি ঘটনা বয়ান করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন কলকাতা এবং মুর্শীদাবাদ এ সকল বড় বড় শহরের বড় বড় দোকানগুলোতে থরে থরে নানারকম উপাদেয় এবং রসাল খাবার সজ্জিত রয়েছে। কাঁচের আলমারী থেকে বাইরে সেগুলো দেখা যাচ্ছে। অথচ দোকানের বাইরে শ' শ' মানুষ না খেয়ে পড়ে আছে। হান্টার সাহেব প্রশ্ন করছেন, এ লোকগুলো তো মারাই গেল, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে দোকানের খাবার লুট করে খেয়ে নিল না কেন? তিনি বলছেন, ইউরোপ ভূখণ্ডে এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। তিনি জার্মানির কৃষক বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, এটা কেমন করে সম্ভব, বাঙালী এরকম কেন, তারা নির্বিবাদে দুঃখ-দুর্দশা মেনে নেয় কেন? জবাবটিও হান্টার সাহেব দিয়েছিলেন, এ লোকগুলোর মধ্যে কখনো জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জন্মলাভ করে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জাতীয়তাবাদী ধারণাটি অপেক্ষাকৃতভাবে পরবর্তী সময়ের সৃষ্টি। তথাপি একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারতে গ্রীক, শক, হুন, মোঘল, পাঠান যে সমস্ত বিদেশী আক্রমণ করে এখানে রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, এ দেশবাসীকে পদানত করেছে, সকলেই এসেছে পশ্চিম দিক থেকে খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে। তারা মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করে এদেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এ দুটো শ্রেণীকে পরাজিত করতে পারলে তারা বিজয়ী বলে পরিগণিত হত। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এ কথা আসামের বেলায় খাটে না। মোগল সেনাপতি মীরজুমলা তাঁর লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রায় লাখ খানেক সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ হাতি নিয়ে তিনি আসাম জয় করতে গিয়েছিলেন। আসামের জনগণের সম্মিলিত বাধার মুখে সৈন্যবাহিনী বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশীর পক্ষে আসামকে জয় করা সম্ভব হয়নি। ভারত কেন বারবার বিদেশীদের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং আসাম কি করে বারবার আক্রমণের মুখে নিজের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে সেটাও একটা চিন্তা করার বিষয়।

বাঙালী জাতীয়তার স্বরূপ বিষয়ে একটা সঠিক ধারণা করার জন্য নানাদিক থেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয়তার স্বরূপ নির্ণয়ের একটা প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে। একইভাবে জাতিতাত্ত্বিক বিচারের প্রশ্নটিও খাটো করে দেখার উপায় নেই। শাসনতান্ত্রিক ধারার যে অভিজ্ঞতা বিগত হাজার বছরের মধ্যে বাঙালী জাতি অর্জন করেছে সেটাও তুচ্ছ করার মতো কোনো বিষয় নয়। ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা একটি বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। বাঙলার সমাজ কৌমভিত্তিক সমাজ। কৌম সমাজের যেটুকু গুণ এবং যেটুকু দোষ সেটা বাঙালী জনগণের মধ্যে সহজে দৃষ্টিগোচর। কাশ্মীরের কলহন পণ্ডিত থেকে শুরু করে মেকলে পর্যন্ত সকলে বাঙালীর চরিত্রের খারাপ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। অবশ্য একটা কথা, তার মধ্যে কতটা জাতিগত বিদ্বেষ কাজ করছে সেটা ভেবে দেখার বিষয়।

বাঙালী কখনো রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করতে পারেনি। এ বাঙলায় নানা সময়ে যে শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ চালু ছিল, সেগুলো সবসময়ে বাইরে থেকে এসেছে। অর্থাৎ সমস্ত ঐতিহাসিক সময়টাতে বিদেশী শাসকেরা বাঙলাকে শাসন করেছে। একটা পর্যায়ে বাঙলার জনগণ নিজেরা একটি বড় ধরনের মাৎস্যন্যায়ের পর গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে বাঙলার রাজা নির্বাচিত করেছিলেন। আমি ইতিহাস বিষয়ে বেশি খোঁজখবর রাখি না। তথাপি আমার ধারণা রাজা গোপাল দেবই ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শাসক। আমার একটা সন্দেহ আছে, এ গোপাল দেব সত্যিসত্যি যে বাঙালী জনগোষ্ঠীর কেউ একজন ছিলেন, তিনি পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারত

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

থেকে আসেননি, সে ব্যাপারে আমার মনে সামান্য সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণটাও বলি, পাল রাজারা সব সময় বাঙলার বাইরে থেকে রাণী সংগ্রহ করে আনতেন কেন? সে যা হোক, পাল রাজত্বের সময়টাই ছিল অতীত বাঙলার ইতিহাসে সবচাইতে সুবর্ণ যুগ। এ সময়ে গৌতম বুদ্ধের বাণী বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অজস্র বিহার এবং দেউল তৈরি হয়েছে। এ সময়টাতে বাংলা ভাষা একটা সুনির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করেছে এবং বাঙালী সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি হয়েছে। বাঙালী জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রথম ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ চর্যাপদ বলে ধরা হয়ে থাকে। চর্যাপদের গানগুলো এ সময়ে রচিত হয়েছে। পাল যুগের পরে সেন আমলে বাঙালীর সেই বর্ধিষ্ণু অবস্থাটা বজায় থাকেনি। লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কীরা সেনদের হটিয়ে বাঙলায় নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেনদের মতো এই তুর্কীরাও ছিল বিদেশী। অনেক দিন পর পাঠান শাসকদের আমলে বাঙলা আলাদা একটি শাসনতান্ত্রিক পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত পশ্চিমের অর্থাৎ দিল্লীর শাসনের বিরোধিতা করে তাদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য মাথা উঁচু করে রক্ষা করতে পেরেছে। আমি আপনাদের সামনে সোনারগাঁয়ের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের নাম উচ্চারণ করব, যিনি ইরানের কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হাফিজ নিজে আসতে পারেননি — একটা কবিতা পাঠিয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দীন শাহের আমলে বাঙলা ধনেজনে অপরিসীম প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। তারপরে আমি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্-এর নাম উচ্চারণ করব। এ হুসেন শাহ্ অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট রকম শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গর্বের সম্পদ বৈষ্ণব গীতিগুলো রচিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল। মৈথিলী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি তাঁর কবিতায় বারবার এ হুসেন শাহ্-র মহিমা কীর্তন করেছিলেন। বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যা মিলে সুবেহ্ বাঙলা বলে যে এলাকাটিকে মোঘলরা চিহ্নিত করেছিল, তাও ছিল বাঙলার সম্প্রসারিত রূপ। মোঘল আমলে বাঙলায় কতিপয় প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং সমস্ত বাঙলা অঞ্চল একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছিল। মোঘল আমলে বাঙলার শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির প্রভূত উন্নতি হয়। বাঙলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যেমন বাণিজ্য করত তেমনি তার সমুদ্র-বাণিজ্যও ছিল অত্যন্ত তেজিয়ান।

বাঙলাকে নানান রাজবংশ শাসন করেছে এবং ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে বাঙলার রাজধানী পরিবর্তন হয়েছে। কখনো গৌড়, কখনো রাজমহল, কখনো ঢাকা, কখনো মুর্শীদাবাদ, কখনো কলকাতা এবং সবশেষে আবার ঢাকা বাঙলার রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। তবে হাল আমলের ঢাকা ছাড়া বিগত আমলের যে সকল নগরী বাঙলার রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ করেছে সে রাজধানীগুলো বাঙালীর সক্রিয়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রয়াসের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি। বিদেশী শাসকরা তাদের শাসন-শোষণের সুবিধার জন্য যে এলাকাটিকে বেছে নিয়েছে, সে এলাকাটি রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাঙালীরা মুখ্যত কৌম-সমাজের লোক। তারা দল বেঁধে বাস করতে অভ্যস্ত এবং গড্ডল স্বভাব পরিহার করা তাদের পক্ষে অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। জার্মান দার্শনিক হেগেল একটা বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন — কোনো একটি প্রাকৃতিক সমাজের জনগোষ্ঠী যখন একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারী হয়, তারা বিশ্বসমাজের অংশ হয়ে ওঠে। কথাটা একটু ব্যাখ্যার দাবী রাখে। কোনো জনগোষ্ঠীর মানুষ যখন একটা রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হয়, তারা বিশেষ অঞ্চলের মানুষ হয়েও বিশ্বসমাজের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন তারা জাতিসংঘে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। পৃথিবীর সবগুলো দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করতে পারে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙলার আবহমানকালের ইতিহাসে গুণগত দিক দিয়ে অবশ্যই একটি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা। বাঙালীরা ইতিহাসের নানাপর্বে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এসব করেছে। ইতিহাসে তার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত বর্তমান। কিন্তু জাতির সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষ একজোট হয়ে একটি স্বাধীন স্বদেশভূমি নির্মাণের অঙ্গীকারে জীবন-মরণ পণ করে যেভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙলার অতীত ইতিহাসে সেরকম আরেকটি ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ অঞ্চলের মানুষ একটি রাষ্ট্রসত্তা নির্মাণ করার জন্যে যে একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল তার প্রেরণার মূল উৎসস্থল কি? অনেকে বলবেন, বাংলা ভাষা বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উৎসস্থল। একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের রক্ত থেকে যে বীজ দল মেলে অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে অঙ্কুরই একাত্তর সালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মহীরুহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশকে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র বললে খুব অন্যায় করা হয় না। তারপরও একটা বিষয় ভেবে দেখার রয়েছে। একমাত্র ভাষাকে অবলম্বন করে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। তার মধ্যে অবশ্যই অন্যান্য উপাদানের মিশেল থাকতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু সংখ্যক দেশ আরবী ভাষায় কথা বলে। ধর্মে মুসলমান এবং ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবেও তারা পরস্পরের প্রতিবেশী। কিন্তু সেখানে একটি রাষ্ট্রের বদলে একগুচ্ছ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ইরান এবং আফগানিস্তান পাশাপাশি রাষ্ট্র। ফার্সী উভয় দেশের মাতৃভাষা এবং উভয় দেশের শতকরা একশো ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অতীতে এমন সময়ও গেছে যখন আফগান শাসকরা ইরানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে অথবা ইরানী শাসকেরা আফগানিস্থানে অধিকার বিস্তার করেছে, তথাপি দু'দেশ মিলে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি।

আমরা যখন বাংলাদেশকে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র বলে জোরের সঙ্গে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করি, একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ভাষা জাতি এবং জাতি রাষ্ট্র গঠনের একটা মৌলিক উপাদান বটে। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটি জিনিস থাকা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অবশ্যই প্রয়োজন। সে জিনিসটি হলো একটি অঞ্চলের বেবাক জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার একটি সম্মিলিত ঐক্য। সেটি না থাকলে শুধু ভাষার ওপর নির্ভর করে একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমান এ রাষ্ট্রের স্থপতি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। কিন্তু আরো একটি ব্যাপার কোনভাবে আমরা খাটো করে দেখতে পারি না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একদিকে যেমন বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই, তেমনি অন্যদিকে এটা ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও লড়াই। এ অঞ্চলের মানুষ একরোখা দাবীর মাধ্যমে এক সময়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরও একজন সৈনিক ছিলেন। এ কথাগুলো স্বীকার করার এবং পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে, কারণ প্রকৃত অতীতের ওপর ভিত্তি করেই আমরা সত্যিকার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি। প্রকৃত সত্য উপেক্ষা করে কোনো মহৎ কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়।

জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয়ের যে সংকট আমরা প্রতি পদে পদে অনুভব করতে বাধ্য হই, তার কারণ এ রাষ্ট্রের অতি সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে প্রোথিত। এ রাষ্ট্রের মূল সংকট হিসেবে যে জিনিসটি আমার কাছে প্রধান বলে প্রতীয়মান হয় সেটি এরকম : এ দেশটি, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, আসলে পূর্ব পাকিস্তানই থেকে গেছে। এ দেশটিতে সত্যিকার অর্থে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে এর বাংলাদেশ নাম সার্থক হবে। নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এদেশের প্রায় আশি শতাংশের মতো মানুষ মুসলমান। শুধু আশি শতাংশ নয়, শতকরা একশো ভাগ মুসলমানও যদি এ দেশে বসবাস করে থাকে তারপরেও আমাদেরকে একটি সেক্যুলার সমাজ, একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র তৈরি করার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে। যে দেশটির শতকরা আশি ভাগ মানুষ মুসলমান এবং যে দেশের মুসলমানেরা অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ ও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন, সেই বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি সেক্যুলার সমাজ গঠন করার দিকে আকর্ষণ করতে গেলে যে ধরনের প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের ভেতর সেরকম মেধা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই আমাদের আসল দুঃখ।

বেশ কিছুদিন ধরে একটা অদ্ভুত বিতর্ক আমাদের দেশে চলে আসছে। আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী? আমরা মুসলমান না শুধু বাঙালী? এগুলো আসলে বিতর্কের বিষয় হওয়া উচিত ছিল না। আমরা যেমন বাংলাদেশী তেমনি আমরা বাঙালীও বটে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আমাদের মুসলমান পরিচয় বাঙালী পরিচয়কে যেমন খারিজ করে না, তেমনি বাঙালী পরিচয়ও মুসলমান পরিচয়কে খারিজ করে না। একটি কথা বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেলায়ও অংশত প্রযোজ্য। হয়তো তাদের কেউ কেউ বাঙালী পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন। কিন্তু বাংলাদেশী পরিচয় দিতে কেউ আপত্তি করবেন না।

আপনারা সকলেই জানেন জল এবং পানি একই অর্থ বহন করে। 'যাহা জল তাহাই পানি'। বাঙলার মুসলমানেরা পানি শব্দটা ব্যবহার করে এবং হিন্দুরা ব্যবহার করে জল শব্দটি। বরাকের ঐ পাড়ের সমস্ত মানুষ — হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই — পানি শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। একটা সময়ে এমন ছিল জল এবং পানি শব্দটির ব্যবহার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কম ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়নি। মানুষের আসল সংকটসমূহ পাশ কাটিয়ে যখন বিবাদ এবং বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুটি প্রতীকে রূপান্তরিত করা হয় সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী, বাঙালী না বাঙালী মুসলমান, এ সমস্ত প্রতীকসমূহ বিশেষ বিশেষ সুবিধাবাদী গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যে সৃষ্টি করেছে। আসলে এগুলোর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সমস্ত বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীকে একটি জাতীয়তার মধ্যে দীক্ষিত করার অক্ষমতা থেকেই এগুলোর সৃষ্টি। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাঁদের অধিকার কখনো অর্জন করতে সক্ষম হবে না, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দরিদ্রতম থাকে এবং নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেরা তাদের অধিকার আদায় করতে না পারে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, বাঙালী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর নির্যাতিত অংশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রটি তৈরি করেছি, সে রাষ্ট্রের সবচাইতে নির্যাতিত এবং নিপীড়িত মানুষেরা যদি অধিকার বঞ্চিত থাকে, আমরা এদেশে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরি করতে কখনো সক্ষম হব না। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে ভৌগোলিক সীমারেখা সেটা আমরা পাকিস্তান থেকেই পেয়েছি। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, অঙ্গীকার এবং অধিকারবোধ এগুলোর মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশটিকে আমরা সত্যিকারের সেক্যুলার বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে পারি। প্রতিটি সম্প্রদায় প্রতিটা ধর্মের অনুসারী মানুষ তাদের পারস্পরিক ধর্মীয়, সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক দূরত্ব সত্ত্বেও যখন সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করবে আমরা এ রাষ্ট্রের নাগরিক এবং নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এ রাষ্ট্রটি আমরা তৈরি করেছি, তখন আমরা বাংলাদেশী কি বাঙালী, বাঙালী না বাঙালী মুসলমান, এ জাতীয় যে-সকল বিতর্ক মাঝে মাঝে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলে সেগুলোর অস্তিত্ব থাকবে না। আরো কতিপয় বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আসল ভিত্তি কি? অনেকেই বলে থাকেন, বাংলা ভাষা। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য, কিন্তু তারপরেও কিছু

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কথা থেকে যায়। ব্রিটিশরা বিদায় নেয়ার পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার সমস্ত হিন্দু-মুসলিম বাঙালীরা একসঙ্গে ছিল। কিন্তু সব বাঙালী মিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর এক অংশ ভারতে থেকে যায়। অন্য অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়। ভাষার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার সময় ভাষার সীমাবদ্ধতার কথাটিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কিছুসংখ্যক মানুষ মনে করেন ইসলাম ধর্মের কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছিল এবং বাঙলার মুসলিম-প্রধান অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পরে বর্তমান বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁরা বলে থাকেন পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হত না। ধর্মকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটা নিয়ামক শক্তি হিসেবে তাঁরা ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পেছনে ভাষা যেমন তেমনি ধর্মও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্রিয়াশীল থেকেছে। এগুলো সত্য। কিন্তু আরো একটি সত্য অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সে সত্যটির গুরুত্ব সর্বাধিক। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন, বঞ্চনা এবং শোষণ ইতিহাসের আদিকাল থেকেই তার চিত্তপ্রবৃত্তির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে সে আকাঙ্ক্ষা নানা বিচিত্র উপায়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের অনতিকাল পরেই বাঙলার কৌম-সমাজের লোকেরা বর্ণাশ্রম ধর্মের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দলে দলে গৌতম বুদ্ধের ধর্মকে গ্রহণ করেছে। আবার সেন রাজত্বের সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন আরো কড়াকড়িভাবে প্রতিষ্ঠা পেল, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা এ অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে একটি পথ অন্বেষণের চেষ্টায় তৎপর ছিল।

তারপরে তুর্কীদের হাতে সেনরা যখন পরাজিত হল, দলে দলে বৌদ্ধরা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এ অঞ্চলের যে জনগোষ্ঠী এবং তার সামষ্টিক চৈতন্য (Collective Consciousness) সেটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা কতিপয় প্রণিধানযোগ্য প্রবণতার সন্ধান পেয়ে যাই। তাঁরা ধর্ম পরিবর্তন করছেন। ধর্ম পরিবর্তন করার মাধ্যমে অনেক সময় রাষ্ট্র এবং সরকারের চেহারা পাল্টে দিচ্ছেন। তারপরেও যখন তাঁদের বাস্তব সংকটের সমাধান হচ্ছে না, তাঁরা নতুন পথ অনুসন্ধান করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ এককাট্টা হয়ে এক সময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জিগির তুলেছিল। এটা ছিল সেই সময়ের মূর্তিমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, কারণ তারা মনে করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তাঁদের অভাব-অভিযোগ এবং সম্প্রদায়গত আকাঙ্ক্ষার সদুত্তর পেয়ে যাবেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেখা গেল তাঁদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়নি। সুতরাং তাঁদেরকে পাকিস্তান ভাঙার কাজে নামতে হল, এ ভাঙন প্রক্রিয়ার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চূড়ান্ত রূপ হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা এক সময়ে ধর্মীয় মোড়কের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে আমরা যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পেয়েছি, তার পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা অর্জনের জন্যে অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রশ্নটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে। প্রথমত আমাদের দেখতে হবে অর্থনৈতিকভাবে এ রাষ্ট্রটি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কিনা। দ্বিতীয়ত সমগ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার এ রাষ্ট্রের মধ্যে স্বীকৃত হচ্ছে কিনা। সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমনকি বাঙালীর ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্ট রাষ্ট্রের গালভরা আস্ফালনের চাইতেও অধিক কঠিন কাজ।

মার্কসবাদীরা নির্যাতিত শ্রেণীর রাষ্ট্র বলতে যে জিনিসটি বুঝিয়ে থাকেন অত কড়াকড়িভাবে না হলেও বাংলাদেশকে সে ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শুরু থেকেই এ অঞ্চলের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে নানা ঘূর্ণিপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আমাদের সময়ে এসে একটি রাষ্ট্রসত্তার আকারে বিকশিত হয়েছে। সে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী – তারা মুসলিম হোক, হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিবাসী হোক – সকলের জন্যে সমান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

কোনো একটি জাতি যখন তার সার্বিক বিকাশ এবং অগ্রগতির একটা স্তরে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়, সাধারণত দুটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উপাদান সমূহের সংশ্লেষণ এবং গুণগত উত্তরণ, অন্যটি হলো বাহ্যিক প্রভাববিস্তারী কারণসমূহ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারল, এ ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, একথা কারোর অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও বাংলাদেশের একটা সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে। ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এ স্বাধীন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলে একটা নতুন ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক সমীকরণের পথ অনেকাংশে প্রশস্ত হতে শুরু করেছে। ভারত যখন ১৯৪৭ সালে ভাগ হচ্ছিল, মুখ্যত দুটো বিষয় অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের নায়ক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দাবী করেছিলেন যে ভারতের মুসলমানেরা আলাদা একটি জাতি এবং তাদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই। অন্যদিকে ভারতের কংগ্রেস নেতারা যেমন : মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ দাবী করেছিলেন,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সব ভারতীয়রা মিলেই একটা জাতি। এ হিসাব, যার ওপর ভিত্তি করে ভারত এবং পাকিস্তান ভাগ হয়েছিল, তার ভেতরে একটা শুভংকরের ফাঁকি লুকিয়ে ছিল। ভারত জিন্নাহ-কথিত দু'জাতির দেশ যেমন নয়, তেমনি গান্ধী-নেহেরুর দাবী মোতাবেক এক জাতিও নয়। ভারত বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু জনগোষ্ঠীর দেশ। ব্রিটিশ শাসন অবসানের সময় এ বিষয়টি সামনে আসতে পারেনি। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হল, দেখা গেল জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরপরই ভারত যে একজাতির দেশ নয় সেই উপলব্ধিটি ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বিশেষত অবহেলিত এবং অনুন্নত অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রবল হতে আরম্ভ করেছে। ভারতের রাজনীতি সচেতন মানুষরা ক্রমাগতই এ সত্যটি অনুধাবন করছেন যে, ভারতে পাঞ্জাবী, বাঙালী, মারাঠী এ ধরনের অনেকগুলো জাতি রয়েছে, ভারতীয় জাতি বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই। এটা জোর করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা টিকে থাকবে কিনা, টিকে থাকলেও কিভাবে টিকে থাকবে, সেগুলো অনুমান এবং জল্পনার বিষয়। উপস্থিত মুহূর্তে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিশেষ অবকাশ নেই।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এ অঞ্চলে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যই একটি অভিনব ঘটনা। এ রাষ্ট্রটিকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথমত তার অর্থনৈতিক ভিত্তিটি অবশ্যই সুগঠিত হতে হবে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালী জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকখানিই ধারণ করার মত যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে। একটা সত্য কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না — বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যা বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের মানুষ একটি লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং শুরু থেকে বাঙালী জনগোষ্ঠীর মানুষ যে ঐতিহাসিক অর্জনসমূহের মাধ্যমে জাতিসত্তাকে বিকশিত করেছে, সেগুলো ধারণ-লালন এবং বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে উঠতে হবে। এরকম একটি স্বপ্ন বাংলাদেশের জনসমষ্টির ভেতরে চারিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর-পূর্ব ভারতের এ অঞ্চলে সমধিক গুরুত্বের অধিকারী। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা থেকে গৌহাটি, কলকাতা, আগরতলা, মেঘালয় এ সকল স্থান প্রায় সমান দূরত্বে অবস্থিত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরিবেশভিত্তিক রাষ্ট্রের যে ধারণাটি ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তার চারপাশের প্রতিবেশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিচার করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

২০০১

বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র
(২০০০)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পলাশীর যুদ্ধের একটি দূরবর্তী প্রতিতুলনা

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাটি আধুনিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রথম ইংরেজরা বাঙলা দেশে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বাঙলা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করার পর গোটা ভারত উপমহাদেশ ইংরেজরা তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। ভারতের জনশক্তি, সম্পদ এবং অর্থের সহায়তায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজরা এমন একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসে, যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যেত না। ভারতের ইংরেজ সাম্রাজ্যকে ধরে নেয়া হত মহারানীর রাজমুকুটের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং মূল্যবান রত্ন হিসেবে। আধুনিক উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে ইংরেজরা সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে পর্তুগাল এবং স্পেন সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয়ে ওঠে। ইংরেজরা ছিল উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কনিষ্ঠ শক্তি। অবশ্য এ সময় ফরাসী, ওলন্দাজ এ সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলো প্রতিযোগিতা করে উপনিবেশ স্থাপনে ব্রতী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দেয়া অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

পলাশী যুদ্ধের বিজয় ভারত উপমহাদেশে শুধু উপনিবেশ স্থাপনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। এ যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে-সকল উপনিবেশ স্থাপন করেছে তার সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধের একটা গভীর সংযোগ রয়েছে। বস্তুত প্রাচ্যদেশীয় রাজ্যগুলোতে পশ্চিমা দেশসমূহের উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পলাশীর বিজয়কে গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ উপমহাদেশে পলাশীর যুদ্ধের চেয়েও তাৎপর্যসম্পন্ন একটি সম্ভবনাময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান একটি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা। ভারতের জনগণ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সংগ্রামের চেহারাটি ছিল অস্পষ্ট এবং ঝাপসা। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আজাদ এবং প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতা দাবি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করেছিলেন ভারতবর্ষে সমস্ত জাতি মিলে একটি জাতি। কংগ্রেসের এ দাবী খারিজ করে দিয়ে মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাল্টা দাবী উত্থাপন করেছিলেন, ভারতের সবলোক এক জাতিভুক্ত নয়, এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নেমেছিলেন। সে সময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী নস্যাৎ করে দেয়া ব্রিটিশ কিংবা কংগ্রেস কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি, অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর হতে না হতেই বাংলাদেশের মানুষরা অনুভব করতে থাকলেন, তাঁরা একটি স্বতন্ত্র, আলাদা জাতি। পাকিস্তানের অন্য অংশের সঙ্গে ধর্ম ছাড়া ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবন-আচরণ কোনকিছুর মিল নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের মানুষরা আরো অনুভব করতে থাকলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর বয়সের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকে সেই বিষয়টি এদেশের চক্ষুষ্মান মানুষদের গভীর চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল মূলত একটি কারণে। ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বিরাট অংশ বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। সে আন্দোলনের তাৎক্ষণিক যে তাৎপর্য ছিল সেটা ছাড়িয়ে ভাষা আন্দোলনকে আমাদের জাতিগত উত্থানের তোরণদ্বার হিসেবে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল। এ দু'হাজার সালের বিশ্বের মানুষ প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের যে একটি বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে পৃথিবীর সকল নির্যাতিত এবং অধিকার-বঞ্চিত ভাষাভাষীদের দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের বীজ থেকেই আমাদের মুক্তিসংগ্রাম বিকশিত হয়েছে। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে যে স্বাধীন-সার্বভৌম ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে, অনেক রাষ্ট্রবেত্তা এবং সমাজবিজ্ঞানী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সে অভ্যুদয়ের সঠিক তাৎপর্য অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই তাঁরা বলে থাকেন মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পরে যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল এবং আজাদের সর্বভারত মিলে এক জাতি এ ধারণাটি কি সঠিক? আসলে ভারত একটি বিশাল মহাদেশ। এখানে নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা জাতি এবং জনগোষ্ঠীর বসবাস। নানা জাতি-গোষ্ঠীর আবাস ভারতকে একটি রাষ্ট্র ধরে নিলে ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে পারস্পরিক যে সকল বৈপরীত্য ক্রিয়াশীল রয়েছে সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনার প্রয়োজন পড়ে না। ভারতের বিভিন্ন অংশের শিক্ষিত জনগণ এখনো যে ভাষাটির মাধ্যমে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কসূত্র রক্ষা করে থাকেন সেটি কোনো ভারতীয় ভাষা নয়, ইংরেজী। ভারত-রাষ্ট্র জন্ম নেয়ার ৫০ বছরের মধ্যেও একটি সর্বভারতীয় ভাষা সৃষ্টি করা গেল না। সেটি ভারত রাষ্ট্রের দুর্বলতার একটি মুখ্য দিক। ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালে আসাম, কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অহিন্দী অঞ্চলগুলো যেভাবে তাদের দাবী আদায়ের সংগ্রামে একসার অগ্নিগিরির মতো কোথাও ধূমায়িত এবং কোথাও জাজ্জ্বল্যমান তার কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব হয় না। ভারতের নির্যাতিত জাতিসত্তাসমূহ এবং দলিত জনগোষ্ঠী তাদের মুক্তির দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে সেগুলো প্রমাণ করে, ভারত ঠিক এক জাতির দেশ নয়। ভারতে বাঙালী জাতিসত্তা আছে, অহমিয়া জাতিসত্তা আছে, কিন্তু ভারতীয় জাতিসত্তা বলে কোনো বস্তু নেই। এটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ যখন ভাষা আন্দোলন শুরু করেছেন দেখাদেখি আসাম এবং দ্রাবিড় অঞ্চলগুলোতেও ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ যখন স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করে, এরপর ভারতের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের স্বায়ত্ত্বশাসনের সংগ্রাম জাগিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভারতের অবহেলিত অঞ্চল এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়ে ভারত রাষ্ট্রের মূল কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে লড়াই শুরু করেছে এবং সে লড়াই অদ্যাবধি অব্যাহত গতিতে চলছে। ভারতীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে কি না সে বিষয়টি ভারতীয় চিন্তাশীল মানুষের নানারকম দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ উপমহাদেশে তিনটি রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্র — যদিও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ অঞ্চলের একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা। সময়ের পরিবর্তনের কথাটি যদি ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়, আমরা দেখতে পাই পলাশীর যুদ্ধ ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ের উপনিবেশ স্থাপনের একটি বীজ-কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম আর একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। পলাশীর যুদ্ধের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের একটি বিরাট প্রভাব বহনকারী ঘটনা, সে-জিনিসটি আমাদের যথার্থভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র
(২০০১)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভেবে দেখতে বলি

আমার বক্তব্য খুবই সরল ভাষায় প্রকাশ করতে চাই। কেন জানি ইদানীং আমার একটা ধারণা হচ্ছে বাঙালী জাতির সামনে একটা নতুন সময় এসেছে। এই জিনিসটি কেন আমার মনে এল একটু বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। হালের পৃথিবীতে অনেক ওলটপালট, ভাঙচুর হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেল। জার্মানি এক হলো। এক হলো ইয়েমেন, এক হয়ে আবার ভাঙার পর্যায়ে এসেছে। দুই কোরিয়ার মধ্যে ঐক্যের কথা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। এ সমস্ত কথা মনে রেখে আমি যখন এই উপমহাদেশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি আমার সামনে তিনটি সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রথমটার কথা বলি। এমন একটা সময় হয়তো আসবে যখন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এই দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো মিলে একটা কনফেডারেশন তৈরি করবে। এই জিনিসটি যদি ঘটে, সকলের জন্যই মঙ্গল। এই ভূভাগে একশো কোটি মানুষ বসবাস করে এবং অধিকাংশ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে জীবনধারণ করে। এই দেশগুলো যদি পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে সেটাই হবে এই অঞ্চলের একশো কোটি মানুষের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। জার্মানি এবং ব্রিটেন দুটি বিশ্বযুদ্ধ করেছে। আজকে বাস্তব প্রয়োজনের ধাক্কায় ব্রিটেন এবং জার্মানিকে অতীত বৈরিতা ভুলতে হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলো মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পেছনে একটাই কারণ, ইউরোপীয় জাতিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের, আঞ্চলিক স্বার্থ সুরক্ষার একটি সুবন্দোবস্ত করা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় জাতিসমূহের এই আকাঙ্ক্ষার তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের থেকে খুব বেশি দূরের কথা নয়, দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগুলো মিলে জোট গঠিত হয়েছে সেরকম একটা ঘটনা এখানে ঘটবে না কেন? উপমহাদেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের এটা তো একটা মোক্ষম উপায়। 'যদি' এবং 'কিন্তু' দিয়ে ইতিহাসের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অথবা আকাঙ্ক্ষা পূরণমূলক চিন্তা ইতিহাসের গতিধারাকে বেগ সঞ্চার করার বেলায় অনেক সময় কোনো কাজে আসবে না। দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর একটা কনফেডারেশনের চিন্তা বর্তমান মুহূর্তে একটি ইউটোপিয়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ইতিহাসে ইউটোপিয়ার মূল্য আছে এ কথাকে অস্বীকার করতে পারে কে?

এখন দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটা বলি। গোটা উপমহাদেশ জুড়ে একটা উন্মত্ত অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি এ দেশ ও দেশ বলব না। সব দেশেই তার প্রকোপ কম বেশি বর্তমান। ভারতের অতীত ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখানো যায় যে, যখন এই ভূখণ্ডে ধর্মান্ধতার শক্তি প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, তা ভারতের ঐক্য বিনাশের পথ প্রশস্ত করেছে। আমরা সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের কথা বলতে পারি। তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাঁর দূরবর্তী প্রতিক্রিয়াতে আবির্ভাব ঘটেছিল শঙ্করাচার্যের। শঙ্করাচার্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের প্রায় এক কোটির মতো মানুষকে খুন করা হয়েছিল। এই ব্যাপক রক্তক্ষরণে ভারতীয় সমাজে যে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে ফাঁক দিয়ে মুসলমানেরা এখানে প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণ ঠেকাবার মতো কোনো সংহতি ছিল না।

অশোকের পর আমি সম্রাট আওরঙ্গজেবের কথা বলব। আওরঙ্গজেব ধর্ম নিয়ে অশোকের চাইতেও বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন। আকবর হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রীতি-সম্প্রীতির সৃষ্টি করেছিলেন আওরঙ্গজেব সেটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন। তার ফলে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়েছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং আখেরে এই দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবেশ করে। 'পোহালে শর্বরী, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'।

অতীতের দুটো দৃষ্টান্তের কথা বললাম। এখন সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে হিন্দু মৌলবাদের যে পুনরুত্থান ঘটেছে সে সম্পর্কে দু'কথা বলতে চাই। হিন্দী বলয়ভুক্ত ভারতীয় রাজ্যগুলোতে ক্রমাগত একটা বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের মনে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। ভারতের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের একাংশের কথাবার্তায় উগ্রতা, অহমিকা এবং দম্ভের প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছে। তাদের কেউ কেউ এমন কথাও বলতে চান, অতীতে ভারতীয় হিন্দুরা অস্ত্রশস্ত্রে দুর্বল ছিল বলেই বিদেশী, বিজাতীয় এবং বিধর্মীরা তাদের পরাজিত করে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী দাস বানিয়ে রেখেছিল। এখন ভারত পৃথিবীর অষ্টম কি নবম শিল্পোন্নত রাষ্ট্র এবং পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। সুতরাং ভারতকে আর যুদ্ধ করে পরাজিত করা সম্ভব নয়। যেহেতু ভারতের হাতে প্রচুর মারণাস্ত্র আছে সে কারণে ভারতীয় মৌলবাদী নেতৃবৃন্দের একাংশ মনে করছেন তাঁরা এখন অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। সেজন্য গোটা রাষ্ট্রটিকে ঢেলে তাঁরা হিন্দু-রাষ্ট্র বানাবেন। ভারতবর্ষকে পুরোপুরি হিন্দু-রাষ্ট্র বানাতে পারলেই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অহং পুরোপুরি চরিতার্থ হয়। এ প্রক্রিয়াটি ভারতবর্ষে দিনেদিনে শক্তি সঞ্চয়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করছে। জওহরলাল নেহেরু এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের প্রথমদিকে ভারতীয় জনগণ যে রকম চিন্তা করতেন হালে অন্তত তার একাংশ ভিন্নরকম চিন্তা-ভাবনা করছেন। বস্তুত বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে এই উগ্র মানসিকতারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। আমার বিশ্বাস এ প্রক্রিয়াটি যদি গতিবেগ সঞ্চয় করে, তাহলে ভারতবর্ষের ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এটা আমার কথা নয়, ভারতীয় রাষ্ট্রবেত্তা এবং চিন্তাশীল মানুষেরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যদি সত্যিসত্যি ভারতীয় মৌলবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করে ভারতকে কোনদিন হিন্দু-রাষ্ট্র বানাতে পারে, তাহলে ভারতের বর্তমান ঐক্যের ভিতটি ভেঙে যাবে। যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে, আমার ভয় হয়, এ অঞ্চলের ইতিহাসে মধ্যযুগের পুনরাবির্ভাব ঘটবে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, নিম্নবর্ণের হিন্দু একে অপরের গলা কাটাকাটির খেলায় এমনভাবে মেতে উঠবে যে অবস্থাটা চিন্তা করলেও আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। এটা যে ঘটবে, এমন কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কনফেডারেশনের স্বপ্ন যখন আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণমূলক চিন্তার একটা অংশ, তেমনি ভারতীয় ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা আমার একটি আতঙ্কিত চিন্তা মাত্র।

এখন আমার তৃতীয় এবং শেষ বক্তব্যটিতে আসি। প্রথমে একটা প্রশ্ন করব, ভারতবর্ষ কি একটি দেশ? অনেকে বলবেন, দেশ নয়, একটি মহাদেশ। কথাটি সত্য। একটা মহাদেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য ভারতের রয়েছে। তাই অনেক সময় ভারতীয় মনীষীরা সেটাকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। যা হোক, এই মহাদেশে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ রাষ্ট্রটির চরিত্র কি? ভারতের লিখিত সংবিধানে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক আদর্শবাদী প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ভারতীয়রা মারাঠী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, শিখ সবাই মিলে একটা জাতি এবং সে জাতির নাম ভারতীয় জাতি। কেউ কেউ আবার বলেন 'মহাজাতি'। জাতি এবং মহাজাতির তাৎপর্যগত বিতর্কে আমি যাব না। আমি শুধু একটা বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হলো, ভারতের নানা অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষেরা যে ভাষাটির মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, সেটা কারো মাতৃভাষা নয়। অর্থাৎ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ভাষাটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর অতীত হয়ে গেল, তথাপি ভারত সর্বসাধারণের 'গ্রহণযোগ্য একটি ভাষা' সৃষ্টি করতে পারল না, এটাই ভারত রাষ্ট্রের বিরাটতম অপূর্ণতা। যে জাতি একটি সাধারণ ভাষা তৈরি করতে পারে না, সে জাতি হিসেবে ভবিষ্যতে টিকে থাকবে তেমন আশাবাদ ব্যক্ত করা অনেকটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রচনা পাঠ করার সুযোগ সচরাচর আমাদের হয় না। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কতিপয় পণ্ডিত, যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যে সকল কথাবার্তা বলেছেন তার কিছু কিছু অনুধাবন করার সুযোগ আমাদের হয়েছে। শিবনারায়ণ বাবু স্পষ্টতই বলেছেন, মারাঠী জাতি আছে, উড়িয়া জাতি আছে, বাঙালী জাতি আছে, গুজরাটি জাতি আছে, তামিল জাতি আছে, কিন্তু ভারতীয় জাতি বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই। ভারতীয় জাতীয়তার কনসেপ্টটি উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া। ভেতর থেকে উন্মোষিত হয়নি। তাই সকলে আশঙ্কা করেছেন, হয়তো তেমন সময় আসতে পারে যখন এই আকারে ভারতীয় ঐক্য না-ও টিকে থাকতে পারে। আবার ভাষাগত এবং জাতিগতভাবে ভারতীয় অঞ্চলগুলোর পুনর্বিন্যাস ঘটবে। সেরকম একটা পরিস্থিতি কখন আসবে, কিভাবে আসবে অথবা আদৌ আসবে কিনা সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। অনেকে মনে করতে পারেন, আমি ক্ষুদ্র দেশের মানুষ বলে ভারতীয় ঐক্যের বিনাশ কামনা করে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ দেখতে চাইছি। যা হোক আমার কথায় ফিরে আসি, যদি এমন পরিস্থিতি আসে যখন বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করতে হবে তখন আমরা সেই পরিস্থিতিটি মোকাবেলা করার জন্য কি ধরনের সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করব? দুই বাঙলার সম্পর্কের কথা যখন আসে, আমার কল্পদৃষ্টির সামনে এই পরিপ্রেক্ষিতটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

দুই বাঙলার জনগণ সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য দিক দিয়ে তাদের একটা ভিন্নরকম ভবিষ্যৎ রচনা করার জন্য যদি পারস্পরিক সহযোগিতার একটা ভিত নির্মাণ করতে চায়, তার আকার-চেহারাটি কিরকম হবে? আমার বিশ্বাস, যে কোনো ঐক্যচিন্তার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসবোধ এবং আস্থা। যে সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাস এবং আস্থার ভাব স্থায়ী হয় সে কাজগুলোকে হতে হবে শর্তমুক্ত, স্বতস্ফূর্ত এবং পারস্পরিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বর্তমানে দুই বাঙলার মধ্যবর্তী সম্পর্কটা সেরকম অনাবিল সম্পর্ক নয়। পশ্চিম বাঙলায় বাংলাদেশের প্রতি মমতা অনুভব করেন এমন মানুষের সংখ্যা অনেক এবং তাঁরা অনেকেই কামনা করেন বাঙালী জাতির এ রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ গৌরব এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠুক। দুঃখের কথা হলো তাঁরা কোনো সংগঠিত শক্তি নন। তাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের কোনো পরিচয় নেই। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সেই শ্রেণীর লোকদের পরিচয় ঘটেছে, যারা কৌশলে বর্ণবাদকে লালন করে এবং সুন্দর পথে আগ্রাসন চালায়। বাংলাদেশ এবং তার সংস্কৃতি নিজের মতো বিকশিত হয়ে সমস্ত বাঙালী জাতি এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করুক এটা তারা কিছুতেই চান না। তারা দু'বাঙলার জনগণের মধ্যে কোনদিন যাতে ঐক্যের ভাব জাগ্রত না হয় সেজন্য ব্যাপক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত রয়েছেন। এটাকে আমি বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে চাই। বাংলাদেশে যারা এই ষড়যন্ত্র করছেন তাঁদের পিতামহরা ১৯৪৭ সালে বাঙলাকে ভাগ করার মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারা স্বভাবতই চান রাষ্ট্র হিসেবে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশ দুর্বল থাকুক, যাতে তাঁরা একে বাজারে পরিণত করতে পারেন। এই সংস্কৃতি জরাগ্রস্ত হোক, যাতে তাঁরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যেতে পারেন। এ সূক্ষ্ম এবং ছদ্মবেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এত অধিক পরিমাণে ঘটেছে যে, খাঁটি বাঙালী-প্রেমিকদের এখানে টিকে থাকা একরকম দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণবিরোধী এবং নষ্ট চরিত্রের লোকদের সম্মান-শিরোপা দিয়ে সীমান্তের এপারে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মস্তক শিকার করা তাঁদের একটা মনোরম হবিতে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, পশ্চিম বাঙলায় এই প্রতিক্রিয়াশীল দুষ্টচক্রের অবস্থান যথেষ্ট রকম দৃঢ় নয়। বাংলাদেশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সেখান থেকে তারা প্রাণরস আহরণ করছে এবং পশ্চিম বাঙলার জনগণকে বাঙালীর ঐক্যবিরোধী তৎপরতায় বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ থেকে সহায়তা না পেলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ছদ্মবেশী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পশ্চিম বাঙলায় তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্বার্থান্ধ দুষ্টচক্রটির মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে, সেটা ভেবে দেখাই এ সময়ের প্রধান কাজ বলে আমি মনে করি।

নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ
(১৯৯৫)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মূলত মানুষ

"মানুষের মান দাও
মানুষের গান গাও
মানুষ সবার সেরা
মানুষ ঈশ্বরঘেরা
এ সংসারে।"

আমাদের একজন নাম না জানা লোককবি মানুষ সম্পর্কে ওপরের ধারণাটি প্রকাশ করেছেন। মহাকবি শেকস্‌পিয়ার হ্যামলেট নাটকের নায়ক হ্যামলেটের স্বগতোক্তির মধ্যে মানুষের অবিস্মরণীয় মহিমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, 'ম্যান দ্যা ম্যাগনিফিসেন্ট ক্রিয়েশন, বোল্ড ইন ইমাজিনেশন -- নোবেল ইন পারসেপশন' ইত্যাদি। আমার তো রীতিমতো ইচ্ছে করে নাম না জানা লোককবির স্তবকটি মহাকবির অমর পংক্তিমালার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করি। আমাদের দেশে এমন একজন লোককবি ছিলেন যাঁর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না, তাঁর অনুভবের উত্তাপ থেকে রক্তপদ্মের কলির মতো এই পংক্তি ক'টি ফুটে উঠেছিল, ভাবতে কার না গর্ব হয়।

২

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ। এই অপরিসীম ব্যঞ্জনাময় শব্দটি যতবার উচ্চারণ করি একটি বিস্ময়বোধ শিরায়-শোণিতে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এই দু'পেয়ে প্রাণীটি পারিপার্শ্বিকের সমস্ত বাধা অপায় সৃষ্টিক্ষমতা বলে অতিক্রম করে এ পর্যন্ত এসেছে। গুহামানবের যুগ থেকে মহাকাশ যাত্রার যুগ, এরই মধ্যে মানুষজাতি তার সহযাত্রী সৃষ্টিজগতের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কতদূর ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেলেছে ভাবতে চেষ্টা করলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। গরুর ইতিহাস গরুরই ইতিহাস। সিংহ লক্ষ-লক্ষ বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে। কিন্তু মানুষ একমাত্র প্রাণী ক্রমাগত প্রতিটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে করতে এই অবস্থায়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এসেছে। নিজেকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে গিয়ে জগৎকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছে। নিজেকে পরিবর্তন করতে গিয়ে সৃষ্টিজগতকে পরিবর্তন করেছে।

মানুষ জগতকে যেভাবে বিস্ময়-স্পন্দিত চোখে দেখেছে, নিজেকেও দেখেছে একই বিস্ময়াবিষ্ট প্রেরণায়। এই বিস্ময়াবিষ্ট প্রেরণা থেকেই সে সৃষ্টি করেছে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা। মানুষই একমাত্র প্রাণী পূর্বপুরুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা তার চেতনাকে সমিধ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে নতুনভাবে জ্বালিয়েও তুলতে পারে।

মানুষ জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-যন্ত্রণা এবং হতাশার শিকার। ব্যক্তিমানুষ মরণশীল। অভাব তাকে দগ্ধ করে, বেদনা তাকে কুরেকুরে খায়। নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতা সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে। এগুলো অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, মানুষের বেলায়ও তেমনি নিষ্ঠুর সত্য। নিষ্ঠুর সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়। মানুষ সম্পর্কে শেষ সত্য হলো — মানুষ সবকিছুকে অতিক্রম করার, সমস্ত জড়-জগতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার সংগ্রাম সে চালিয়ে যাবে।

মানুষ সবকিছুর সংজ্ঞা আবিষ্কার করে, কিন্তু সে সংজ্ঞার অতীত একটা সত্তা। মানুষের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে কৃৎকৌশল, মগজ থেকে বিজ্ঞান, অন্তর থেকে শিল্পকলা, দর্শন এবং ধর্ম। মানুষ ধর্মের কল্পনা করেছে, কিন্তু ধর্মের অনুশাসন যখন প্রাণের প্রকাশপথ রোধ করে দাঁড়ায় মানুষ তার বিরোধিতা করারও ক্ষমতা রাখে। ধর্মগ্রন্থের বাণীও তো মানুষের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে। মানবিক আবেগের চরমতম শিহরিত মুহূর্তটিতে মানুষ মনে করেছে একজন ঈশ্বর আছেন। যেহেতু মানুষ আপন চেতনার প্রতিরূপেই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, তাই ঈশ্বর আছেন। প্রাণ থেকে যার সৃষ্টি প্রাণই তো তাঁকে লালন করতে হয়। সুতরাং প্রাণে-প্রাণে তিনি লালিত হয়ে আসছেন।

My All Garbage

৩

বিজ্ঞান যেমন মানুষের ঊর্ধ্বে উড্ডীন চেতনার সৃষ্টি, ধর্মও তেমন। একইভাবে মানব মেধা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলা এবং দর্শন। এমিয়েল তাঁর জার্নালের এক জায়গায় লিখেছিলেন, "যেদিন মানুষ গোষ্ঠী-দেবতা, আঞ্চলিক দেবতার বদলে চরাচর ব্যাপী বিরাজমান অনন্ত শক্তির উৎস এক ঈশ্বরের নির্মল নাম ধারণায় গেঁথে নিতে পেরেছিলেন, মানুষের ইতিহাসে সেটি অত্যন্ত উজ্জ্বল দিন।" মানুষ নিজের সৃষ্টিশক্তির পরিধি নির্ণয় করার জন্য অনন্ত অসীম সমস্ত চরাচরের ওপর ক্ষমতাবান এক মহাসত্তার কল্পনা করতে পেরেছিল। এইখানেই মানুষের মহত্ত্ব, এইখানেই তার অনন্যত্ব। ছায়াপথের জগতের অনন্ত রহস্য থেকে শুরু করে সবুজ তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েমিশিয়ে সে অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারে। আবু সয়ীদ আইয়ুব বলতেন, 'আমি প্রচলিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মানুষের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী।'

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আলোচনাটা মারেকাত শাস্ত্রের পাশ ঘেঁষেঘেঁষে যাচ্ছে। যেহেতু মানুষ অনাদি অনন্ত নির্মল সর্বনাম এক ঈশ্বরের কথা কল্পনা করতে পারে, তাই এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। মনসুর ইবনে হাল্লাজ ভাবের আবেশে বলে উঠেছিলেন, যেহেতু আমি অনুধ্যানের ভেতরে চরম সত্যের রূপ ধারণ করতে পারি সুতরাং আমিই সে চরম সত্য — আনাল হক। মানুষের ধারণার বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং মানবজীবন সার্থক করতে গেলে সেই ঈশ্বরে অবিচল আস্থা রাখতে হবে। বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রাহীন অবস্থান। সেই ঈশ্বর সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই। যদি বিশ্বাস রাখতে পারি পরকালে স্বর্গলোকে আমার স্থান হবে এবং যদি না পারি নরকে অনন্তকাল ধরে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। ক্লান্তপ্রাণ মানুষের চিন্তা-চেতনার যে অংশ নিছক প্রাণ ধারণের গ্লানির ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, বিদ্যুতের অক্ষরে পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে বিরাজমান থাকে এবং যা মানুষের ইতিহাসকে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহমান রেখেছে, তাকেই মানুষের ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি।

আমার কাছে ঈশ্বর-চিন্তা আর মানুষের অমরতার চিন্তা সমার্থক। কেউ যদি আমাকে আস্তিক বলেন বিনা বাক্যে মেনে নেব। আমি আস্তিক। যদি কেউ বলেন নাস্তিক আপত্তি করব না। আস্তিক হোন, নাস্তিক হোন, ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি কোনো বিবাদের হেতু দেখতে পাইনে। আমার অভীষ্ট বিষয় মানুষ, শুধু মানুষ। মানুষই সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যচিন্তা, সমস্ত বিজ্ঞানবুদ্ধির উৎস। সবকিছুই উচ্ছ্রিত হয়েছে মানুষের ভেতর থেকে। ধর্ম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন যা-ই বলুন না কেন, মানুষের সৃষ্টিক্ষমতাই সবকিছুর জন্ম দিয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে যা কিছু বেরিয়ে এসেছে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন, গহনে ওগুলোর সবকিছুর মধ্যে একটা মিলনবিন্দু কোথায় যেন আছে। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সবকিছুর মধ্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে মানুষের মানুষী-চেতনা ছাড়া অন্য কোনকিছুর সন্ধান পাইনি। যে পিতামাতা আমাকে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা আমাকে-আপনাকে লালনপালন করেছেন, যে সমস্ত মানুষের সুখস্মৃতি আমি-আপনি ধারণ করে থাকি, আমি-আপনি যে সমস্ত মানুষকে জানি, যাদের জানি না — শুধু অস্তিত্ব অনুভব করি, আমি-আপনি যখন থাকব না, সেই সময়ে যে সমস্ত মানুষ-মানুষী প্রাণের কলরবে এই পৃথিবীকে ভরিয়ে রাখবে বলে ধরে নিয়েছি, সবকিছু মিলিয়ে অনন্তজীবী এক বিমূর্ত মানুষের স্মৃতি আমার চেতনায় আসন নিতে চায় এবং সেটাকেই আমরা ঈশ্বর মনে করি।

এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। নানা মানুষ নানা পদ্ধতিতে এ সকল কথা বয়ান করে গেছেন। যেহেতু আমার অনুভূতি থেকে এই সদ্যোজাত বাক্যগুলো বেরিয়ে এসেছে, তাই আমার কথা — এরকম একটা মোহ কখনো-কখনো আমাকে একটুখানি আড়ষ্ট করে রাখে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আলোচনাটা মারেফাত শাস্ত্রের পাশ ঘেঁষেঘেঁষে যাচ্ছে। যেহেতু মানুষ অনাদি অনন্ত নির্মল সর্বনাম এক ঈশ্বরের কথা কল্পনা করতে পারে, তাই এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। মনসুর ইবনে হাল্লাজ ভাবের আবেগে বলে উঠেছিলেন, যেহেতু আমি অনুধ্যানের ভেতরে চরম সত্যের রূপ ধারণ করতে পারি সুতরাং আমিই সে চরম সত্য — আনাল হক। মানুষের ধারণার বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং মানবজীবন সার্থক করতে গেলে সেই ঈশ্বরে অবিচল আস্থা রাখতে হবে। বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রাহীন অবস্থান। সেই ঈশ্বর সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই। যদি বিশ্বাস রাখতে পারি পরকালে স্বর্গলোকে আমার স্থান হবে এবং যদি না পারি নরকে অনন্তকাল ধরে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। ক্লান্তপ্রাণ মানুষের চিন্তা-চেতনার যে অংশ নিছক প্রাণ ধারণের গ্লানির ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, বিদ্যুতের অক্ষরে পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে বিরাজমান থাকে এবং যা মানুষের ইতিহাসকে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহমান রেখেছে, তাকেই মানুষের ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি।

আমার কাছে ঈশ্বর-চিন্তা আর মানুষের অমরতার চিন্তা সমার্থক। কেউ যদি আমাকে আস্তিক বলেন বিনা বাক্যে মেনে নেব। আমি আস্তিক। যদি কেউ বলেন নাস্তিক আপত্তি করব না। আস্তিক হোন, নাস্তিক হোন, ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি কোনো বিবাদের হেতু দেখতে পাইনে। আমার অভীষ্ট বিষয় মানুষ, শুধু মানুষ। মানুষই সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যচিন্তা, সমস্ত বিজ্ঞানবুদ্ধির উৎস। সবকিছুই উচ্ছ্রিত হয়েছে মানুষের ভেতর থেকে। ধর্ম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন যা-ই বলুন না কেন, মানুষের সৃষ্টিক্ষমতাই সবকিছুর জন্ম দিয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে যা কিছু বেরিয়ে এসেছে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন, গহনে ওগুলোর সবকিছুর মধ্যে একটা মিলনবিন্দু কোথায় যেন আছে। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সবকিছুর মধ্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে মানুষের মানুষী-চেতনা ছাড়া অন্য কোনকিছুর সন্ধান পাইনি। যে পিতামাতা আমাকে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা আমাকে-আপনাকে লালনপালন করেছেন, যে সমস্ত মানুষের সুখস্মৃতি আমি-আপনি ধারণ করে থাকি, আমি-আপনি যে সমস্ত মানুষকে জানি, যাদের জানি না — শুধু অস্তিত্ব অনুভব করি, আমি-আপনি যখন থাকব না, সেই সময়ে যে সমস্ত মানুষ-মানুষী প্রাণের কলরবে এই পৃথিবীকে ভরিয়ে রাখবে বলে ধরে নিয়েছি, সবকিছু মিলিয়ে অনন্তজীবী এক বিমূর্ত মানুষের স্মৃতি আমার চেতনায় আসন নিতে চায় এবং সেটাকেই আমরা ঈশ্বর মনে করি।

এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। নানা মানুষ নানা পদ্ধতিতে এ সকল কথা বয়ান করে গেছেন। যেহেতু আমার অনুভূতি থেকে এই সদ্যোজাত বাক্যগুলো বেরিয়ে এসেছে, তাই আমার কথা — এরকম একটা মোহ কখনো-কখনো আমাকে একটুখানি আড়ষ্ট করে রাখে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানুষের ভেতরে ঈশ্বর এ কথাটি উচ্চারণ করার সময়ে নাম না জানা লোককবির সে 'মানুষ ঈশ্বরঘেরা' পংক্তিটির কথা স্মরণে এলে মনের জোর অনেকখানি বাড়ে। আমার কত আগে গ্রামের নিভৃত কুটিরে রেড়ির তেলের পিদিমের স্বল্পালোকে আমার দেশের এক অখ্যাত কবির হৃদয়ে ঢেউ দিয়ে এই হীরের শিখার মতো পংক্তিটি জেগে উঠেছিল। সেই কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম।

৪

সমস্ত কিছুর উৎস মানুষ। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছু মানুষেরই সৃষ্টি। আমার তো মনে হয়, জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের সে বক্তব্যটির গুরুত্ব কোনদিন ফুরোবে না। তিনি বলেছিলেন, "মানুষের যাবতীয় সিদ্ধির উৎকর্ষ-অপকর্ষ মানবতার মূল ভূমিতেই নির্ণয় করে নিতে হবে।" মানুষ আকাশে উড়তে পারে, জলে ভাসতে পারে এবং আরো নানাবিধ ক্ষেত্রে শক্তি এবং ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। আকাশে তো পাখিও ওড়ে এবং জলে জলচর প্রাণীরা ভেসে থাকতে পারে। সুতরাং পাখি কিংবা জলচর প্রাণীর মতো শক্তি অর্জন করে মানুষের কী লাভ! মানুষের জৈবিক সংগঠনের ভেতরেই এমন একটা আশ্চর্য রহস্য নিবাস করে যা মানুষকে যুগ থেকে যুগান্তরে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ক্রমাগত নবনব পরিবর্তনের স্রোতে ধাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভেতরের এই আগুন, এই প্রমিথিয়ান ফায়ার এটাই মানুষের ঐশ্বরিক সত্তা। ব্যক্তি-মানুষের দুঃখ আছে, ক্লান্তি আছে, পরাজয় আছে, মৃত্যু আছে কিন্তু মানবজাতির দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই, পরাজয় নেই, মৃত্যু নেই। এই অদ্ভুতকর্মা মানুষ কোনদিন তার কীর্তির মধ্যে বাধা পড়ে না। মানুষের কীর্তি, তার বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি, সামাজিক সংগঠন যদি অন্তরের অভিসারী সত্তাকে আড়াল করে, তাকে অভ্যাসের মৌমাছিচক্রের পৌনঃপুনিকতায় নিমজ্জিত করে রাখে, ধরে নিতে হবে সেখানে মানুষের অধঃপতন ঘটে গেল, সেখানে মানুষের মানুষীসত্তা পরাজয়কে মেনে নিল।

বোধকরি ভগবান বুদ্ধ মানবসত্তার এই অনন্ত তৃষ্ণাকেই নির্বাণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, সমুদ্রের পানি যেমন লোনা তেমনি আমার এই সাধনা, তারও একটি স্বাদ আছে। সেটা হলো মুক্তির স্বাদ। মানুষ সমগ্রের সৃষ্টি এবং সমগ্রের মধ্যে যদি লীন হতে না পারে, তাহলে তার মুক্তি হলো না।

৫

সভ্যতার স্পর্শবর্জিত আদিম উপজাতি থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক জীবনোপকরণ এবং প্রযুক্তির অধিকারী মানব সমাজ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বোধ এবং উপলব্ধি অনুসারে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে যুক্ত করে তার জীবন-ভাবনা নির্মাণ করে। কেউ খণ্ডিত একা এবং বিচ্ছিন্ন থাকতে চায় না। মানুষকে যা কিছু অনন্তের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা মানুষের মহত্ব এবং অনন্যত্বকে খর্ব করে, খাটো করে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানুষ ধর্মের আবিষ্কার করে অনন্তের মধ্যে তার অবস্থানের একটা সামঞ্জস্য নির্মাণ করেছে। যখন ধর্ম অনন্তের উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে। এক বিশ্বাস বর্জন করে অন্য বিশ্বাসকে বরণ করে নিয়েছে। ধর্ম-বিশ্বাস হোক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংগঠন হোক, যেদিক থেকেই নৈতিক বন্ধন তার চলমানতার পথে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ করার অধিকার, গতানুগতিকতাকে মেনে না নেবার অধিকারই মানুষের চলার পথে সব চাইতে বড় পাথেয়।

৬

মানুষ আশ্চর্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ সৃষ্টি করতে পারে এবং সেগুলোকে স্থায়িত্ব এবং প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর নীতিমালা এবং কেজো আচরণবিধির জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তারও চাইতে বড় কথা হলো, মানুষ এক সময়ের নির্মিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহ ভেঙে ফেলে ভিন্নরকম সামাজিক সংগঠনের কথা চিন্তা করতে পারে, জন্ম দিতে পারে এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য ভিন্ন ধরনের নীতিমালা এবং আচরণবিধির সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ আশ্চর্য সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলোর উপযোগিতা অস্বীকার করে অধিকতর উদ্দেশ্যানুগ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারে। চিন্তা-ভাবনা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের মহত্ত্ব তারও চাইতে অধিক। মানুষের কীর্তির চেয়ে মানুষ মহৎ।

মানুষ বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, স্বীকার করে, প্রয়োজনে ঈশ্বর সৃষ্টি করে, সৃষ্ট ঈশ্বরের নির্বাসন দিতে পারে। মানুষের ঈশ্বরচেতনা বস্তুত অনন্তের পথে মানুষের আত্মোপলব্ধির একটা পর্যায় মাত্র। মানুষ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েমিশিয়ে চিন্তা করেছে এবং এই ফাঁকে এক লোকোত্তর ঈশ্বর তার চেতনায় অধিষ্ঠান নিয়ে বসেছেন। মানুষ নিজেকে যতদূর জেনেছে, তারও চাইতে বেশিদূর জানতে পারেনি। মানুষ সৃষ্টি-জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারও চাইতে বেশি অজ্ঞ নিজের বিষয়ে। এই অজ্ঞতার অবসান যেদিন হবে বোধকরি সেদিন মানুষের আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না।

মানুষ সৃষ্টিজগৎ সম্বন্ধে শেষকথা যেমন বলতে পারে না, তেমনি নিজের সম্বন্ধে শেষকথা বলারও তার অধিকার নেই। সুতরাং একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। তিনি ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। ইতিহাসে অনেক সময়েই দেখা গেছে মানুষেরই কল্পনাপ্রসূত নানা জিনিস ঈশ্বরের স্থান দখল করেছে, আর মানুষ মহা উৎসাহে সেগুলোকে মান্য করতে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্য এই মানুষ!

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বুদ্ধদেবের কথায় ফিরে যাই। তিনি মানুষের বাইরে অন্য সত্তার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'ওহে মানুষ, তোমার অস্তিত্বের বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই; তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও।' কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যেরা তাকে ভগবানের আসনে বসিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। মানুষের চেতনার এমনই একটা ধরন সে ক্রমাগত ঈশ্বর সৃষ্টি করছে এবং ঈশ্বর ধ্বংস করছে।

মানুষের বাইরে অন্য কোনো ঈশ্বর আছেন কিনা, তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু মজার কথা হলো এই ঈশ্বরকে মানুষ কল্পনায় ধারণ করেছে এবং মানুষের কল্পনার মধ্যে এই ধারণাটা চারিয়ে দিয়ে গেছে। মানুষ যেরকম তার হাত-পা এবং অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাদ দিতে পারছে না সেরকম ঈশ্বরের ধারণা ত্যাগ করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের বিকল্প যা কিছু আবিষ্কার করুক না কেন তার মধ্যে ঈশ্বরীয় মহিমা তাকে আরোপ করতে হয়। ঈশ্বর যেমন দুর্জ্ঞেয় তেমনি মানুষ দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এটা মেনে নিতে পারলে সমস্যাটা মিটে যেত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে এবং সেখানেই ভর করেছে সমস্ত জটিলতা। ঈশ্বরের কথা না হয় নাই বা ভাবলাম। কিন্তু মানুষ কি? কোনদিন কি জবাব পাওয়া যাবে?

১৯৮৯

আহমদ ছফার প্রবন্ধ
(২০০০)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

লালন ফকির : হিন্দু কি যবন

গহন পরিচয় উদঘাটন করার ক্ষমতা নেই। লালন ফকিরের যে পরিচয় সকলে জানেন সেটা আবার নতুন করে উল্লেখ করছি। লালনের সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী চালু আছে। লালন জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে পরিবারটি তীর্থ করতে যাওয়ার পথে ছোট বাচ্চাটি কলেরা বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। সে অবস্থাতেই বাচ্চাটিকে নদীর পাড়ে রেখে পরিবারটি পালিয়ে আত্মরক্ষা করে কিংবা মারাত্মক প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে মারা পড়ে, সঠিকভাবে জানা যায়নি। এই অরক্ষিত শিশুটিকে এক মুসলমান জোলা মহিলা বাড়িতে নিয়ে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। এবং লালন নামটি তাঁরই দেওয়া। লালন বড় হয়ে পালকি-বেহারার কাজ করতে থাকেন। লালন যাঁকে বারবার তাঁর শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেই সিরাজ শাঁইও ছিলেন একজন পালকি বাহক।

এখানে একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। তিনি ভারতের নির্যাতিত সম্প্রদায়সমূহ থেকে যে সকল বিশাল বিশাল মানুষের উত্থান ঘটেছে, তাঁদের কারো কারো ওপর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সন্ত কবীরের ওপর তিনি অত্যন্ত খেটেখুটে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। কবীরের অনেকগুলো দোহার তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে কবীরের ১০০টি দোহার ইংরেজী অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। চর্মকার সম্প্রদায় থেকে আগত দাদুর ওপরও ক্ষিতিমোহন সেন একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। (আমার স্মৃতি যদি আমাকে প্রতারণা না করে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন। এই 'দাদু' গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন বাবু একটা মজার জিনিস খুঁজে বের করেছেন। ক্ষিতিবাবু দেখিয়েছেন দাদুর আসল নাম ছিল 'দাউদ'। দাউদ নামটি মুসলমান-মুসলমান শোনায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পাল্টে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দাদু'। লালন এবং কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যে কাহিনীটা চালু আছে দাদুর বেলায়ও অনুরূপ একটা কাহিনী ব্রাহ্মণরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। দাদু

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ব্রাহ্মণ সন্তান। চর্মকার পিতামাতার ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর 'দাদু' গ্রন্থে একটা বিষয় খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যখন জ্ঞান এবং মনীষার বলে চারপাশ আলোকিত করেন, উঁচুবর্গের লোকেরা অত্যন্ত সুকৌশলে নিম্নবর্গের মানুষদের থেকে উত্থিত মহাপুরুষদের নিজেদের সম্প্রদায়ের পাটাতনের ভেতরে ছিনতাই করে নিয়ে যান। ভারতের নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে এমন সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের উদ্ভব ঘটেছে, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার অলোকসামান্যতা এবং জ্ঞানের গভীরতায় তাঁদের বেদ-উপনিষদের ঋষিদের চেয়ে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সকল নির্যাতিত সম্প্রদায় তাঁদের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, তারা এই মহামানবদের নিজেদের মানুষ বলে অনেকদিন পর্যন্ত দাবী করতে পারেনি। উঁচুবর্গের লোকেরা তাঁদের নাম-পরিচয় ঠিকুজি-কুলজি সব পাল্টে ফেলেছেন। লালনকে হিন্দুরা যেমন দাবী করে হিন্দু, মুসলমানরা মনে করে তিনি ছিলেন তাদের স্বজাতিভুক্ত। এখনো পর্যন্ত এ বিতর্কের কোনো সমাধান হয়নি — লালন ফকির 'হিন্দু' কি 'যবন'?

লালন ফকির অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মানুষ। তিনি কোথায় জন্মেছিলেন জানা না গেলেও কুষ্টিয়া ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। অবিভক্ত বাঙলায় কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার একটি মহকুমা হিসেবে পরিচিত ছিল। নদীয়া ছিল এক সময়ের বাঙলার সাংস্কৃতিক রাজধানী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মেছিলেন এই নদীয়ায়। চৈতন্যদেব কলম দিয়ে একটি বাক্য না লিখেও সারা বাঙলায় একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। গোটা নদীয়া (কুষ্টিয়াসহ) অঞ্চলটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জায়গা। ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতিচিন্তা এখানে তরঙ্গের মতো উঠেছে এবং আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী এলাকায় বাস করতেন 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক মীর মশাররফ হোসেন। 'গ্রামবার্তা' প্রকাশক এবং সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ কুষ্টিয়াতেই বাস করতেন। তিনি মীর মশাররফ এবং লালন উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে মীর মশাররফও কিছু গান লিখেছিলেন। আর কাঙাল হরিনাথ ছিলেন অত্যন্ত নমস্য ব্যক্তি। তিনি তাঁর 'গ্রামবার্তা' পত্রিকায় স্থানীয় জমিদাররা কৃষক প্রজাদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালাতেন সেগুলো তুলে ধরতেন এবং প্রজা সাধারণকে এই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণিত করতে চেষ্টা করতেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারী ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের আমলে বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য নানারকম পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। একবার ঠাকুরবাড়ীর কাচারী থেকে পাইকদের পাঠানো হয়েছিল 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক কাঙাল হরিনাথকে ধরে আনার জন্য। এই সংবাদ লালনের কাছে যায়। লালন যখন জানতে পারলেন তাঁর বন্ধুকে ধরে নেওয়ার জন্য ঠাকুর মশাইদের কাচারী থেকে পাইক পাঠানো হয়েছে, তিনি তাঁর শিষ্যদের অনুরোধ করলেন এই

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পাইক-পেয়াদাদের যেন পিটিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। লালন সম্পর্কে এ ধরনের অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে যাওয়া-আসা করতেন, তখনও লালন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। অবশ্য এ কথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে লালনের কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালনকে বাঙলার শিক্ষিত লোকদের সামনে তুলে ধরেন। লালনের যে প্রতিকৃতি এখন সব জায়গায় ছাপা হয় সেটা এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি মন থেকে ছবিটি এঁকেছিলেন নাকি লালনের হুবহু প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন, জানার উপায় নেই।

লালনের সময়ের বিষয়ে আরো কিছু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন। যশোর অঞ্চলে জমিরুদ্দীন নামক এক মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে পাদ্রী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি লোকজনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নানারকম উদ্যোগ-আয়োজন করতে থাকেন। সমাজে তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পাদ্রী জমিরুদ্দীনের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টিত ছিলেন এবং একটা সময়ে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার বন্ধ করতে হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র অনুসারীরা পাদ্রী জমিরুদ্দীনের বিরুদ্ধে যেমন খড়্গহস্ত হয়ে মাঠে নেমেছিলেন, একইভাবে বাউলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। অবশ্য এই প্রয়াসের সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ কিংবা তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গীসাথীরা কতদূর যুক্ত ছিলেন সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত আলেমদের একটা অংশ একাট্টা হয়ে বাউল-দমন ফতোয়া জারি করেছিলেন। তার ফলে অনেক সহিংস ঘটনাও ঘটে। গোঁড়া আলেমরা বাউলদেরকে লা-শরা-সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বাউলরাও তাঁদের মতবাদ এবং তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করার জন্য সভা-সমিতির আয়োজন করতেন। মাঝে মাঝে বাহাসের অনুষ্ঠানও করা হত। খুব সম্ভবত ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লালন যে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার পেছনের কারণ ছিল সুন্নী-আলেমদের মারমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি নির্মাণ করার তাগিদ।

২

বেশ কিছুদিন থেকে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই একটা জিনিস প্রমাণ করতে চান, বাউলতত্ত্ব একমাত্র বাংলাদেশেরই একান্ত আপন গহন, আধ্যাত্মিক সম্পদ। এই মনোভাবের মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। বাউলরা যে ধরনের তত্ত্ব এবং মতবাদে বিশ্বাস করেন সারা ভারতে এ ধরনের মতবাদ এবং তত্ত্বের অনুসারী আরো নানা সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী রয়েছে। আমার ধারণা বাউলতত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধ-

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দর্শনের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। এদেশে বৌদ্ধধর্ম যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো, সেই আপৎকালীন সময়টিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ নিজেদের আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য নানারকম ছদ্মবেশে আশ্রয় নিতে থাকেন। বাঙলা অঞ্চলে নাথপন্থী সাধকেরা যে সাধনপদ্ধতি চালু করেছিলেন এবং তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রভাব অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাউলদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নাথপন্থী সাধকদের চিন্তাভাবনার আশ্চর্য একটা সাযুজ্য বর্তমান। বাঙলার নাথপন্থীদের মতো ভারতের আরো নানা অঞ্চলে নিম্নবর্গের নানা পেশা এবং বৃত্তির লোকদের মধ্যে ছদ্মবেশী বৌদ্ধ মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বেনারসের সন্ত কবীর ছিলেন পেশায় লালনের মতো একজন জোলা। তিনি হিন্দু-মুসলমান এ দুই প্রবল সম্প্রদায়ের বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাবের কোনো এক পক্ষকে সমর্থন না করে সম্পূর্ণ একটি নতুন পথ কাটার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কবীর যে দোহাগুলো রচনা করে গেছেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, লালনের অনেকগুলো গান আক্ষরিক অর্থে সেই দোহাগুলো থেকে উঠে এসেছে। এরকম গানের সংখ্যা একটা-দুটো নয়, একশোরও বেশি। এই বিপুলসংখ্যক গানের কোনরকমের শব্দ কিংবা অর্থবিকৃতি ব্যতিরেকে লালনের রচনায় উঠে আসার পেছনে একটি কারণই বর্তমান। তা হলো এই যে, বাউল-সাধনার ধারাটি সমগ্র ভারতে প্রবাহমান ছিল। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের একটি গানে এরকম উল্লেখ আছে —

আমি লালনের সিঁড়ি
ভাইবন্ধু নাই আমার জুড়ি।

আরো একটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তন্তুজীবী সমাজের সঙ্গে বাউলদের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। তন্তুজীবী সম্প্রদায়ের পেশা হচ্ছে বস্ত্র বয়ন করা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা বস্ত্র বয়ন করেন তাদেরকে তাঁতি বলা হয়। নামের শেষে নাথ কিংবা দেবনাথ পদবী তাঁরা ব্যবহার করেন। এই তাঁতিরা গোড়ার দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হত না। তাদের আহার-বিহার, পূজা-অর্চনা এবং সামাজিক আচার-বিচারের ধরনও হিন্দু সমাজের চাইতে আলাদা। এই অল্প কিছুদিন আগেও নাথ বা যুগীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হিন্দুদের চাইতে ভিন্নভাবে সম্পন্ন হত।

সাধারণত হিন্দুরা দাহ করার মধ্য দিয়ে মৃতদেহের সংকার করে। নাথ বা যুগীরা তাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। অবশ্য এই সমাধিস্থ করার প্রক্রিয়াটি মুসলমানদের কবর দেয়ার অনুরূপ নয়। অতি সাম্প্রতিককালে নাথ সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী ভেদরেখাগুলো অনেকটা মুছে যাওয়ার উপক্রম। সে যা হোক, এই ভূখণ্ডে ইসলামের আগমনের পর ব্যাপকভাবে যুগীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধর্মান্তরিত নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা জোলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ধর্মের পরিবর্তনের কারণে তাদের পেশার পরিবর্তনের কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এটা শুধুমাত্র বাঙলার ব্যাপার নয়। বাঙলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। লালন বোধকরি সবচাইতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্ত কবীরের দৃষ্টান্তে। এই রচনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে লালনের অনেকগুলো গানই কবীরের দোহাগুলোতে যে ধরনের অনুভূতি এবং ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে অবিকল তারই প্রতিধ্বনি। কবীর জন্মেছিলেন কাশীর কাছাকাছি কোনো একটি গ্রামে এবং পেশায় ছিলেন একজন তন্তুবায়।

এ পর্যন্ত এমন কোনো সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা আমার চোখে পড়েনি যেখানে পেশাগত ভূমিকা উল্লেখ করে বাউলদের সাধনার প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকরা যদি এদিকটাতে দৃষ্টি দেন আমার বিশ্বাস বাউল-সাধনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলা সম্ভব হবে। বাউলদের সঙ্গে পেশাগতভাবে তাঁতি সম্প্রদায়ের একটি নিকট-সম্পর্ক রয়েছে এবং বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে একটা দূরবর্তী অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অদ্যাবধি বাউল-সাধকরা রক্ষা করে যাচ্ছেন। বাউলদের চিন্তা- চেতনা কম্পাসের কাঁটার মতো সবসময়ে শূন্যবাদের দিকে হেলে থাকে। এ জগৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, শূন্যের মধ্যে মিলিয়ে যাবে — এ পরমশূন্যতা একেই বাউলতাত্ত্বিকরা কখনো পরম শাঁই, নিরঞ্জন এ সকল নামে অভিহিত করেছেন। দার্শনিকভাবে বাউলতত্ত্বের মধ্যে গতিশীল সত্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সামাজিকভাবে বাউলতত্ত্ব হলো পরাজিত মানুষদের দর্শন। একটা বিরাট সংখ্যক মানবগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত হয়েছে, তথাপি পরম অনুরাগে সে বিশ্বাসটি আঁকড়ে থাকার অনমনীয় সংকল্প তাঁরা সবসময় প্রদর্শন করেছেন। সামাজিক একক হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রভাবশালী সমাজ-প্রপঞ্চসমূহের সঙ্গে কখনো আপোস করেছে, কখনো তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজেদের বিশ্বাস এবং আস্থার স্থিরবিন্দুটি কখনো নিঃসৃত হয়নি।

লালনের পূর্বে বাউল ছিল, পরেও বাউল ছিল। কেননা বাউল-সাধনা এই অঞ্চলের পরিব্যাপ্ত একটি আধ্যাত্মিক সম্পদ। বাউলরা তাঁদের গানে যে সমস্ত কথা বলে থাকেন সেগুলোর দু'রকম মানে হয়। সাধারণ মানুষ বাউলদের গান থেকে এক ধরনের অর্থ আবিষ্কার করে, কিন্তু বাউলরা নিজেরা নিজেদের মতো করে এ গানগুলোকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বাউলদের নিজস্ব একটি পরিভাষা রয়েছে, যার অর্থ পূর্ব থেকে জানা না থাকলে অন্য কারো পক্ষে উদঘাটন করা সম্ভব নয়। যেমন লালনের গানে বাঁকা নদী, সুখ-সরোবর, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, চাঁদ ইত্যাদি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে নরনারীর, বিশেষ করে নারীর শরীরতত্ত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল বিষয় নিয়ে লালনের পূর্বের বাউলরা অনেক গান লিখেছেন। লালনের পরবর্তী বাউলরাও লিখেছেন। অদ্যাবধি এ প্রক্রিয়া সমানে সক্রিয় রয়েছে। এ রচনায় লালন ফকির এবং তাঁর মতবাদ সম্পর্কে সব কথা গুছিয়ে বলা সম্ভব হয়নি। অনেক বক্তব্য অপরিস্ফুট এবং অবগুণ্ঠিত থেকে গিয়েছে। ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানসমূহ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

যথাযথ প্রয়োগ করলে লালন সম্পর্কে কতিপয় যুৎসই মন্তব্য করা হয়তো সম্ভব হত কিন্তু বুকপিঠ দুই দিকেই প্রচণ্ড চাপ নিয়ে এ ধরনের একটি রচনা লেখার চেষ্টা অনেক কিছুকেই গুলিয়ে ফেলে, অনেক সময় কলমের মুখে সঠিক বক্তব্যটি উঠে আসতে চায় না। এসব সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও লালন সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। লালন ফকির বাউল ছিলেন, এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু লালন একজন বাউলের চেয়েও অধিক কিছু ছিলেন এবং লালন কি কারণে অন্য বাউলদের চাইতে আলাদা – সে বিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম কথা হলো লালন ছিলেন একজন জাগ্রত প্রতিভা। জগৎ এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার একটি সাহসী দৃষ্টিভঙ্গী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। যখনই মানবিক সমস্যা-সংকটসমূহ তাঁর চিন্তা-কল্পনার উপজীব্য হয়েছে সেগুলো আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠতে পেরেছে। লালন ছিলেন শক্তিমান কবিসত্তার অধিকারী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। তাঁর কাব্যবোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। উপমা-অলঙ্কার তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন। সহজভাবে সহজ কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর অধিকার ছিল। আধুনিক যে সকল জীবন-জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীর সময় থেকে বাঙলায় প্রসারলাভ করেছিল কুষ্টিয়ার এ পালকিবাহক ভদ্রলোকটি সেগুলো সম্পর্কে অপরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। জ্ঞান এবং কবিসত্তার সম্মিলন লালনকে এমন একটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছে, হিসেব করলে দেখা যাবে বাঙলার সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাধকদের মধ্যে লালনের একখানি আসন প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে দেখলে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে লালনের একটা তুলনা চলে। দুজনে একই সময়ের মানুষ। লালন এবং রামকৃষ্ণের যখন আগমন ঘটেছে সে সময়ে বাঙলা দেশ নবযুগে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে গেছেন। নতুন যুগের মর্মবাণী একেবারে সাদামাটা গ্রাম্য বামুন রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে, একথা লালনের বেলায়ও খাটে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে লালনের পার্থক্যের বিষয়টিও লক্ষ্য করার মতো। রামকৃষ্ণ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর মানুষ, ব্রাহ্মণ। তাঁর সাধনার স্থলটি ছিল কলকাতার উপকণ্ঠে। বিবেকানন্দের মতো গনগনে উত্তপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণেরা দর্শন-জিজ্ঞাসা তাড়িত হয়ে রামকৃষ্ণের চারপাশে এসে ভিড় করেছিলেন। লালন ছিলেন কুষ্টিয়ার গণ্ডগ্রামের মানুষ। গ্রামের সীমানা ডিঙ্গানো লালনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু লালন নয়, লালনের দীক্ষাগুরু সিরাজ শাঁইজীকেও অনেকদিন পর্যন্ত পালকী-বেহারার শ্রমসাধ্য জীবন কাটাতে হয়েছে। এই পরিবেশে বাস করেও প্রগাঢ় মনীষার অধিকারী হয়ে যশোরের নিজস্ব ভাষারীতিটি অনুসরণ করে হৃদয়ের যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছেন সেটা বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা বটে। এটাও সত্য বৈষ্ণব-সাধকদের মধ্যে একটা মননসমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। চণ্ডীদাস লিখেছিলেন 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এবার লালনের একটা গানের দুটো পংক্তি উদ্ধৃত করি :

'মিয়া ভাই কী কথা শুনাইলেন ভারী।
হবে না-কি কেয়ামতে আযাব ভারী
নর-নারী ভেস্ত মাঝার
পাবে কি সমান অধিকার
নরে পাবে হুরের বহর
বদলা কি তার পাবে নারী?'

এই পংক্তিগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লালন যখন লিখেছিলেন সেই সময়ে এই বেবাক বাঙলা মুলুকে কেউ নারীবাদের কথা উচ্চারণ করেনি। কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পয়সা নিয়ে লালনকে এই পংক্তিগুলো লিখতে হয়নি। চণ্ডীদাস এবং লালন উভয়েই মানবতাবাদী। কিন্তু চণ্ডীদাসের তুলনায় লালনের মানবতাবাদ অনেক বেশী বিশিষ্ট এবং কংক্রিট। চণ্ডীদাসে মানুষ এসেছে একটা আইডিয়া হিসেবে। মানুষের মধ্যে যে লিঙ্গভেদ রয়েছে সে জিনিসটি চিন্তা করার অবকাশ চণ্ডীদাসের হয়নি। তবে একথাও সত্য, চণ্ডীদাস অনেক আগের জমানার মানুষ। লালন ফকির নারী-অধিকার সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থকে চ্যালেঞ্জ করে কথা বলার যে ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারটি সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। এ রচনাটি প্রায় শেষ করে এনেছি। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকরা লালন ফকিরকে যে দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তার মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ বা অনুরাগের ঘাটতি আছে, আমার তেমন মনে হয় না। কিন্তু তাঁকে একজন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মহান স্রষ্টা হিসেবে দেখার, বিচার করার মনোভাবটি অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। আমরা লালনের সৃষ্টিকর্মকে লোকসাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে বিচার করতে, দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তার ফলে আমরা যখন লালনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সম্মান জানাই, তাতেও আমরা যে লালনের ওপর অবিচার করছি, সেটা নিজেরাই বুঝতে পারিনে।

একটা বেদনার কথা বলব। লালনের অবদান বিচার করার বেলায়ও আমাদের দেশের পণ্ডিতদের একটা শ্রেণীদৃষ্টির উৎকট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লালন একজন মহান সাধক, চিন্তা-ভাবনায় অগ্রসর এবং আলোকিত মানুষ। স্বভাবতই শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ দাবী করার যোগ্য। কিন্তু আমাদের একাডেমিক পরিমণ্ডলে লালনের এই মহত্ত্ব এবং উচ্চতা কি যথাযথভাবে বিচার করা হয়? সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মানুষের সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি আমরা কি লালনের সৃষ্টিকর্মের তুলনা করে থাকি?

২০০০

উপলক্ষের লেখা
(২০০১)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অমৃতভাণ্ড মাইজভাণ্ডার

মাইজভাণ্ডারের মহাপুরুষদের সাধনার প্রকৃতি এবং ধারাক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার সীমিত। এই রচনায় আমি যা বলব, সবগুলো বাইরের কথা। আধ্যাত্মিক সাধনার এই বিশেষ তরিকাটি বিকশিত হয়ে ওঠার ফলে ইসলাম ধর্মের নতুন একটি ব্যাখ্যা সুষ্ঠুরূপ ধারণ করেছে। মাইজভাণ্ডার ছাড়াও আরো অনেক সাধু-পুরুষ ইসলামের সেবায় তাঁদের মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এই বাঙলা মুলুকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে রাজানুগ্রহের চেয়ে আউলিয়া-দরবেশদের প্রচারের ভূমিকা যে অনেক বেশি সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই অঞ্চলে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে যে সকল ইসলাম-প্রচারক ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের কর্মপদ্ধতি একরকম নয়। কেউ কেউ জেহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন। কেউ মানবিক সাম্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বর্ণবাদী হিন্দু-সমাজের নিষ্পেষিত অংশের মধ্যে মানবিক মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোনো কোনো সাধক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মানবপ্রেম বিতরণ করার মধ্য দিয়ে ইসলামের সেবা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মাইজভাণ্ডার তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা শাহ্ সুফী আহমদ উল্লাহর জন্ম ১৮২৬ সালে এবং তিনি লেখাপড়া করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি যশোরে কাজীর চাকরী করেছেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তীকালীন সময়টির কথা বিবেচনায় আনলে একথা মেনে নিতে হবে, তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের মানুষ। সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, তিনি সুফীপন্থী সাধক ছিলেন। বাঙলা দেশে যে সময় থেকে সুফীদের আগমন ঘটতে থাকে, তাঁদের বিশ্বাস এবং আকিদার মর্মবস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও একেক ঘরানা এবং যুগের সাধকদের সাধনার ধারা — রস-রূপ এবং রঙ একরকম নয়।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হযরত মাওলানা শাহ সুফী আহমদ উল্লাহ সাধনার যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার কতিপয় প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। মাওলানা সাহেব ইসলামের হুকুম-আহকাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও মানবমুক্তির এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করেছেন, যেখানে ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ এবং সংঘাতের বদলে অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রশ্নটি অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ সাহেবের ধর্ম-সাধনার প্রকৃতিটি কি রকম ছিল একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে সে বিষয়ে একটা ধারণা গঠন করা সহজ হবে। একবার ধনঞ্জয় বড়ুয়া নামধেয় একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আসেন মাওলানা সাহেবের কাছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা বলেন। মাওলানা সাহেব জবাবে জানান, 'তুমি তোমার ধর্মে থেকে যাও, আমি তোমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলাম।'

ইসলামের যে মর্মশাঁস তার বিস্তার-সাধন আর আক্ষরিক অর্থে টুপিধারী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এক জিনিস নয়। এটাই হজরত মাওলানা আহমদউল্লাহর ধর্মসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি।

'লাকুম দিনুকুম ওলয়াদিন' অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনরকম জোর-জবরদস্তি নেই। সুফী-সাধকেরা কোরানের এই শিক্ষাটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাদের প্রায় সকলেই অহিংস পদ্ধতিতে প্রচারকাজ চালিয়ে গেছেন।

আজমিরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহেকে বলা হয়ে থাকে হিন্দুস্থানের পয়গম্বর। কারণ তাঁর কাছ থেকেই প্রথম হিন্দুস্থানের মানুষ ইসলামের পাঠ গ্রহণ করেছে। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন : 'তোমরা গাছের মতো ছায়া দেবে, বহতা নদীর মতো করুণা বিলিয়ে যাবে।' এখনো পর্যন্ত তাঁর তিরোধান-দিবসে যে ওরশ হয়, তাতে আমিষ জাতীয় কোনো খাদ্যদ্রব্য রান্না করা হয় না। নিশ্চয়ই খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি লক্ষ্য করেছিলেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে আমিষ বর্জন করে এই বিরোধের একটা সমাধান তিনি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, 'খাদ্যাভ্যাস' এবং 'ধর্ম' এক বস্তু নয়। মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে এই বিষয়টি যেন প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়। সেই কারণে তার স্মরণোৎসবে সব ধরনের আমিষ বর্জন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে, তথাপি একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। এই পর্যন্ত এই উপমহাদেশে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা রয়েছে তার শতকরা আশিভাগ দুটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘটেছে। একটি হলো গরু জবাই এবং অন্যটি মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো। এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে অবশ্যই ধরা পড়ার কথা হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক সময়ে হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ) ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম এবং খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ভেদরেখাটি কি রকম স্পষ্ট করে নির্ণয়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কথায় কথা টেনে আনে। এখানে আমার একটি উপলব্ধির কথা সসংকোচে প্রকাশ করতে চাই। সসংকোচে বললাম, কারণ কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বা প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইনি। শুধু মরহুম হুমায়ুন কবির একবার নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধসমূহের ভূমিকা লিখতে যেয়ে ভারতীয় উদারনৈতিক ধর্মসাধনার ইতিহাসে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির যে একটি অনন্য ভূমিকা আছে সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। আমার বিচারে ভগবান বুদ্ধের পরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ) হলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা এবং কর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভারতীয় ধর্মসমূহের ওপর এতদূর ক্রিয়াশীল হয়েছে যে, কবীর, নানক, দাদু, তুকারাম, সাইদাস, রায়দাস থেকে শুরু করে শ্রী চৈতন্য পর্যন্ত তাবৎ সাধকদের মধ্যে খাজা মঈনুদ্দীনের সাধনার সম্প্রসারিত রূপ অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা যায়।

মাইজভাণ্ডারের মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ যে সাধন-পদ্ধতিটি প্রবর্তন করেছিলেন, মর্মবস্তুর দিক দিয়ে সেটা হজরত মঈনুদ্দীন চিশতির পন্থাটির চেয়ে ভিন্ন নয়। তথাপি সময় এবং পরিস্থিতির বিচারে মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বাদ-রঙ এবং রস একটু আলাদা একথা বলা বোধকরি অন্যায় হবে না। সুফী-সাধকের সাধনার প্রকাশরূপের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ বর্তমান সে কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না। বাইরের দিক দিয়ে দেখলে মাওলানা মঈনুদ্দীন চিশতি এবং মাওলানা আহমদ উল্লাহর সাধন-পদ্ধতির আঙ্গিকের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য অনায়াসে লক্ষ্য করা যাবে। তথাপি দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সুফী-সাধকদের সাধনার রঙ এবং দাহিকা-শক্তি একরকম নয়। মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ হজরত মঈনুদ্দীন চিশতির সাধনপন্থার সঙ্গে হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর সাধনপন্থার একটি সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। এ দু'তরিকার সম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছে মাইজভাণ্ডারী তরিকা। কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশে বন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া এই চার প্রধান তরিকার কথা প্রায়শ বলা হয়ে থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তরিকার সংখ্যা অসংখ্য। তরিকা শব্দের সহজ অর্থ হলো 'পথ'। প্রতিজন সাধকের আলাদা একটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ-প্রকাশের আলাদা একেকটি পন্থাও রয়েছে।

মাইজভাণ্ডারের সাধন-পদ্ধতির গভীরতা এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কোনো গাঢ় অনুভবের কথা উচ্চারণ করার ক্ষমতা এবং অধিকার এই নিবন্ধ লেখকের থাকার কথা নয়। মধুর স্বাদ মিষ্টি এই ধারণা যেমন মধু খেয়ে দেখে অর্জন করতে হয় তেমনি অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে ডুবে গিয়েই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। সাধনার নিরঞ্জন স্বরূপ সম্বন্ধে বাইরের মানুষের কথা বলা অসম্ভব। মাইজভাণ্ডারের অধ্যাত্ম-সাধনার বিশেষ ধারাটি সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে কি বিশেষ অবদান রেখেছে বড়জোর সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলা যেতে পারে।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হজরত মাওলানা আহমদ উল্লাহর সাধনার ধারা তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী কয়েক পুরুষ-পরম্পরা অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল একদল সাধক-পুরুষের জন্ম সম্ভব করে তুলেছে মাইজভাণ্ডার। তাঁরা নিজ নিজ সাধন ক্ষেত্রে সকলেই অনন্য এবং অধ্যাত্মজগতে এক-একটি মর্যাদার আসন অধিকার করে আছেন।

হজরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ হলেন মাইজভাণ্ডারের উচ্চতম মহিমাশিখর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত মাওলানা গোলাম রহমানের স্থানও সাধক হিসেবে অনেক উঁচুতে। হজরত দেলোয়ার হোসেন এবং জিয়াউল হোসেন এই সকল ব্যক্তিত্ব মাইজভাণ্ডারী সিলসিলায় পূর্বপুরুষের পবিত্রতার নিষ্ক্রিয় অনুগ্রহভোগী ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। সাধন-মার্গের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে নিজ নিজ আলোক বিচ্ছুরিত করে গেছেন তাঁরা সকলে। ব্যক্তিগত পবিত্রতার ক্ষেত্রেও তাঁরা সকলেই একেকটি গৌরবময় আসনের দাবীদার।

কয়েক পুরুষ ধরে মাইজভাণ্ডারের সাধকেরা, সারাদেশে ছড়ানো তাঁদের খলিফাবৃন্দ অখণ্ড অনুরাগে এমন একটি সাধনপন্থার মাধ্যমে জগৎ-জীবনের অর্থ সন্ধান করেছেন, তার মর্মবেগ, তার চিত্তদোলা আমাদের দেশের জনগণের মনে এক অচিন্তিতপূর্ব অধ্যাত্ম জাগরণের সূচনা করেছে।

সাধনার এই ধারাটি অদ্যাবধি সজীব এবং সক্রিয়। যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার গতিবেগ তীব্রতা হারাতে বসেনি। অন্তত কোটিখানেক মানুষের অন্তরে মাইজভাণ্ডার ভক্তিসাধনার হিতাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পুরুষানুক্রমিক অধ্যাত্ম-সাধনার একটি নঞর্থক দিকের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। পীর নামধারী ব্যক্তিরা সকলেই সমান পবিত্র অগ্নির ধারক হতে পারেন না। অনেক সময়েই দেখা যায় একেকজন অলোকসামান্য সাধকের সাধনাকে মূলধন করে তার আপোগণ্ড অলস উত্তরাধিকারীর দল পুরুষানুক্রমিকভাবে বিনা মূলধনের ব্যবসাদারি পেতে বসে আছে।

মাইজভাণ্ডার তরিকার অনুসারীদের মধ্যে যান্ত্রিক ভক্তিবাদ এবং ভক্তি সর্বস্বতা আশ্রয় করেনি, একথা বললে ঠিক হবে না। পীর-মুরিদী সম্পর্কে তেজারতির প্রতিযোগিতায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার উত্তরাধিকারীদের অনেকেই আসল সাধনপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি অভ্যস্ত অভ্যাসে লোকঠকানোর চমৎকার ক্রীড়ায় মেতে ওঠেননি তা-ও সবসময়ে সত্য নয়। বস্তুত বর্তমানে মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীর দাবীদার উত্তরাধিকারীদের নানা শরীকের মধ্যে কে সঠিক পথে রয়েছেন, কে বিচ্যুত হয়ে জাগতিকতার মধ্যে আত্মসমর্পন করেছেন, পরখ করার উপায় কি? তবে একটি বিশেষ ব্যাপার আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

মাইজভাণ্ডারের পীরবংশের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একজন ক্ষ্যাপা পুরুষের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে, যাঁদের মধ্য দিয়ে মাইজভাণ্ডারী তরিকার ভক্তিসাধনা নুতন বেগ এবং আবেগ অর্জন করেছে।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মাইজভাণ্ডারী তরিকার ভক্তিসাধনা এই অঞ্চলের সমাজে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে কিছু না বললে অন্যায় করা হবে। মাইজভাণ্ডারের পীরেরা এই অঞ্চলে ইসলামের একটি অভিনব ব্যঞ্জনা স্পষ্ট করে তুলেছেন। কোরান-হাদীসের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী সাধক-পুরুষদের যে সাধনা, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে মাইজভাণ্ডারী তরিকা তার একটি অগ্রবর্তী সম্প্রসারণ মাত্র। তথাপি ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির পথ মাইজভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছে।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবজনিত কারণে কিনা আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, ধর্মীয় আচারের কঠোরতা এই অঞ্চলের ইসলামকে অনেকদিন পর্যন্ত একটি জল-অচল কুঠুরিতে পরিণত করে ফেলেছিল। তার প্রভাব মুসলিম সমাজে এমন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে অদ্যাবধি তার জের সমানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রাণহীন আচার-সর্বস্বতা এবং নিরেট যান্ত্রিকতার মধ্য থেকে ইসলামের প্রেমধর্মের মর্মবাণী সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করাই হলো মাইজভাণ্ডারী তরিকার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের যখন বিচ্ছেদ ঘটে ধর্ম তখন প্রাণহীন আচার-সর্বস্বতা এবং নিছক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ততার দ্যোতনা তখন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। মাইজভাণ্ডারী তরিকা এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে নতুনতর একটি স্বতঃস্ফূর্ততার দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পেরেছে। ধর্মের সঙ্গে যদি আনন্দ-সাধনার সংযোগ না ঘটে তাহলে ধর্ম বিধিনিষেধের ছককাটা মৌমাছিতন্ত্রের রূপ নেয়। মাইজভাণ্ডার ধর্মের সঙ্গে আনন্দ ও রসচর্চার সংযোগ ঘটিয়ে ধর্মের একটি ইতিবাচক অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছে। সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল বলেই ইসলাম একটি নতুন জীবনাবেগ নিয়ে জীবনের নতুন মহিমা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু সম্প্রদায়কে কখনো প্রধান করে তোলে না।

রামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, 'যত মত তত পথ।' ধর্মগুলোর অন্তর্নিহিত যে প্রেরণা তার মধ্যে একটা মর্মগত ঐক্য অবশ্যই বিদ্যমান। এটা মুখে বলা সহজ বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে এই সত্য আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কারের মতোই দুরূহ এবং কঠিন। মাইজভাণ্ডারের সাধকেরা এই কঠিনের সাধনা করেছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

কে কিভাবে নেবেন জানিনে, আমি মাইজভাণ্ডারের সঙ্গে নবদ্বীপের তুলনা করতে চাই। নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে যে একটি নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল, বাঙলার সাংস্কৃতিক বিকাশে তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বৈষ্ণব সাধকদের লিখিত গীতিকবিতাগুলো বাঙলার কাব্যলোকের এমন এক অক্ষয় সম্পদ, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার তুলনা মেলা ভার হবে। এই গীতিকবিতাগুলো কালের কণ্ঠে ইন্দ্রমনির হারের মতো দুলছে। বলা হয়ে থাকে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেব স্বয়ং একটি বাক্যও না লিখে একটি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তুলনা জিনিসটি সব সময় ভালো নয়। তুলনার মাধ্যমে একটা সাদৃশ্যবোধ জন্মানো সম্ভব হলেও তাতে আসল সত্য পরিস্ফুট করা হয় না। প্রতি প্রজন্মের বংশধরের যেমন একটি নিজস্ব জীবন রয়েছে, তেমনি প্রতিটি আন্দোলন এবং জাগরণের একটি নিজস্ব প্রাণপ্রবাহ এবং অভিব্যক্তি রয়েছে। তথাপি আমি মাইজভাণ্ডারের সঙ্গে নবদ্বীপের তুলনা করেছি, যাতে চট করে একটা ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়।

মাইজভাণ্ডারের পীরেরা কেউ সরাসরি সাহিত্যচর্চা বা সঙ্গীত সাধনা করেননি। কিন্তু তাঁদের সাধনাকে উপলক্ষ করে সঙ্গীতের এমন এক বিপুল ভাণ্ডার রচিত হয়েছে তাঁর সঠিক সংখ্যা কত হবে অদ্যাবধি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। মাইজভাণ্ডারকে উপলক্ষ করে উর্দু-ফার্সী ভাষায় গজল ও কাওয়ালী গান যেমন অজস্র লেখা হয়েছে, তেমনি সরল গ্রাম্য মানুষের বোধ এবং অনুভবগম্য বাংলা ভাষায় এমন কি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাতেও হাজার হাজার গান লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো সুফী সাধকদের খানকাহ্ এবং মাজারে যে গজল, যে কাওয়ালী গান গীত হত, সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই প্রাথমিক পর্যায়ে মাইজভাণ্ডারে উর্দু-ফার্সী ভাষায় গজল, কাওয়ালী লিখিত হয়েছে এবং গীত হয়েছে। একথা তো নতুন নয়, মুসলিম সুফী-সাধকদের সাধনার সঙ্গে কাওয়ালী গজলের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে।

কাওয়ালী প্রথম চালু করেছিলেন হজরত আমির খসরু ফার্সী ভাষায়। পরে উর্দু ভাষায় কাওয়ালী লিখিত এবং গীত হতে থাকে। সুফী-সাধনা পদ্ধতির এই আদি রূপটি মাইজভাণ্ডারেও অনুসৃত হয়েছে, তাতে অবাক বা বিস্মিত হবার কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, চট্টগ্রামে কালু, পেয়ারু এবং আবু কাওয়াল এই সকল জনপ্রিয় কাওয়ালী গায়কের যে আবির্ভাব ঘটেছিল তার সঙ্গে মাইজভাণ্ডারের একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে, আজকের দিনে ধর্মজিজ্ঞাসু জনগোষ্ঠীর বাইরে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মাইজভাণ্ডারের যে প্রসার এবং পরিচিতি, মাইজভাণ্ডারের সাধনরীতিকে উপলক্ষ করে লেখা হাজার হাজার বাংলা গানই তার মুখ্য কারণ। এই গানগুলো মাইজভাণ্ডারের একটি নতুন ভাবমূর্তি সকলের সামনে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছে। গান দিয়ে মাইজভাণ্ডারের সাধনা এবং গানেই মাইজভাণ্ডারের পরিচয়। মাইজভাণ্ডারী গানের একটি বিশেষ দাহিকাশক্তি, একটি অন্তরাবেগ, একটি বিশেষ সুর এবং বিশেষ ধরনের তাল-লয় রয়েছে। যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, মাইজভাণ্ডারী গানে বাঙালী সঙ্গীত-সাধনার একটি বিশেষ রসময় ধারা বাণীমূর্তি লাভ করেছে। মাইজভাণ্ডারী গানের কথা বাদ দিলে বাঙালীর সঙ্গীত-সাধনার প্রতি সুবিচার করা কখনো সম্ভব হবে না। এটা তর্কাতীত সত্য যে, মাইজভাণ্ডারী গান বাঙলার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সঙ্গীতকে আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মাইজভাণ্ডারী গান ভাব, ভাষা, বাণী, সুর এবং তাল সর্বদিক দিয়ে অভিনব ও একক পরিচয়ে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে।

নন্দনতাত্ত্বিক মানদণ্ডে মাইজভাণ্ডারী উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি এখনো শুরু হয়নি। মাইজভাণ্ডারী গানের উপযোগবাদিতার দিকটাই সকলের সামনে আসতে পেরেছে। যেহেতু অধিকাংশ গান লিখেছেন মাইজভাণ্ডারের ভক্তবৃন্দ, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকারের বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। কাদের উদ্দেশ্যে এই গানগুলো লিখিত হয়েছে সেকথাও স্মরণে রাখতে হবে। অতি সাধারণ গ্রাম্য সরল মানুষের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ মাইজভাণ্ডারী গান লিখিত হয়েছে। এই গানে ভাবটাই প্রধান, ভাষাগত উৎকর্ষ বা প্রকাশভঙ্গী মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তারপরেও একটি কথা বলা যায়, এই স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের ভক্তির কোনো কোনো গান এমন দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠেছে যেগুলো অমরতার দাবী করতে পারে। ভাববাণীতে সমৃদ্ধ এরকম শত শত গান মাইজভাণ্ডারকে উপলক্ষ করে লিখিত হয়েছে।

মরমী সাধক মনোমোহন দত্ত প্রথম মাইজভাণ্ডার শরীফ থেকেই গান রচনার পুলকিত প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অবিস্মরণীয় সংগ্রামী কবিয়াল রমেশ শীল সারাজীবন শুধু মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেই ব্যয় করেননি, মাইজভাণ্ডারী তরিকার আদর্শ তাঁর সমগ্র জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পেরেছিল। জীবনান্তেও এই আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি।

১৯৯৪ *সংকটের নানান চেহারা*
(১৯৯৬)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়

অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল একটি সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের ক্রমাগত গ্রাস করে ফেলছে। পাকিস্তান আমলে এই অনুভব আমার মধ্যে ছিল না। সত্তরের দশক, আশির দশক এমনকি নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকেও এই বিচ্ছিন্নতাবোধটি এরকম প্রকট আকার ধারণ করেনি।

দু-পাঁচ বছর আগেও আমার যেসব হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে প্রাণখোলা আলাপ করতাম, তাদের বাড়ীতে অবাধে যাওয়া-আসা করতাম, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করতাম, সে জিনিসটি এখন আর সেরকম করতে পারছিনে। আগে আমি হিন্দু বন্ধু এবং মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে কোনরকম ফারাক করতে পারতাম না। বরং আমার হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা ছিল অধিক। এমন কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু-বান্ধব আমার ছিল যাদের সঙ্গে জীবনের কঠিন সংকট এবং গভীর অনুভবের বিষয়গুলো পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আলাপ করতাম। কিন্তু বিগত আট-দশ বছরে এমন কিছু ঘটে গেছে, হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নিজের ভেতরে একটা আড়ষ্টতা অনুভব করি। এটা একতরফা নয়। হিন্দু বন্ধুদের মধ্যেও সেই একইরকম আড়ষ্টতার ভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। সেই পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে মুখে জোর করে হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করি। ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে আলাপসালাপও করি। কিন্তু হৃদযন্ত্রে সেই পুরনো আন্তরিকতার সুরটি বাজিয়ে তুলতে পারিনে। আগের দিনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলতাম, ঝগড়া করতাম, রাগ-অভিমান, ক্রোধ প্রকাশ করতাম; তখন এই অনুভবগুলোর একটি ইতিবাচক প্রভাব ছিল। হিন্দু-মুসমানদের মধ্যে যে দূরত্ব আছে সেটা কমিয়ে আনার জন্য আমাদের ভেতরের অনুভূতিগুলো সৎভাবে প্রকাশ করতাম। হাল আমলে আমরা যান্ত্রিকভাবে ভদ্রতা রক্ষা করি বটে, পূর্বের দিনে যেসব বিষয় নিয়ে মতান্তর এবং মতানৈক্য প্রকাশ করতাম সেগুলো টেনে আনার দুঃসাহস মনের ভেতর থেকে সঞ্চয় করতে পারিনে। এধরনের শঙ্কাবোধ আমাদের এতদূর তাড়িত করে নিয়ে যায়, যদি ওইসব পূর্বের বিষয় এবং প্রসঙ্গের অবতারণা করি, মনের ভেতরে আতঙ্কিত বোধ করি। আমাদের বিচ্ছিন্নতার বোধটি এত বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ছে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে হয়তো মামুলি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সম্পর্কটাও রক্ষা করতে পারব না। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক উদাসীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিয়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একগুচ্ছ কারণ বর্তমান। আমরা সেগুলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারি, সেগুলোর প্রকৃতি এবং হেতু নির্ণয় করার জন্য প্রযত্ন-প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে ধরনের প্রয়াসগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, যে পর্যন্ত না আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের একই দেশে বাস করতে হবে। একই ইতিহাসের অংশভাগী হিসেবে পরস্পরকে মেনে নেয়ার এবং গ্রহণ করার একটা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ভবিষ্যতমুখী, কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা নির্মাণ করতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যতে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের দেশে-সমাজে বিশেষ একটা শ্রেণী সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে যাচ্ছেন। এগুলোর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা অস্বীকার না করেও একথা বলা বোধকরি অন্যায় হবে না, এসব তৎপরতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য যতদূর, সামাজিক কল্যাণ সাধনের আকাঙ্ক্ষা ততটুকু নয়। সুতরাং এ ধরনের প্রয়াস-প্রযত্ন আমাদের সমাজের মর্মমূল থেকে সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বোধ-উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারছে না। যে ধরনের প্রয়াসের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কোনরকমের ধর্ম এবং সম্প্রদায়গত অভিধা ব্যতিরেকে গ্রহণ করার স্পৃহা বলবান এবং জাগ্রত হয়, যা প্রাকৃতিক ঘটনার মতো সহজ এবং স্বাভাবিক, সে ধরনের কোনো লক্ষণ পরিদৃশ্যমান নয়।

আমি প্রাণ থেকে বিশ্বাস করি আমাদের দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এমন ভালো মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছেন যাঁরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন আমাদের সকলকে এই দেশের মাটি, আকাশ এবং জল-হাওয়া নয় শুধু, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মধ্যেও পারস্পরিক অংশগ্রহণ ছাড়া একটা সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ তৈরি করা সম্ভব নয়। মানুষ যেভাবে চেয়ার-টেবিল তৈরি করে, ঘরবাড়ী নির্মাণ করে, একইভাবে নিরন্তর সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলো প্রতিটি নরনারীর মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সমাজ-নির্মাণের পারস্পরিক বিরোধী প্রক্রিয়াগুলো একটা অন্যটাকে প্রতিহত করছে বলেই সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথটিও ক্রমাগত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠছে।

যাঁরা বোঝেন, যাঁরা উপলব্ধি করেন এবং চিন্তার আলোকে ভবিষ্যৎ পাঠ করতে পারেন যে একটি অমঙ্গল দ্রুতবেগে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে, আমরা একটি বিশাল মৃত্যু-গহ্বরের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে চলেছি, তাঁদের সকলের ইতিবাচক কিছু করার জন্য এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়।

১৯৯৯

উপলক্ষের লেখা
(২০০১)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গ্যোতে : প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রেক্ষিতে

বিশ্বসাহিত্য শব্দটি প্রথম গ্যোতেই ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে বিশ্বের জাতিসমূহের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করে, সেগুলোকে মননশীলতার স্পর্শে নব-রূপায়ণের প্রয়াস অন্য কোনো সৃজনশীল ইউরোপীয় মনীষীর মধ্যে গ্যোতের মতো তেমন উজ্জ্বলতা সহকারে ফুটে উঠতে দেখা যায়নি। গ্যোতে রেনেসাঁর সন্তান। গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির প্রায় সবটুকু আগুন নিজে জ্বলে ওঠার প্রয়োজনে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন, একথা বললে খুব বেশি বলা হবে না।

গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির মর্মমধু আপন চিত্ততলে আহরণ করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের কল্যাণময় দিকটির প্রভাবও যে তাঁর মধ্যে খুব ভালোভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্যোতে যাজক-শাসিত ধর্মতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর বাণীকে অন্তরে অন্তরে মানবজাতির সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অন্যতম মৌলিক উপাদান মনে করতেন। গ্যোতের চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বয়সের সঙ্গে নানা ব্যয় পরিবর্তন এবং রূপান্তর এসেছে, তথাপি খ্রিস্টধর্মের এই সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি তাঁর যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং অঙ্গীকার তার কোনদিন রংছুট হয়নি।

তাঁর মানস-প্রবৃত্তির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি নিজেকে গ্রীক প্যাগানদের মতো মনে করতেন। অবশ্য এটা একটা কাব্যবিশ্বাস। সব বড় কবিদের মধ্যে এই ধরনের একটা জ্বলন্ত বোধ ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের একটা উপলব্ধি ক্রিয়াশীল না থাকলে তাঁরা চিত্তবৃত্তি স্ফূর্তির উপযুক্ত স্বাধীন, স্বরাট এবং নির্ভর মনে করতে পারেন না। কিন্তু গ্যোতে ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপের মানুষ। রেনেসাঁ থেকে রিফরমেশান, তারপর ফরাসী বিপ্লব — এই যে বিরাট যুগান্তকারী পরিবর্তনসমূহ ইউরোপীয়-মানসের বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে, তার প্রত্যেকটিই গ্যোতের ভাবনাপ্রবাহে তরঙ্গ তুলেছে। শুধু গ্যোতে একা নন, তৎকালীন প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার চিন্তা, তাঁদের অনেকেরই পদ্ধতিতে এগুলো একভাবে না হলে অন্যভাবে প্রভাব হিসেবে কাজ করেছে।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কিন্তু গ্যোতে-ব্যক্তিত্বের প্রাতিস্বিকতা এবং তাঁর জীবন-ভাবনার অনন্যত্ব সন্ধানের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে হবে। আর সেটি হলো এই, গ্যোতে গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির ঘনত্ব, গভীরতা এবং গরিমা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি এর একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেই ব্যাপারটিও খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও অনিদ্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতিসমূহের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন। এই অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতিসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্যোতে প্রথম বা একমাত্র ব্যতিক্রম একথা বলা ঠিক হবে না। গ্যোতের পূর্ব থেকেই পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশের পণ্ডিতসমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা তীক্ষ্ণ এবং গভীর আগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠতে লক্ষ্য করা গেছে। গোত্যের সমসাময়িক কালে ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ জার্মানীতে অনেককেই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম করতে পারি।

গ্যোতের সঙ্গে অন্যদের এ ব্যাপারে একটা মৌলিক ফারাক হলো এইখানে যে, অন্যেরা ভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতিসমূহকে অনেকটা উপাত্ত সংগ্রহের উৎস হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু গ্যোতে দেখেছিলেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির মহিমামণ্ডিত গরীয়ান পূর্বসূরী কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে। এই যে অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তাকে আপন সংস্কৃতির সমান জ্ঞান করা এবং তার মধ্যে উৎকর্ষমণ্ডিত কিছু থাকলে কর্ষণে-ঘর্ষণে আপন মানসের অঙ্গীভূত করা, এটা গ্যোতের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, অন্যকোনো ভাবুক কিংবা চিন্তানায়কের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটতে দেখা যায়নি।

গ্যোতের সমসাময়িক অন্যান্য ভারত-বিশেষজ্ঞের তুলনায়, তাঁকে হিন্দু-সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারক, একথা বলা যাবে না। তথাপি তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রাচীন হিন্দু কবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের গৌরচন্দ্রিকা বা সূচনাংশের অনুকরণে তাঁর গোটা জীবন-সাধনার ধন 'ফাউস্ট' নাটকে একটা সূচনাংশ সংযোজিত করেছিলেন। বন্ধুজন বন্ধুজনের সঙ্গে যেভাবে বাক্যালাপ করে, গ্যোতে সংস্কৃতিসমূহের আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে সেরকম একটি মানদণ্ড আপন অন্তরে স্থির করে নিয়েছিলেন। গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের অহংপুষ্ট মনোভাব কখনো গ্যোতের মধ্যে স্থানলাভ করতে পারেনি।

শুধু কালিদাস অথবা হিন্দু-সংস্কৃতির নয়, একই দৃষ্টিতে তিনি পারসীক সংস্কৃতির প্রতিও তাকিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ পারসীক গীতিকবি হাফিজের দীওয়ানের অনুকরণে তিনি যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 'দীওয়ান' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, পাশ্চাত্যের সমালোচক তাঁর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কাব্য সফলতা নিয়ে যতই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতর্ক উত্থাপন করুন না কেন, তিনি যে শ্রদ্ধা-বিজড়িত দৃষ্টিতে প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছিলেন, প্রাচ্যের মানুষও তাঁকে একইরকম শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করবে।

গোত্তের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি-চিন্তা যে যথার্থ অর্থে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছিল বোধকরি তার পেছনে প্রধান কারণ এই ছিল যে, জাতিসমূহের মননশীলতার প্রকাশের প্রতি তিনি আদিতে শ্রদ্ধা সহকারে তাকাতে পেরেছিলেন। সংস্কৃতি-চিন্তার মতো ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও গ্যোতে সার্বজনীনতা বোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। গ্যোতের সময়কালীন ইউরোপের ইহুদীদের প্রতি কি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গীই না পোষণ করা হত! অথচ গ্যোতে কি অকুণ্ঠ প্রশংসা সহকারে ইহুদীদের ভালো গুণগুলো তুলে ধরেছেন। একই কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে ওসমানীয় তুর্কীদের হাতে রোমানদের পতনের পরে রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত দেশসমূহে ইসলামের প্রতি একটা বিদ্বিষ্ট মনোভাব সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। তার পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টান-মুসলমান ক্রমাগত ক্রুশেডের মাধ্যমে এই বিদ্বেষ, এই ঘৃণা আরো গভীরাশ্রয়ী এবং আরো দৃঢ়মূল ও কঠিন হয়েছে। ল্যাটিন ভাষার প্রভাব হ্রাস পাওয়ার যুগে ইউরোপের জাতীয় ভাষাসমূহ যখন বিকশিত হতে শুরু করেছে, সেই পুরাতন বিদ্বিষ্ট মনোভাব এই ভাষাসমূহের সৃজনশীল ব্যক্তিত্ববর্গের রচনায় নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য ইসলাম এবং ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে একটি পুনর্বিচার ইউরোপে শুরু হয়েছিল। এটা যে সঠিক বিচার তা কিছুতেই কবুল করা যাবে না। তথাপি এই পুনর্বিচারের পদ্ধতির মধ্যে অন্ধ একগুঁয়ে মনোভাবের প্রকাশের বদলে একটা বিবেচনাশীলতা, একটা যুক্তি-শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে: ইংরেজ কবি শেলীর Revolt of Islam কাব্যগন্থ, ভোলতেয়ারের Mohmet নাটক এই পর্যায়ের ইসলাম সম্পর্কিত সৃষ্টিশীল রচনাসমূহের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্যোতে তাঁর যৌবন-দিনে ভোলতেয়ারের এই Mohmet নাটকটির জার্মান অনুবাদ করেছিলেন। আজকের দিনের ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানাশোনা আছে এমন ইউরোপীয় ব্যক্তির এই নাটকটির প্রতি তাকালে আঁতকে ওঠার কথা। ভোলতেয়ার মহাপুরুষ মুহম্মদের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করেছিলেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই নাটকের জার্মান ভাষায় অনুবাদক ছিলেন গ্যোতে।

কিন্তু পরিণত বয়সে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা কতদূর বিকশিত হয়েছে দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। কি বিস্ময়কর বিবর্তন! এটা যুগ-রুচি, সামাজিক সংস্কার এবং তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের পোষিত মনোভাবের প্রতিকূলে কতদূর দুঃসাহসী মানস-অভিযাত্রার ফলে সম্ভব হতে পেরেছে, ভেবে দেখার বিষয়। কি ধর্ম, কি সংস্কৃতির বিষয়ে গ্যোতের যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন মনোভাব, তা তাঁকে কঠোর সাধনায় অর্জন করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হয়েছে। পরিবেশ বা পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো মানস-সম্পদ তা নয়।

পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে গ্যোতের শ্রেষ্ঠত্ব একরকম অবিসংবাদিত। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের মধ্যে গ্যোতের অনন্যত্ব, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ উপাদান যুক্তি-বিচার এবং অপরিমেয় প্রশ্নশীলতা তার ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়েছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখটা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে সমর্পিত চিত্ততা এবং মরমী-চিত্ত সাধক-পুরুষ — ভারতবর্ষে যাদের বলা হত ঋষি এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইরান আর তুর্কীস্থানে যাঁরা সুফী-সাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, বিনা দ্বিধায় গ্যোতেকে এবং মরমীপনা মূল্যবিচারের একটি মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করানো যায়। এই নিরিখে তাঁদেরকে একই তুলাদণ্ডে স্থাপন করে তুল্যমূল্যে বিচার করা যায়। গ্যোতে গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতি-চিন্তার অংশ অপহারী, ইউরোপীয় চিৎপ্রকর্ষ তথা রেনেসাঁর উত্তরসূরী, শেক্সপীয়রের যথার্থ শিষ্য একথা যেমন বর্ণে বর্ণে সত্য, তেমনি একইভাবে আরবীয়, পারসীক এবং হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগসম্পন্ন, কালিদাসের মুগ্ধ ভক্ত এবং হাফিজের অন্তরের মিতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দুই বিরাট, মহান, গরীয়ান সংস্কৃতি প্রবাহের দুইটি ধারাই তাঁর মানস-সরোবরে গঙ্গাযমুনার মতো এসে মিশেছে।

১৯৮৬

আহমদ ছফার প্রবন্ধ
(২০০০)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির সঙ্গে জার্মান কবি গ্যোতের সৃজনীশক্তির আশ্চর্য একটা মিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমের এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিলে বোধকরি খুবই অন্যায় করা হবে। বঙ্কিম ছিলেন নানা ইউরোপীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রথম বাঙালী লেখক যিনি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে ইউরোপের বড় বড় স্রষ্টা-পুরুষদের রচনা পাঠ করেছিলেন। সুতরাং গ্যোতের রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হার্দ্য পরিচয় ঘটেছিল, একথা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই। গ্যোতে-প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা যথার্থ ধারণা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে স্বতঃস্ফূর্ত গভীর জীবনোল্লাস বিকশিত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে এমন একটা যুৎসই মন্তব্য তিনি করতে পারতেন না।

বাস্তবিকই গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই কবির আন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সর্বাগ্রে একটা বিষয় চোখে পড়বে। উভয়েই জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন প্রধানত গীতিকবি। কবি ছাড়া গ্যোতের আরো অনেক পরিচয় রয়েছে। যেমন তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, বলতে গেলে আজীবন মন্ত্রী, নাট্যমঞ্চের পরিচালক, খনিজ বিশেষজ্ঞ, উপন্যাস লেখক, নাট্যকার, চিত্রকলার সমঝদার এবং বিজ্ঞানসাধক। গ্যোতের মতো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও ছিল অত্যন্ত প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথ রাজ্যশাসন করেননি, কিন্তু জমিদারী চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারীর আয়তন ভাইমারের তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল না। বাংলা সঙ্গীতে তিনি একটা রীতির প্রবর্তন করেছেন। বাঙলার চিত্রকলায় সর্বপ্রথম আধুনিকতার সূচনা করেছেন। একক প্রচেষ্টায় সেই পরাধীন ভারতবর্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। গল্প, কবিতা, নাটক, শিশুসাহিত্য সবকিছু তো লিখেছেনই। এই দুই মহান স্রষ্টা-পুরুষের জীবনবৃত্তের দিকে তাকালে স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের চোখেও ধরা পড়তে বাধ্য, উভয়েই ছিলেন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। প্রতিভার বহুমুখিতা এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যের বিচারেও দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অতি সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। কিন্তু এই দুই কবির সবচেয়ে যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তা হলো, উভয়েই গীতিকবি। জীবনের সকল পরিস্থিতিতে, সকল বয়সে দুই কবি অজস্র গীতিকবিতা রচনা করে গেছেন। উভয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটা একরকম অবধারিত সত্য যে, গীতিকবি এই পরিচয় অন্য সবগুলো পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে।

এছাড়া অন্য যে ব্যাপারটি সকলের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে যায় সেটা হলো প্রতিভার বহুচারিতা। শিল্প-সাহিত্যের কোনো বিশেষ একটা মাধ্যমের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে উভয়েই অনেকগুলো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই কারণেই উভয়ের অবদান বিপুল কলেবর ধারণ করে স্ফীত হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রতিভার চারিত্র্যের কথা বাদ দিলেও বহিরঙ্গের দিক দিয়ে কতিপয় স্থূল বিষয়ে গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃতিবান বিত্তসম্পন্ন পরিবারে। দুজনেই জন্মসূত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতির অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। গ্যোতে যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কার বহুধাবিভক্ত জার্মানীতে একটি জাতীয়তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে সন্ধান করলেও দেখা যাবে তাঁর শৈশবে স্বাধীনতার স্পৃহা ভারতীয় তথা বাঙালী-মানসে জাগ্রত হয়েছে। যৌবনে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বেগ এবং আবেগ দুইই সঞ্চারিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটার যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন ভারতবর্ষ এক রকম স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত প্রতিভার সঙ্গে একটা অলোকসামান্য ব্যাপার যুক্ত থেকেই যায়। সেটুকু বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে দু'জনের সম্বন্ধে একটা বিষয় অবশ্যই কবুল করতে হবে যে আপনাপন দেশ এবং কালের উত্তাপে উভয়ের সৃজনীপ্রতিভা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে উভয়কেই বলতে হবে আপনাপন দেশ-কালের সন্তান।

My All Garbage

রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের মধ্যে বড় ধরনের যে সকল মিল লক্ষ্য করা যায়, নারীর প্রেম হলো তার মধ্যে একটি। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে দুজনেই কৈশোরের উন্মেষ থেকে একেবারে বার্ধক্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত একের পর এক অনেকগুলো রমণীর প্রেমে পড়েছেন। তবে গ্যোতের প্রেম সরাসরি নর-নারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এরকম মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম এসেছে নানা ঘুরতি পথে, নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে। এটি ঘটেছে সমাজ ও সামাজিক রীতির বাধ্যবাধকতার কারণে। উভয়েই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। উভয়েরই জীবন প্রকাণ্ড হর্ম্যমালার মতো বিরাট ও সমুচ্চ। গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বিষয়ে যেমন মিল দেখা যায়, তেমনি উভয়ের মধ্যে গরমিলের পরিমাণও কম নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে সময়, সমাজ এবং সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার ব্যাপার বাদ দিলেও

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপনাপন পরিবেশ-পরিমণ্ডলে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন স্রষ্টাপুরুষ। একজনের সঙ্গে অন্যজনের তুলনা করার কোনো অর্থই হয় না। প্রসঙ্গক্রমে তুলনার কথাটি আসে।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে গ্যোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করার কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। গ্যোতে অনেক বেশী দৃঢ়, ঋজু; তাঁর মেরুদণ্ড অনেক বেশী সবল এবং দৃঢ়-সংবদ্ধ। সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী জড়ানো-পেঁচানো। গ্যোতের প্রতিভা যে পরিমাণে উল্লম্ব বা ভার্টিক্যাল তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বলতে হবে হরাইজেন্টাল অথবা বিস্তারমান। গ্যোতের মধ্যে নিখাদ সত্যের পরিমাণ অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথে সত্য আছে, তবে তাতে গিল্টির পরিমাণও নেহায়েত কম নয়। গ্যোতে সমাজ-সংসার থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করে প্রবহমানতার সূত্রসমূহের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সমাজ-সংসারের মধ্যে বয়ে যেতে হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপোষকামিতার লক্ষণটি অধিক সুপরিস্ফুট। কিন্তু গ্যোতের মধ্যে পৌরুষ অনেক শক্তিশালী। তিনি যা সত্য এবং ন্যায় মনে করেছেন, তাই পালন করেছেন। কেউ তাঁকে আপন অন্তরস্থিত বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেনি। "আমি ভালো হব, মন্দ হব, প্রকৃতির মতো হব"— একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না। গ্যোতের অভীষ্ট ছিল শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সঙ্গে ধর্মের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। গ্যোতের বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য তুলনাবিহীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনই বাস্তবতাকে কামড়ে ধরতে গেছেন অমনি আধিভৌতিকতা এসে তাঁকে অন্য লক্ষ্যে তাড়িত করে নিয়ে গেছে। রচনার মধ্যে সন্ধান করলে দেখা যাবে গ্যোতের রচনার দাহিকাশক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনার চাইতে অনেক বেশী।

গ্যোতে ছিলেন রীতিমতো বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর দখল নিয়ে কারো প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনো অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানে অপরিসীম উৎসাহ এবং শিশুসুলভ বিস্ময়বোধ ছিল। সাবালক মানব-মস্তিষ্কের ফসল হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা কখনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য একথা উল্লেখ করা একটুও অযৌক্তিক হবে না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের অন্যান্য কৃতবিদ্য লোকের তুলনায় অনেক বেশী বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। এই বিজ্ঞানমনস্কতা না থাকলে তাঁর রচনা ঠিক ধর্মতত্ত্বে পর্যবসিত হতে পারত।

গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপন দেশ-কাল-পরিমণ্ডলে যথার্থ অর্থেই মহান পুরুষ। একজনকে অন্যজনের তুল্যমূল্যে কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। তথাপি মানুষকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের গোটা পরিপ্রেক্ষিতটা বিচার না করে একতরফাভাবে বিচার করতে গেলে অবশ্যই তা একমুখো হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গ্যোতে করেছেন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জার্মান তথা ইউরোপীয় সমাজের। রবীন্দ্রনাথের মেকিত্ব তাঁর সামাজিক মেকিত্বেরই সাহিত্যিক রূপায়ণ। তথাপি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান জার্মান সাহিত্যে গ্যোতের অবদানের তুলনায় তা কিছু পরিমাণে কম নয়। গ্যোতের সমসাময়িক কালে জার্মান ভাষা বিজ্ঞান, দর্শন ও কলাবিদ্যার নানা শাখায় যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। দার্শনিক হেগেল, কান্ট এবং শোপেনহাওয়ার জন্মগ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতে বেটোফেন এবং মোৎসার্ট এসে গেছেন। তারও আগে ইউরোপীয় সঙ্গীত জগৎকে বাখ এবং হ্যাণ্ডেলের প্রতিভা কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। ভাষাবিজ্ঞানী শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় ভাষাতত্ত্বের নতুন অবদানের মাধ্যমে জার্মান ভাষাকে অনেকদূর সমৃদ্ধির পথে ধাবিত করে নিয়ে গেছেন। বহু আগে মার্টিন লুথার জার্মান গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করে যে একটি পেশী-বহুল কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, সেই ভাষাতেই অনেক বিজ্ঞানসাধক তাঁদের সাধনা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পেছনে কি ছিল? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্বসাকুল্যে এই তো ছিল রবীন্দ্রনাথের মূলধন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনুসন্ধান এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, শিক্ষিত 'এলিট' বাঙালীরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লিখতে রীতিমতো লজ্জাবোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই তেজারতিতে এত অল্প মূলধনে কত বেশী লাভ হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের দিনের বাংলা ভাষাটি। একটি প্রাদেশিক ভাষাকে সারাজীবনের সাধনায় একটি বিশ্ব-ভাষায় উন্নীত করা এ কি কম শ্লাঘার বিষয়! গ্যোতের প্রতিভার পাশাপাশি বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে যতই ঝাপসা এবং অস্পষ্ট মনে হোক না কেন, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বাঙালী যে-পরিমাণ ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, এককথায় তাকে অন্তহীন বললে খুব বেশি বলা হবে না। বাংলা সাহিত্যে কোনো কবির ওপর গ্যোতের যদি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে থাকে, তখনও অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর বয়সে জার্মান শেখার জনশ্রুতিটি ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও নিশ্চিত করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খুঁটিয়ে গ্যোতের রচনা পাঠ করেছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খেদ সহকারে তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং গ্যোতের সমসাময়িক পরিস্থিতির তুলনা করেছিলেন অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন, গ্যোতে তাঁর পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছ থেকে যে-পরিমাণ আনুকূল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে তুলনায় খুব অল্প আনুকূল্যই লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিবেশিনী' গল্পে 'টাসসো' নাটকের উল্লেখ দেখতে পাই। গল্পের নায়ক একটি কলেজের ছাত্র। তার ছিল প্রবল যশাকাঙ্ক্ষা। সে টাসসো নাটকের মূলভাব চুরি করে নিজের নামে একটি নাটক রচনা করেছিল। অধ্যাপক সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। খুব খুঁটিয়ে না পড়লে এভাবে টাসসো নাটককে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো কবিতায় গ্যোতের প্রভাব কখনো সরাসরি কখনো বা স্থানীয় রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় 'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে' – এই গোটা প্রথম স্তবকটিই 'ফাউস্ট', দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অংশের আক্ষরিক অনুবাদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। মনে হয়েছে গ্যোতের কাছ থেকে মূলভাবটি গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেছেন। যেমন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি। 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের গৌরচন্দ্রিকায় কবির উক্তি – 'মানুষের মহিমাকে দেবত্বের স্তরে / নিয়ে যেতে একমাত্র কবিকৃতি পারে।' পাঠ করে যে কেউ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির জন্মরহস্য কোথায়। আবার 'বৈষ্ণব কবিতা' কবিতার চরণ দুটি :

'আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা

এই অংশটির সঙ্গে 'ফাউস্ট', প্রথম খণ্ডের মার্গারিটার সঙ্গে কথোপকথন কালে ফাউস্টের এই কথাগুলো মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

'প্রেম বলো, বলো তারে আনন্দ স্বরূপ
কিংবা অনুরাগ ভরে ডাকো আল্লা-রহমান
আমি তো জানি না নাম, নামে তার ঘটে সংকোচন
নাম মানে শব্দ মাত্র, নাম মানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।'

তাছাড়া 'কাহিনী', 'কথা ও কাহিনী'র অনেকগুলো কবিতা এবং 'বিদায় অভিশাপ' নাট্য-কবিতাটিতে সরাসরি গ্যোতের প্রভাব পড়েছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ গ্যোতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এসব কবিতা যদি লিখে থাকেন তাহলে তো খুবই ভালো কথা। আর গ্যোতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এসব কবিতা যদি লিখে থাকেন, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ হয় না। এটা কোনো নতুন কথা নয় যে এক মশালের আগুন থেকে যেমন অন্য মশাল জ্বলে উঠতে পারে, তেমনি এক প্রতিভাই অন্য একজন প্রতিভাবানের অন্তরের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে।

১৯৮৬

আহমদ ছফার প্রবন্ধ
(২০০০)

15-5-03 Khalil Kaligaon Shibganj Thakurgaon F.R. HALL D.U

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন ও মনীষার এক অংশ মাত্র সাধারণের চোখে পড়েছে। অপর অংশ চাঁদের অপর পিঠের মতো লোকলোচনের অন্তরালে রয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীর মাত্র চল্লিশ জন বিশারদ লোক নাকি 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' পড়েছেন। তাঁদের সকলে যে রাসেলের সূক্ষ্ম চিন্তাপদ্ধতির সূক্ষ্মতর তত্ত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারেননি। দর্শনে তাঁর নিজস্ব অবদান 'থিয়োরী অব ডেসক্রিপশন' প্রসঙ্গে একথা অতটা না হলেও অল্পবিস্তর খাটে। জনপ্রিয় রচনাসমূহ সাধারণ মানুষের কাছে এনেছে তাঁকে — একথা সত্য বটে। কিন্তু আসল রাসেল মানুষটিকে তাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। রচনারীতির সরল ভঙ্গী এবং ঋজু বক্তব্যের মতো মানবিক ভাবাবেগের স্ফুরণের মাধ্যমে যেন জনসভায় জানান দিতে চেয়েছেন — তাঁদেরই একজন তিনি। মনের গুঞ্জরণশীল ভাবনাগুলো আলাদা করে ছেঁকে ছেঁকে সঠিক ভাষায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা সহকারে তর্জমা করতে পেরেছেন বলেই তিনি মোটামুটি ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম মানুষের মনেও একটা আসন অনেকটা জোর করে আদায় করে নিয়েছেন। লোক-মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি লিখেননি। বরং বলা চলে অনেক সময়েই বেশিরভাগ মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস এবং চিন্তনপদ্ধতির ওপর খুব তীক্ষ্ণ আক্রমণ চালিয়েছেন।

এখানে ধরা পড়ে রাসেলের লক্ষ্য করবার মতো একটি বিশেষত্ব। আক্রমণ করার যে একটা পালোয়ানী বা খেলোয়াড়ী উল্লাস থাকে তা রাসেলের নেই। ব্যথিত হয়েছেন অনেক সময়, কিন্তু ধৈর্য হারিয়েছেন কম সময়। তাঁর পছন্দের এবং অপছন্দের সীমানাও তিনি টানেন নিজের ভঙ্গীতে। কোনকিছু মনঃপুত না হলে তিনি কারণ বলে দেন। বিষয়টি তার মনঃপুত নয়, যেহেতু তাঁর ধারণায় বিষয়টি মানুষের শরীর-মনের সুস্থ বিকাশের অনুকূল নয়। যুক্তিগুলো থরে থরে সাজিয়ে বিন্যাস করে দেখাবেন। রাসেলের উইট হীরার ছুরি। ইচ্ছা করে কথা বলেন না, হঠাৎ কথা বলবার ঝোঁকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। প্রচলিত অর্থে চমৎকার ধারালো-ভারালোর কোনটাই নয়। বর্নার্ড শ'র মতো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষোভ মেশানো জ্যাঠামী দিয়ে লোক হাসানোর ইচ্ছা রাসেলের আদৌ নেই। তিনিও কিন্তু লোককে শিক্ষা দিতে চান। তাই বলে আগ্রহাতিশয্য তাঁর নেই। মানুষের জানা প্রয়োজন, ইচ্ছা করলে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। তাই রাসেলীয় উইট ঝিলিক দিয়ে বুকে বেঁধে কিন্তু মুখে হাসি আসার আগে মনে চিন্তার শিকড় বাড়িয়ে দেয়। তাঁর অপছন্দবোধ আছে — সেটা কঠিন এবং হিমশীতল, মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত স্পর্শ করে। কিন্তু ঘৃণা? সম্ভবত তা তিনি করেন না।

তাঁর মতের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছেন এমন মানুষও তাঁর রচনারীতির প্রতি আকর্ষণ চেপে রাখতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য চতুর্মাত্রিক; তাতে স্পষ্টতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতার মিলন ঘটেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই অর্জুনের মতো পাখীর চোখ দেখে ফেলেন। কেউ তাঁকে গ্রহণ করুন না করুন ইচ্ছে — তাঁর কাজ বিষয়টি ধরিয়ে দেয়া। তিনি কর্তব্য মাত্র পালন করেছেন। অঙ্কবিদের নিখুঁত পারিপাট্যের সঙ্গে আরেকটি দুর্লভ গুণের মিশেল দিয়েছেন তিনি। সে গুণটি ধ্রুপদ সঙ্গীতের রস। বস্তুত সংখ্যার রোমাঞ্চ গাণিতিকের মনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমশ্রেণীর নিষ্কাম আবেগের জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই এই গভীরতা-সন্ধানী জাফরানের ঘ্রাণ এবং অনুভূতির লাবণ্য অপরের কাছে তুলে ধরতে পারেন না। কিন্তু রাসেলের পারঙ্গমতা সন্দেহের অতীত। তাঁর মানবিক আবেগের স্পর্শলাগা রচনাগুলো পাঠের পর মনে ঘনিয়ে ওঠে ধ্রুপদ সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা। মন চারধারে আপনা থেকে প্রকাশিত করে শান্ত-শীতল এলানো ছায়া। মরুভূমির মধ্যে উদ্যানকুঞ্জের মতো। বলতে সাধ হয়, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অঙ্কবিদ যাই হোন না কেন, এই ঋজুরেখ চিন্তার অধিকারী ধাতব-কঠিন মানুষটির মধ্যে এমন কেউ কোথাও একজন আছেন, যাকে শেকস্‌পীয়ার-শেলীর 'জাতভাই' বলতে পারি।

শুধুমাত্র রচনারীতির ওপর যাঁদের নাম-ধাম-খ্যাতি, রাসেল সে জাতীয় পুরুষ নন। সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো যুঝেছেন। তার অস্ত্রলেখা বীরত্বের প্রতীকের মতো সকল গতরে ছড়ানো রয়েছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিউটন সম্বন্ধে যা বলেছেন, 'Voyazing alone in the Ocean of thought', রাসেলের ব্যাপারেও কথাটা লাগসই। তা ঠিক, রাসেলের আরেকটি দিকও রয়েছে। নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের জীবন রাসেলের নয়। একা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে মুক্তো-মানিক তুলেছেন এমন অনেকে আছেন। শীগগির কিংবা দেরীতে তাঁদের অবদান মানব সমাজ গ্রহণ করেছে। রাসেল চিন্তানায়ক, একাকীত্বের বিষণ্ন-বেদনা অনেক চিন্তানায়কের প্রিয়তম সুহৃদ। চিন্তা-ভাবনার জগতে ক্ষ্যাপার পরশপাথর সন্ধান করেছেন তিনি। কিন্তু নিজে তিনি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এমন একটা স্বর যা শুধু অরণ্যে আর্তনাদ করবে না। লোকালয়ে, নগরে, জনপদে, মানুষের নিবাসকুঞ্জে ধ্বনিত হবে সে স্বর নিটোল ঝর্ণার আওয়াজের মতো; এবং মানুষ দেবে তার সানন্দ উত্তর। মানুষের আবেগে-চিন্তায় আশার আকুল আকুতি রাসেলকে প্যাঁচালো বিতর্কের পানে ঠেলে দিয়েছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানুষ মাত্রেই কতেক সীমিতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তার চৌহদ্দী ডিঙ্গোনোর আকুতি যার মধ্যে যত বেশী প্রবল, পশুর সঙ্গে তার প্রভেদ তত স্পষ্ট অর্থাৎ তিনি অনেক বেশী মানুষ। ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করার এ অনিভন্ত উদ্দীপনাকে বলা যেতে পারে মানুষীসত্তার প্রমিথিয়ান রশ্মি। যাঁরা অসাধারণ তাঁদের মধ্যে এ আগুন অনেক বেশি তেজোময়। চেতনার বলয়ে অন্তর্জ্ঞানের বেশে যে শিখা অবস্থান করে তার আলোতে বস্তু-জগৎ, সমাজ-জগৎ এবং মনোজগতের উত্তরণের ভাবী ক'টি ধাপ আগাম প্রতিফলিত হয়। বন্ধ দরজার ফুটো দিয়ে তেরছা হয়ে যে ক'টি আলোকরেখা চোখে পড়েছে তার ওপাশে কি জানার জন্য, দেখার জন্য, অনুভব করার জন্য অন্তরাত্মা আকুল হয়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত রক্ত পরামর্শ করে উজান যেতে চায়। এক ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অস্থিরতা লোমকূপে রি-রি করে কাঁপে। কিন্তু মানুষ সবসময় তালা খুলতে পারে না, সবসময় রহস্য ভেদ করতে পারে না, সমস্ত জীবনের উদ্যম প্রচণ্ড ব্যর্থতার অপঘাতে ধুলোকাদায় গড়াগড়ি করে। সুন্দরীর এলোকেশের মতো রহস্য জট পাকিয়ে যায় – অন্তরালের সুন্দরী ডাকে 'আয়-আয়'। মানুষ ছুটে তুরঙ্গম গতিতে। সীমিত বুদ্ধির পুঁজি নিঃশেষিত হয়, পথরেখার দুপাশে পড়ে থাকে সাদা হাড়, মাথার খুলি। সে পথে আবার যায় যাত্রী।

বস্তুত রহস্য ভেদ করবার জন্য যে ধরনের বলবান শীলিত-বুদ্ধির প্রয়োজন তা অনেকের থাকে না, নানা কিছুই বুদ্ধির সতীত্ব হরণ করে। বংশক্রম, শ্রেণী, পেশা, জলবায়ু, দেশ, কাল, ধর্ম এবং রাষ্ট্র সবকিছু একযোগে বুদ্ধিবৃত্তির সতীত্বনাশ করার মানসে ওঁৎ পেতে রয়েছে। সেগুলো চেকন চেকন লতার নাগপাশের মতো বুদ্ধির শীর্ষ এপাশে না হয় ওপাশে হেলিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যপ্রদ সূর্যালোকে অভিসার করতে পারে না। এসব কিছুর দড়াদড়ি ছিঁড়ে বুদ্ধিকে প্রাকৃতিক সত্যের মতো করে বিকশিত করাই হলো বিজ্ঞানবুদ্ধি। মানুষ কি বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে? প্রখর ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করলে পরিশীলন সে আনতে পারে? জন্ম এবং মৃত্যুর পরাক্রান্ত সীমানা মেনে নিয়ে তাকে কাজে নামতে হয়। তার জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। যে মানুষের খেয়াল-খুশীতে তার জন্ম, তাদের কাছ থেকে পাওয়া রক্তধারার মধ্য দিয়ে সে তাদেরই সংস্কারের বীজাণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে অসহায় মানব-শিশু মা-বাপ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে স্নেহ, প্রেম, রাগ, অনুরাগ, ক্ষোভ, দ্বেষ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের মাধ্যমে যা গ্রহণ করে, সেসব সংস্কারের জাল তাকে আটকে ধরে। জীবনকে বলা যেতে পারে চলিষ্ণু উদ্ভিদ। আবার আরেক নামে ডাকা যায় – চিন্তান্বিত কামনা। এখন কথা দাঁড়াল চিন্তান্বিত কামনা-তরুর গতিবিধি কতদূর পর্যন্ত চেষ্টা, উদ্যম এবং শ্রমে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে মানুষ। শিয়রে তো মৃত্যু পরোয়ানা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীর্ঘদিন সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মেজেঘষে অবচেতনকে চেতনের স্তরে এনে সত্য-মিথ্যা পরখ করে দেখবে সে ফুরসত অবসর কই? তবু মানুষ এ সংকীর্ণ সময়সীমার বাঁধনের মধ্যে নিজের বুদ্ধি এবং বোধির স্বরূপ যতদূর উপলব্ধি করতে পারে, সিদ্ধি ততদূর।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সীমিতি কতদূর এবং তা ভাঙ্গার জন্য তাঁর চেষ্টা কত বেশি শানানো এবং পরিকল্পনা কতদূর নিখুঁত উপলব্ধির জন্য আশা করি পরের কথা ক'টির প্রয়োজন আছে।

রাসেল জন্মেছিলেন ইংল্যাণ্ডের এক বনেদী পরিবারে। তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ কীর্তিমান ছিলেন। তাঁর বাবা এবং এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া পরিবারের সকলে ছিলেন আচারনিষ্ঠ খ্রীষ্টান। খুব ছোট বয়সে রাসেল মা-বাবা দুজনকে হারান। তাই পিতামহ এবং পিতামহীর আশ্রয়ে তাঁকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। তাঁরা প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষায় তাঁকে শিক্ষিত করে তোলেন। রাসেলের চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে খাঁটি খ্রীষ্টানের কিছুটা রেশ রয়ে গিয়েছে তাই। সে সময়টা ছিল রাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। ঐতিহাসিকেরা রাণী এলিজাবেথের যুগ থেকে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রসারিত সময়কে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে বাকী চারটি মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। ইংল্যাণ্ডের যা গর্বের বস্তু — শিল্পকলা, দর্শন এবং যন্ত্রশিল্প ঐ সময়েই বিকশিত হয়। অভিজাত শ্রেণীর ইংরেজ ভদ্রলোক যে জাতিক ও-শ্রেণীক বীরত্বের ব্যঞ্জনা মধ্যদিনের অলস-স্বপ্নে, বলনাচের আসরে অনুভব করতেন সে পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন রাসেল। বুর্জোয়ার উন্মেষ যুগের স্বপ্ন-কল্পনার উদ্দামতা যার শিল্প-সংস্কৃতির শিরায়-উপশিরায় তাজা শোণিতের মতো প্রবহমান ছিল, বর্তমান যুগে পটের স্থিরচিত্রের মতো স্থবির-নিশ্চল হতে পারে, কিন্তু তারও ছিল যৌবনদিন। রাসেল সম্পর্কে আরেকটি তথ্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নইলে তাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের আসল চেহারাটি ধরা নাও পড়তে পারে। তাঁর বাবা ছিলেন নাস্তিক। তিনি উইলে লিখে গিয়েছিলেন, তাঁর সন্তানদের শিক্ষা যেন ধর্মনিরপেক্ষভাবে দেয়া হয়। পরে এ সম্পর্কে অবহিত হলে রাসেলের মনে ঘোরতর প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি নাস্তিকতা পেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে রাসেল ছাত্র হয়ে আসেন। তাঁর পাঠ্যবিষয় দর্শন। তিনি জার্মান ক্লাসিক্যাল দর্শনের শিরোমণি হেগেলের রচনার সংস্পর্শে আসেন। নব্য হেগেলীয়দের বিশিষ্ট একজন হিসেবে খুব শীগগির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রূঢ়-কঠোর আঘাতে গোটা মহাদেশে হেগেলীয় দর্শন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছিল। মার্কসীয় চিন্তার প্রভাবে জার্মানী প্রভৃতি দেশে সংঘবদ্ধ শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। রাসেল যেহেতু শৈশবে খুবই নিঃসঙ্গ থেকেছেন সম্ভবত সে কারণে শীগগিরই হেগেলের দর্শনের বাকসর্বস্বতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন। ঝুঁকলেন অঙ্কের দিকে। তখন কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় নতুন যান্ত্রিক দর্শন এবং মরমী দর্শনের স্ফূরণ হতে লেগেছে। রাসেলের যৌবনেই কাইজারের জার্মানী ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঘোষণা করেছে। তাবৎ ইউরোপীয় শক্তি সে যুদ্ধে এপক্ষ-ওপক্ষে অংশ নিয়েছে। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরা জারের রাশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় একযোগে রাসেল মানুষটির অন্তর্লোকে রেখেছে গভীর অনপনেয় স্বাক্ষর।

ওপরের ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবনাস্রোতের নিরিখে রাসেল-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর মহত্ত্ব-বিরাটত্ব বুঝতে পারব, এমনকি তাঁর অসঙ্গতিগুলোও বিচার করতে পারব। প্রথমত তিনি ইংরেজ। ইংরেজরা বিপজ্জনক রকমের প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। সম্ভবত ভূয়োদর্শনের প্রতি অধিক ঝোঁকের কারণেই সমস্ত ইংরেজ জাতি একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর এবং এক হব্‌স্‌ বাদে কোনো বিশাল কল্পনার দার্শনিক সৃজন করতে পারেনি। বস্তুর প্রতি মোহ এবং অবারিত কল্পনার প্রতি সন্দেহসূচক দৃষ্টিভঙ্গী ইংরেজ জাতের একচেটে, রাসেলেরও তা আছে। আত্মকথার গোড়ার দিকে তিনি তা স্বীকার করেছেন: ভিক্টোরীয় যুগের বনেদী ইংরেজের রুচি তাঁর চরিত্রের গড়নে রেশমী বস্ত্রের সুন্দর কারুকর্মের মতো ফুটে রয়েছে। নানা পরিবর্তন-রূপান্তরের মধ্যেও রঙছুট হয়নি। আর সে যুগে দার্শনিকেরা মনে করতেন যুক্তির মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সমাধান সম্ভব। তাঁকে তাও প্রভাবিত করেছে। শ্রেণীগতভাবে তিনি অভিজাত ছিলেন, কতেক কোমল মানবিক অনুভূতি এবং মানুষোচিত হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়ার নগদ টাকার সম্পর্ক এ সম্বন্ধের ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত হেনেছে। অভিজাতকুলে জন্ম চিরকালের জন্য তাঁর বিপজ্জনক বিপ্লবী হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই দেখা গেছে চূড়ান্ত সময়ে যখন ঘটনাস্রোত অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা অপরিহার্য করে তুলেছে তখনও রাসেল দুরূহ পরিশ্রম করে যুক্তি বের করে আনছেন। যে যুক্তি রাসেলের জন্য সত্য ছিল পৃথিবী তা গ্রহণ করেনি। ঘটনা ঘটেছে নিজের নিয়মে। রাসেলকে পুরনো যুক্তি আবার নতুন করে ঝালাই করে নিতে হয়েছে। ঘটনাস্রোতের বেগ বারবার যুক্তির গোছালো সুতো আউলা করেছে। বুদ্ধির ভাষা বোঝেন এমন সব মানুষও বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, এখানেই রয়েছে তাঁকে ভুল বোঝার উৎস।

কৈশোরের নিঃসঙ্গতা নিঃসন্দেহে তাঁর মনে প্রশ্নশীলতার বীজ বপন করেছিল। ট্রিনিটি কলেজের জ্ঞানের উত্তাপিত আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সবল অঙ্কুরণ লক্ষ্য করার মতো। রাসেলের সৌভাগ্য তিনি অনেকগুলো যুগান্তকারী প্রতিভার সঙ্গে মানসিক আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন। দার্শনিক জি. ই. মুর, অর্থনীতিবিদ কিন্‌স্‌ এবং আরো অনেক যুগন্ধর প্রতিভা তাঁর বন্ধু ছিলেন।

আশ্বস্ত প্রতিবেশ যুবকের লজ্জা কেড়ে নিল, সে সঙ্গে নিল আল্লাহ এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থা। ভেতরের স্বেচ্ছাচারী শক্তি নিজের পথ কেটে প্রবাহিত হলো। হেগেলের ইতিহাসের দর্শনকে তো অগ্রাহ্য করলেনই এমনকি অন্যান্য দার্শনিকের ওভারকোটেও আত্মগোপন করলেন না। তাঁর অনিদ্র-সন্ধান শীগগির জগতকে দেখার, বোঝার, বিচার করার, ঘটনা ব্যাখ্যা করার নিজস্ব একটা ভঙ্গী উদ্ভাবন করল।

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আনাড়ির চোখেও ধরা পড়বে জার্মান ক্লাসিক্যাল দর্শন থেকে তিনি কতটুকু সরে এসেছেন। রাসেলের দর্শনে মৌলিক অবদান 'থিয়োরী অব ডেসক্রিপসনের' বিবরণ অল্প কথায় দেয়া সম্ভব নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়ের একটা প্রাথমিক ধারণামাত্র দেয়া যেতে পারে। ধরুন, একটা চোখ। তার বিশেষ আকার, বিশেষ গড়নভঙ্গী আর রয়েছে যান্ত্রিক নির্মাণশৈলী। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রভাবে বাইরের আলোকের প্রতিফলনে সক্ষম। যে যন্ত্রটির মাধ্যমে সম্পাদন করে এ প্রতিফলন কর্ম তাকে বলা যেতে পারে অক্ষিগোলক। এ প্রতিফলন কর্মকেই আমরা বলি দেখা। কিন্তু হেগেলীয় দর্শন চোখকে দেখবে অন্যভাবে। চোখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার না করে বলবে চোখ মানব-শরীরের একটা অংশ। ব্যক্তি-মানুষ আবার সমাজ-মানুষের একটি অংশ। সমাজ যখন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখনই আসে সাবালকত্ব। তাঁর মতে রাষ্ট্র মানুষের হাতে গড়া ঐশী-প্রেরণার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক। ওখানে তিনি থামেননি। বিষয়টি অনেকদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছেন। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ক্ষতিকর নয়, বরং লাভজনক। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই ঐশী-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে। হেগেল জীবনে প্রাশিয়ার বাইরে যাননি, তাই জার্মান রাষ্ট্রকেই বিশ্বরাষ্ট্র বুঝতেন। এখনো হয়নি তবে হওয়ার পথে। প্রমাণ করার জন্য বিরাট বিরাট কেতাব লিখেছিলেন। তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ছিল দর্শনের অন্তরালে, সম্রাট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে শীগগির বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বলা বাহুল্য সে কর্মটি কাইজার এবং হিটলার উভয়ে করেছিলেন। হেগেলের দর্শন নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড মানবচিন্তার প্রকাশ। কিন্তু রাসেলের সে চোখের ব্যাপারটির কোনো সমাধান নেই তাতে।

বিষয়কে ধরে দেখা, ছুঁয়ে দেখার ইংরেজসুলভ প্রাকটিক্যালিটি তাঁকে হেগেলের দর্শনের স্বর্গের বর্বর উন্মাদনা থেকে রক্ষা করেছে। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তত্ত্বের নিরিখে বারবার প্রায়োগিক দিকটি যাচিয়ে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। বলতে হয় তাঁর দর্শনের এই ভঙ্গীটি তাঁকে করে তুলেছে সংশয়বাদী। প্রশ্ন না করে, বিচার না করে কোনকিছুই গ্রহণ করতে রাজী নন। শুরুতে বাঁকাদৃষ্টিতে দেখেছেন বলে লোকে ভুল বুঝেছে, কিন্তু মনটা বাঁকা ছিল না। রাসেলের দর্শনটি নমনীয় নয়। মানুষকে জ্ঞানী, বিচারশীল এবং সহনশীল করার মোক্ষম অস্ত্র। জ্ঞানী করা এবং হয়ে ওঠা এক নয়। শুধু মাত্র কেতাবের বিষয় হলে দর্শন এবং দার্শনিক দুয়ের সম্মান অটুট থাকে। দৈনন্দিন জীবনের বাঁকাচোরা, ব্যক্তিক, জাতিক, আন্তর্জাতিক সমস্যার সামনে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকতে হলে দর্শন এবং দার্শনিক দুয়েরই ভাগ্যে গালমন্দ এমনকি শাস্তি পর্যন্ত জোটে। রাসেলেরও তা জুটেছে। তাঁর দেখার দৃষ্টিতে যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘটনা ঘটেছে ভিন্নরকম। তাই রাসেলকে মত বদলাতে হয়েছে। তাঁর অভিপ্রায় ছিল মানুষের অন্তরের সত্য এবং জগতের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত টেনে আনা। তাতে করে সাধারণ মানুষ তাঁর চিন্তার সূত্র ধরতে পারেনি। অনুরাগী এবং বন্ধুজনের কাছেও রাসেলকে খিদঘুটে ঠেকেছে। বস্তুত তিনি অঙ্ক, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের নীতি মাংসল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মানুষের জগতে প্রয়োগ করেতে চেয়েছেন। ঐ সকল শাস্ত্রে রাসেলের সিদ্ধান্ত অনেক সময় কার্যকরী। দলমত নির্বিশেষে অনেকেই মনে করেন, বিশেষ বিষয়ে তাঁর মতামত অনেক বেশি মূল্যবান এবং তা যে টেকসই হবে তাতে দ্বিমত পোষণ করার মানুষ খুবই স্বল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উদারনৈতিক রাসেল স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে ধারণায় এসেছেন মার্কসবাদী ক্রিস্টোফার কডওয়েলও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

যেহেতু রাসেল আরোহ তথা ইণ্ডাকটিভ পদ্ধতিতে শুরু করেছিলেন, তাই তাঁকে ঘটনার অভিঘাতে যুক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে হয়েছে। মার্কসবাদের সঙ্গে রাসেলের বিরোধের স্থল এখানে। মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে অনেকটা ডিডাকটিভ পদ্ধতিতে বিচার করেন। দুই বিচারধারা এক নয়। রাসেলের প্রথম যৌবনে তিনি সংগ্রামী মানবতার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন।*

এখানে একটা জিনিস ভেবে দেখার রয়েছে। অন্যান্য নাম করা ব্রিটিশ-মার্কিন বুদ্ধিজীবী, লেখক, চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক যেখানে আপোষ করে খানাখন্দের মধ্যে অঘোষিতভাবে তলিয়ে গেলেন, অনুরূপ অবস্থায় রাসেল এগিয়ে আসতে পারলেন কেন?** যে সন্দেহ রাসেলকে সহজ বিশ্বাসী হতে দেয়নি, কঠিনের পূজারী করেছে, তার বলেই রাসেল বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। রাসেলের ভুলচুক আছে – কিন্তু তিনি চলমান মানব। তাঁর জীবনপথের ধ্রুব নক্ষত্র দুটি। এক সত্য, অন্য স্বাধীনতা। সত্য বলতে চ্যাপ্টা এবং গোলাকার যুগপৎ সেরকম কোনো পদার্থ নিশ্চয়ই রাসেল মনে করতেন না। সত্য চলমান, সত্য সজীব, সত্য মরমীর আনন্দে, কবির কাব্যে, বিজ্ঞানীর গবেষণায়, শ্রমজীবী মানুষের ঘাম-শ্রম-সংগ্রামে নিত্য মুকুলিত হচ্ছে।

জ্ঞান এবং জীবনকেও তিনি দেখেছেন একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের জীবনের চারধারে যে অদেখা অন্ধকার কুহক সৃষ্টি করে, জ্ঞানের শাণিত তলোয়ারে হত্যা করে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন প্রবাহিনী নদীরূপে। জীবন সুন্দর হবে, সুখী হবে, বলিষ্ঠ, ভাবনা-সমৃদ্ধ হবে এবং আকাশের আয়তনে মাথাতোলা সবল শুকগাছের মতো বাড়বে; তাই তিনি জ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে কারাগার থেকে লেখা একটি চিঠিতে তা কিভাবে ধ্বনিত হয়েছে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'I want to stand at the rim of the world and peer into the darkness behind and see a little more than others have seen of the strange

* এই অনুচ্ছেদটি ২০০০ সালে প্রকাশিত লেখকের আহমদ ছফার প্রবন্ধ পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে। বাঙালী মুসলমানের মন গ্রন্থে এটি নেই। – সম্পা.

** এখানে, বাঙালী মুসলমানের মন গ্রন্থে ডি এইচ লরেন্সের সঙ্গে তুলনা টেনে আহমদ ছফা লিখেছিলেন, "ডি.এইচ. লরেন্সের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি খনি মজুরের ছেলে। লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত জনের প্রতি তাঁর সমবেদনা অনেক বেশি বাস্তব এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি হলেন ফ্যাসিবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ এবং মাতৃতন্ত্রমূলক যৌন সর্বস্বতাবাদের প্রবক্তা। আমাদের গোড়ার দিকে যেতে হবে।" পরবর্তীকালে প্রকাশিত আহমদ ছফার প্রবন্ধ গ্রন্থে লেখক সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় এই অংশটুকু বর্জন করেছেন। – সম্পা.

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

shapes of mystery thet inhebit behind that unknown night. I want to bring back into the world of men some little bit of wisdom. There is e little bit of wisdom in the world. Heraclitus. Spinoze end e seying here end there. I went to edd to it, even if only ever so little.'

এই কথা ক'টির মধ্যে রেনেসাঁ যুগের শিল্পী মিকেলেঞ্জেলোর আদম-চিত্রের সম্মোহিত তরুণের স্বপ্নময়তার সঙ্গে যে বলিষ্ঠ বাসনা রঙের কুশলী ছটায় ফুটে বেরিয়েছে — তেমন একজন মানুষের বুকের হৃদস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। যাঁর কামনা প্রথম মানুষটির মতো — অবশ্য বাইবেলীয় অর্থে নয়। তিনি পুরনো কোনকিছুতে নির্ভর করতে চান না। অতীতের জ্ঞানীরা ধ্যান-দৃষ্টিতে যা দেখেছেন — তার বাইরে দেখতে চান, বাড়াতে চান নিজের পৃথিবীর সীমানা। সে দেখা শুধু রাসেলের দেখা নয় — তাঁর যুগ, তাঁর জেনারেশনের দেখা। তাই যতই দিন যাবে রাসেল স্বচ্ছ হয়ে উঠবেন।

রাসেলের আত্মকথার পাঠকের দুটি নেহায়েত মামুলী টুকিটাকির প্রতি দৃষ্টি পড়তে পারে। প্রথম যৌবনে তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি কিছু কামনা করেননি। শুধু চেয়েছিলেন সন্তানের জনক হতে। একেবারে আদিম কামনা। জুলু-হটেনটটের সঙ্গে কেনো প্রভেদ নেই। প্রথম সন্তানের জনক হওয়ার সংবাদ এমন বিভোর আনন্দে পরিবেশন করেছেন নেহায়েত জৈবকর্মে বিরক্ত মানুষের মনেও এক ঝলক দখিনা হাওয়া সমীরিত হয়। এই মানুষী আবেগটিই রাসেলের অমরত্বের কারণ। তিনি বিশাল পুরুষ, বিখ্যাত মানুষ। কণ্ঠস্বর আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে পাঁচ মহাদেশের কানে কানাকানি করে। এমন বিখ্যাত মানুষের আনন্দিত হওয়ার জন্য সুগায়কের গানের একটা কলি, জাতশিল্পীর ছবির একটু দর্শন, সবুজ বনানীর একটু অন্তরঙ্গ নিবিড় ছোঁয়া এই-ই যথেষ্ট। হাসি পাওয়ার মতো সাধারণ। সমস্ত অসাধারণেরাই অতিবেশী সাধারণ, কথাটি বোধকরি সত্য।

১৯৬৯

বাঙালী মুসলমানের মন
(১৯৮১ / ১৯৯৬)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মাদ্রাসা শিক্ষার কথা

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অনেকে কথাবার্তা বলছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের নানা পরামর্শও নানান ব্যক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাদ্রাসার যারা ছাত্র এবং মাদ্রাসাসমূহে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো মন্তব্য কিংবা পরামর্শ কোথাও চাওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত আলীয়া মাদ্রাসা এবং অন্যান্য মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে শুনেছি পাঁচ লাখের মতো। সরকারী মাদ্রাসা ছাড়াও দেশে কওমী বা ওয়াহাবী মাদ্রাসা নামে আরেক ধরনের মাদ্রাসা চালু রয়েছে। এই মাদ্রাসাসমূহে যে পরিমাণ ছাত্র পড়াশোনা করে তাদের পরিমাণ সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের চেয়ে কম হবে না বরং বেশি হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের কথা বলেন, তাঁদের সদিচ্ছার প্রতি আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষাকে যথার্থঅর্থে যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বেশিরভাগ ব্যক্তি মাদ্রাসা শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি জোর দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে মধ্যযুগীয় আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং মাদ্রাসাসমূহে যে সকল ছাত্র পড়াশোনা করে, আধুনিক জগৎ এবং জীবন সম্পর্কিত কোনো ধারণা তাদের স্পর্শই করে না।

মাদ্রাসাসমূহে যে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে তাতে আধুনিক জগৎ এবং জীবন-জিজ্ঞাসা কখনো অগ্রাধিকার লাভ করতে পারে না। মাদ্রাসা থেকে যে সকল ছাত্র পাশ করে বেরিয়ে আসে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের কোনো কাজে আসে না। মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রদের এক ভগ্নাংশ মাত্র মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং মাদ্রাসার শিক্ষক অথবা স্কুলের ধর্মশিক্ষক হিসেবে কাজ পেয়ে থাকে। বাকী সিংহভাগ ছাত্র সরকারী-বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পারে না। ফলে বেশিরভাগ মাদ্রাসা পাশ ছাত্রকে একরকম বেকার অথবা ছদ্মবেকার থেকে যেতে হয়।

যাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের কথা বলছেন তাঁরা আরো একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেটা হলো, এই বাংলাদেশের মতো একটি দেশের মধ্যে দুটি আলাদা শিক্ষাপদ্ধতি যদি থাকে তাহলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা দ্বিমুখিতা, একটা দ্বিধান্বিত দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত দৃষ্টিভঙ্গী অথবা দ্বিমুখী নীতি কখনো ভালো ফল প্রসব করতে পারে না। তাই তাঁরা বলছেন স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাসহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের পাঠ্যসূচী অবিলম্বে চালু করা উচিত।

মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে একটা গুণগত এবং দৃষ্টিগত পরিবর্তন আসুক এটা সকলেই কামনা করেন। কারণ যে বিপুল পরিমাণ ছাত্র মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তাদের নীরব উপস্থিতির যে বোঝা সৃষ্টি হয় তার ভার আমাদের গোটা সমাজকে একদিকে এমনভাবে চেপে রাখে, সমাজ অগ্রগতির পথে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। পৃথিবীর ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের একটি হলো বাংলাদেশ। এই দেশে কোনো খনিজ সম্পদ নেই, কাঁচামালের পরিমাণও প্রচুর নয়। আমাদের জনসমষ্টি, আমাদের জমি, আমাদের জল একমাত্র সম্পদ। এই দেশে যদি একটা বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই, তাহলে প্রতিটি নাগরিককে কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়টিকে অবশ্যই আমাদের সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা যেভাবে চলছে এভাবে চলতে পারে না। যদিও অনেকে বলে থাকেন মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ধর্মশিক্ষা আর বেকার এবং অকর্মা লোক তৈরি করা কিছুতেই এক হতে পারে না। সুতরাং অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বড় ধরনের সংস্কার কর্মকাণ্ড শুরু হওয়া উচিত। সমাজকে যদি খোলনলচে পাল্টে আধুনিক জগতের স্রোতে টেনে আনা সম্ভব না হয়, তবে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হব — এই কথা দিবালোকের মতো সত্য। তথাপি সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা সংস্কারের যে সকল প্রস্তাব রাখছেন সে-পন্থা অনুসরণ করে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সত্যিকার কোনো সংস্কার করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। তার কারণগুলো বলতে চেষ্টা করছি।

মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতির একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান। সুতরাং এই শিক্ষাপদ্ধতিতে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয়, এই পরিবর্তনের দাবীটি সেই বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের মধ্য থেকেই সর্বপ্রথম আসতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষকরা এবং ছাত্ররা যদি পরিবর্তন না চান, তাহলে ওপর থেকে শুধুমাত্র

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একটা পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে কোনপ্রকার পরিবর্তন আনা যাবে না। এরকম ধারণা পোষণ করা অনেকটা বোকামির নামান্তর। এ পর্যন্ত কোথাও শোনা যায়নি যে, মাদ্রাসার শিক্ষকেরা কিংবা ছাত্রেরা মাদ্রাসা-পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন দাবী করেছেন।

বাইরে থেকে সরকারী নীতির বলে যদি মাদ্রাসা শিক্ষা পাল্টাতে বাধ্য করা হয় সেক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা বেঁকে বসবেন। তাঁরা বলতে থাকবেন — 'আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং ধর্মের শত্রুরা সমাজে নাস্তিকতা কায়েম করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতির ওপর জোর-জবরদস্তি চালাচ্ছে।' যেহেতু সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলো সরকারের অনুদান গ্রহণ করে থাকে, তাই তাদেরকে সরকারী নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। জোর করে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করা সম্ভব হলেও দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক পাঠসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হবে না।

আগেই বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহ ছাড়াও আরো এক ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে, সেগুলোতে যত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে তাদের পরিমাণ সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে বেশী। ওয়াহাবী বা কওমী মাদ্রাসাসমূহ সরকারের কাছ থেকে কোনো অনুদান গ্রহণ করে না। তাদের কর্মকাণ্ডের ধরনটাই আলাদা। সমাজ এই মাদ্রাসাসমূহকে দান-অনুদান দিয়ে টিকিয়ে রাখে। কোরবানীর চামড়া, যাকাত এই মাদ্রাসাসমূহ গ্রহণ করে থাকে। বেশীরভাগ মানুষ পুন্যকর্ম হিসেবে মাদ্রাসাতে অর্থ, ভূমি এসব দান করে থাকেন। ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেও এই ধরনের মাদ্রাসাসমূহ ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছ থেকে চাঁদা তোলে।

My All Garbage

বিগত পনেরো/বিশ বছর থেকে দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ থেকে এই মাদ্রাসাসমূহের জন্য চাঁদা এবং অর্থ দানের আকারে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সব মাদ্রাসায় মধ্যপ্রাচ্যের অর্থ আসে না। যেগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের সাহায্য আসে সেগুলোর রমরমা অবস্থা। পাকা দালান, সুবিস্তৃত পরিসর, বিরাট কম্পাউণ্ড রয়েছে এরকম মাদ্রাসায় সংখ্যা গোটাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ। আবার এমনও দেখা গেছে, কালো টাকার মালিকেরা রাতারাতি সম্মান কেনার জন্য মাদ্রাসাসমূহে বড় বড় অঙ্কের টাকা দান করে থাকে। আমি মায়ানমার সীমান্তে টেকনাফে একটি মাদ্রাসা এবং একটি স্কুল, দুয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় সমান সমান; বার্ষিক ব্যয়ের বিষয়টি তুলে ধরছি।

হাই স্কুলের পেছনে এক বছরে অর্থ ব্যয় হয়েছে এগারো লাখ কত হাজার টাকা। কিন্তু মাদ্রাসার পেছনে ব্যয় করা হয়েছে এক কোটি কত লাখ টাকা, সঠিক সংখ্যাটি মনে নেই। এই অর্থের কানাকড়িটিও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছ থেকে নেয়নি। দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ, যেখানে চোরাচালানের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা, সেসব জায়গায় মাদ্রাসাসমূহের আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ বেশি। চোরাচালানিদের অপরাধবোধ জন্য

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেয়, মাদ্রাসায় মোটা অঙ্কের অর্থদান করে এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে চেষ্টা করে। এটাও ঠিক যে, বিগত পনেরো/বিশ বছরে সারাদেশে বিস্তর মাদ্রাসা তৈরী হয়েছে এবং সেগুলোতে সরকারের কোনো প্রভাব নেই এবং তারা সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করে না। সুতরাং সরকার ইচ্ছা করলেও তাদের ওপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না। বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতা এই যে, একটি গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও মাদ্রাসা একটা ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মাদ্রাসার লোকেরা অসন্তুষ্ট হলে একজন প্রার্থীর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভ করাও একরকম অসম্ভব।

বাংলাদেশে এমন কতিপয় ওয়াহাবীদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলোকে আয়তন এবং সম্পদের দিক দিয়ে এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন কামরাঙ্গির চরে হাফেজ্জী হুজুরের মাদ্রাসা, লালবাগ মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের পটিয়া, হাটহাজারী ইত্যাদি। এই মাদ্রাসাসমূহের কোনো কোনোটার সঙ্গে সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যোগাযোগ রয়েছে। তারা ওই সমস্ত দেশ থেকে নিয়মিত দান-অনুদান পেয়ে থাকে।

যদি মাদ্রাসাসমূহে আইন করে কিছু সংস্কার করাও হয়, সে সংস্কার এই মাদ্রাসাসমূহকে স্পর্শ করবে না। সরকার যদি তাদের ওপর জোর প্রয়োগ করে, তারা পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে বলবে — 'তোমরা খ্রীষ্টান পাদরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নটরডেম কলেজ চালাতে দিচ্ছ, মিশনারী স্কুলসমূহ চালু রেখেছ, সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিজাতীয় আদর্শে চালিত গণ্ডায় গণ্ডায় কিণ্ডারগার্টেন স্কুল চালানো মেনে নিচ্ছ অথচ আমাদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে এসেছ, কেননা আমরা ইসলামের সেবায় রত রয়েছি।

আলীয়া এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহ ওয়াহাবী মাদ্রাসার তুলনায় অনেক বেশী নমনীয় এবং পরিবর্তনপন্থী। এই সময়ের মধ্যে এই মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন হয়েছে। ছাত্রদের ধর্মীয় বিষয় ছাড়া বাংলা, ইংরেজী, সমাজপাঠ এসব বিষয়েও পড়াশোনা করতে হয়। এই ধরনের মাদ্রাসা থেকে জামায়াতে উলা অথবা টাইটেল পাশ করে অধিকতর উদ্যোগী ছাত্ররা কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। কিন্তু ওয়াহাবী মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীতে কোনরকম পরিবর্তন হয়নি। যাঁরা এ ধরনের মাদ্রাসাসমূহের কর্ণধার তাঁরা পরিবর্তনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। ওয়াহাবী মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। তাঁরা বলতেও কুণ্ঠিত হন না — 'লর্ড. ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। ওয়ারেন হেষ্টিংস যে মাদ্রাসা তৈরি করেছেন তার চেহারাটি ইসলামী হলেও প্রাণবস্তুর মধ্যে ইসলাম নেই।'

কওমী মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে ওয়াহাবী আন্দোলনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ওয়াহাবীরা দীর্ঘকালব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন এবং ওয়াহাবী আন্দোলন একটি গৌরবময় উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামী ঐতিহ্যের দাবীদার।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই বিশেষ ঐতিহ্য লালন করার জন্যই দেওবন্দে প্রথম একটি মাদ্রাসা তৈরি করা হয়েছিল। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে দেওবন্দ মাদ্রাসা একটি প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমদের বিরাট অংশ ভারত-বিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। এই দেওবন্দপন্থী মাদ্রাসাগুলোকে ওয়াহাবী বা কওমী মাদ্রাসা বলা হয়ে থাকে। ওয়াহাবী মাদ্রাসাসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এক ধরনের গর্ব এবং অঙ্গীকারবোধ ক্রিয়াশীল। তাঁরা মনে করেন শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর আদর্শ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের নিজেদের অনুসৃত শিক্ষানীতি ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষনীতি গ্রহণ করার কোনরকম দায়বদ্ধতা তাঁরা স্বীকার করেন না। এই কারণে এই সকল মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারেনি। সরকার যদি আইন করে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে একটা সংস্কার আনতে চান তাঁরা সেটা মেনে নেবেন না। তাঁরা বলবেন — 'আমরা সরকারের অর্থ এনে করিনি, সুতরাং সরকারী আইন কেন মানব?'

যদি অধিকতর চাপাচাপি করা হয় ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলতে পারেন, 'ওই সকল দেশেও ক্যাথলিকদের একাংশ ক্যাথলিক মতে ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রোটেস্টান্টরা কোনো কোনো জায়গায় তাঁদের ধর্মমতে স্কুল-কলেজ চালায়। সুতরাং আমরা পারব না কেন?'

যে-সমস্ত ব্যক্তি মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের কথা বলেন, তাঁদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত। এ সকল ব্যক্তি যখন পরিবর্তনের কথা বলেন, তাঁদের কথা শুনে কওমী মাদ্রাসার অনেক শিক্ষককে বলতে শোনা গেছে — 'তোমাদের যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছ সেটা যে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা একথা প্রমাণ করার উপায় কি? তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে প্রতিদিন খুনোখুনি হচ্ছে, মাসের পর মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে। তোমরা পড়িয়ে-শুনিয়ে লায়েক করে যে-সমস্ত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি করছ, তাদের মধ্যে কত অংশ চাকরিবাকরি পেয়ে থাকে? আর তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বেকারেরা সমাজের কোন্ উপকারে আসে? আমরা ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকি। এই দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। সুতরাং ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তোমরা ধর্মশিক্ষার সঙ্গে জাগতিক শিক্ষা গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছ। কারণ তোমাদের মনে এক ধরনের বদমতলব কাজ করে থাকে। তোমাদের কথা আমরা মানব কেন?'

এই পর্যালোচনাটিকে আমরা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাই। মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করে থাকেন তার প্রধান একটি কারণ এই যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে থাকে। এই মনোভাব এই ধরনের লোকদের মধ্যে এতদূর গাঢ়মূল হয়েছে, নাটকে, নভেলে ও সিনেমায় কোনো অপরাধীর চরিত্র দেখাতে হলে একজন দাড়িওয়ালা-টুপিওয়ালা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মওলানাকে নিয়ে আসা হয়। মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি এই মারাত্মক সহানুভূতিহীনতা তাঁদের অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্তন-বিরোধী করে তুলেছে।

বাস্তবিক মাদ্রাসাতে যারা পড়াশোনা করে থাকে তাদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। যে সমস্ত ছাত্র স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারে না তাদের বেশিরভাগ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে আসে এবং সমাজের দান-খয়রাতের অর্থে তাদের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করতে হয়। কোনো কোনো ধনী ভদ্রলোক পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা এবং মা-বাবার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রামে-গঞ্জে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কখনো মাদ্রাসায় পড়তে দেন না। ধনী এবং সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা খুব অল্পই মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করতে আসে। বেশীরভাগ গরীব, বিত্তহীন পরিবারের ছেলে হওয়ার কারণে এবং ভবিষ্যতের কোনরকম নিরাপত্তাবোধের অভাবের দরুন তাদের মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতাবোধ আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই হীনম্মন্যতাবোধ যখন প্রাতিষ্ঠানিক আকার লাভ করে সেটা একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোনরকমের পরিবর্তনের কথা উঠলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

যাঁরা যুগের দাবীর তাগিদে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবর্তনের কথা বলেন, তাঁদের মধ্যে এমন একটা মনোভঙ্গী প্রকট হয়ে ওঠে — বন্যজন্তুকে ধরে শিক্ষা দিয়ে পোষ মানানোর মতো করে মধ্যযুগীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান। এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মানবিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মানবিক সহানুভূতির কোনো সংযোগ নেই। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, মাদ্রাসা-কলেজের শিক্ষা এবং স্কুলের শিক্ষা এক অপরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষিত ব্যক্তিরা এক ধরনের চাপা ঘৃণা, ক্ষোভ এবং অবিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

যে কোনরকমের পরিবর্তনের জন্য এক ধরনের বিশ্বাসবোধ, আস্থা, মানবিক সম্মাননা এবং শ্রদ্ধা থাকার প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া মানুষের সামান্যতম কল্যাণ করা সম্ভব নয়। যাঁরা পরিবর্তনের কথা বলছেন, বলছেন এ কারণে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়েছে এবং যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করছে না। কিন্তু যাঁরা মাদ্রাসার শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তাঁরাও তো মানুষ। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রতি এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে থাকেন, যেরকম দৃষ্টিভঙ্গী উঁচুবর্ণের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি পোষণ করেন। তাই ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যখনই পরিবর্তনের কথা বলেন, মাদ্রাসার লোকেরা তত বেশি জেদের সঙ্গে পুরনো পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। এইভাবে যদি চলতে থাকে মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন আনা অনেকদিন পর্যন্ত অনিশ্চিত থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পণ্ডিতবর্গ তাঁদের মডেলটি মাদ্রাসার ওপর চাপাতে গেলে মাদ্রাসার লোকেরা দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই নিবন্ধে আগেই বলা হয়েছে, সরকার আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার ওপর থেকে আরোপ করে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা সমতা আনতে পারবে না। কারণ অর্ধেকের চেয়ে বেশী মাদ্রাসা সরকারের কাছ থেকে কোনরকমের অর্থ গ্রহণ করে না এবং কোনভাবে সরকারের কাছে দায়বদ্ধ নয়। এই মাদ্রাসাসমূহ সবসময় সরকারী আওতার বাইরে থেকে যাবে। মাদ্রাসার প্রতি শিক্ষিত লোকেরা এক ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে থাকে। আর মাদ্রাসার লোকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের মতো। বাইরের পৃথিবীতে যতই পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যাক, সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। তাঁরা মৃত অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, হাজার চেষ্টা করেও একটা আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় তিনরকম শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসবোধ সমানে কাজ করে যাচ্ছে।

এই তিনরকম শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা না যায়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা কার্যকর পরিবর্তন আনা যাবে না। পারস্পরিক দূরত্ব একের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছে। যদি এরকম একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা হত সেখানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের এক জায়গায় ডেকে আনা হত এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হত, শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্যে কেন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন সেটা ব্যাখ্যা করে মাদ্রাসার শিক্ষকদের মানসিক ভীতি অপনোদন করা হত, অনেক বেশি সুফল পাওয়া যেত।

বর্তমানে একেকটি রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে চাইছে। সেখানেই আমাদের জাতীয় বিপত্তির সমস্ত উৎস। রাজনীতি ছাড়া দেশ চলে না। কিন্তু রাজনীতির লোকেরা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এক জায়গায় জড়ো করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কি ধরনের সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে মতামত যাচাই করে দেখতে পারতেন। এই ধরনের সম্মেলন ঘন ঘন ডাকা হলে শিক্ষা-পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে জড়িত লোকদের ভুল বোঝাবুঝির অনেকখানি অবসান হত, আমাদের বিশ্বাস মাদ্রাসার শিক্ষকেরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সংস্কার-কর্মসূচী গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতেন।

আমরা এই নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শিক্ষাকে সরকারীকরণ করা হলে শিক্ষার উন্নতি হয় একথা পুরোপুরি সত্য নয়। প্রাইমারী স্কুলগুলোকে সরকারীকরণ করার একটা মারাত্মক কুফল হল এই যে, আগে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হত। বর্তমানে থানার শিক্ষা অফিসারকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তাদের দায়দায়িত্ব সবটা মিটে যায়। সমাজের কথা না ভাবলেও চলে। হাজিরা খাতায় নাম সই করে মাসের শেষে মাইনে নিতে তাঁদের অনেকের আটকায় না। মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী আওতায় আনলেও যে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে সে কথা ঠিক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নয়। মাদ্রাসাগুলো তাদের পদ্ধতি রক্ষা করে যুগের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। নিজেরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে বেশি ভাল ফল পাওয়া যাবে। সব কথার সারকথা হলো যুগের প্রয়োজন স্বীকার করা। কর্মক্ষম এবং যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা। এই প্রয়োজনটুকু সকলের মনে গেঁথে দিতে পারলেই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের পথটা প্রসারিত করা যাবে।

১৯৯৫ *রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ*

(২০০০)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আধুনিক আরবী-ফার্সী ও আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা

কিছুদিন আগে গ্রামে গিয়েছিলাম। এবার নতুন যে জিনিসটি চোখে পড়ল গ্রামে আর একটি নতুন জুনিয়র মাদ্রাসা জন্ম নিয়েছে। আগে গ্রামে একটি সিনিয়র মাদ্রাসা ছিল। গ্রাম থেকে চলে আসার দুদিন আগে আমার ভগ্নিপতি এবং আরও কিছু প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে জানালেন, তাঁরাও গ্রামে একটি মাদ্রাসা তৈরি করতে চান, আমি কোনকিছু সাহায্য করতে পারি কিনা। চলে আসার পথে গ্রামের বাজারে চা খেতে বসেছিলাম। আমার স্কুল-জীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। এখন কলেজে পড়ায়। আগে কলেজটি বেসরকারী ছিল, এখন গ্রামের মন্ত্রীর বদৌলতে সরকারী হয়েছে। বন্ধুটির মুখে বেশ ঝোপের মতো দাড়ি। সে আমার সামনে একটি চাঁদার বই প্রসারিত করে বলল, 'চাঁদা দাও।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের? অধ্যাপক জানালেন তাঁর বাড়িতে তার বাবার নামে একটা মাদ্রাসা বানিয়ে ফেলেছেন। অনেকদিন পর দেখা, আমি দুশো টাকা চাঁদা দিলাম। বন্ধুটির মুখে হাসি ফুটল না। বুঝতে পারলাম বেশি কিছু আশা করেছিলেন। বন্ধুটির বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে, একই ইউনিয়নের ভেতরে।

আমাকে প্রায়শ গ্রামে-গঞ্জে যেতে হয়। যে জিনিসটি চোখে পড়েছে, গ্রামে মাদ্রাসা তৈরি করার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। এমন লোকজনও আমার কাছে মাদ্রাসার জন্য সাহায্য চাইতে এসেছে যাদের ছেলেমেয়েরা কস্মিনকালেও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করবে না। আমি জানতে চেয়েছি, 'আপনাদের ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়বে না তবুও আপনারা মাদ্রাসা করতে চান কেন?' নানারকম জবাব পেয়েছি। সেগুলো এরকম, 'গ্রামের অপর পাশে অমুক ধনী ব্যক্তি একটি মাদ্রাসা করে ফেলেছেন। আমার অংশে একটি মাদ্রাসা না থাকলে কেমন দেখায় অথবা আমি যদি একটি মাদ্রাসা তৈরি করতে পারি গ্রামে দ্বীন-ই এলেম চর্চা হবে।' এগুলো হলো মুখের কথা — আসল বিষয় অনেকেই বলেননি। গ্রামের ভোটে নির্বাচিত হওয়া, গ্রামীণ-সমাজে কেউকেটা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণেই সকলে মাদ্রাসা বানাতে চান। আমি টেকনাফ থানার একটি গল্প শুনেছি। সেখানে একটি মাদ্রাসায় পেছনে বছরে কোটি টাকার মতো খরচ হয়। পাশে একটি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হাইস্কুল আছে। ঐ স্কুলে সারাবছরে ব্যয় হয় দশ লাখ টাকার মতো। স্কুলের ব্যয়ভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার বহন করেন। মাদ্রাসার ব্যয়ভার অধিকাংশই সমাজ বহন করে থাকে। শুনেছি ঐ টেকনাফের সীমান্ত-চোরাচালানী ধনীদের অনেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করার জন্যে মাদ্রাসাতে চাঁদা দিয়ে থাকে।

মাদ্রাসা সম্পর্কে ঢালাওভাবে খারাপ মন্তব্য করা আমার ইচ্ছা নয়। এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মাদ্রাসার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার একটা সংযোগ মনে মনে পোষণ করেন। সুতরাং মাদ্রাসা সম্পর্কে কোনো কিছু অন্যায্য বলে ফেললে তাঁদের প্রাণে চোট লাগার কথা। জমানা অনেকদূর পাল্টে গেছে। আমাদের গ্রাম, গ্রামে কেন, শহরের জীবনে ক্ষমতা-কাঠামোতেও মাদ্রাসা একটি ভূমিকা পালন করছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মাদ্রাসার সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা কত আমি জানিনে, এক বন্ধু বলেছেন, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত ছাত্রসংখ্যার চাইতেও মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা বেশি। আবার মাদ্রাসাগুলোও তো এক রকম নয়। কতগুলো মাদ্রাসায় স্কুলের মতো ইংরেজী-বাংলা পড়ানো হয়। এছাড়া আরো মাদ্রাসা আছে যেগুলোতে আধুনিক যুগের উপযোগী কোনো বিষয়ই পড়ানো হয় না। যে মাদ্রাসাগুলোকে কাওমী বা ওহাবী মাদ্রাসা বলা হয় সেগুলোতে অদ্যাবধি দেওবন্দের পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই ওহাবী মাদ্রাসার সংখ্যাই সবচাইতে বেশি। ধরে নেয়া হয়ে থাকে মাদ্রাসাসমূহে শরা-শরীয়তের বিষয় ছাড়া আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই সকল ভাষা পড়ানো হয়। আমি খোঁজ করে কোনো মাদ্রাসায় আধুনিক আরবী বা ফার্সী জানেন এমন কোনো শিক্ষক বা ছাত্রের দেখা পাইনি। একমাত্র কামরাঙ্গীর চর মাদ্রাসায় একজন তরুণ শিক্ষকের দেখা পেয়েছিলাম, যিনি আধুনিক আরবী ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখেন। মাদ্রাসাগুলোতে শরা-শরীয়ত সম্পর্কে যা কিছু পড়ানো হয় সে সকল বিষয়ে ভালোমন্দ মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু মাদ্রাসাগুলোতে আরবী-ফার্সী বিষয়ে বা শিক্ষা দেয়া হবে সে বিষয়ে কিছু বলার অধিকার অবশ্যই আমার আছে। আরবী একটি আধুনিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার হয়েছে। তাছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় বিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা আরবী।

আরবী ভাষা জাতিসংঘের একটি মর্যাদাপ্রাপ্ত ভাষা। আরবী ভাষাতে এমনসব কবি-সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছেন যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন। এইতো কিছুদিন আগে মিসরের নাগিব মাহফুজ নোবেল প্রাইজ পেলেন। নাগিবের চাইতেও বড় লেখক আরবী ভাষায় অনেক রয়েছেন। আরবী ছাড়া আধুনিক ফার্সীও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা। অনুবাদের মাধ্যমে আধুনিক ফার্সী কাব্য, নাটক, উপন্যাস আমরা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের মাদ্রাসাসমূহে যে আরবী-ফার্সী পড়ানো হয় তার সঙ্গে আধুনিক আরবী বা ফার্সীর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে যে আরবী ভাষা পড়ানো হয় সেগুলো বহুকাল পূর্বের আরবী, ফার্সী। বর্তমানে ঐ ভাষা অচল হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে যদি আমরা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আধুনিক আরব দেশগুলো কিংবা আধুনিক ইরানের সঙ্গে সম্পর্কটাও রক্ষা করতে না পারি তাহলে ঐ শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে একটি প্রশ্ন অবশ্যই করতে হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার সবটা অর্থহীন একথা বলার আমার দুঃসাহস নেই; তবু যদি বলি অধিকাংশ মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকার অধিকাংশ বিষয় বর্তমান যুগে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে আশা করি অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমি অন্তত আমাদের মাদ্রাসাসমূহে আধুনিক জীবন্ত আরবী, ফার্সী পড়াবার কথা বলব যাতে করে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে পারি।

আনুপূর্বিক তসলিমা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ
(১৯৯৪)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অনানুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে

আমার শিক্ষার ওপর বলার বিশেষ যোগ্যতা নেই। বর্তমান নিবন্ধটিতে আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথা নিবেদন করতে চাই। ১৯৮২ সালের দিকে হবে, আমার হাতে একটি বই আসে। বইটির নাম ছিল 'Road to life', লেখক আনতোন মাকারেংকো। মাকারেংকো সাহেব ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের পর ছিন্নমূল শিশু-কিশোর এবং বিপথগামী যুবকদের শিক্ষা দেয়ার যে বিশেষ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন, এই বইটিতে তার নানামুখী অভিজ্ঞতার কথা বয়ান করেছিলেন।

লেখাটি পাঠ করার পর আমি অত্যন্ত চঞ্চল এবং উতলা হয়ে উঠি। আমার মনে হতে থাকে যে, আমার চারপাশে যে হাজারে হাজারে অবহেলিত শিশুরা রয়েছে তাদের প্রতি কোনো কর্তব্য আমি করিনি। একটি অপরাধবোধ আমার মনে পাথরের মতো চেপে থাকে। এই 'Road to life' বইটি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার জনাব নাজিমউদ্দিন মোস্তানকেও পড়তে দেই। তিনিও বইটি পাঠ করার পর আমার মতো উদ্দীপিত বোধ করেন এবং আমরা দুইজনে মিলে অনেক আলোচনার পর ঠিক করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে নীলক্ষেতের বস্তিতে শিশুদের একটি স্কুল তৈরি করে মাকারেংকোর কিছু আইডিয়া কাজে খাটাতে চেষ্টা করব। এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, শাহবাগের দক্ষিণে বর্তমানে যেখানে বঙ্গবন্ধু এবং শহীদ জিয়া ছাত্রাবাস দুইটি তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটি ছিল খালি এবং কাঁটাবন মসজিদটিও ছিল একেবারে ক্ষুদ্র। এই প্রশস্ত খালি জায়গাটিতে বসানো হয়েছিল হাজার হাজার ঝুপড়ি ঘর। আমরা এই বস্তিতে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে একটি স্কুলঘর করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বস্তির লোকজনের একাংশকে রাজি করালাম, আমরা যদি স্কুলটি চালু করি, তাঁরা যেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে অমত না করেন।

আমরা ছেলেমেয়েদের যখন পড়াতে শুরু করলাম, আমাদের একটা কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো। বস্তির এই শিশুদের মুখ থেকে অনর্গল অশ্লীল বুলি নির্গত হয়। একজন আরেকজনের মা-বাবা তুলে এমন অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে যে, শুনলে কানে হাত দিতে হয়। একজন শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার বাবা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কি করেন?' পাশের শিশুটি জবাব দেবে, 'অর বাপ ছিচ্‌কা চোর'। একটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার মা কি কাজ করেন?' তার বয়েসী পাশের মেয়েটি কালবিলম্ব না করেই জবাব দিয়েছিল, 'অর মা খারাপ কাম করে।' এই জাতীয় বাচনরীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না। তথাপি কি করব! বাচ্চাদের স্কুলটি যখন আরম্ভ করেছি, ফেলে দিয়ে তো আর আসতে পারিনে। বন্ধু-বান্ধবরা স্কুল ঘর বানানোর সময়েই বলেছিলেন, 'বস্তির পোলাপানদের পড়ানো তোমাদের কাজ নয়।' এখন যদি স্কুলটি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমাদের মুখ থাকে না এবং আত্মসম্মানবোধ ভীষণভাবে আহত হয়। অতএব আমরা বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলটা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

এখানে বলে রাখা ভালো, স্কুল চালানোর ব্যাপারে আমার কোনো কৃতিত্ব ছিল না। সিলেবাস তৈরি, শিক্ষকতার কাজ সবকিছু একা মোস্তান ভাই করতেন। তাঁকে রেজা নামের একটি যুবক সাহায্য করত। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সুন্দরপ্রাণ যুবকটি অকালে মারা যায়। নাজিমউদ্দিন মোস্তান সাহেবের মতো এরকম নিষ্ঠাবান শিশুদের দরদি মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। সব মিলিয়ে স্কুলটি আমরা সাত/আট মাসের বেশি চালাতে পারিনি।

এরশাদ সাহেব সবে ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁর লোকেরা মনে করলেন আমাদের বিশেষ রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। নইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা স্কুলটি চালাবার ঝুঁকি নেব কেন! জেনারেল আবদুর রহমান উদ্যোগ নিয়ে আমাদের পাশে আরেকটি স্কুল বানালেন। স্কুলে হাজিরা দিলেই শিশুদের মাথাপিছু আধাকেজি করে চাল দেবার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের স্কুলটি উঠিয়ে দিতে হলো। অবশ্য জেনারেল আবদুর রহমান কর্তৃক পাল্টা স্কুল করাই তার একমাত্র কারণ নয়। বলেছি, স্কুলটি বড়জোর সাত/আট মাস চালু রাখতে পেরেছিলাম। এই সময়টাতেই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলো কাটিয়েছি। শিশুদের শিক্ষা দিয়ে যে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় তার স্বাদ এত মধুর হতে পারে আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

এই স্কুল চালাতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেগুলো আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ মনে করি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দেশের অবহেলিত শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বৃহত্তর অর্থে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু অন্তরদৃষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হই। এই অন্তর্দৃষ্টি থেকে পরবর্তী কথাগুলো বলছি।

বস্তির শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে যে জিনিসটি আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হলো বস্তির শিশুদের গ্রহণশক্তি গড়পড়তা মধ্যবিত্ত শিশুদের চেয়ে অনেক প্রখর। শেখানোর পদ্ধতিটি যদি আনন্দদায়ক হয়, তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করতে পারে।

বস্তির শিশুদের নিয়ে আমরা একটা ফুটবল টিম করেছিলাম। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ওই বয়সের মধ্যবিত্ত শিশুদের চেয়ে তারা অনেক বেশি চৌকষ। আমরা যে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শিশুদের লেখাপড়া শেখাতাম তারা ছিল একেবারে বিত্তহীন মা-বাবার ছেলেমেয়ে। এই শিশুরা নিজেরাই নানারকম কাজকর্ম করে মা-বাবাদের সাহায্য করত। কেউ রাস্তায় ছেঁড়া-পুরনো কাগজ কুড়াত, কেউ লোহালক্কড়ের টুকরো সংগ্রহ করত। আবার কেউ নিউমার্কেট অঞ্চলে মিনতির কাজ করত। এরকম নানা ধরনের কাজ করে শিশুরা দৈনিক ৮/১০ টাকা উপার্জন করত। এই রোজগেরে শিশুদের দেখে আমার মনে একটি ধারণা জন্মায়, এখানে সেটা প্রকাশ করি।

আমাদের দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলোতে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছরে গিয়ে দেখা যায় তার পরিমাণ অর্ধেকে চলে এসেছে। সংখ্যাটি হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই যে, শিশুদের বাবা-মাকে নানা কাজে সহায়তা করতে হয়। ছেলেদের বাবার জন্য মাঠে ভাত নিয়ে যেতে হয়, হুঁকোটি দিয়ে আসতে হয়, গরু রাখতে হয় এবং মেয়েদের মাকে রান্নাবাড়ার কাজে সাহায্য করতে হয়। যেহেতু বেশিরভাগ মা-বাবা অভাবি, ছেলেমেয়েদের দিয়ে এসব কাজ না করিয়ে তারা পারে না। তাই ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। স্কুলে যদি ছেলেমেয়েদের কোনো কাজের ব্যবস্থা করা হত, যেগুলো করতে শিশুদের বিশেষ বেগ পেতে হত না, বরং শরীর গঠনের সহায়ক হত এবং সপ্তাহ কিংবা মাস অন্তর শিশুদের কিছু টাকা শ্রমের মূল্য হিসাবে পরিশোধ করা হত, আমার বিশ্বাস, অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না। অবশ্য স্কুলের পরিচালনা ব্যবস্থাটির মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন ছিল।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি সরকার কিছু পরিমাণে দৃষ্টি দিয়েছেন একথা স্বীকার করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পূর্বের তুলনায় অধিক মাইনে পেয়ে থাকেন। কমবেশি স্কুলগৃহের প্রতিও মনোযোগ দেয়া হয়ে থাকে, যদিও সবখানে নয়। কিন্তু এই সংশোধিত ব্যবস্থার মধ্যে আমি একটি বিরাট ত্রুটি দেখতে পাই। আগের দিনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা খুব কম বেতন পেতেন এবং তা-ও ছিল অনিয়মিত। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে তুলনায় মাইনে বেশি পেয়ে থাকেন এবং নিয়মিত পেয়ে থাকেন। কিন্তু তার পরেও শিক্ষাদান কর্মের প্রতি তাঁদের মনোযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

আগের দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হত। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অন্য দশটি অফিসের মতো নিজেদের সরকারী কর্মচারী মনে করেন। সমাজের কাছে কৈফিয়ত দেয়ার বদলে থানা শিক্ষা অধিকর্তাকে সন্তুষ্ট করে সপ্তাহে সাতদিনের জায়গায় তিনদিন স্কুলে এলেও মাসান্তে বেতন পেতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় না। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আগের দিনে থানাতে যে পরিমাণ দুর্নীতি হত, বর্তমান থানা শিক্ষা অফিসে তারও চেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়ে থাকে।

অবহেলিত শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা-পদ্ধতি নামে যে জিনিসটি চালু

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হয়েছে সে বিষয়ে কিছু কথা আমি নিঃসংকোচে বলতে চাই। 'ব্র্যাক' এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করার নাম করে যে ধরনের শিক্ষা দিয়ে আসছেন তা আমাদের দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে না বলে আমি মনে করি।

প্রথমত সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা সে কথাটিও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার দাবী রাখে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ যেভাবে অতিরিক্ত বিদেশী অনুদানের অর্থের বলে শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে চান, সেটা আদৌ একটি শিক্ষাদানের পদ্ধতি, এটা মেনে নিতে আমি ভয়ানক আপত্তি করব।

দ্বিতীয়ত আপত্তি করব তাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহের কারণে। এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট শ্রম এবং প্রযত্ন ব্যয় করেছেন। তাছাড়া আমাদের দেশের মক্তব-মাদ্রাসা ও টোলসমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহকে পাশ কাটিয়ে আনকোরা একটি নতুন পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে কোনো ফল পাওয়া যাবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

তৃতীয়ত যে কারণে আমি আপত্তি করব সেটা হলো এই পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা-পদ্ধতি বলে যে জিনিসটি এখানে চালানো হচ্ছে, তাতে পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাচিন্তার কোনো প্রতিফলন নেই।

পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা-দর্শনের মূলকথা হলো শিক্ষা একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া এবং এতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়াও পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের গতি-প্রকৃতির একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। এখানে সেটি মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। এ সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ভাবের ঘরে চুরি বলে যে একটি কথা আছে সেটি অহরহ ঘটছে। দাতা দেশগুলো বুঝতে পারছে না তাদের সহায়তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটছে না এবং গ্রহীতা দেশও উচ্চকণ্ঠে বলতে পারছে না, বিদেশী সাহায্য অর্থবহ করে তোলার জন্য ভিন্নরকম পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই ভিন্নরকম পদ্ধতিটির চেহারা কি রকম হবে আমি বলতে পারব না। অবহেলিত শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা সবাইকে গ্রহণ করতে হবে।

মানুষ যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এতদূর উন্নতি সাধন করেছে তার মূল কারণ শিক্ষা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের শিশুকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি অনেক বেশি ধৈর্য ও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধীরগতিসম্পন্ন। কে কি মনে করবেন জানি না, আমি কিছু অন্তর্দৃষ্টি, কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলাম।

১৯৯৩

সংকটের নানান চেহারা
(১৯৯৬)

My All Garbage
www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ফারাক্কার ষড়যন্ত্রের নানান মাত্রা

মহাভারতের একটি প্রসঙ্গ দিয়ে আমার কথা শুরু করি। একাবার যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরূপী বক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় কি?'

যুধিষ্ঠির জবাবে বলেছিলেন, সব মানুষ মরবে অথচ এ কথাটি সে ভুলে থাকে এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। যখনই ফারাক্কার কথাটা মনে জাগে, এ গল্পটির কথা মনে আসে।

আমাদের কারো জানতে বাকি নেই, ফারাক্কা ব্যারেজ বাংলাদেশের অর্ধেক এলাকা কারবালার মতো ধু-ধু মরুভূমিতে পরিণত করেছে। আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে যে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেছিল, মানুষ মানুষের এতটা সর্বনাশ করতে পারে ইতিপূর্বের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। বিশ্ববিবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই অপরাধের জন্য ধিক্কার জানিয়েছিল এবং এখনও ধিক্কার জানায়।

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, আমাদের বাংলাদেশে প্রতিবছর সেই পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিবছর এক-একটি হিরোশিমা-নাগাসাকি জন্ম নিচ্ছে। অথচ এখানে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ফারাক্কার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের জনগণের যে সচেতনতা থাকা উচিত ছিল তার শতাংশের একাংশও নেই। ফারাক্কাকে সবগুলো রাজনৈতিক দল মিলে একটা প্রধান জাতীয় সংকট হিসেবে শনাক্ত করতে পারেনি, এটা জাতীয় জীবনের এক বিরাট ব্যর্থতা। বর্তমানে ফারাক্কা সম্পর্কে যে যা-ই বলুক, সংকট মোকাবেলার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

বেগম জিয়াকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার সরকার ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে কি কি বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে — জবাবে বেগম জিয়া কি বলবেন অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তিনি বলবেন, আমরা প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করেছি। পৃথিবীর মানুষ জেনেছে ভারত আমাদের পানি দিচ্ছে না। আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি।

খুব সম্ভবত আগামী নির্বাচনে বেগম জিয়ার দল তাঁর সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক ফোরামে ফারাক্কার প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়টি তুলে ধরে জনগণের কাছে আবেদন রাখবেন — আমরা ফারাক্কার জন্য লড়ছি। সুতরাং আমাদের ভোট দিন। এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করে ভারত-বিরোধিতা উস্কে দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করবেন।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ নানা জায়গায় সভা-সমিতিতে ফারাক্কা প্রশ্নে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রশ্নে তাঁর দলের অবস্থান কোথায় ব্যাখ্যা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ করলে ওই দাঁড়াবে — বর্তমান সরকার ভারতের কাছে দাসখত দিয়ে বসে আছে। অথচ পানির ব্যাপারে কোনকিছুই করতে পারেনি এবং ক্রমাগত জনগণকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে তারা ফারাক্কা-প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো সবচেয়ে বড় ধোঁকা। ফারাক্কা প্রশ্ন জাতিসংঘের আলোচনায় স্থান পেয়েছে তাতে করে আমাদের পদ্মা নদীতে পানির ঢল নামেনি। জনগণ যদি আগামী নির্বাচনে আমাদের ভোট দেয় এবং আমরা যদি বিজয়ী হই, ইনশা'ল্লাহ্ ভারতকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের হিস্যাটুকু আমরা আনতে পারব।

জামাত নেতাদের প্রশ্ন করলে একই ধরনের রেডিমেড জবাব পাওয়া যাবে। তাঁরা বলবেন — বি.এন.পি. ও আওয়ামী লীগের ঈমানের জোর নেই এবং মুসলিম জনগণের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা নেই। তাই তাঁরা ভারতবর্ষের হিন্দুনেতাদের কাছ থেকে কোনদিন পানি আনতে পারবেন না। জনগণ যদি আমাদের নির্বাচনে বিজয়ী করেন ইনশা'ল্লাহ আমরা পানি আনব — পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ সবগুলো নদীতে প্লাবন সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ফারাক্কা প্রশ্নে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এ হলো অবস্থান। দুঃসাহসের মতো শোনাবে, তবু আমি বলব ফারাক্কা প্রশ্নে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা সংকট মোকাবেলার ব্যাপারে মোটেও সহায়ক নয়। আমি মনে করি আমাদের মেনে নেয়া উচিত, ভারত কোনদিন আমাদের পানি দেবে না। ফারাক্কা ব্যারেজ আমাদের অস্তিত্বের প্রতি একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। ভারত ঠাণ্ডা মাথায় দাবার ছকের মতো ধীরেসুস্থে, বুঝেশুনে ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছে।

জওহরলাল নেহেরুর সরকার যখন ফারাক্কার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল সেই সময়েই তারা একটা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পাছে তৎকালীন পাকিস্তানের তরফ থেকে কোনো বাধা এবং প্রতিবাদ আসে সে আশংকা করে তাঁরা বলেছিলেন — কলকাতা বন্দর চালু রাখার জন্য আমাদের পানির প্রয়োজন; তাই বাঁধ নির্মাণ করে অতিরিক্ত পানি ভাগীরথী খাত দিয়ে প্রবাহিত না করালে কলকাতা বন্দর বাঁচবে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কলকাতা বন্দর বাঁচানোর ধুয়াটি তোলারও একটি বিশেষ কারণ ছিল। পশ্চিম বাংলার জনগণ ফারাক্কার কারণে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, এরকম প্রবল মত সেই সময়ে পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। পশ্চিম বাংলার মানুষ যদি বাধা দিতেন তাহলে দিল্লীর শাসকেরা গঙ্গার উজানে বাঁধ তৈরি করতে সক্ষম হত না। পশ্চিম বাংলার লোকদের ভুলিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় শাসকেরা একটা স্তোকবাক্য আবিষ্কার করেছিলেন। আর সেটা হলো এই, 'আমরা পশ্চিম বঙ্গবাসীর স্বার্থেই এই ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছি।'

পশ্চিম বাংলার মানুষ একথা বিশ্বাসও করেছিলেন। তাই এ নিয়ে বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। যে সমস্ত ব্যক্তি বিজ্ঞান এবং পরিবেশগত যুক্তির কথা উত্থাপন করে এই বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করেছিলেন, ভারত সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের মতামত চেপে রাখতে বাধ্য করেছিল। প্রসঙ্গত প্রকৌশলী কপিল ভট্টাচার্যের কথাটি উল্লেখ করা যায়।

এই ভদ্রলোক ছিলেন ফারাক্কা ব্যারেজের প্রধান স্থপতি। ভারত সরকার তাঁকে স্থপতি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। কপিল বাবু সব ঘেঁটে-ঘুটে যখন বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এই বাঁধ পশ্চিম বাংলার মানুষের উপকারে আসবে না, বরঞ্চ তাঁদের একটা সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে ছুড়ে দেবে; তখন সবকিছু ব্যাখ্যা করে তিনি একটা পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। ভারত সরকার তাঁকে ধরে জেলে পুরে দিল এবং বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখল। কপিল ভট্টাচার্যের মতামত জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এই সন্দেহ করে দেয়ালে দেয়ালে প্রচারপত্র সেঁটে দিল ফারাক্কার ব্যাপারে, যে কেউ গুজব ছড়াবে তাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হবে। আসলে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম।

ভারত তার কৃষিব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছিল তলে-তলে। সেটা গোপন রেখে কলকাতা বন্দর চালু রাখার কথা বলে পরিকল্পনাকারীরা পশ্চিম বাংলার জনগণকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার পরও পশ্চিম বাংলার লোক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন কলকাতা বন্দর আস্তে আস্তে মারা যাবে। ফারাক্কা তাতে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না। কলকাতাকে বাঁচাবার জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। সংকটের চেহারাটা তখনই তাঁরা আঁচ করতে চেষ্টা করলেন যখন জানতে পারলেন কেন্দ্রীয় সরকার কানপুরের তেহরীতে গঙ্গা নদীর ওপর আরো একটা বাঁধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

গঙ্গার পানিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার অভিপ্রায় থেকেই তাঁরা প্রথম ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করেছিলেন। তার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আছে। এই রচনায় সেটিও বলার চেষ্টা করব।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় বাঁধটি নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নিলেন, অনেকে মনে করেন তাতে ভারতের হিন্দী বলয়ের শাসকগোষ্ঠীর একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রের জোড়াগুলো কাঁপছে। কাশ্মীরীরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম করছে। পাঞ্জাবী শিখরা বিক্ষুব্ধ এবং পশ্চিম বাংলা হলো ভারতের ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতম অংশ। অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পশ্চিম বাংলা ভিন্ন চিন্তা করতে পারে। সে কথা আগাম চিন্তা করে হিন্দী বলয়ের কর্তারা তেহরীতে আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করে গঙ্গা নদীর পানির ওপর একচ্ছত্র অধিকার অর্জন করতে চান। যদি সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তাঁরা গঙ্গাকে ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়তে দেবে না। তাঁরা গঙ্গার সঙ্গে গোদাবরী কিংবা নর্মদা যে সকল নদী আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে তার একটার সঙ্গে জোড় বেঁধে দেবেন। এগুলো আমার নিজের কথা নয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিজের জবানিতে প্রকাশ করলাম মাত্র।

ফারাক্কা ষড়যন্ত্রের একটি যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আছে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলতে চাই। গঙ্গা পূর্বে ভাগীরথীর খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ত। এটা খুব বেশিদিনের কথা নয়। একটা সময় প্রবল জলপ্লাবনের তোড়ে ভাগীরথীর খাত ছেড়ে দিয়ে পদ্মা নতুন খাত দিয়ে বইতে থাকে। এই নতুন খাতটি সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে বর্তমানে যে অঞ্চলটিকে বাংলাদেশ বলা হয় তার কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই অঞ্চলে আগে তুলনামূলকভাবে কম মানুষ বাস করত। গঙ্গা প্রবাহ পদ্মা নদী দিয়েই প্রবাহিত হওয়ার কারণে যে উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তাই-ই দলে দলে মানুষকে এখানে বসতি স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। পদ্মা নদীর কারণে এই অঞ্চলে নগর এবং জনপদ সৃষ্টি হয়েছে। ফল-ফসলে-প্রাচুর্যে জীবন শান্তিময় হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, গঙ্গা যদি খাত পরিবর্তন না করত মোঘল আমলে বাঙলা দেশ যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা কখনো সম্ভব হত না। গঙ্গার খাত পরিবর্তন করার কারণেই কৃষিজীবী মানুষেরা জীবিকার নিশ্চিন্ত অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম ব্যাপ্তি এবং প্রসার লাভ করেছে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ের কথা বলে লাভ নেই। আসল কথা হলো আজকে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে তার পেছনে পদ্মা নদীর ভূমিকা সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী হতে পেরেছে। মানুষের ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে নিসর্গ একটি বড় ভূমিকা পালন করে, সেকথা নতুন করে বলে লাভ নেই।

ভারতের কর্তাব্যক্তিরা ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করার সময় গঙ্গার এই খাত পরিবর্তনটির কথা মনে করেছিলেন কিনা বলার উপায় নেই। তবে তাঁদের বাস্তব কাজ প্রমাণ করেছে, তাঁরা সেই খাতটি রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। পদ্মা নদী বাংলাদেশের প্রাণপ্রবাহের প্রতীক। পদ্মার অপমৃত্যু বাংলাদেশের অপমৃত্যু ডেকে আনবে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় 'ইসলামাবাদের শয়তান দিল্লীর ঘাড়ে ভর করেছে' এই শিরোনামে একটি নিবন্ধে খ্যাতিমান লেখক এবং কবি জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর বদ্বীপরূপে প্রকৃতি গড়েছিল বাঙলাকে। একা নীলনদের দান মিশর। কিন্তু বহু নদনদীতে নদীময় বাঙলা। সুরমা, পদ্মা, মেঘনা, বিশালক্ষী, আড়িয়াল খাঁ, কপোতাক্ষ, রূপসা, ভৈরব, রায়মঙ্গল, ইছামতী, গঙ্গা, ভাগীরথী নদী জপমালাধৃত শস্য-শ্যামল সমতল প্রান্তর। এমন করে বাঙলাকে গড়েছিল বিধি, কিন্তু দিল্লীর ধারণা বিধির বিধান ভাঙতে সে সমর্থ হবে। ইয়াহিয়া খানের কাঁধে যে শয়তান একদা ভর করেছিল সেই শয়তান এখন দিল্লীর সুলতানের ঘাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর উর্দু চাপানোর চক্রান্তের চেয়েও শয়তানী ষড়যন্ত্র দিল্লীর। উপমহাদেশের মতিভ্রষ্ট নতুন তুঘলকেরা সারা বাঙলাকে রাজস্থান কি বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে পরিণত করতে চায়। প্রথমে ফারাক্কা, এখন তেহরী। বাঁধ মাত্রেরই আমরা বিপক্ষে, বাঁধ প্রবাহের বিকৃতি। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় পদ্মার অপমৃত্যু দেখতেন, শুধু প্রতীকী অর্থে নয়, ফারাক্কার দিকে রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গর্জে উঠতেন — 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো।' আমরা এখানে শুধুমাত্র জ্যোতির্ময় বাবুর লেখা প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম।

আমাদের জানামতে পশ্চিম বাংলায় এ পর্যন্ত ফারাক্কার অভিশাপকে উপজীব্য করে কম হলেও ছয়টি উপন্যাস রচিত হয়েছে। আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কেন? পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কোনরকম অমানবিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেন, কাগজপত্রে বিবৃতি দেন, সভা-সমিতির আয়োজন করেন। অথচ চোখের সামনে নিষ্ঠুর ঘটনাটি ঘটছে আমাদের লেখক, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং আইনজীবীদের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই কেন? আমি তাঁদের ওপর কটাক্ষ করে কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু ফারাক্কা সংকটটি এমন ভয়াবহ যে, সেটা কারো অবহেলার বিষয় হতে পারে না।

ধরে নিলাম ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন ভালো নেই, তাই ভারত পানি বন্ধ করে রেখেছে। কোনো ভারত-প্রেমিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে আমাদের প্রাপ্য পানি ছাড় দেবে বিশ্বাস করার কোনো কারণও নেই। ভারতের কাবেরী নদীর পানি নিয়ে অন্ধ্র এবং কর্ণাটকের মধ্যে যে বিরোধ চলছে, তার প্রতিবাদ করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা পনেরো দিন অনশন ধর্মঘট করেছেন। পনেরো দিন না খাওয়ার ফলে মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার শরীরের বাড়তি মেদ কমেছে একথা সত্য বটে, কিন্তু কর্ণাটকের মানুষ পানি পায়নি। সুতরাং ধরে নেয়া উচিত বন্ধু হোক শত্রু হোক, ভারত আমাদের পানি দেবে না। আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে।

ফারাক্কার ফাঁড়া তো রয়েছে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো, ভারত অন্য নদীগুলোর পানিও প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য ক্রমাগত বাঁধ নির্মাণ করে যাচ্ছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মরুকরণ প্রক্রিয়াটি শুধু উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অনতি ভবিষ্যতে গোটা বাংলাদেশ রাজস্থানের মতো মরুভূমি হয়ে উঠবে। গঙ্গার পানি নিয়ে গেছে, এখন যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্রের পানির দিকে হাত বাড়িয়েছে। দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চুয়ান্নটি নদ-নদী কোনটার পানি খরার সময় বাংলাদেশে আসতে দেবে না। আমাদের কৃষকের ক্ষেতের পানি টেনে নিয়ে রাজস্থানের মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তুলছে ভারত। আর আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে চমৎকার সুন্দর চকচকে ধূলিতপ্ত এক-একখানি মরুভূমি।

আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, ভারত আমাদের নিয়ে কি করতে চায়? জাতি হিসেবে আমাদের অপরাধ কি এতই বেশী যে, ভারত এরকম একটি চরম দণ্ড আমাদের দেবে! আমাদের কৃষক, আমাদের প্রকৃতি, আমাদের পশু-পাখি, এদের অপরাধ কি? ভারত কেন এদের সবকিছুকে জ্বলন্ত আগুনে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা পাকা করছে? একটি বন্ধুপ্রতিম জনগোষ্ঠী আরেকটি বন্ধুপ্রতিম জনগোষ্ঠীর ওপর এরকম সমূহ-সর্বনাশ সাধনের ষড়যন্ত্র কোথাও করছে, এমন ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা কিছু করছি না কেন? ভারত পানি প্রত্যাহার করে আমাদের শাস্তি দিতে চায়, তাদের যদি দয়া-অনুকম্পা না হয় কিছু তো করার উপায় নেই। কেউ তো মোষের শিং থেকে টেনে দুধ বার করতে পারে না। ভারতও আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে – এটা মেনে নিয়ে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি সব ব্যাপার বিশ্বসমাজের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে না পারি, বিশ্বসমাজ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে কেন? যে শিশু কাঁদে না সে তো দুধ পায় না। আসন্ন সর্বনাশের মুখে আমাদের জাতির মর্মতল ভেদ করা সেই অন্তরস্পর্শী কান্না কোথায়? কোথায় বারো কোটি জনগণের নিবিড় ঐক্য?

আমরা ধরে নিয়েছি ভারত সূক্ষ্ম মারপ্যাচে আমাদেরকে জাতি হিসেবে চিত করে ফেলেছে। আমরা তার কবল থেকে কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারব না, এটা কোনদিনই সত্য হতে পারে না। শিশুর যেমন মায়ের বুকের দুধে অধিকার, পানিতে আমাদের জনগণের সেরকম অধিকার। ক্ষমতান্ধ রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের জনগণের মানবিক দাবীকে জাতীয় দাবীতে পরিণত করতে পারছে না, এখানেই আমাদের বেদনা। কেউ বলছেন, আমরা ব্যাঘ্র প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাস করছি। বাঘকে 'বড় মামা' সম্বোধন করে তার মনে দয়া সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর করণীয় কিছু থাকতে পারে না। এগুলো কি মানুষের মতো কথা?

১৯৯৫

রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ
(২০০০)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বঙ্গভূমি আন্দোলন, রাষ্ট্রধর্ম, মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার প্রবীণ মনীষী লেখক শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলাদেশে তাঁর একজন স্নেহভাজন পত্রিকা-সম্পাদককে একখানি চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিটি সম্পাদক আমাকে দেখিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের সততা সর্বজন বিদিত। তাঁর ঝুঁকি নিয়ে কথা বলার সাহস প্রবাদের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অন্নদা বাবু আমারও শ্রদ্ধাভাজন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় এবং বিশ্বজনমত প্রভাবিত করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সময়ে আমরা অনেকেই তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই একজন ব্যক্তি মানবিকতাবোধ, ঔদার্য এবং দরদ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কি পরিমাণ ঋণী করেছেন, সেটা এখনো মর্মে মর্মে অনুভব করি। এরকম একজন সংস্কারমুক্ত দরদী মনের মানুষ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করে, বুড়ো বয়সের জড়তাকে উপেক্ষা করে এই দেশেরই একটি পত্রিকা-সম্পাদককে চিঠি লিখে যখন শঙ্কার বিষয়টি প্রকাশ করেন, আর যাই হোক ব্যাপারটিকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনে। একটি জবাব দেয়া নানা কারণে অত্যন্ত সঙ্গত মনে করি।

অন্নদাবাবুর চিঠির একটা অংশ নিজের জবানীতে প্রকাশ করব। তিনি লিখেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন পশ্চিম বাংলার মুসলিম জনগণ পলিটিক্যালি ডিমোরালাইজ ছিল। আমি তাঁদের পক্ষ হয়ে লিখেছি এবং কথা বলেছি। তার জন্য আমাকে অনেক নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে। আমি কিছুই মনে করিনি। ওসব শুনতে হবে কবুল করে নিয়েই আমি মুসলমানদের সপক্ষে কথা বলেছি। এখন পশ্চিম বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় আর পলিটিক্যালি ডিমোরালাইজ নয়। তারা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এত বড় একটা মুক্তিযুদ্ধের পরও হিন্দুদের বড় একটা অংশ বাংলাদেশে বাস করা মনেপ্রাণে নিরাপদ মনে করছে না। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের সম্মুখ সারির মানুষদের কর্তব্য হওয়া উচিত হিন্দুদের মনের এই ভীতি এবং শঙ্কা দূর করার জন্য সমুচিত পন্থা উদ্ভাবন করা।'

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অন্নদা বাবুর এই চিঠির ব্যাপারটি স্মরণে রেখে একটি লেখা লিখব এবং তাতে আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ আনতে চেষ্টা করব -- মনস্থির করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম বাংলার আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৯শে আগস্ট ১৯৮৯ তারিখে 'ওই বাংলা, এই বাংলা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিখেছেন সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার নামে একজন মার্কিন প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক। অন্নদা বাবুর চিঠির আবেদন ছিল একান্তই মানবিক। কিন্তু দস্তিদারবাবুর এই ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, চড়াও হয়ে লেখা নিবন্ধটি পাঠ করে ভিন্ন রকমের ধারণা জন্মাল। রচনাটিতে যে পরিমাণ ধোঁয়া আছে, সে তুলনায় আলোর ভাগ নিতান্তই অল্প। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতার বিষয়টি অনুধাবন করার অক্ষমতা থেকেই তাঁর মনে উষ্মার সঞ্চার হয়েছে এবং সেটিই তিনি নিবন্ধের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ করেছেন। আসলে এ ধরনের লেখার কোনো জবাব হয় না, ঝগড়া করা যায়। রচনাটির একটিই মেরিট -- লেখাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সাড়ে তিন লক্ষ পাঠক-পাঠিকা রচনাটি পাঠ করেছেন। আমার এ রচনাটি অন্নদা বাবুর চিঠি এবং সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদারের প্রবন্ধ দুটোর কোনোটারই সরাসরি জবাব নয়। আমাদের নিজেদের ঘরের কথা প্রকাশ করার জন্য লেখাটিতে হাত দিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে অন্নদাশংকরের চিঠি এবং সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদারের নিবন্ধের প্রসঙ্গ এসে যেতে পারে।

My All Garbage

২

জন স্টুয়ার্ট মিলের 'টাইরেনি অব দ্যা মেজরিটি' গ্রন্থটির প্রকাশকাল সঠিক মনে নেই। বোধকরি দেড়শো বছর পেরিয়ে গেল। আমার তো স্থির ধারণা, গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। দেশে দেশে বিরাজমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা স্টুয়ার্ট মিলের আমলে যেমন ছিল এখনো সেরকমই আছে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় স্রেফ নিরীহ কাজকর্মের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তরে আঘাত দিয়ে বসতে পারে। ঈশপের গল্পের পুকুরে ঢিল ছোড়া বালকটির কথা অনেকেরই মনে আছে। বালক বলছে, 'আমি নেহায়েতই আনন্দের জন্যই পুকুরে ঢিল ছুড়েছি। বিশেষ করে কারো ক্ষতি করার সমান্যতম ইচ্ছাও আমার নেই।' ভাগ্যহত ব্যাঙদের বক্তব্য, 'বালক তোমার কাছে যেটা নির্দোষ প্রমোদ, সেটাই আমাদের মৃত্যুর কারণ।'

যে কোনো সমাজে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সম্পর্ক তার সঙ্গে ঢিল-ছোড়া বালক এবং মৃত্যুপথযাত্রী ব্যাঙের তুলনা করা যেতে পারে। কথাটা অপ্রিয়, সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানো একটা পাপ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে মনোবেদনা তা নিরসনের কোনো দাওয়াই আজ পর্যন্ত কোনো দেশ উদ্ভাবন করতে পারেনি। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার শিকার। মাত্রাটা কোথাও কম, কোথাও বেশি এই যা। একটা সময় ছিল যখন বলা হত সোভিয়েত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জাদুকাঠিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল সংকট-সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রমাণিত হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ সত্য ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়াতেও সংখ্যালঘুরা নানা ধরনের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এবং সামাজিক ভয়ভীতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে।

বস্তুত পৃথিবীতে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে' পাওয়া যাবে না যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর একভাবে না একভাবে নির্যাতন করা হয় না। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়, ইসরাইলের আরব, দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, পাকিস্তানের কাদিয়ানী, ভারতের মুসলমান, বাংলাদেশের হিন্দু, ইরানের বাহাই সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু শ্রেণীর আওতাভুক্ত নয় বলেই শুধু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও এক ধরনের শাস্তি ভোগ করেন এবং মনস্তাপ অনুভব করেন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যখন মারমুখী তথা এ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে, তখন তো দুর্দশার অন্ত থাকে না।

৩

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের কথা আলোচনা করার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই নির্যাতিত হয়ে থাকে এ কথাটি মনে রেখেই অগ্রসর হওয়া উচিত। শুধু বাংলাদেশে কেন দুনিয়ার সব দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একভাবে না একভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। যদিও যন্ত্রণার ধরন এবং মাত্রাটা সর্বত্র একরকম নয়। কোথাও শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে রুটি-রুজিতে টান পড়ে, কোথাও গুণের স্বীকৃতি মেলে না, আবার কোথাও বিবেক-বেদনার তাড়নায় জ্বলেপুড়ে মরতে হয়। প্রতিটি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত হওয়ার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বর্তমান থাকে। সেটি বাদ দিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায়ত্ববোধটি বিশদ করাও একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এ একবার ভারত-উপমহাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল। মোটামুটি ব্যবস্থাটা ছিল এরকম : হিন্দুরা ভারতে চলে যাবে এবং মুসলমানেরা পাকিস্তানে চলে আসবে। বাস্তবে তা কার্যকরও হয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগির পর যে পরিমাণ মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গিয়েছিল তার পরিমাণ এত বিপুল ছিল যে ইতিহাসে তার কোনো তুলনা মেলে না। অনেক হিন্দু ভারতে গেল, অনেক মুসলমান পাকিস্তানে এল। তারপরেও যাওয়া-আসার পালা সাঙ্গ হলো না। কয়েক কোটি মুসলমান ভারতে এবং প্রায় কোটিখানেক হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যেতে বাধ্য হলেন। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে মুসলমানদের সেখানে থাকার আইনগত স্বীকৃতি দিল। কিন্তু পাকিস্তানে জিম্মি তথা আশ্রিত হিসেবে হিন্দুদের অবস্থান নির্ধারিত হল। অবশ্য জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তান সৃষ্টির

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অব্যবহিত পরে ঘোষণা করেছিলেন যে নতুন রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না – জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই ভূখণ্ডের সকল মানুষ পাকিস্থানী নাগরিক হিসেবে পরিচিত হবেন। যার ইচ্ছা মসজিদে যাবে, যার ইচ্ছা মন্দিরে বা গীর্জায় যাবে; তার সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহর এই ঘোষণা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরবর্তী ইতিহাসে কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি, সেকথা বলাই বাহুল্য। ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হলো, হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হলেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ একরকম বাধ্য হয়েই এই অবস্থাটা মেনে নিলেন। কারণ, তাঁদের দেশের বাইরে অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ব্যাপারটা এভাবে চলতে পারত দীর্ঘদিন, কিন্তু মধ্যখানে বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলনের অভিঘাতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

পাকিস্তানের ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি অস্বীকৃতিই ছিল বাঙালী তথা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানীদের স্বাধিকার আন্দোলনের মুখ্য দাবী। স্বভাবতই বাংলাদেশের হিন্দুরা এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে ফেলেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাঁরা সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতো সব রকম নাগরিক অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

এই একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। তাঁদের জানমালের ওপর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে একক সম্প্রদায় হিসাবে অন্য কারো সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্র্যাকডাউনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেছেবেছে হিন্দুদের বাড়ীঘর, মহল্লা এবং গ্রামে আগুন লাগিয়ে হিন্দু নরনারীদের অবলীলায় খুন করে যাচ্ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাথমিক যে রোষ তা হিন্দু-সম্প্রদায়কেই সর্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করতে হয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেছে বেছে হিন্দু-বস্তিতে আগুন লাগানো, তাদের বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, অধিবাসীদের হত্যা করা, মঠ-মন্দির-দেবালয় ধ্বংস করা, এসবের পেছনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা সুগঠিত পরিকল্পনা ছিল। দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ধরে নিয়েছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের জনগণের আন্দোলন এমন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করতে পেরেছে। তাই প্রথমে বেছেবেছে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে এবং তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারলে তাঁরা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবেন। প্রায় এককোটির মতো হিন্দু জনসংখ্যাকে ঠেলে সীমান্তের ওপর পারে পাঠিয়ে দিতে পারলে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মওকা পেয়ে যাবে। প্রথমত বিতাড়িত এই এককোটি মানুষের ঘরবাড়ী,

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জমিজিরাত, দোকানপাট স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারলে পূর্বাঞ্চলের বিক্ষোভ আপনা থেকেই অনেকখানি প্রশমিত হয়ে আসবে। কেননা ঘনবসতিপূর্ণ পূর্বাঞ্চলে জমির সমস্যা অত্যধিক প্রকট। দ্বিতীয়ত বিতাড়িত এই কোটি মানুষের দোকানপাট দখল করতে পারলে মুসলমান জনগণ নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। নতুন জমিজমা অধিকার করার আনন্দে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে যুদ্ধ করার বাসনা ভেতর থেকেই মরে যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই দখলদার সেনাবাহিনী হিন্দুদের ওপর নির্বিচার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

তাছাড়া দখলদার সেনাবাহিনীর মাথায় আরো একটা পরিকল্পনা ছিল। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিম বাংলায় চরমপন্থীদের উৎপাত এই কারণে বেড়ে গিয়েছে যে, সেখানে রিফিউজি সমস্যা তিরিশ বছরেও ভালোভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়নি। প্রায় সময়েই একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। প্রায় এককোটি মানুষকে বেয়নেটের মুখে ঠেলে যদি পশ্চিম বাংলায় কোনরকমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভারতবর্ষের নাভিশ্বাস উঠবে। পরিবার পিছু একটি টিনের ঘর বরাদ্দ করতে হলেও ভারতের পঞ্চাশ বছরের বাজেটের সমপরিমাণ অর্থ ঐ খাতে ঢুকে যাবে। এই বাড়তি জনসংখ্যার ভারে ভারতের ঐক্য আপনা থেকেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একই অস্ত্রে পাকিস্তান ভারতকে ঘায়েল করতে সক্ষম হবে।

৪

দীর্ঘ ন'মাস মুক্তিযুদ্ধের পর অন্যান্য শরণার্থীদের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল পরিমাণ মানুষ ভারত থেকে দেশের মাটিতে ফিরে এসে নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন হলেন। কোথাও কোথাও ঘরবাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। প্রতিবেশীরা সব লুটেপুটে নিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য তাঁরা মুসলমান। তাঁদেরও বা দোষ কি! ধরে নিয়েছিলেন হিন্দুরা জন্মের মতো চলে গেছে। আর ফিরে আসবে না। কোথাও কোথাও বসতবাড়ী ভেঙেচুরে চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কোথাও বাড়িঘর খাড়া থাকলেও দরজা, জানালা, ওপরের টিন সব খুলে নিয়ে গেছে। এভাবে ঘরবাড়ী, জমিজমা, দোকানপাট সব বেহাত হয়ে গিয়েছে।

বাস্তুচ্যুত হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অর্থভাণ্ডার শূন্য। এ সমস্ত সহায়-সম্বলহীন মানুষদের এক পয়সা সাহায্য করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। দেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক চাপের মুখে দখলদারী ব্যক্তিরা হিন্দুদের ঘরবাড়ী, জমিজমা, দোকানপাটের দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো বটে; নগদ পুঁজিপাটা, ক্ষেতের ফসল বা প্রতিবেশীর বাড়ীতে উঠে গেছে সেসব আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। হবেই বা কেমন করে!

My All Garbage
www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশ না হয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ওটা তো কাগজ-কলমের ঘোষণা। যে গ্রামে তিন হাজার মুসলমান এবং তিনশো হিন্দু বসবাস করে সেখানে হিন্দুদের কোনো পরিস্থিতিতেই কি মুসলমানদের বিরোধিতা করা সাজে? কাগজের ঘোষণা তো তাদের বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা দিতে ছুটে আসবে না।

হিন্দুরা ফিরে আসতে পেরে মোটামুটি নিরাপদ এবং নিরুপদ্রব জীবনধারনের গ্যারান্টি পেয়েই আপাতত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোটাই যখন পরিবর্তিত হয়েছে আস্তে আস্তে তাঁরা সব রকমের অধিকার ফিরে পাবেন। এই ধরনের একটা আশাবাদে বুক বেঁধে নেহায়েত যেটুকু না হলেই নয় ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। পাকিস্তানীরা যে-সকল মঠ-মন্দির-দেবালয় ধ্বংস করেছে সেগুলো পুনর্নির্মাণের দাবী উত্থাপন করেননি। যে প্রতিবেশী তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে তার বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

মুজাফফর ন্যাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি যে, দুটো রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল উল্লেখ্য পরিমাণ, তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়কে সবসময় বুঝিয়েছেন ওসব ছোটোখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ দাবীর কথা উল্লেখ করার প্রকৃষ্ট সময় এ নয়। এখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সময়। হিন্দুসমাজের যে-সকল নেতা আওয়ামী লীগ করতেন, তাঁরাও তাঁদের পদ্ধতিতে আপন সম্প্রদায়ের সঙ্গে একরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা লাঞ্ছিত হিন্দুদের সামনে যে যুক্তি তুলে ধরেছেন তার সারমর্ম অনেকটা এরকম — 'দেখতেই তো পাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। পাশে ভারত ছিল বলেই হিন্দুরা আবার বাস্তুভিটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আছে তখন আপনাদের আর বিশেষ চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। একসময় সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বসন্ত চ্যাটার্জি নামে একজন ভারতীয় সাংবাদিক বাংলাদেশ সফর করে ইংরেজীতে একখানি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম ছিল 'ইনসাইড বাংলাদেশ টু-ডে'। ওই বইয়ের এক জায়গায় বসন্তবাবু একজন বাংলাদেশের হিন্দু ভদ্রলোকের মুখের কথা তুলে দিয়েছেন। ওই বাংলাদেশী ভদ্রলোক একজন ভারতীয় দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃখের কথা তুলেছিলেন। জবাবে ভারতীয় কর্তা ব্যক্তিটি বলেছিলেন, 'ওগুলো আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়, বাংলাদেশ সরকার সেসব দেখবে।' ওই বাংলাদেশী হিন্দু ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন, বিহারীদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, রাজাকার মুসলিম লীগের এবং জামাতীদের ব্যাপারেও দেখছি আপনারা খুব সজাগ; কেবলমাত্র একটা বিষয় আপনাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না, সেটা হলো বাংলাদেশের হিন্দু। হিন্দুদের অপরাধ কি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এতই অধিক যে তারা আপনাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়?'

প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত সরকারেরও বেশিকিছু করার ছিল না। ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ধ্বংস হয়েছে এই আনন্দেই তাঁরা আত্মহারা ছিলেন। হিন্দুদের সমস্যা সে তো স্থানিক সমস্যা। স্থানিকভাবেই তার সমাধান হওয়া উচিত।

স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেও তাদের একটা সাময়িক তৃপ্তিবোধ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নন। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের একটা অধিকার জন্মে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে রক্ত দিয়ে, প্রাণ বিসর্জন করে, সে অধিকার তাঁরা আদায় করেছেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী হিন্দু-মানসের ধ্যানধারণা এক রকম নয়। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে সম্পন্ন হিন্দুদের বেশিরভাগ এক দেশে বাস করলেও সব সময়ে ভারতে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং উপযুক্ত সময়টির অপেক্ষা করতেন। জীবন-জীবিকার মোটামুটি নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে এক সময় নীরবে পাড়ি জমাতেন। তাই এখানকার নির্যাতনকে নির্যাতন মনে করতেন না। এই ম্লেচ্ছ দেশে বসবাস করলে তাঁদের সেটুকু তো সহ্য করতে হবে — এটা একরকম অবধারিত ধরে নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরে হিন্দু-মানসিকতার এই বিমুখিতার অবসান ঘটানোর একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অধিকারের ব্যাপারে এতকাল যারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি, হঠাৎ করে সব ব্যাপারে মুখ খুলতে আরম্ভ করেছেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ এটাকে শুরুর থেকে ভাল চোখে দেখতে পারেননি। আড়ালে-আড়ালে সবাই বলাবলি করতে আরম্ভ করলেন, 'দেখো, হিন্দুর আস্পর্ধা ভীষণ বেড়ে গেছে।'

আওয়ামী লীগ সরকার এই পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়ার জন্য কিছুই করতে পারেনি। তারা অসাম্প্রদায়িকতার বাঁধাবুলি উচ্চারণ করে গেছেন, নতুন বাস্তবতার নিরিখে জনগণের মন পরিবর্তনের কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

প্রচ্ছন্নভাবে আওয়ামী লীগও ছিল একটি কট্টর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক কারণে তাদের অসাম্প্রদায়িক বোলচাল আওড়াতে হয়েছিল বটে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে সেক্যুলারিজমের অভিমুখে একপা-ও অগ্রগমন তাদের হয়নি। অথচ জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে জানাজানি, চেনাশোনা এবং দেয়া-নেয়ার নানাবিধ কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ জাতি গঠন এবং দেশ গঠনের বিষয়ে কোনো গঠনমুখী কর্মসূচী হাজির না করে প্রচণ্ড আত্মমগ্নতার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। তার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সমান অধিকারের জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ধারণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে মূলধারা থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একজন গ্রামের হিন্দু পাকিস্তান আমলে যেসব অত্যাচার প্রাপ্য বলে ধরে নিতেন স্বাধীন বাংলাদেশে তার প্রতিকার কামনা করতেন। কেননা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার মানসিকতার অনেক রূপান্তর

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ঘটে গেছে। সে ভাবতে শিখেছে এই স্বাধীনতার জন্য তার ঘরবাড়ী জ্বলেপুড়ে গেছে। তার ভাই পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তার কন্যার শ্লীলতাহানি ঘটেছে। বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা তা অত্যন্ত চড়াদামে কিনতে হয়েছে। এই দেশে সে যদি একান্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা উচ্চারণও করতে না পারে, তা হলে তার অস্তিত্বের মূল্য কোথায়? জোর গলায় দাবীর কথা উঠলেই পার্শ্ববর্তী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সকলের না হলেও একাংশের আঁতে ঘা লাগে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ভারতের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হিন্দুরা বাংলাদেশে মুসলমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, এ-তো কম ঔদ্ধত্য নয়!

আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে-কুশাসনে গোটা দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। তারা লুঠপাট এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে, বিহারী-পাঞ্জাবীদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখল করছে। এই সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার সময় আওয়ামী লীগের কোথায়? দেশে দুর্ভিক্ষ জাঁকিয়ে বসছে। পথেঘাটে লোকজন না খেয়ে মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করার আনন্দে আওয়ামী লীগের আত্মহারা বেসামাল অবস্থার কারণে তারা যুদ্ধবন্দীদের বিচারও করতে পারেনি।

দখলদার ক্রিমিন্যাল আর্মি পাকিস্তানের মাটিতে ফেরত গেছে। রাজাকার-আলবদর এবং কোলাবরেটররা সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারল না বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল তাঁদের প্রকৃত হত্যাকারী কারা।

তাছাড়া দক্ষিণপন্থীদের, বামপন্থীদের জোর প্রচারণা আওয়ামী লীগ ভারতের কাছে দেশ বেচে দিয়েছে। অজ্ঞ লোক বিশ্বাস করল কথাটা মিথ্যা নয়। তারা মনে করতে লাগল তাদের পেটে যে ভাত নেই, পরনে যে কাপড় নেই, তার জন্য ভারতই দায়ী। কিন্তু ভারত তো চোখে দেখা যায় না, অনেক দূরে রয়েছে। সুতরাং হিন্দুরাই দায়ী। এ পদ্ধতিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার তেজ অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল।

৫

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের প্রশ্নটি আপাতত মুলতবি থাকুক। বর্তমান রচনার একটি পর্যায়ে আবার সে প্রসঙ্গে ফিরে আসব। তার আগে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করায় আমাদের জাতীয় জীবনে যে সকল সংকট এবং জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। এই রাষ্ট্রধর্ম বিলটি বাংলাদেশ সংসদে পাশ হওয়ার পর তৎকালীন সংসদনেতা এবং বাংলাদেশের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জনাব মওদুদ আহমদ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আজ এই দিনে পবিত্র ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে এমন একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করলাম, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এই মহৎ কর্মের জন্য আমাদের কথা কৃতার্থ অন্তরে স্মরণ করবে। সংখ্যাগুরু

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করে, এই জাতির নতুন পরিচয়চিহ্নের একটা শিলালিপি আমরা উৎকীর্ণ করলাম।' রাষ্ট্রধর্ম বিলটির বিরুদ্ধে দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্দোলন করেছেন, মিটিং-মিছিলের আয়োজন করেছেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে এই সরকারী পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। কাগজপত্রেও লেখালেখি হয়েছে বিস্তর। দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং আদিবাসী সম্প্রদায় কখনো যৌথভাবে কখনো আলাদা আলাদাভাবে এই বিলটির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মওদুদ সাহেব সংসদে এই বিলটির ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে এমন একটা মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন, যার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধর তাঁদের স্মরণ করবেন, তাত্ত্বিকভাবে সে বিষয়ে কেউ মন্তব্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

মওদুদ সাহেবের বক্তব্যের যা নিহিতার্থ, বিস্তারিত করে বললে এই রকম দাঁড়াবে — এ দেশের শতকরা পঁচাশি জন মানুষ মুসলমান, সুতরাং তাঁদের আচরিত ধর্ম দেশের রাষ্ট্রধর্ম হবে, এটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁরা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে বিষয়টিকে পাকাপোক্ত করলেন মাত্র। মওদুদ সাহেব তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে আরো একটি কথা বলতে পারতেন। সেটি হলো দুনিয়ার মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমানদের একটা আত্মিক, একটা অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দিয়ে আমরা সেই ঐতিহাসিক বন্ধনের মধ্যে সজীবতা সৃষ্টি করেছি। মওদুদ সাহেব নিজে এ বিষয়ে কিছু না বললেও সরকারী তরফের ছোট-বড় কর্তারা কথাটি সাতকাহন করে জাতিকে শোনাতে বাকি রাখেননি। আরো একটা স্থূল সত্য সরকারী কর্মকর্তারা প্রকাশ করেননি। কারণ তার মধ্যে আরো একটা নিষ্ঠুর সত্য আত্মগোপন করে আছে। প্রকাশ করলে আমাদের জাতির একটি চরম লজ্জার বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেটি হলো এই — আমরা দরিদ্র জাতি, নিজেদের রাষ্ট্রকে ইসলামের লেবাসটি পরালে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভাইদের হাত থেকে কিছু টাকাকড়ি হাত করতে পারব।

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথায় মওদুদ সাহেবের উক্তি এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার গূঢ় কারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করায় এ জাতির যদি কোনো স্থায়ী কল্যাণ হয়ে থাকে মেনে নিতে দোষ কি? সরকারের বিরোধিতা করতে পারি, কিন্তু সরকারের কোনো একটি বিশেষ কর্ম যদি জাতির কোনো একটি বিশেষ উপকার সাধন করে সেটি মেনে নিতে আপত্তি কোথায়? তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে এমন একটা পরিচয়ে পরিচিত করলেন, পরবর্তীতে যা একটি বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এখন প্রশ্ন হলো, সে বিরাট ইতিবাচক ভূমিকাটি কি?

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আমাদের সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিতে ভাবীকালের সম্ভাবনাটি যে কি হবে, কিছু তো হদিস করতে পারছিনে। একটি হতে পারে অদূর ভবিষ্যতের বাংলাদেশ একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বর্তমান মুহূর্তে সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেকথা চিন্তা করে শুধু ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করা হলো। এ কর্মটি সমাধা করে বর্তমান সরকার ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার পথে একটি বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

বাংলাদেশ তো ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীন ছিল। ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা খারিজ করে দিয়ে এ দেশের জনগণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার দাবীতে একটা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। বাঙালী জনগণের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফসল বর্তমানের বাংলাদেশ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রটিকে ইসলামীকরণ করার চেষ্টা তো জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করা। এই জাতীয়তাবাদী অবস্থানটিকে প্রত্যাখ্যান করলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির ভিত্তিভূমি কি হবে? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্য থেকে হঠাৎ করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দাবী এবং অধিকারকে খর্ব করা হয় না কি? যদি এ সত্য মেনে নেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের গর্ভ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্ম নিয়েছে, এই যুদ্ধে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, তাহলে অন্যান্য ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের অধিকার ও দাবীকে খর্ব করার কারো কি কোনো নৈতিক অধিকার থাকা উচিত? যদি রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে অন্যান্য ধর্মকে বাদ দেয়া হলো কেন? প্রসঙ্গত ইন্দোনেশিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। দুনিয়াতে মুসলিম দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়াকে সবাই চেনে। অথচ সেখানে সরকারীভাবে পাঁচটি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ইসলাম, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রধান ধর্মসহ পাঁচটি ধর্মকেই জাতীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র কয়েক লক্ষ হিন্দু বসবাস করেন। ইন্দোনেশীয় সরকার এ মুষ্টিমেয় মানুষের ধর্মকেও জাতীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের দেশে হিন্দু জনগণের সংখ্যা আনুমানিক দেড় কোটির মতো। বৌদ্ধ জনগণের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষের মতো হবে। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হত আমরা সবগুলো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে নিতে পারতাম। শুধু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে অন্যান্য ধর্মকে খাটো করা হয়েছে, তা বোঝানোর জন্য আইনশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যার গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করার মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণী নিজেদের একগুঁয়ে মনোভাবের প্রকাশ ঘটালেনই না শুধু, জাতীয় স্রোত থেকে অন্যান্য ধর্মের সংযোগসূত্রটিও পরোক্ষে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। স্বাধীন বঙ্গভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনার সময়ে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

কিছুদিন পূর্বে ভারতের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন মৌলবাদীদের চোটপাট এবং তৎপরতা ঠেকানোর মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ ওটা তাঁর একটা নিছক রাজনৈতিক কৌশল। তিনি নিজে থেকে অগ্রণী হয়ে যদি ইসলামের রক্ষাকর্তা সেজে না বসেন তাহলে ইসলাম-ব্যবসায়ীরা তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দিলেন। রাজনীতিবিদদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য নানারকম কলাকৌশল এবং ফন্দিফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করাও সরকারের একটা রাজনৈতিক কৌশল। রাজনৈতিক কৌশল ও রাষ্ট্রের মূলনীতি এক বস্তু নয়। সরকার একটা রাজনৈতিক কৌশলকে জয়যুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধানটা পরিবর্তন করে ফেলবেন, এ কথাটা কতদূর যুক্তিযুক্ত? ক্ষমতার খইমুড়ি ভক্ষণ করার আশায় ধানের গোলাতেই আগুন দিয়ে বসলেন!

মৌলবাদীরা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে, মুক্তিযুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানীদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে। মৌলবাদীরা সর্বতোপায়ে চেষ্টা করেছে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম পরাজিত হোক। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়েও তারা কলঙ্কজনক ভূমিকার জন্য দুঃখ বা অনুতাপ প্রকাশ করেনি। এখনো প্রকাশ্যে বলতে কসুর করে না, তারা পাকিস্তানের সপক্ষে যুদ্ধ করে কোনো অন্যায় করেনি। পাকিস্তান ভেঙে গেলেও পাকিস্তানের আদর্শে একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশে সৃষ্টি করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। সরকারের কাছে মৌলবাদীদের ভীতিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। আর লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, কত মা সন্তান বিসর্জন দিলেন, স্ত্রী স্বামী, পিতা পুত্র, সে কথাটি একবারও মনে এল না, এটাই সবচাইতে আশ্চর্যের! মৌলবাদীরা প্রবল হয়ে উঠেছে, সেজন্য দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে মৌলবাদী অবস্থান গ্রহণ করলেন। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা টিকিয়ে রাখবে, নাকি মৌলবাদের প্রেরণা? মৌলবাদীদের ঠেকাবার নাম করে মৌলবাদী অবস্থান গ্রহণ করে সদাশয় সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাটি ভেতর থেকে ছেঁটে দিলেন। তারা রাজনৈতিক কৌশলকে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমান স্তরে দাঁড় করালেন, এতেই কি তার প্রমাণ মেলে না?

সরকারী নেতা-উপনেতারা ঢোক গিলে এবং দক্ষিণপন্থীরা প্রকাশ্যে যে-সকল বক্তব্য রেখেছেন সেগুলোর সার-সংকলন করলে এরকম দাঁড়াবে — ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশের স্বাধীন এবং সার্বভৌম সত্তা টিকিয়ে রাখার একমাত্র রক্ষাকবচ হলো ইসলাম। সেই কারণে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং এটি একটি উৎকৃষ্ট কর্ম। ভারতের আগ্রাসী চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। বাংলাদেশ

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দেশ, এ কারণে ভারত আগ্রাসন চালাচ্ছে আমরা এ বক্তব্যের ঘোরতর বিরোধিতা করি। পৃথিবীতে নেপালই হচ্ছে একমাত্র হিন্দু-রাষ্ট্র। ভারতের জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু হলেও ভারত পুরোপুরি হিন্দু-রাষ্ট্র নয় -- সাংবিধানিক ভাবে তো নয়ই। ভারত একমাত্র হিন্দু-রাষ্ট্র নেপালে আগ্রাসন চালাচ্ছে। নেপালের সমস্ত মানুষ ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, এই সংবাদটি তো আর সকলের অজানা নয়। কোনো কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে ওঠে, তার কারণ ধর্ম নয়। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের আগ্রাসী হয়ে ওঠার পেছনে নানাবিধ কারণ বর্তমান। বর্তমান রচনায় সে বিষয়ে আলোচনা করার বিশদ অবকাশ নেই। যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রের ইসলামীকরণ করে ভারতের আগ্রাসন ঠেকানো যাবে তাঁরা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। আমরা পাল্টা প্রশ্ন করব, হিন্দু-রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারত কেন নেপালের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে?

একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ এ ধরনের একটা বিশ্বাস এখনো পোষণ করেন যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির ইসলামী চেহারা প্রকটিত করলে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে একটা কার্যকর বেড়া দেয়া যাবে। সকলেই জানেন ছাগলে ক্ষেত খায় সেজন্য বেড়া দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সে বেড়াতেই যখন ক্ষেতের ফসল ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে, তখন কি উপায়? বর্তমান সরকার, শুধু সরকার কেন, একশ্রেণীর রাজনীতির অনুসারী ব্যক্তিবর্গও সচেতন বা অবচেতনে বিশ্বাস করেন যে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে একটি বেড়া দেয়া হলো। কিন্তু সেই রাষ্ট্রধর্মের বেড়া এখন মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেতের ফসল ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেছে।

আরো একটি কথা প্রায়শই উচ্চারিত হয়ে থাকে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার কারণে দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের নৈকট্য স্থাপিত হলো। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বধর্মাবলম্বী অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসাধারণের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করতে পারলে একটা মনোস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি উপলব্ধি করা যায়। এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনগণ মুসলিম উম্মাহ্‌র নৈকট্য থেকে কি বঞ্চিত রয়েছেন? তুরস্কের মুসলমানেরা আজান পর্যন্ত তুর্কী ভাষায় দিয়ে থাকে, তাই বলে আরবের মুসলমানেরা তুর্কীদের ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে বলে মনে করে? প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামে মুসলমান, খ্রীস্টান এমনকি ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিও অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা ঘোষণা দিয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করবেন। প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রাম অর্থ-বিত্ত অনেকদিক দিয়ে আরবদের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে তো আরব রাষ্ট্রগুলো বলতে পারছে না, 'তোমাদের ভাবী রাষ্ট্রটিকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করো।' বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা চড়াও হয়ে আদেশ দিতে আসবে কেন? দোষটা তাদের নয়, আমাদের। আমরা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতি ও ধর্মগত বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের পরিচয় ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হই বলে তারা আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবার অবকাশটি পেয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সময়ে পাকিস্তানী প্রচারণায় অন্ধ হয়ে তারা পাকিস্তানকে সব ধরনের সাহায্য দিয়েছে; পাকিস্তানের অত্যাচার, নির্যাতন, নরহত্যার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার ইসলামসঙ্গত দাবীটিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো স্বীকার করেনি বলে কি জনগণ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে? আমাদের দেশে যতদূর ইসলাম জারি আছে তথাকথিত ইসলামের ধারক-বাহক আরব দেশে ততটুকু ইসলাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের যে অঙ্গীকার সেটিই চূড়ান্ত। বিদেশীরা কি বলবেন সেটা নয়। আমাদের এদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে। সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং নীতিই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম।

৬

'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনের পশ্চাদপট সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সমাজের একাংশের মধ্যে প্রায়শ আলোচিত হয়ে থাকে এমন একটি বিষয় স্পর্শ করতে চাই। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজের জনগণের একাংশের একটি প্রিয় ধারণা, হিন্দুরা এদেশকে আপন মনে করে না, এখানে তারা কাজকর্ম করে বটে, কিন্তু টাকা-পয়সা হুণ্ডির মাধ্যমে ভারতে পাঠায়। ওখানে একটা পাকা ব্যবস্থা হলেই তারা প্রথম সুযোগে ভারতে চলে যাবে। একইভাবে পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের একাংশ মনে করে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু নরনারী মুসলমানদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকাসমূহ মাঝে মাঝে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে সেই ধারণা বহুল পরিমাণে শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ভারতে যাওয়া এবং ভারত থেকে মুসলমানদের এখানে আসা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ওদেশ থেকে টাকা হুণ্ডির মাধ্যমে এদেশে আসত এবং এদেশের টাকা যেত ওদেশে। ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ মনে করত, শেষপর্যন্ত ভারতে অবস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এক সময় পাকিস্তানে চলে যেতেই হবে। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সমাজের একাংশের ধারণাও ছিল একই রকম। মনে রাখতে হবে ভারতের মুসলমান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনগণের যে অংশটি হুণ্ডির মাধ্যমে এদেশ থেকে ওদেশে টাকা চালাচালি করত, নীরবে-নিঃশব্দে দেশত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করত, তাদের সংখ্যাটি ছিল নিতান্তই মুষ্টিমেয়। মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগও বোধকরি হবে না। অন্যদের দেশত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও সংগতি ছিল না। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে একটি নতুন দেশে গিয়ে বসবাস করা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতো জীবিকার ব্যবস্থা করা সহজ কর্ম নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় মুসলমানদের এই নির্মম সত্য মেনে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নিতে হয়েছে, পাকিস্তানে হিজরত করার প্রিয় স্বপ্নটি তাদের জন্মের মতো ত্যাগ করতে হবে। যে ভিত্তিভূমির ওপর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের জন্মের পর সেটি ধ্বসে গেছে। এদেশে আসার নৈতিক কোনো অধিকার তাদের নেই। ভারতকেই স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিগত সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিমুখী মানসিকতার মধ্যে পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে।

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের ভিতরেও এরকম একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তারাও এদেশকে স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বকে খারিজ করে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং ভারত বাংলাদেশকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছে। শুধু এই কারণে বহুকাল পূর্বে চলে যাওয়া অনেক হিন্দু ভারত থেকে ফিরে এসে তাদের ফেলে যাওয়া জমিজমা-ঘরবাড়ী ফেরত দেয়ার দাবী উত্থাপন করেছে। সমস্ত হিন্দু জনগণের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে খুবই অল্প। কিন্তু গোটা পরিবেশটা ছিল নৈরাজ্যকর এবং অবিশ্বাসের হাওয়ায় তপ্ত। কোথাও কোথাও এ জাতীয় দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সেসব প্রচারিত হয়েছে অনেকগুণ বেশি। সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকল যে হিন্দুরা ভারত থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের কাছে বেচে দেয়া জমিজমা ফেরত নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে ভারতের কাছে বেচে দিয়েছে। এখন মুসলমানদের জানমাল কিছুই নিরাপদ নয়। আওয়ামী লীগ সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার কোনোটির সমাধান করতে পারেনি। সর্বত্র অনিয়ম, অরাজকতা, অব্যবস্থা। অন্তত মহৎ ব্যর্থতার কোনো দৃষ্টান্ত পর্যন্ত তারা স্থাপন করতে পারেনি। এই মাৎস্যন্যায় পরিবেশে তারা আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল। আওয়ামী লীগ-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের ঘুসঘুস-ফুসফুস প্রচারণার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের উপায়ও তাদের হাতের কাছে ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যের বদলে গুজবই সে সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তার যে ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে সেটা আওয়ামী লীগ সরকার জানত। পরিস্থিতির চাপে তাদেরকে ১৯৬৫ সালে আয়ুব খান কর্তৃক আরোপিত শত্রু-সম্পত্তি আইনটাকে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে বহাল রাখতে হলো।

তারপরেও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি হিন্দু জনসাধারণ সর্বতোভাবে বিশ্বাস হারিয়ে বসেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী হিন্দুদের যে সকল মঠ-মন্দির-দেবালয় ধ্বংস করেছে, আওয়ামী লীগ সেগুলো পুনর্নির্মাণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। স্বাধীনতার আনন্দ, উল্লাস, উন্মাদনার ভেতরেই হিন্দু জনগণের চক্ষুষ্মানদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিতে আরম্ভ করেছিল। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, রক্ত দিয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার তাঁদের স্বাধীন নাগরিকের একান্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ মঠ-মন্দির-দেবালয়সমূহ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়নি। নাম পাল্টে শত্রু-সম্পত্তি আইনটা তখনো তাঁদের ওপর অবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে বহাল রয়েছে। দেশে অভাব-অশান্তি বাড়ছিল, দুর্যোগের নিষ্ঠুর আক্রমণ ক্ষীণপ্রাণ অর্থনীতির নিশ্বাস রুদ্ধ করে ফেলেছিল।

তারপরে তো শেখ সাহেব সপরিবারে নিহত হলেন। দেশের রাজনীতির স্রোতটাই গেল পাল্টে। মুক্তিযুদ্ধের মৃত্যুযজ্ঞ এবং রক্তস্নানে সিঞ্চিত হয়ে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে সমান নাগরিক অধিকারের যে স্বপ্ন অন্তরে রক্তপদ্মের কুঁড়ির মতো দল মেলেছিল তা শেষপর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেল। কখনো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

শেখ মুজিবের পর মুশতাক। মুশতাকের পর জিয়া। সাম্প্রদায়িকতা সমাজের ভেতর থেকে ম্যানহোল-উপচানো ময়লার মতো উপচে পড়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাটাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রগতিশীল রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিসমূহের জন্য ছিল এগুলো বেদনাদায়ক ব্যাপার; হিন্দুদের কাছে এ ছিল প্রাণধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় নিশ্বাসবায়ুর অভাবের মতো। মুজিব পরবর্তী সরকারসমূহের কেউ সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসত্তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী অবস্থানটাকে পাশ কাটিয়ে অন্যরকম একটা জোড়াতালি তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। এই [illegible] প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো এরশাদ কর্তৃক সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল পাশ করিয়ে সংবিধানে কাঁচি চালানো। এই কর্মটি করে হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেয়া হলো।

My All Garbage

হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিমান সাংঘাতিকভাবে আহত হল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের ক্ষমতা আছে, এই দেশটিতে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অযোগ্য মনে করে অধিক সংখ্যায় ভারতে যেতে আরম্ভ করলেন। ভারতে যাওয়া তো সহজ কর্ম নয়। ওখানে তো সুখ-সম্পদ, আনন্দ-আশা পরিপূর্ণ জীবন তাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই। এই দেড়কোটি হিন্দুর মধ্যে, সীমান্তের দুয়ার খুলে দিলেও, কতজন আর ভারতে চলে যেতে পারে? ধরে নিলাম সংখ্যাটা পাঁচ লক্ষ হবে। তাছাড়া আরো একটা বিবেচনার বিষয় আছে। এই হতভাগা দেশে থাকতে চায় শতকরা কতজন মানুষ? এই কিছুদিন আগে আমেরিকায় চলে যাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। তার মানে জনসংখ্যার তেইশ ভাগের একভাগ। এখানে যদি জীবনধারণ সুখকর হত সামাজিক অধিকারহীনতার বেদনা সহ্য করেও দেশটিতে থাকত। একদিকে মানুষ হিসেবে বাঁচার সম্মান-বঞ্চিত, অন্য দিকে জীবনধারণের দুঃসহ কষ্ট। এই দেশটিতে থেকে কি লাভ? বাপ-পিতামহের ভিটেমাটির এমন কি মহিমা যে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে মানুষ হিসেবে বাঁচার মর্যাদাটুকু দিতে অক্ষম, কি হবে এখানে থেকে? হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা ভয়ংকর অনিকেত মানসিকতা জন্ম নিল। কিন্তু গিয়েছে বা যেতে পেরেছে কতজন? কতজন মানুষের ভারতে চলে যাবার মতো আর্থিক সংগতি আছে?

দুঃখের বিষয় হলো, ভারতের একশ্রেণীর পত্রিকা ব্যাপারটিকে এমন ফলাওভাবে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রচার করতে থাকল, পরিবেশটা বিষিয়ে উঠল। এটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশ এবং ভারতের একশ্রেণীর পত্রপত্রিকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে মিথ্যা, অর্ধসত্য এবং বিকৃত সত্য প্রচার করার প্রতিভা এত অধিক যে বিবেকবুদ্ধি এবং সুস্থ কাণ্ডজ্ঞান বজায় রাখা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান অবিবেচনা-প্রসূত মন্তব্য উচ্চারণ করে ব্যাপারটিকে সবদিক থেকে জটিল করে তুললেন।

এখন 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনের কথায় আসি। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাসমূহের কল্যাণে অনেকেরই জানা হয়েছে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে চিত্ত সূতার এবং ডঃ কালিদাস বৈদ্যের যৌথ নেতৃত্বে। তাঁরা বাংলাদেশের চার-পাঁচটি জেলা অধিকার করে একটি স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্র তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশে বসবাসকারী সমস্ত হিন্দুর আবাসভূমি রচিত হবে এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'। শক্তিপ্রয়োগ করে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সেনাবাহিনী তৈরি করছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। এই স্বঘোষিত তথাকথিত রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক হাওয়াকে কিছু পরিমাণে হলেও উত্তপ্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি কি এবং পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের কোন্ রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তির আনুকূল্যে এই আন্দোলন বিকশিত করার চেষ্টা চলছে, সে ব্যাপারগুলো আলোচনার পূর্বে এই ধরনের একটি রাষ্ট্র গঠন করে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের সমস্যার আদৌ সমাধান করা যাবে কিনা সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্রের প্রবক্তারা যে স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্রের কথা বলছেন, তাতে হিন্দু ছাড়া খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্থান হবে কিনা সে বিষয়ে কিছু বলেননি। ধরে নিলাম অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও সেখানে স্থান পাবে। তারপরেও কিন্তু একটা কথা আছে। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও তথাকথিত বঙ্গভূমি রাষ্ট্রে যোগ দেবে কিনা। সেটা অসম্ভব। এখানে যেমন তারা সংখ্যালঘু আছে সেখানেও সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। এক রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে যোগ দিয়ে তাদের সংখ্যালঘুত্বের অবস্থান পাল্টাচ্ছে না। সুতরাং স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন তারা সমর্থন করবে কেন? পেছনে তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

এ তো গেল বিষয়টার একটা দিক। অন্য দিকটা বিবেচনা করা যাক। ধরে নিলাম যুক্তির খাতিরে বর্তমান বাংলাদেশের ভেতরে হিন্দুদের জন্য আলাদা একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দু বসবাস করবে। ধরুন কোনো যাদু-মন্ত্রবলে একটা হিন্দু-রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার পরবর্তী অবস্থানটা কল্পনা করা যাক। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার হিন্দুরা ঐ প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে বাস করতে গেল আর মুসলমানেরা বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে বাস করতে চলে এল। উনিশশো সাতচল্লিশের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com
My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেশ-ভাগাভাগির পর যে অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছিল, সেরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভারত স্বাধীন বঙ্গভূমিঅলাদের মদদ দিয়ে ঐতিহাসিক অগ্রগতির এই পর্যায়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে রাজি হতে পারে কিনা? সেটা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। বাংলাদেশে হিন্দুদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে রাজি হওয়া যেমন তেমনি ভারতকে পাঞ্জাবী দাবী মেনে নিয়ে ভারতীয় ঐক্য নষ্ট করা একই কথা। ভারত যেমন শিখদের স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে পারছে না, তেমনি বাংলাদেশের ভেতর একটি স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও রাজি হতে পারে না।

তবু আমরা বিশ্বাস করি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন ধরনের একটি শক্তিকে অনেকদূর পর্যন্ত মদদ দেবে। প্রথম কারণটি হলো বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করবার একটি স্থায়ী যন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণটি পশ্চিম বাংলার বামপন্থীদের বিপর্যস্ত করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন উপস্থিত মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সে প্রয়োজনটি সিদ্ধ করছে।

বর্তমানের বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের জন্যও সীমান্তের অপর পারে এরকম একটি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান নিতান্তই আকাঙ্ক্ষিত। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার জিকির তুলে পবিত্র ইসলামের নামে নবীর উম্মতদের এককাট্টা করে শহীদী জোশ সৃষ্টি করার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ তারা হেলায় হারাতে রাজি হবে না। সুতরাং বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মাদনা স্থায়ী করার জন্য সীমান্তের অপর পারে একটা শত্রু থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে কলকাতার রাজপথে, স্টেশনগুলোতে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স পার্টি'র একটি দেয়াল-লিখন অনেকেরই চোখে পড়ার কথা। 'দু-বাঙলার চেক পোষ্ট উড়িয়ে দাও' এটাই ছিল শ্লোগান। এই বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স সংক্ষেপে 'বিএনভিপি' কারা? সে সময়ে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম, বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একাংশ যাঁরা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাস করতে পারেননি এবং গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেসী মতাদর্শও মেনে নিতে পারেননি, তাঁরাই ছিলেন 'বিএনভিপি'র নেতৃত্বে। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধ্যান-ধারণায় আকীর্ণ এই বিপ্লবীদের মধ্যে তখনো যাঁরা জীবিত ছিলেন, কিছুতেই বাঙলা-বিভাগকে মেনে নিতে পারেননি। রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে তাঁদের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে হিন্দু ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে প্রাক্তন বিপ্লবীরা এগিয়ে এসে 'বিএনভিপি' গঠন করেন এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্য থেকে তাঁরা সদস্য সংগ্রহ করেন। নিজেদের মতামতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটান। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের এককালীন সংসদ সদস্য চিত্ত সুতার ছিলেন 'বিএনভিপি'র একজন ডাকসাইটে লোক। অন্যান্য বাংলাদেশী রাজনৈতিক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সংগঠনেও তাদের গুপ্তচর থাকা বিচিত্র নয়। ভারতে বর্তমান কেন্দ্র-অঞ্চলের রাজনীতির টানাপোড়েনে এই সংগঠনটি নিজেকে চাঙ্গা করার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বোধকরি সংগ্রহ করে ফেলেছে।

৭

সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলায় হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কতিপয় মানস-প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁদের অনেকের মধ্যে দেখা যায়, একই সময়ে তাঁরা বাংলাদেশকে ভালোবাসছেন এবং ঘৃণা করছেন। বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙালী হিসেবে তাঁরা গভীরভাবে পুলকিত বোধ করেন। হিন্দীভাষার আগ্রাসন এবং নানাবিধ কারণে যখন তাঁদের বাঙালীসুলভ স্বাতন্ত্র্য এবং অভিমানে আঘাত লাগে তখন তাঁরা প্রেরণার জন্য বাংলাদেশের দিকে তাকান। আবার বাংলাদেশের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ দেখে তাঁদের অন্তরের লালিত বাঙালিত্বের বোধে চোট লাগে। বাংলাদেশকে গালমন্দ করেন। বাংলাদেশ একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেটা সব সময়ে যে ভালো দিকে মোড় নিচ্ছে সেটাও সঠিক নয়। রাষ্ট্র সমাজে নানা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না, একথা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। বাংলাদেশের জনগণের প্রতিক্রিয়ার নানা শক্তির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস জনগণের পরাজয়ের ইতিহাস। এই পরাজয়ের কারণে শিল্প-সংস্কৃতি-রাজনীতি কিছুই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে না। পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত একটা পরিস্থিতি বিরাজ করুক এটা কামনা করেন; সেটা যখন বাস্তবে ঘটে না, তাঁরা ভয়ঙ্কর রকম ক্ষুব্ধ হয়ে নানা অকথা বলে বসেন। আসলে ব্যাপারটি হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশকে তাঁদের মনের মতো দেখতে চান। সেই ছবিটার সঙ্গে যখন মেলে না, ক্ষেপে গিয়ে দু'চার কথা বলে ফেলেন। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা নানা সময়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে যে ভ্যালু-জাজমেন্ট দিয়ে বসেন সে সবের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটা থাকতে পারে, কিন্তু পুরো সত্য থাকে না। আমার তো মনে হয় এতে একটা আহত মানসিকতার প্রকাশ ঘটছে। পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অবচেতনে তাঁদের ব্যর্থতা এবং আশাভঙ্গের বেদনা অনেক সময় বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপাতে চান। তাঁরা অল্পতেই অধিক প্রত্যাশা করেন এবং অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়েন।

বাংলাদেশের পুরো বাস্তব চিত্রটা তাঁদের মানসদৃষ্টির সামনে হাজির নেই বলেই এটা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতটা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই অনুভব করতে পারেন না। তাঁদের অনেকের মধ্যেই একটা অহমিকা এবং দাম্ভিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়েও তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা রয়েছে। পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা সে জিনিসটা বুঝতে চান না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার সুধীসমাজের একাংশের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ইচ্ছা-অজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির বিচারের একটা আলাদা মানদণ্ড এবং দৃষ্টিকোণ থাকা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত প্রবল বদ্ধমতসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যদি একমত পোষণ না করেন, তাঁদের মধ্যে উম্মা জমতে থাকে।

বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান দাবী সমর্থন করেছিলেন কেন? রাজ্জাক সাহেব একটা মজার জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যতগুলো চরিত্র আছে সে নামগুলোর একটা যোগফল করুন এবং মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি শতকরা কতভাগ দেখান। দেখবেন, পাঁচ ভাগও হবে না। এই সূচকের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙলার পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক জনসংখ্যা সাহিত্যে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। উপেক্ষিত থেকে যাওয়া মানে সংস্কৃতিতে অধিকার অর্জন করা থেকে বাদ পড়া। এই একটি কারণেই আমি পাকিস্তান চেয়েছিলাম।' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উদার মানবতাবাদী ধারাটির প্রচুর বিকাশ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও একথা মিথ্যা নয় যে, বাংলা সাহিত্য বাঙালীর সম্প্রদায়সমূহের সাহিত্য। সমস্ত বাঙালীর সাহিত্য নয়। উৎকর্ষ বিচারে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের সাহিত্যকীর্তি সমস্ত বাঙালীর গর্বের বিষয় হলেও জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কিছুতেই তা সমস্ত বাঙালীর প্রাণের জিনিস হয়ে উঠতে পারেনি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের ওপর সাম্প্রদায়িক বিতর্কের এখনো অবসান হয়নি।

আসলে এগুলো এমন স্পর্শকাতর বিষয় তর্ক করে কোনদিন তার সমাধান হবে না। যে তর্ক উপলব্ধিকে জাগ্রত করে না, বিচারবোধকে শাণিত করে না, শুধু একতরফা নিজের জেদটাকেই তুলে ধরে, তা ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রটাকে প্রশস্তই করে যাবে।

১৯৮৯

আনুপূর্বিক তসলিমা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ
(১৯৯৪)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া : কতিপয় বিবেচনা

আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। আমার বাড়ি যেখানে তার এক কিলোমিটার পূর্বে পাহাড়। এই সামান্য পথ হেঁটে পাহাড়ে যাওয়া আমার কোনদিন হয়নি। ষাটের দশকে স্কুলের শেষ পরীক্ষা শেষ করার পর আমাকে পুলিশের নেকনজরে পড়তে হয়েছিল। লাল পাগড়ির হাত থেকে বাঁচার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বমোট থেকেছিলাম এক বছর তিন মাস। এই এক বছর তিন মাস সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেকখানি অঞ্চল আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছি। আমি যে সমস্ত জায়গায় গিয়েছিলাম, পাহাড়ী বন্ধুদের কাছে সেসব জায়গার বর্ণনা যখন তুলে ধরি, অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও অবাক হয়ে যান এবং বলে থাকেন 'আপনি যত জায়গায় গিয়েছেন, সচরাচর আমাদের পাহাড়ীরাও অতোগুলো জায়গায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যাই না।'

আমি বিলাইছড়ি বাজার থেকে গোটা একদিন-আধারাত দুর্গম পাহাড়ী পথ পায়ে হেঁটে ফারুয়া অবধি গিয়েছি। ফারুয়ার পথে যেসব পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয় তার একেকটার চূড়ায় চড়লে চন্দ্রঘোনার কাগজের কল দেখা যায়। ওই জায়গা থেকে চন্দ্রঘোনার দূরত্ব একশো কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদীকে আঁকাবাঁকা চিকন একটি রূপালী রেখার মতো দেখায়। ফারুয়া ছাড়াও আমি রাঙামাটি হয়ে বুড়িঘাট বাজার, নানিয়াচর বাজার, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, মাইনিমুখ — এ সকল এলাকা পায়ে হেঁটে, কখনো মুড়ির টিনের মতো লক্কড় বাসে চেপে, কখনো নৌকাযোগে ভ্রমণ করেছি। ভ্রমণ করেছি কথাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। আসল ব্যাপারটি, আমি অন্ন ও নিরাপত্তার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি।

কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। নিজেদের জমিতে নিজ হাতে চাষবাসের কাজ করিনি। পৈতৃকসূত্রে যে জমিগুলো আমি পেয়েছি, তার কোনো অংশ কোনদিন আমি পুরোপুরি চিনে নিতে না পারলেও মামলার খরচ ঠিকমতো যোগাতে হয়। আমি বুড়িঘাট

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাজারের কাছে মইশছড়ি পাড়ায় নতুনচন্দ্র কারবারীর জমিতে প্রথম মোষের হাল বাইতে শিখি। আগে কোনদিন লাঙলের মুঠিও আমাকে ধরতে হয়নি। সেই সময়েই প্রথম রক্তখেকো, ছাড়ালে ছাড়ানো যায় না, মইষা জোঁকের সাথে আমার পরিচয় হয়। মোষের হাল বাইতে গিয়ে আমার আঙুলে যে কড়া পড়েছিল তা এখনো মিলিয়ে যায়নি। নিতান্ত ঠেলায় পড়ে নতুনচন্দ্র কারবারী বাড়ীতে অন্য দিনমজুরের সাথে দিনমজুরের কাজ আমাকে করতে হয়েছে। আমি পরিবারের কনিষ্ঠতম সন্তান এবং অনেকগুলো বোনের পর মায়ের একমাত্র বেটা-ছাওয়াল। বাড়িতে আরাম-আয়েশ, খাওয়া-পরা, আদর-যত্নের অভাব ছিল না। কিন্তু আমি সাধ করে কষ্টটা মাথায় তুলে নিয়েছিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত কষ্টের জীবন যাপন করতে হয়েছে। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে যখন চোখ বন্ধ করে ভাবি, কষ্টের কথাগুলো আমার মোটেও মনে পড়ে না। অতীতের সুখ-স্মৃতিগুলো মনের আনাচ-কানাচ থেকে উঁকি দিতে থাকে।

নতুনচন্দ্র কারবারী মশায়রা একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলে উর্দু পড়াবার একজন হুজুরের ঘাটতি দেখা গেল। উর্দুর শিক্ষক ছাড়া স্কুলের মঞ্জুরী পাওয়া যাচ্ছিল না। মাসিক ছাব্বিশ টাকা মাইনের লোভে ওই জঙ্গলে কোন্ হুজুর মরতে যাবেন। আমার অল্প-স্বল্প উর্দু এলেম ছিল। প্রাইমারীর তালেবে-এলেমদের জন্যে সেটা যথেষ্ট ছিল। সুতরাং আমাকে টেনেহিঁচড়ে মোষের হাল থেকে উর্দুর হুজুর হিসেবে প্রমোশন দেয়া হল। যাক, হালের পেছনে ছোটা থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। ভাগ্য আমাকে আরো একটু করুণা করল। নতুনচন্দ্র কারবারীর বাড়িতে একটা টুটাফাটা মহাভারত ছিল। সেটার সামনের এবং পিছন দিকের পাতাগুলো ছিল না। গ্রন্থটিকে একখণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে মুড়িয়ে মাচানঘরের উঁচু জায়গায় তুলে রাখা হত, পাছে পরিবারের কোনো মানুষের অপবিত্র স্পর্শে গ্রন্থের মর্যাদাহানি ঘটে। শুধাং মানে শাস্ত্র। আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানুষ সচরাচর কথায় কথায় বলে ফেলে, 'এই জিনিস আমার শুধাংয়ে নেই।' অর্থাৎ বিষয়টিতে আমার অভ্যাস নেই। 'শুধাং' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমার জানা নেই। খুব সম্ভব শব্দটি বর্মি ভাষা থেকে এসেছে।

একদিন আমি কারবারী মশায়ের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা শুধাংয়ের বইটি কখনো কি পড়ে দেখেছেন?' তিনি হতাশভাবে বললেন, বুড়িঘাট বাজারের অমূল্য কবিরাজ শুধাং পাঠ করে কথার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর পর শুধাংয়ের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করার মতো কোনো লোক পাওয়া যায়নি। আমি একদিন কথায় কথায় জানালাম আমি স্মৃতি থেকে মহাভারতের নানা অংশ শুধু উদ্ধৃত করতে পারিনে, চেষ্টা করলে মাহাত্ম্যও বুঝিয়ে দিতে পারি। একজন 'মগদা বাঙ্গাল' শুধাং পড়ে মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে পারে একথা জানাজানি হওয়ার পরে, ওই পাড়ায় আবাল-বৃদ্ধ লোকজনের দৃষ্টিতে রাতারাতি একটা সম্মানের আসন পেয়ে গেলাম। আমার স্মৃতিতে ভাসে অনেক অনেক জ্যোৎস্না-জ্বলা রাত। থোকা থোকা পরিপক্ক সিঁদুরে লিচুর মতো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আকাশের তারাগুলো উপত্যকার নির্জন ভূমির প্রতি তাকিয়ে আছে। কেরোসিনের আলোকে মাচানে ঘরের সামনের আঙিনায় আমি সুর করে মহাভারত পাঠ করছি, অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি, নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ অবাক হয়ে যুধিষ্ঠির-অর্জুন-দ্রৌপদী-দুর্যোধনের কাহিনী শুনে যাচ্ছে। নতুনচন্দ্র কারবারীর একটি মেয়ে ছিল, নাম লক্ষ্মণা। সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। আমার কাছে উর্দু ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও পড়ত। বয়স পনেরো-ষোলো। ওই সমস্ত অঞ্চলে আট-ন'বছরের পূর্বে ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেয়ার নিয়ম ছিল না। এসব কথা থাকুক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শুধু চাকমারা নয়, অন্য উপজাতির লোকেরাও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময়, কি হিন্দু কি মুসলমান, এমনকি স্বধর্মী বাঙালী বৌদ্ধদেরও 'মগদা বাঙাল' বলে সম্ভাষণ করত। মগদা বাঙাল একটা খুব বিশ্রী ধরনের গালি। অর্থ করলে বোধ হয় এরকম দাঁড়াবে 'শালার বাঙাল'। পাহাড়ীরা নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীদের মগদা বাঙাল বলে যে ডাকে তার পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অনেক মর্মান্তিক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। সাম্প্রতিক সময় ছাড়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর লোকদের বাঙালীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এমন স্পষ্ট একরোখা রণধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত হওয়ার অবকাশ আসেনি।

বাঙালীদের প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মনে যে ধারণা যুগ যুগ ধরে মেলামেশার ফলে বিদ্যুতের অক্ষরে অঙ্কিত হয়ে আছে, সেগুলোর সমষ্টিকরণ করলে এই দাঁড়াবে : বাঙালীরা চোর, প্রতারক, লম্পট। তাদের স্ত্রী এবং কন্যা-সন্তানেরা বাঙালীদের কাছে নিরাপদ নয়। তারা কৌশলে তাদের ভূসম্পত্তি দখল করে নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ঠকায়। তাদের কাছ থেকে জিনিস কেনার সময় ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে টাকা ধার দিয়ে চড়াসুদে আদায় করে সর্বস্বান্ত করতে বাঙালীদের বাধে না।

আমি বাঙালীদের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অত্যাচার, বিশ্বাসভঙ্গের এত কাহিনী শুনেছি তার সবগুলো যদি বিস্তারিতভাবে বয়ান করি, বিশাল কলেবরের একটা গ্রন্থ দাঁড়িয়ে যাবে। শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করব। উনিশশো আটান্ন সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির পর ছাউনি থেকে বের করে আনা সৈন্যদের কুকুরের ল্যাজ সোজা করার মতো একটা সার্বক্ষণিক কাজ বের করলেন। ঝোপ-জঙ্গল সাফ করো, বাড়ীঘর পরিষ্কার করো, নইলে সৈন্যরা ডাণ্ডা দিয়ে পেটাবে। ডাণ্ডা খাবার ভয় থেকে বাঁচার জন্যে অনেক গেরস্ত যে ফলের গাছ, তরিতরকারির বাগান কেটে ছত্রখান করেছে গ্রামদেশে তার ভুরিভুরি নজির রয়েছে। ওই 'সাফা করো' নির্দেশ যখন পাহাড়ীদের কাছে গেল তারা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তারা বলল, সাফা করে লাভ কি। আমরা বন-জঙ্গল কেটে সাফা করে যেটুকু নাল জমি আবাদ করি, দশ বছর না যেতেই সে জমি মগদা বাঙালদের হাতে চলে যায়। সুতরাং গবমেন্টের নির্দেশে আর সাফা করব

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

না। সৈন্যরা যদি ডাণ্ডা নিয়ে মারতে আসে, নাগাল না পায় মতো বাল-বাচ্চা, গরু-বাছুর নিয়ে আরো গহীন জঙ্গলে চলে যাব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাহাড়ীদের ওপর যে নির্মম শোষণ চালানো হয়েছে, তার অজস্র কাহিনী আমি জানি। এখানে শুধু একটা উল্লেখ করব। অনেক দিন আগে হেমন্ত কুমার নামে এক মহাজন একটা ইলিশ মাছ তার হালে-পাতানো চাকমা বন্ধুকে দিয়ে বলল, 'বন্ধু এটা পদ্মার ইলিশ, তোমার জন্যে এনেছি, ঝোলে-ঝালে রান্না করে খাও। অমৃতের স্বাদ পাবে।' চাকমা বন্ধুটি বলল, 'তুমি ঠিকই বন্ধুর কাজ করেছ। মাছটা তো তুমি কষ্ট করে এনেছ, বলো কত দাম দিতে হবে?' হেমন্তবাবু দাঁতে জিভ কেটে বললেন, 'বন্ধু, তুমি আমাকে এত কমিনা মনে কর কেন, আমি তোমার কাছে ইলিশ মাছের দাম চাইব! মাছটা আমি তোমাকে উপহারই দিলাম। বছরে বছরে শুধু তুমি এক আড়ি (১০ কেজি) করে ধান দেবে।' হেমন্তবাবু যতদিন বেঁচেছিলেন এক আড়ি করে ধান প্রতিবছর বন্ধুর কাছে আদায় করেছেন। হেমন্তবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে বন্ধুপুত্রের কাছ থেকে উপহার দেয়া ইলিশ মাছের শুল্ক ঠিকমতো আদায় করেছে। নাতির আমল যখন এল চাকমাটির নাতি বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল, 'একটা ইলিশ মাছ দিয়ে তিন পুরুষ ধরে এক আড়ি ধান আদায় করছ, তোমার ইলিশ মাছের দাম কত?' হেমন্ত বাবুর নাতি হিসেব করে জানাল বর্তমানের হিসেবে ছ'টাকা চৌদ্দো আনা। তখন নাতি চাকমা ছ'টাকা চৌদ্দো আনা নগদে শোধ করে বলল, 'আগামী বছর থেকে আর আসবে না।' পার্বত্য উপজাতিদের প্রতি যে শোষণ তা শুরু হয়েছে অনেক অনেক আগে। শান্তিবাহিনী গঠিত হওয়ার আগে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ভারত-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে, কাপ্তাই বাঁধ চালু হওয়ার আগে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ার আগে, নওয়াবেরা বাঙলার মসনদে আসীন হওয়ার আগে, মোগলেরা জঙ্গলমহাল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্পাসমহাল বলে চিহ্নিত করার আগে, কত আগে আমি বলতে পারব না। যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম অনুসারে রণরক্ত-সফলতার মধ্য দিয়ে শক্তিমান জনগোষ্ঠীর কাছে মার খেয়ে দুর্বল মানবগোষ্ঠী একটেরে পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহের ভাগ্যও তার চাইতে বিচ্ছিন্ন নয়।

কাপ্তাই বাঁধ চালু হওয়ার পূর্বের ব্যাপার। রাঙামাটি শহর ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে। নদীর জলস্তর থেকে বাজারের উচ্চতা ছিল সত্তর-আশি হাতের মতো। বাঁধ যখন চালু হলো বাজার পানিতে ডুবে গেল। আরো একশো হাত উঁচু জায়গায় সরিয়ে নিতে হলো। সে জায়গাও পানির তলায় চলে গেল। আরো দূরে, আরো উঁচুতে সরিয়ে নিতে হলো বাজার। কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়ীদের জীবনে কিরকম মারাত্মক অভিশাপ বয়ে এনেছিল, সে বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্যে ক্রমাগত বাজার স্থানান্তরের বিষয়টা উল্লেখ করলাম। আমার স্বচক্ষে দেখা গৃহহারা পাহাড়ীদের দু'একটা খণ্ডচিত্র

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এখানে তুলে ধরতে চাই। এক মাঝবয়সী মহিলাকে দেখলাম নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটে যাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে একটি নারকেলের শলার ঝাড়ু, আরেক হাতে মাটিসুদ্ধ একটি বারোমেসে বেগুনের চারা। এখানে বলে রাখা অন্যায় হবে না পাহাড়ী এলাকায় নারকেলের ঝাড়ু বড় সহজলভ্য বস্তু নয়। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তিনি একটা মুরগী এবং একটি কুকুরের বাচ্চাকে কোলের কাছটিতে নিবিড়ভাবে ধরে পাহাড়ী পথে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁদের চোখের যে অসহায় দৃষ্টি আমি দেখেছি, সারাজীবনে তা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

২

ভারতের সাতটি গোলমেলে রাজ্য, যেমন ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড এ সকল অঞ্চল যে ভৌগোলিক সংলগ্নতার বলয়ভুক্ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান তার সাথে অনেকখানিই সংযুক্ত। ভূপ্রকৃতি এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি পাশাপাশি রাজ্যের ততখানিই মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যতখানি জীবিকা এবং জীবনযাপন পদ্ধতির দিক দিয়ে একের সাথে অন্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ভারতের এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বোধটি যতদূর জোরাল অনৈক্যের ভাবটিও তার চেয়ে কম নয়। তারা আলাদা আলাদাভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, কিন্তু নিজেরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সম্মিলিত সংগ্রামের পাটাতন তৈরি করতে এ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। তথাপি ওই পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বৃহত্তর ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরম্পরাগত প্রক্রিয়া থেকে এই রাজ্যসমূহ অতি সাম্প্রতিককাল ছাড়া বরাবরের মতোই বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে।

ভারত স্বাধীন হবার পরেও এই রাজ্যসমূহ ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটিয়ে মিশে যেতে পারেনি। নাগা, মিজো এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। নানারকম ছাড় দেয়ার পরও ভারতের শাসকেরা এই রাজ্যসমূহের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অথচ ওই অঞ্চলটির সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ-হিন্দ ফৌজের সহযোগিতায় নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা অবধি ধাওয়া করেছিল। ষাটের দশকের প্রথম দিকে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় নেফার সীমানারেখা অতিক্রম করে ওই অঞ্চলে চীনা সৈন্যের হামলার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এই সকল রাজ্যে খ্রীস্টান মিশনারীরা দীর্ঘকাল ধরে এমন নিবিড় প্রচারকার্য চালিয়েছে যে, এই দুটি রাজ্যের প্রায় সব অধিবাসী খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ফেলেছে। নিজেদের ভাষার বদলে তারা ইংরেজীকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করে ফেলেছে। এভাবে ইংরেজী ভাষা এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করানো সম্ভব হয়েছে, যা ভারতীয় রাজনীতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের সাথে কোনো সামঞ্জস্যই রক্ষা করে না। এ সকল কারণে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে নতুন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্ম সম্ভাবিত হয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেষ্টা করেছে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রতিস্পর্ধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে বৈদেশিক শক্তির উস্কানি এবং গোপন সহায়তা তাদেরকে অনেকখানিই বেপরোয়া করে তুলেছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভারতকে দুর্বল করে রাখার যাবতীয় প্রকাশ্য এবং গোপনীয় তৎপরতা চালিয়ে গেছে। মাঝখানে শোনা গিয়েছিল পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সমন্বয়ে 'নিউ এশিয়া' নামে একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি এশীয় শক্তিধর রাষ্ট্রের পুরো সমর্থন রয়েছে। জগৎজোড়া কমিউনিজমের ভরাডুবির কারণে স্নায়ুযুদ্ধের গতিমুখ পরিবর্তিত হওয়ায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যবর্তী সম্পর্কের ধরনটিও পাল্টে গেছে। পশ্চিমা শক্তিবর্গ আরবদের নাকের ডগার ওপর যেমন ইসরাইলকে বসিয়ে দিয়েছিল, ভারত উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে সেরকম একটি রাষ্ট্র তৈরি করার নীল নকশা আপাতত তারা হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাকিস্তান যখন টিকেছিল প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ব্যক্তিগত প্রযত্নে নাগা, মিজো ইত্যাদি বিদ্রোহী রাজ্যের অধিবাসীদের আমন্ত্রণ করে এনে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিতেন। বিদ্রোহী নাগা নেতা লালডেংগা পাকিস্তানের সম্মানিত মেহমান হিসেবে মিরপুরের লালকুঠিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করে গেছেন। পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে নাগা-মিজোদের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা অনেকখানিই থিতিয়ে এসেছে, কিংবা তারা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকের স্মরণ থাকার কথা, নাগা-মিজো জনগোষ্ঠীর লোকেরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতা করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সাম্প্রতিক সময়ে জোরালো হয়ে উঠেছে। সরকার এবং জনসংহতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ একটি সমঝোতায় এসে পৌঁছেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বিরোধী দলও একটি নমনীয় অবস্থান নিতে যাচ্ছে। আমরা এ প্রয়াসকে অভিনন্দিত করি এবং সর্বান্তকরণে কামনা করি ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু আমাদের আশঙ্কার ব্যাপারটাও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে চাই। সংকটের আসল প্রকৃতিটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের সরকার বা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কারো পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভিত রচনা করা সম্ভব হবে না।

একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাবর্ত্য জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন, কাপ্তাই বাঁধের কারণে তাদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, নির্বাসন, সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন নীতি, লোগাং হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংস ঘটনা, পার্বত্য এলাকায় বাঙালী জনগোষ্ঠীর অভিবাসন এ সকল ঘটনা একযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সংকটের একটা দিক মাত্র। এ সংকট সৃষ্টিতে ভারতের একটি বড় নেপথ্য ভূমিকা রয়েছে। সে জিনিসটি বাদ দিয়ে বাঙালী জনগোষ্ঠী যা বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিরোধকে একমাত্র কারণ বলে ধরে নিলে আসল সংকটটি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হবে। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বিরাজমান সংকটের একটি সম্প্রসারিত রূপ।

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। ভারতের কাছে আমরা ঋণীও বটে। ভারতকে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভাবতে পারলে আমরা অনেকখানি আশ্বস্তবোধ করি। প্রতিবেশীর সাথে বিরোধ ভালো নয়। আমরা ক্ষুদ্র দেশ। আপোসের ব্যাপারে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কারণ দুর্বলের অনেক দায়। শক্তিমান প্রতিবেশীর সাথে বিরোধ জিইয়ে রেখে আমরা লাভবান হতে পারব না। আমরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডটি উঠিয়ে নিয়েও আমাদের মনমতো কোনো দেশের পাশে স্থাপন করতে পারব না। এটা নির্মম সত্য। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা উচিত, আমরা আমাদের দেশটাকে ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেও পারব না। এরকম কোনো প্রয়াস যদি কোনো মহল থেকে দেখা দেয়, আমাদের দায়িত্ব হবে সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করা।

প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে আলোচিত হোক না হোক, ভারত এ চুক্তির একটা শক্তিশালী পক্ষ। ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ না পেলে পার্বত্য বিদ্রোহীরা পূর্ব থেকে শর্ত আরোপ করে বাংলাদেশকে আলোচনার টেবিলে আনতে বাধ্য করতে পারত না। ভারতের অবস্থান যদি আমাদের মতো হত, আমাদের অবস্থা হত ভারতের মতো, আমরাও নাগা-মিজো কিংবা উলফা বিদ্রোহীদের আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে ভারতের সরকারকে নাগা-মিজো কিংবা উলফা বিদ্রোহীদের মধ্যবর্তী বিরোধ মীমাংসা করতে বাধ্য করতে পারতাম।

যে শান্তিচুক্তির কথা সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে তার দুটি দিক। একটিতে থাকতে হবে পার্বত্য জনগোষ্ঠী যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাদের এলাকায় বসবাস করতে পারে। তারা যেন তাদের জমি-জিরেতের ওপর পূর্ণ অধিকার ফেরত পায়। তাদের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা ক্ষতিপূরণ পায়। নিজেদের সংস্কৃতির অবাধ বিকাশ সাধন করতে পারে। মানবিক, নাগরিক এবং জাতিগত সবগুলো অধিকার যেন তারা ভোগ করতে পারে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিল্প-বাণিজ্য এ সকল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা যেন নিজেদের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার সুযোগ পায়। এ চুক্তির দ্বিতীয় দিকটি হলো বাংলাদেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। এ চুক্তির মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে প্রতিবেশী ভারত পূর্ব-ভারতীয় রাজ্যসমূহের সংকটের সাথে বাংলাদেশে পার্বত্য গোষ্ঠীকে জড়িত করে বাংলাদেশের ওপর অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার ভেতরের সংকট বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ না পায়। পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক সংকটের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার সামান্যতম অবকাশও যদি থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুদূর-পরাহত হয়ে উঠবে। বড়জোর একটা 'ব্যালেন্স অব টেরর' হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সংকটটি ঘনীভূত আকার ধারণ করে একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে সকলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার শুরু উনিশশো একাত্তর সালে। পার্বত্য অধিবাসীরা ভাষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে নিজেদের বিশেষ সম্পর্কিত মনে করেন না। বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে তাদের বাঙালীদের সম্পর্কে যে ধারণা জন্ম নিয়েছে সেটা বিশেষ ইতিবাচক নয়। এই রচনার প্রথম দিকে পাহাড়ী-বাঙালী সম্পর্কের তিক্ততার কারণগুলো দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙালী জনগোষ্ঠীর একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্যোন্নয়নের কোনো ইশারা খুঁজে পায়নি। তাদের মনোভাব ছিল অনেকটা এ রকম : ক্ষমতায় পাকিস্তানীরা থাকুক কিংবা বাঙালীরা আসুক আমাদের জন্যে তো সবাই এক রকম। আমরা একইভাবে শোষিত হব। সুতরাং আমরা কেন বাঙালীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব? এ রকম একটা মনোভাব পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে। যদিও এ মনোভাব সকল পাহাড়ীর নয়। পাহাড়ীদের একাংশ তো রীতিমতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করার পেছনে আরো একটি প্রভাব কাজ করেছে। রাঙামাটির চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ছিলেন বার্মায় অর্থাৎ বর্তমান মায়ানমারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর রাজকীয় প্রভাব পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে যে সরকারটি ক্ষমতাসীন হয়, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের প্রসন্ন মনোভাব ছিল না। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধের বৈরি শক্তি মনে করে অনেকখানি সন্দেহের চোখে তাকাত। মূখ্যত এ কারণেই বাংলাদেশের সরকার-প্রধান

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শেখ মুজিব রাঙ্গামাটির এক জনসভায় পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বাঙালী হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উনিশশো একাত্তর সালের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্ম হয়েছে, শেখ সাহেবের এ ঘোষণা থেকেই তার সূত্রপাত। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নেতা মানবেন্দ্র লারমা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কতিপয় প্রতিনিধিসহ সরকারের কাছে একটা ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বাঙালী হিসেবে চিহ্নিত করা কিছুতেই উচিত হবে না। মানবেন্দ্র লারমা দাবী করেছিলেন, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আলাদা একটা নৃতাত্ত্বিক জাতিতাত্ত্বিক সত্তা রয়েছে, সেটার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হবে। সেদিন যদি মানবেন্দ্র লারমার দাবী মেনে নেয়া হত পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট এ রকম আকার নিয়ে হয়তো দেখা দিত না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এখন নানান রাজনৈতিক দল নানাভাবে ব্যাখ্যাদান করতে চেষ্টা করছে। পাহাড়ীরা একরকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। সরকার একরকম ব্যাখ্যা হাজির করছেন। বিএনপি একরকম। সকলের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রকৃত সত্য একরকম দুর্লভ হয়ে উঠেছে। তাঁরা আপন-আপন অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চাইছেন।

ভারতের অবসরগ্রহণকারী মেজর জেনারেল জেকবের লেখা বই 'বার্থ অব এ নেশন — সারেণ্ডার এ্যাট ঢাকা' প্রকাশিত হয়েছে। এটা ঢাকার বাজারে এখন পাওয়া যাচ্ছে। জেকব সাহেব মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর ওই গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়ার পরও শেখ সাহেবের অনুরোধে ভারতীয় সৈন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে থেকে গিয়েছিল। জেকবের বইতে লোম দাঁড়িয়ে যাবার মতো অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলো যদি সত্যি হয়, অনেক বিষয়েই নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার খোরাক পাওয়া যাবে। তার একটা উল্লেখ করছি। বাংলাদেশের সকলেই একটা কথা এতকাল সত্য বলে মনে করে আসছি। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে লণ্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার পথে নয়াদিল্লী বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ম্যাডাম আপনি আমার দেশ থেকে কখন সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন?' কিন্তু এখন মেজর জেনারেল জেকব বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর ভাষ্য হলো, শেখ সাহেব ভারত সরকারকে আরো কিছুদিন বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ভারত একতরফাভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে গেছে। মেজর জেনারেল জেকবের বই এখন ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায়। জেকব সাহেব যদি অসত্য তথ্য পরিবেশন করে থাকেন, আওয়ামী লীগ সরকারের উচিত ছিল প্রতিবাদ করা। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার উচ্চবাচ্য কিছু করেননি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আমার বক্তব্য বিষয়ে ফিরে আসি। শেখ মুজিবের ঘোষণা, মানবেন্দ্র লারমার দাবী প্রত্যাখান, ভারতীয় সৈন্যের দীর্ঘকাল উপস্থিতি পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তোলে। তাঁরা মনে করতে আরম্ভ করেন শেখ মুজিবুর রহমান সরকার তাঁদের প্রতি সংশয় এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এ ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে চরমপন্থী নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা বাস করতে থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার একটি পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সর্বহারা পার্টির প্রয়াত নেতা সিরাজ সিকদার পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ব্যাপক গেরিলা সংগ্রামে নিয়ে আসার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা তাঁর কবিতার বই 'জনযুদ্ধের পটভূমিতে' অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সর্বহারা পার্টির কর্মীরাই প্রথম পার্বত্য জনগোষ্ঠীর তরুণদের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর দীক্ষাদান করে। সে সময়ে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে চীনপন্থী রাজনীতির একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নেতারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করে সেগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতেন, প্রয়োজনবোধে সেগুলোতে যোগ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সমগ্র বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন, একথা সকলে না হলেও অনেকেই বিশ্বাস করতেন।

শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ায় ক্ষমতার যে পালাবদল ঘটে তা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মানসিক ভীতি অনেকগুণে বাড়িয়ে তোলে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র শব্দ দুটো ছেঁটে দেয়া হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর পাহাড়ী জনগোষ্ঠী প্রথমবার হোঁচট খায় বাঙালী বনে যাওয়ার ঘোষণা শুনে। তিন বছরের মাথায় তাঁদের শুনতে হলো সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কাটা পড়ে গেছে। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ পূর্বে যেভাবে নির্যাতিত বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের সাথে তাঁদের সংগ্রাম অবিচ্ছিন্ন মনে করতেন, সেই জিনিসটিতে ছেদ পড়ে যায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা-চেতনা, তাঁদের মধ্যে প্রসারলাভ করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। এতকাল যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে চীনপন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের সাথে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উনিশশো পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পরে ভারতের শাসকেরা খুব সম্ভবত আশা করেছিলেন, বাংলাদেশের জনগণ উনিশো একাত্তর সালের মতো মুজিব হত্যার প্রতিবাদে আরেকবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এ ধরনের চিন্তার বশবর্তী হয়ে ভারত মুজিবের অনুসারী কিছু রাজনৈতিক কর্মী এবং কবি-সাহিত্যিকদের একাংশকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সময়টিতেই ভারতীয় শাসকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তার নগদ ফল এই দাঁড়াল যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

চীনপন্থী এবং ভারতপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুই ধারার কর্মীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র লারমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লোকদের হাতে প্রাণ দিতে হয়।

মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যুর পর বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারাটিই প্রবল হয়ে ওঠে। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন এবং ভারতে আশ্রয় নেন। সশস্ত্র পার্বত্য অঞ্চলে তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটান। দেশ-বিদেশে তাঁদের সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে শক্তিশালী যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারত প্রতিটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের সহায়তাদান করেছে। সংক্ষেপে এটাই হলো পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ভেতরের কথা।

৪

জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতাসীন হন, তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত সামরিক শাসন জারি রাখতে হয়েছিল। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক খুনোখুনি তো ছিলই, সেনা-ছাউনিগুলোতেও সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। তাছাড়া সীমান্তের ওপার থেকে চোরাগোপ্তা হামলা তাঁর সরকারকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখে। সশস্ত্র পাহাড়ীরা সীমান্তের ওপার থেকে দলবেঁধে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে নাশকতামূলক কাজের আয়োজন করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের সরকার পুরো বিষয়টি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেন। ভারতীয় সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাহাড়ী গেরিলারা যদি এভাবে ক্রমাগত হামলা পরিচালনা করতে থাকে, এমন একটা সময় আসা বিচিত্র নয়, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে জিয়াউর রহমান দু'রকম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র সেনাছাউনি বানালেন। দ্বিতীয়ত, সমতলভূমি থেকে দরিদ্র বাঙালী জনসাধারণকে নিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসনের ব্যবস্থা করলেন। রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট দুর্বল সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্যে অন্য এলাকা থেকে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে এসে অভিবাসনের ব্যবস্থা করতেন। একদিকে সেনাছাউনি স্থাপন এবং অন্যদিকে বাঙালী জনগোষ্ঠীর অভিবাসনকেই জিয়াউর রহমান পার্বত্য এলাকা বাংলাদেশের দখলে রাখার একমাত্র পন্থা বলে অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাঙালী জনগোষ্ঠীর অভিবাসন পাহাড়ী জনগণের সে বিপুল অংশটিকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি যাদের কোন অনুরাগ কিংবা আস্থা ছিল না। দিনে দিনে পরিস্থিতি জটিল এবং ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে।

জিয়াউর রহমানকে নানা ধরনের চাপের মুখে এ রকম একটি সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তাঁর জানতে বাকী ছিল না, ভারতের তৎকালীন সরকারটি তাঁর প্রতি অনুকূল নয়। তাঁকে শারীরিকভাবে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্রের কথাও

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরবর্তী সরকার ফাঁস করে দিয়েছিল। তারপরেও জিয়াউর রহমানের পক্ষে শেষরক্ষা সম্ভব হয়নি। আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

জিয়াউর রহমানের পর যখন এরশাদ ক্ষমতায় আসেন, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ মোকাবেলা করার সেই সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর একচুলও হেরফের হয়নি। এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন। বেশকিছু রাস্তাঘাট বনিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নয়নের চাইতে সৈন্য বাহিনীর অবস্থান নিষ্কণ্টক করা এবং তাদের অবস্থান ও চলাচলের সহায়তার জন্যে সেগুলো করা হয়েছিল বলেই অধিকাংশ পাহাড়ী জনগণ মনে করে থাকেন। এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উন্নয়নের নামে পাহাড়ী এলাকায় তথাকথিত গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তাও হরণ করলেন। পার্বত্য অধিবাসীদের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হলো।

বিগত বিশ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে জঙ্গলের আইন চালু রয়েছে। পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। অসংখ্য লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। নারী নির্যাতনের ঘটনাও অল্প নয়। পাহাড়ীদের জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। শান্তিবাহিনীর লোকদের হাতেও সেনাবাহিনীর যথেষ্ট মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। অনেক নিরীহ বাঙালীও তাদের হাতে নিহত হয়েছেন। বিরোধ সেনাবাহিনী এবং শান্তিবাহিনীকে ছাড়িয়ে পাহাড়ী এবং বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী, বাঙালী এবং সেনাবাহিনীর লোক মিলে কত মানুষ মারা গেছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। কেউ বলছেন দশ হাজার, কেউ আরো বেশি।

My All Garbage

খালেদা জিয়ার সরকারের আমল থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল - সেনাবাহিনী মোতায়েন রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটটির সমাধান সম্ভব নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে। খালেদা জিয়ার সরকার একটি আপোস-প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। শেখ হাসিনার সরকার সেই আপোস-প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আপোস-প্রক্রিয়াকে আমরা অভিনন্দিত করি। খালেদা জিয়ার চাইতে শেখ হাসিনা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। ভারতে বর্তমানে যে সরকারটি রয়েছে, তার সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সম্পর্ক অধিক সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাছাড়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা উপলব্ধি এতদিনে নিশ্চয় এসেছে, ভারত নিজস্ব স্বার্থ ছাড়া চিরদিন তাদের দায়িত্ব বহন করতে রাজি হবে না। মানুষ যেমন তার শরীরকে অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে বাংলাদেশের বারো কোটি জনগণের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশের শাসকদেরও খতিয়ে দেখার সময় এসেছে — অত্যাচার, নির্যাতন করে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। সবদিক বিবেচনা করে একথা অবশ্যই বলা যায়, একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এখনই প্রকৃষ্ট সময়।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশ বেচে দেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে, সেটা আমরা পুরো সত্য বলে মনে করিনে। তথাপি আমাদের কতিপয় সন্দেহ এবং আশঙ্কার কথা আমরা উচ্চারণ করতে চাই। অতীতে আওয়ামী লীগ ভারত সরকারের সাথে যে সকল চুক্তি করেছে, তাতে বাংলাদেশের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। প্রথমত, বেরুবাড়ী হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করি। চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তিন বিঘার দখল পাওয়ার জন্যে বাংলাদেশকে পঁচিশ বছর সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র একটি দল ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মী এই মর্মে হাইকোর্ট মামলা ঠুকে দিয়েছিল, তিনবিঘা বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। তারপরে একচল্লিশ দিনে ফারাক্কার ফিডারে ক্যানেল চালুর সম্মতি দেয়ার পর দেখা যাচ্ছে পঁচিশ বছর পরেও সেই একচল্লিশ দিনের মেয়াদ শেষ হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হাসিনা সরকার পানিচুক্তি সম্পাদন করলেন, এটাকে হাসিনা সরকারের একটা বিরাট সাফল্য হিসেবে প্রচার করা হলো। কিন্তু পরপরই এল বন্দর সুবিধা এবং ট্রানজিটের দাবী। আওয়ামী লীগ সমর্থিত পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল, ভারতকে ট্রানজিট এবং বন্দর-সুবিধা দিলে বাংলাদেশেরই লাভ। যা হোক ভারতের সাথে পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু গত বছর আমরা পানি পাইনি। ভারতীয়দের কোনো কোনো কর্তাব্যক্তি আশ্বস্ত করছেন, এ বছর পানি পাওয়া যাবে। এ বছরও যদি ফারাক্কা পয়েন্টে পানি না থাকে, আমরা পানি পাব না, চুক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জ্যোতি বসু তো বলেই দিয়েছেন ভুটানের সঙ্কোশী নদী থেকে খাল কেটে ফারাক্কা পয়েন্টে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সে পানি বাংলাদেশকে দিতে হবে। সঙ্কোশী নদী থেকে খাল কেটে পানি আনার প্রশ্ন যখনই উঠবে আবার জ্যোতি বাবুই বলবেন, রাজ্য সরকারের টাকা কোথায়, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করবেন তারপর খাল কাটার কাজ শুরু হবে। ধরুন খাল কাটার অর্থ পাওয়া গেল, তারপর? পঞ্চাশটা এনজিও একযোগে আপত্তি উঠিয়েছে পরিবেশগত কারণে সঙ্কোশী নদী থেকে খাল কেটে পানি আনা অসম্ভব। অনুগ্রহ করে ওই এনজিওগুলো যদি আরেকটা মামলা ঠুকে দেয়, তাহলে বাংলাদেশকে তিরিশ বছরি চুক্তি কার্যকর করতে আরো তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ভারত বাংলাদেশকে নিয়ে কি করবে তার একটা ধরাবাঁধা ছক আছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সেই ছকের মধ্যে পড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। আমাদের ভারতের সাথে তো একটা সুসম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা কিভাবে আত্মরক্ষা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করব তার কোনো ছক প্রণয়ন করা হয়নি। মেজর জেনারেল জেকব তাঁর বইতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ সেটি তুলে ধরতে চাই। ঘটনাটি তাঁর জবানিতেই তুলে ধরছি : "উনিশশো একাত্তর সালে কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ডি পি ধরের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি ডি পি ধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা এখনো বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ট্রানজিট এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অধিকার আদায় করে নিচ্ছেন না কেন? ডি পি ধর জবাবে বলেছিলেন, 'আপনি সৈনিক মানুষ, রাজনৈতিক জটিলতা বুঝবেন না, ওগুলো একসময় আপনিই আমাদের হাতে এসে যাবে'।" আমি এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এই কারণে যে, ট্রানজিট এবং বন্দর-সুবিধা নেয়ার কথা আমরা শান্তিচুক্তির সময়েই শুনেছি। কিন্তু ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের উনিশশো একাত্তর সাল থেকেই সেগুলোর দিকে কড়া নজর ছিল।

একটু অপ্রাসঙ্গিক শোনালেও কথাগুলো এ কারণে বললাম, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সাথে যে কোনো চুক্তি সম্পাদনের বেলায় ভারতীয় কূটকৌশলের ফাঁদে আমরা যেন জড়িয়ে না যাই। দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে চুক্তি করলে ভারতকে ছাড় দিতে হবেই। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থানের বিচারে আমাদের অবস্থান দুর্বল নয়। আমরা পূর্ব-ভারতের স্বাভাবিক নেতা। সেই অবস্থানটি খাটো করে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে, সেটা হবে আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী — আওয়ামী লীগ সরকারকে এই কথাগুলো ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

৫

চট্টগ্রামের পার্বত্য অধিবাসীরা যদি স্বাধীনতা দাবী করতেন আমার এই রচনার বিষয়বস্তু এবং সুর অনেকখানি পাল্টে যেত। জনসংহতি পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি, বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখ্যা, এমনকি যে ভারত পার্বত্য অধিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছে সেই ভারতীয় নেতাদেরও সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সকলে পার্বত্য অধিবাসীদের সংকট বাংলাদেশের সংবিধানের আওতার মধ্যে সমাধানের আলাপ-আলোচনা করছেন এবং ভবিষ্যতে যদি কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাও সংবিধানের আওতার মধ্যেই হতে হবে।

পাহাড়ী জনগোষ্ঠী যদি বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হত না। যুদ্ধের মাধ্যমেই সবকিছুর নিষ্পত্তি করতে হত। এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মার্কসবাদী রাজনীতির অনুসারীদের একাংশ মনে করেন, পার্বত্য অধিবাসীরা ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনধারণ পদ্ধতি কোনদিক দিয়ে যেহেতু বাঙালীদের সঙ্গে সংযুক্ত নন, তাঁরা যদি মনে করেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রে অবস্থান

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করার কারণে তাঁদের মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব হচ্ছে, তাঁদের আলাদা হয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাঁরা অক্টোবর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই ধরনের মতামত পোষণ করে থাকেন। আশা করি এতদিনে তাঁরা জেনে গেছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বও গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাঁরা যেন একথাটি মনে রাখেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধিবাসীদের নেতারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাস করতে হবে এবং বাংলাদেশীদের সুখ-দুঃখের শরীক তাঁদের হতে হবে। এটা তাঁদের দিক থেকে এবং আমাদের দিক থেকে খুবই আশার কথা। নতুন উপলব্ধির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাঁদের অধিকারগুলো অর্জন করতে সক্ষম হোন এবং এই দেশ, এই জাতিকে সমৃদ্ধ এবং শক্তিমান করার কাজে তাঁদের প্রযত্ন-প্রয়াস নিয়োজিত করুন সেটা হবে সবচাইতে উৎকৃষ্ট ব্যাপার।

মনে রাখতে হবে যেখানে চুক্তি করা হয়, চুক্তি ভঙ্গ করার একটি অবকাশও সেখানে থেকে যায়। আমরা আশা করব কোনো পক্ষ এমন কোনো চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করবেন না যাতে অপরপক্ষ মনে করতে পারেন, তারা বঞ্চিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ অশান্তি ডেকে আনতে পারে এমন ক্ষণস্থায়ী শান্তিতে কোনো পক্ষই লাভবান হতে পারবেন না, উদ্যমের অপচয় হবে শুধু।

প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিটির রূপরেখা কি হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা অন্ধকারেই থেকে গেছি। এটাও আমাদের দেশের নাগরিকদের একটা ভাগ্য বটে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যখন বেরুবাড়ী এবং তিনবিঘা ছিটমহল বিনিময়ের পাকা চুক্তি সম্পাদিত হলো, একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক হাইকোর্টে মামলা করে সেই চুক্তি পঁচিশ বছরের জন্যে ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের সরকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, পার্লামেন্টে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় না, বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। নাগরিকদের সঙ্গে পরামর্শ সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। শুধু বর্তমান সরকারের কথা বলছিনে, বর্তমান সরকারের আগের সরকার, তার আগের সরকার, সব সরকারের আমলেই এমনটি হয়ে আসছে। অথচ আমাদের এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়, আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি।

বিগত একমাস থেকে সরকার সমর্থক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীরা প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির সমর্থনে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে আসছেন। কিন্তু জেনে রাখুন সরকার চুক্তির শর্তসমূহ সাধারণ্যে প্রকাশ করেননি। যে সকল ব্যক্তি চুক্তিতে কি আছে সে বিষয়ে কিছুই না জেনে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বসেন তাঁদের সম্পর্কে অধিক বলার কি প্রয়োজন আছে?

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, পার্বত্য অধিবাসীদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেয়া হচ্ছে কিনা, তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিলিবণ্টন কিভাবে হবে, অভিবাসিত বাঙালী অধিবাসীদের নিয়ে কি করা হবে — এ সকল বিষয়ে সরকার কিংবা জনসংহতির নেতারা কোনরকম পূর্বাভাষ দেননি।

চুক্তিতে কি থাকছে, না থাকছে, সেসব বিষয়ে কিছুই না জেনে আমি একটা সাহসী প্রস্তাব রাখতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যে বিকাশ ঘটছে তার অংশীদার করা হোক। বাংলাদেশে যে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটছে আনুপাতিক হারে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের তার অংশ দেয়া না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কোনদিন সম্ভব হবে না। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অর্থনৈতিক নিস্পেষণ চালানো হয়েছে তাই-ই সেখানকার জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং বিদ্রোহের পথে ধাবিত করে নিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক নিস্পেষণ, জাতিগত নিস্পেষরণর জন্ম দিয়েছে, জাতিগত নিস্পেষণ সাংস্কৃতিক নিস্পেষণের পথ প্রশস্ত করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, কলকারখানা, দোকানপাট ইত্যাদিতে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত আছে, তার শতকরা পাঁচভাগ মূলধনও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকে আসেনি। পার্বত্য এলাকার লোকদের হাতে যদি পর্যাপ্ত মূলধন থাকত, তাঁরা যদি বাঙালীদের মতো সমগ্র বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারতেন, নিজেদের অবহেলিত, বঞ্চিত এবং প্রতারিত না ভাবতেন, তাহলে তাঁরা নিজেরা হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতিরোধ করতেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে ক্যান্টনমেন্ট রাখার প্রয়োজন হত না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সকল দাবী যদি মেটানোও হয়, তাঁরা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিযুক্ত থাকেন, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁদের দারিদ্র্য তাঁদেরকে বিচ্ছিন্নতার পথে টেনে নিয়ে যাবে। প্রচলিত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, সেগুলো পার্বত্য এলাকায় শান্তি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবে না।

সমতল ভূমির বাঙালীরা পার্বত্য অধিবাসীদের যদি সত্যিসত্যি নিজের দেশের নাগরিক মনে করেন, তাঁদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কর্তাব্যক্তিদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে চিন্তা করতে বলি। পার্বত্য অধিবাসীদের মূলধন সংগ্রহ করার জন্যে একটা ব্যাংক করা হোক। স্বাধীনভাবে তাঁদের মূলধন বিকাশের জন্যে অন্তত দশটা কোম্পানী গঠন করা হোক। অন্তত আগামী দশ বছর সেই কোম্পানীগুলোকে প্রোটেকশন দেয়া হোক। উদ্যমী তরুণদের সর্ববাংলা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার জন্যে অবাধ সুযোগ দেয়া

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হোক। তাঁদের অনভিজ্ঞতা, কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ব্যবসায়িক দক্ষতা যাতে অর্জন করতে পারে সে জন্যে বিজ্ঞ পরামর্শক সরবরাহ করা হোক। আমরা সমতল ভূমির মানুষেরা পার্বত্য অধিবাসীদের যদি সমান নাগরিক মনে করি, আমাদের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো প্রতিভাবান ও যোগ্য ব্যক্তি যদি থাকেন সেই ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

অতীতে সংশয়, সন্দেহ, প্রতিরোধ, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, অবিশ্বাসের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রক্রিয়াগুলো চালু রয়েছে, সেই সংকটসমূহের সৃষ্টিশীল সমাধানের জন্যে একটা বড় ধরনের উল্লম্ফন প্রয়োজন। এই উল্লোম্ফনটাকেই আমি অর্থনৈতিক উন্নয়নে পার্বত্য অধিবাসীদের অংশীদারিত্ব দান বোঝাতে চাইছি। পেছনের ইতিহাস ঘাঁটলে কোনো সমাধান আসবে না। তাকাতে হবে সামনের দিকে। সংশ্লিষ্ট সকলকে একটা বিষয় বিবেচনা করার অনুরোধ করব। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টগুলোতে যুদ্ধাবস্থা বজায় রেখে এ পর্যন্ত যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সেই অর্থটাই মূলধন হিসেবে পার্বত্য অধিবাসীদের প্রদান করা হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি প্রসারিত হবে।

১৯৯৭ *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*
(১৯৯৮)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন

শেখ হাসিনা সরকার শেষপর্যন্ত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে যাচ্ছে – এরকম একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তথাপি আমার মনে একটা সন্দেহ আছে, এ কুখ্যাত আইন সাত্যিসত্যি বাতিল হতে যাচ্ছে কিনা? কারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলো নানারকম ভালো কাজ করার ভঙ্গী দেখিয়ে থাকে। আমরা কামনা করব, এটা সরকারের কোনো মুলো ঝোলানোর ব্যাপার নয়, এ আইনটি বাতিল করার জন্য সরকারের সত্যিসত্যি সদিচ্ছা রয়েছে। হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকরা অনেকদিন ধরে দাবী করে আসছিলেন — এ জঘন্য আইন বাতিল করা হোক। এ আইন বলবৎ করেছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান। সে আয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হলেন, পাকিস্তান ভাঙল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। তারপরও এ আইনটি অনড় থেকে গেল। তবে ভাষার হেরফের ঘটিয়ে চাতুর্যপূর্ণভাবে আইনটিকে জায়েজ করা হলো। পাকিস্তান আমলে যেটা শত্রু সম্পত্তি আইন ছিল বাংলাদেশ আমলে সেটা অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বলে পরিচিতি লাভ করল। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাকিস্তান সৈন্যের গুলিতে তাদের মরতে হয়েছে, যেভাবে উদ্ধত সঙ্গীনের আক্রমণের মুখে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে; যেভাবে ভারত থেকে ফিরে এসে ঘরবাড়ী, দোকানপাটের লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত দৃশ্য দর্শন করতে হয়েছে সেগুলোর মূল্য স্বাধীন বাংলাদেশে এভাবেই নিরূপণ করা হলো — হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সুতরাং পুরস্কারস্বরূপ শত্রু সম্পত্তি আইনটিকে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বলে ঘোষণা দেয়া হলো। পাকিস্তান সৈন্যের হাতে ক্ষয়ক্ষতি এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পুরস্কার এ 'অর্পিত' শব্দটি; একমাত্র এ শব্দটিই হিন্দু-সম্প্রদায়ের অর্জন। পাকিস্তান আমলেও দেশে বিবেচনাসম্পন্ন সৎ নাগরিকরা এ আইনটির ঘোরতর বিরোধিতা করে আসছিলেন। সে সময়ে পাকিস্তানে যে ধরনের সরকার ক্ষমতায় ছিল আর সারাদেশের পরিস্থিতি যেরকম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তাতে করে তারা একটি অমানবিক আইন রহিত করতে এগিয়ে আসবে সেটা প্রত্যাশার বিষয় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে এ আইনটি বাতিল করা হলো না কেন? ঈষৎ

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরিবর্তন করে এ আইনটিকে নতুনভাবে বৈধতা দেয়া হলো কেন? এসব প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে। যদি বলা হয়, এ সময়ের মধ্যে যতগুলো সরকার এসেছে এবং গেছে তাদের নানারকম জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় সংকট নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে এ আইনটি রদ করার অবকাশ তাদের হয়নি। অনেকে এ ধরনের কৈফিয়ত দিয়ে থাকেন। সেগুলো যাঁরা দেন তাঁরা জানেন, যাঁদের কাছে দেন তাঁরাও জানেন, আসলে সত্য নয়।

যে কারণে আইনটি দীর্ঘদিন ধরে চালু থেকেছে, তার মুখ্য কারণ এ আইন চালু থাকার কারণে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। অনেকেই জোর করে, জাল দলিল করে, ভয় দেখিয়ে হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। এ আইনটি রদ করা হলে তাদের সেই অন্যায়ভাবে অধিকার করা সম্পত্তি ফেরত দিতে হয়। সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের সম্পত্তি সমাজের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকদের মধ্যে কোন্ দলের সমর্থক কি পরিমাণ আত্মসাৎ করেছে সে বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে তৈরি করা একটি মেধাবী জরীপ দেখার সুযোগ আমার ঘটেছে। এ জরীপে দেখানো হয়েছে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা কিভাবে হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, এমনকি শ্মশানের জায়গাজমি ছলেবলে, কলেকৌশলে নিজেদের অধিকারে নিয়ে গেছে। যারা হিন্দুদের সম্পত্তি জোর-জবরে দীর্ঘকাল থেকে অন্যায়ভাবে দখল করে ভোগ করে আসছে রাজনীতিতে তাদের অপ্রতিহত প্রভাব থাকার কারণে এ পর্যন্ত এ কুখ্যাত আইনটি বাতিল করা সম্ভব হয়নি।

হিন্দুদের জমিজমা যারা দখল করেছে তাদের বেশিরভাগই প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের মানুষ। কতরকম প্রক্রিয়া অবলম্বন করে দখলদাররা হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, বলে শেষ করা যাবে না। একান্নবর্তী পরিবারের এক ভাই ভারতে চলে গেছে। সেই লোক ঐ দলিলের বলে অনেক সময় দেখা গেছে বাকী শরীকদের জমিও দখল করে নিয়েছে। যে মানুষ কোনদিন ভারতে যায়নি তার সম্পত্তিও শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জমির প্রকৃত মালিকের উপস্থিতি সত্ত্বেও সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে অন্য লোক এ জমি অধিকার করে নিয়ে বসে আছে। এরকম ঘটনা একটা-দুটা নয়, অসংখ্য।

একমাত্র সংখ্যাগুরু মুসলমান-সমাজের লোকেরা যে দুর্বল হিন্দু-সমাজের জায়গা-জমি দখল করে আছে একথার সবটা সত্য নয়। হিন্দু-সমাজের মধ্যেও এমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে যারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বলতর হিন্দুদের জমিজমা নিজেরা ভোগদখল করে আসছে। আমি নিজে ঢাকা শহরের কিছু হিন্দু ভদ্রলোককে চিনি, তাঁরা যেসব বাড়ীতে বসবাস করে আসছেন সেগুলো অর্পিত সম্পত্তির আওতাভুক্ত। ওইসব বাড়ীর বৈধ মালিকরা এদেশে বসবাস করা সত্ত্বেও এ দখলদারদের হাত থেকে তাদের বাড়ীঘরের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এ আইনটির বিরোধিতা করে আসছে। যে লোকদের সঙ্গে আমি বাস করি, যাদের সঙ্গে প্রতিদিন আমাকে কাজ-কারবার করতে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে যুক্ত থাকতে হয়, একই সঙ্গে নানারকম সামাজিক কর্মসূচীর দায়িত্ব নিতে হয়, তাকে আমি শত্রু মনে করব কেমন করে? তাকে যদি শত্রু মনে করি তাহলে আমার নিজের অস্তিত্বের একাংশকেই শত্রু ভাবতে হয়। আরো একটা ব্যাপার চিন্তা করার আছে, এ আইনটি বলবৎ থাকার কারণে আমাদের সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে কোনপ্রকারে লাভবান হয়নি। মুষ্টিমেয় মানুষ হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে রেখেছে। এ আইনটি চালু থাকার কারণে তারাই লাভবান হচ্ছে। তাদের বেশিরভাগ মানুষ অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু এ আইনের সুযোগ-সুবিধা হিন্দু-সম্প্রদায়েরও কিছু মানুষ ভোগ করে আসছে। এ কায়েমি স্বার্থবাদী মানুষরা আমাদের রাজনীতিতে যে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের নীরব প্রতিরোধের কারণেই এ আইনটি এত দীর্ঘকাল চালু থাকতে পেরেছে।

এ আইনটি রদ হতে যাচ্ছে এ সংবাদ শুনে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা শঙ্কাও বোধ না করে পারছি না। আইনটি রদ হওয়ার পর কি পরিমাণ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, কি পরিমাণ মামলা আদালতে উঠবে, সে ব্যাপারগুলো আগাম কল্পনা করে আমি শিহরিত বোধ না করে পারছি না। এই আইন বাতিল করার আগে একটি সামাজিক জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন। থানায়-থানায়, গ্রামে-গ্রামে সভা করে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, এটি একটি খারাপ আইন, এ আইন চালু থাকলে আমরা কলঙ্কমুক্ত হতে পারব না এবং যেসব মানুষ অন্যায়ভাবে হিন্দুদের জায়গা-জমি, ঘরবাড়ী দখল করে আছে সেগুলো তাদের ফেরত দেয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য জনগণের এগিয়ে আসা উচিত। অসৎ লোকরা যাতে গোটা ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রভাবিত করতে না পারে সে ব্যাপারে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

সিলেটের একটা অঞ্চলের একটি সংবাদ পত্রিকায় এসেছে এবং সেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোন্ থানা এখন মনে করতে পারছি না, ঐ এলাকার লোকরা সভা করে জানিয়ে দিয়েছে, সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইন রদ করতে পারে কিন্তু হিন্দুদের যেসব জমিজমা তাদের দখলে আছে সেগুলো তারা ফেরত দেবে না। যদি কেউ ফেরত দাবী করে তাহলে কারবালা হয়ে যাবে।

পরিশেষে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলি, সরকার অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন রদ করতে যাচ্ছে সেজন্য অবশ্যই সরকারকে ধন্যবাদ দেব। সরকার-দলীয় যেসব মহাত্মা হিন্দুদের বাড়ীঘর দখল করে আছে তাদের কথাটা যদি সরকারের মাথায় থাকে তাহলে খুব ভালো হয়।

২০০০

উপলক্ষের লেখা
(২০০১)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস : একটি রাজনৈতিক পাপ

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৬৭ সালে। কিন্তু শেষ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। যেহেতু আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখতে বসিনি তাই মাঝখানের চার বছরের কথা আমি বলব না। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখনকার বিচারে সেটাকে একটা ভয়ঙ্কর সময় বলেই ধরে নেয়া হত। আইয়ুব খান সাহেব ক্ষমতায় বসেছেন, মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। আইয়ুব-মোনায়েম সমর্থনপুষ্ট একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি হয়েছে। সংগঠনটির নাম এনএসএফ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন। ছাত্রদের মধ্যে যারা এনএসএফ করত, তাদের অনেকেই ছিল বলিষ্ঠ এবং দীঘল শরীরের অধিকারী। কথাটা একটু বিশদ করে বলা দরকার। সরকারী ছাত্রদলে শারীরিকভাবে সক্ষম ছাত্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিক্রুট করা হত। এনএসএফ-এর এই সুঠামদেহী ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে লাঠি এবং তারপরে হকিস্টিক আমদানী করে। কেউ কেউ ছোরাছুরিও সঙ্গে রাখত। কিন্তু কেউ ব্যবহার করেছে তার প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যায়নি। এনএসএফ-এর হকিস্টিকধারী ছাত্ররা অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা প্রতিপক্ষের ছাত্রদের পেটাত, হল থেকে বের করে দিত এবং আরো নানা অপকর্ম করে বেড়াত। এক সময় এনএসএফ-এর গুণ্ডারা বর্তমানে প্রয়াত তখনকার দিনের অত্যন্ত একজন জনপ্রিয় শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবু মাহমুদের ওপর শারীরিকভাবে হামলা করেছিল। ড. মাহমুদের ওপর হামলার ব্যাপারটি গোটা দেশের সৎ মানুষের কাছে একটি ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এনএসএফ-এর সমর্থকদের বর্বরতা এবং যাবতীয় অপকর্মের মূর্তিমান প্রতীক বলে ধরে নেয়া হত। ছাত্রসমাজতো বটেই, সাধারণ মানুষের মনেও এনএসএফ-এর প্রতি একটি জ্বলন্ত ঘৃণা কাজ করত।

আমি ষাটের দশকের কথা বলছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এই ধরনের অরাজকতা চলতে দেখে বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠতেন। সরলপ্রাণ মানুষকে আমি নিজের কানে বলতে শুনেছি, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অরাজকতা! রোজকেয়ামতের আর বুঝি বেশী দেরী

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেই। আর দু'মাস পরে আমরা নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে যাব। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিস্থিতি তার সঙ্গে ষাটের দশকের তখনকার ভয়ঙ্কর সময়টির যখন তুলনা করি, আমার মনে হয় তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যযুগ। কিন্তু আমার পাঁচ-দশ বছর আগে যাঁরা পাশ করেছিলেন তাঁদের কাছে সেটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কলংকিত সময়।

আমাদের সময়ও সন্ত্রাস চলত, মারামারি হত, কিন্তু খুন-জখম হয়েছে তার নজির অধিক পাওয়া যাবে না দু'একটি ছাড়া। এনএসএফ-এর ছাত্রদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে '৬৯ সালের শেষের দিকে সব ছাত্ররা মিলে রমনা পার্কে সাইদুর পাঁচপাত্তুকে খুন করেছিল। পাঁচপাত্তু খুন হওয়ার পর এনএসএফ অনেকটা দমে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের ঘটনা আর বিশেষ ঘটেনি।

আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনিয়ম এবং অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তাই নিয়ে আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তখনো ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতেন। বিনা নোটিশে ছাত্রদের হল ছাড়তে হত, পরীক্ষা তিনমাস থেকে ছয়মাস পর্যন্ত পিছিয়ে যেত। আমি বলব, তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার একটি আদর্শ পরিবেশ ছিল। কিছু শিক্ষকের নাম শোনা যেত, যাঁরা গ্রন্থাগারে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। বর্তমানে জাতীয় প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (সংক্ষেপে যাঁকে 'ম্যাক' বলা হত), শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং আরো কিছু শিক্ষককে অনেকে রসিকতা করে গ্রন্থাগারের বাসিন্দা বলে ডাকতেন। তাছাড়া আরো কিছু শিক্ষক ছিলেন যাঁদের দয়া, মায়া-মমতা এবং মনীষার কথা প্রায় প্রবাদের মতো ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন শহীদ ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, শহীদ* ড. মোকাররম হোসেন প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত। কেন বলা হত চিন্তা করে আমি তার কারণ খুঁজে পাইনি। দালান, ইমারত, বাড়ীঘর এগুলোর সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীঘরের মিল ছিল বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত কিনা আমি বলতে পারব না। তবে একটি কথা সত্য, গোটা ভারত উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার খুব সুনাম ছিল। এখানে অধ্যাপনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ সত্যেন বসু, কবি মোহিতলাল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি মনীষা এবং শ্রমে এখানে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার একটি উত্তাপিত আবেষ্টনী সৃষ্টি করেছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্র তৎকালীন অখণ্ড বাঙলার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসু, কবি অজিত দত্ত প্রমুখ আধুনিক কবিতার বিকাশের

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা রসায়নবিদ ড. মোকাররম হোসেন খোন্দকারের মৃত্যু ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর। সুতরাং, বলাই বাহুল্য, লেখক অনবধানতা বশত তাঁর নামের সঙ্গে 'শহীদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। — সম্পা.

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রেখেছেন।

তিরিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা বুদ্ধির মুক্তির জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার গুরুত্ব বাঙলা দেশের মননশীলতার বিকাশে মস্ত বড় ভূমিকা রেখেছিল, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। অদ্যাবধি স্বাধীন চিত্তবৃত্তি এবং মুক্তচিন্তার চর্চার কথা উঠলেই সকলে একবাক্যে শিখা গোষ্ঠীর নাম উচ্চারণ করে থাকেন।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি এ সকল গৌরবের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি একটা কথা অবশ্যই মানতে হবে। সামন্তচিন্তার প্রভাব ছিন্ন করে এখানে যে একটি নতুন চিন্তা-চেতনার ধারা বিকাশলাভ করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় তার ধাত্রীপনার ভূমিকা পালন করেছে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি তখনও '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ এবং আগুন থেকে একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনের আগেকার কোনো কবি-সাহিত্যিকের মিল পাওয়া যাবে না। কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহীদ সাবের প্রমুখ তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা এ অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটা নতুন বেগ এবং আবেগ, একটা নতুন মূল্যচিন্তা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে ১৯২১ সালে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল এ সময়সীমার মধ্যে সন্ধান করলে একটা জিনিস পরিষ্কার ধরা পড়বে, '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর যে একদল লেখক-সাহিত্যিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জন্ম নিয়েছিলেন তার আগে সাতাশ-আটাশ বছরের সময়সীমার মধ্যে মুসলমান-সমাজের মধ্যে তেমন একজন মানুষও জন্ম নেননি।

My All Garbage

আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ আগের চাইতে অনেকাংশে নষ্ট হবে এসেছিল। তথাপি আমাদের দেশে পড়াশুনার জন্য বিদেশ থেকে অনেক ছাত্র আসত। থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইরান, তুরস্ক এ সকল দেশের ছাত্ররা এখানে পড়াশুনা করতে আসত। সাধারণ শিক্ষার মান অনেকাংশে নেমে গেলেও আমাদের দেশের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার একটা গুণগত মান ছিল। এসব বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রী আসত। বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণও করা হয়েছিল। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ি সে সময়ে আমি গণচীনের চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে দেখেছি। তাঁরা এখানে বাংলা ভাষা শিখতে এসেছিল। অধিকহারে ছাত্র-ছাত্রী আসার মুখ্য কারণ একশো/একশো পঁচিশ ডলার খরচ করলে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারেও যে কোনো ছাত্র-ছাত্রী আরাম-আয়েশে কাটাতে পারে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

২

অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশ কেমন ছিল তার একটি আভাস এ রচনায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তখন দেশে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল — ঢাকা এবং রাজশাহী। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম পরে তৈরি করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই ওপরের কথাগুলো বলা হলো।

এখানে বর্তমানের কথায় আসি। সংকট এত বিশাল, পরিস্থিতি এত নাজুক এবং জটিল যে কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব সেটা ঠিক করতে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। আপাতত আমরা একটি বিষয় নিয়ে শুরু করি। ভারতে স্নাতক শ্রেণীতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলাদেশের কত ছাত্র পড়াশুনা করে তার সঠিক সংখ্যাটা জানা যায়নি। প্লেগ আতঙ্ক যখন ছড়িয়ে পড়েছিল পত্র-পত্রিকায় ভারতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৫ হাজার বলে উল্লেখ করেছিল। অনেকে মনে করেন এই সংখ্যাটি লাখের কাছাকাছি দাঁড়াবে। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাদীক্ষা এমন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে এক লাখ তরুণ-তরুণী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করার জন্য ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। তারা ভারতে পড়তে গেছে তার পেছনে একটা কারণ, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা নিজের ইচ্ছায় শুরু করা যায় বটে, কিন্তু সাঙ্গ কবে হবে সেটা কেউ বলতে পারে না। দু'বছরের কোর্স শেষ করতে দশ বছর লেগে যায়। এই সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিয়ের বয়স ডিঙিয়ে যায়, ছেলেদের চাকরীর বয়স পার হয়ে যায়। ভারতে যারা পড়তে গেছে সামাজিক কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে একথা বলা যাবে না।

আমাদের দেশ থেকে দু'ধরনের ছেলেমেয়ে বিলেত-আমেরিকায় পড়তে যায়। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে খুবই মেধাবী, তাদের পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার একটা স্বপ্ন থাকে; এবং যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের অভিভাবক অসম্ভব রকমের ধনী, সামাজিক মর্যাদার স্মারক হিসেবে তাঁরা ছেলেমেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে থাকেন। ভারতে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়তে গেছে, তাদের ব্যাপারে একথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সব মিলিয়ে এই আটটির কোনোটিতে ভর্তি হয়ে একটা সময়ে পড়াশুনা শেষ করতে পারবে না, এই আশঙ্কায় ভারতে গেছে। আর সব ছাত্র যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত, সে কথাও সঠিক নয়। আরো একটা কথা বিবেচনা করার মতো রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের খুন-যখম এবং সন্ত্রাস চলে অভিভাবকেরা তাদের পুত্র-কন্যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কিছুতেই স্বস্তিবোধ করতে পারেন না। ভারত ছাড়া ইউরোপ-আমেরিকায়, বিশেষ করে আমেরিকায় এন্তার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করার জন্য যাচ্ছে। এদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি, বছরে কমসে কম পাঁচ-দশ হাজার তো হবেই। এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে একটি কথা আগাম বলে দেয়া যায়, এদের বেশীরভাগই লেখাপড়া শেষ করে ওই দেশে থেকে যাবে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতে যে বাংলাদেশের একলাখ ছাত্র পড়াশুনা করছে তার পেছনে মাসে কত টাকা পাঠাতে হয় তার একটি হিসেব করতে চেষ্টা করি। প্রতিটি ছাত্রের পেছনে যদি প্রতিমাসে চার হাজার টাকা পাঠাতে হয়, একলাখ ছাত্র-ছাত্রী পেছনে মাসিক চার কোটি। মাসে চার কোটি টাকা এখান থেকে ভারতে যায়। মাসে চার কোটি টাকা হলে বছরে দাঁড়ায় ৪৮ কোটি। আর দু'কোটি যোগ করলে বলা যায় ৫০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভারতে ব্যয় করে। বিলেত-আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধরা যাক ব্যয় হয় আরো বিশ কোটি টাকা। বাংলাদেশকে ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে বিদেশে বার্ষিক সর্বমোট সত্তর-আশি কোটি টাকার মতো ব্যয় করতে হয়। এই হিসেবটা আমার মনে ছিল। পরে জেনেছি বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমাদের বার্ষিক পাঁচশো কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। এখানে আর একটি দিকের কথা আমরা আলোচনা করব। সাম্প্রতিককালে ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুখ্যত সেসব অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের দিকে লক্ষ্য রেখে, যাঁরা ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠাতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভর্তির অসুবিধার জন্য পাঠাতে পারেন না। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে একজন ছাত্রকে মাথাপিছু অন্তত দু'লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে প্রধানত একটা কারণে, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সে সকল ছাত্ররাই পড়াশুনা করে, করতে বাধ্য হয় যাদের মা-বাবার ভারতে শিক্ষা দেয়ার ব্যয় বহন করার মতো ক্ষমতা নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় সিকি শতাব্দী অতীত হতে চলল। এ সময়ের মধ্যে একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। তা হলো স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশের সমূহ সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে পচন ধরেছে তার ওপর আলোচনা করা এ রচনার বিষয়বস্তু নয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সৃষ্ট সন্ত্রাস বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে কিভাবে অচল করে দিয়েছে, রচনার পরবর্তী অংশে আমি সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব।

৩

আমাদের তেল নেই, কয়লা নেই, লোহা বা অন্য কোনো মূল্যবান খনিজ পদার্থ নেই। দূরপ্রাচ্যের নানা দেশে সয়াবিন-পামঅয়েল যেমন পাওয়া যায় আমাদের দেশে সে সবেরও কিছু নেই। একসময় পাটের বাজার ছিল। সে বাজার সংকুচিত হতে হতে ঘরের কোণে এসে ঠেকেছে। এই একটুখানি ভূমি, যাতে সাড়ে বারো কোটি মানুষ পোকা-মাকড়ের মতো কিলবিল করছে। আমরা দুনিয়াতে কি করে বেঁচে থাকব? এই যে বিপুল পরিমাণ মানুষ একে শক্তিতে পরিণত করতে পারলে বাঁচার একটা উপায় পেয়ে যেতে পারি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একবিংশ শতাব্দী নাকের ডগায় এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আগামী একবিংশ শতাব্দীতে কি করতে হবে, কি ভাবতে হবে এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। একবিংশ শতাব্দী তো আর কোনো একটি দেশের জন্য আসছে না, সমস্ত পৃথিবীর জন্যই আসছে। এই একবিংশ শতাব্দী আসার প্রাক্কালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকছে, ক্লাস বসছে না, লাইব্রেরীগুলো তালা খুলছে না। পার্শ্ববর্তী ভারতের দিকে তাকালেও আমরা একটা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাব। সেখানে রাজনৈতিক যত অঘটনই ঘটুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। লাইব্রেরীর দুয়ার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধারাত পর্যন্ত খোলা থাকে। হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যার লাইব্রেরী দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় বন্ধ থাকে।

আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বছরের পর বছর একই ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবাজি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, রগ কাটা চলছে। কেন এ সমস্ত ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলছে? বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার। বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার ভূমিকা পালন করতে না পারে, সমুন্নত ভাবমূর্তি দিয়ে ইতরের স্পর্ধা দমন করতে না পারে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয় যদি একদিন বন্ধ থাকে, জাতি এক বছর দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকছে। এ নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেমন মাথাব্যথা নেই, তেমনি সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবৃন্দ তাদের কিছু করার আছে এমন মনে করেন না। সকলেই ধরে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় একটি দুশ্চিকিৎস্য রোগী, যার আরোগ্য বা নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে দুটি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। প্রথমটি হলো যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় থাকে তার, তাকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এবং যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় যেতে চায় তাকেও সরকারী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার জন্য পাল্টা সন্ত্রাস করতে হবে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ছোট-খাট দলকেও রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সন্ত্রাসীদের পুষতে হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সন্ত্রাস স্বয়ং আমাদের সমাজ-জীবনের একটি সত্তা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। রাজনীতি করতে গেলে যেমন নেতা দরকার, ক্যাডার দরকার, তেমনি সন্ত্রাসও রাজনীতির অঙ্গবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের অন্যতম কারখানা। এখানে সন্ত্রাসের চর্চা হয়, সন্ত্রাসীদের সবকিছুর কেন্দ্র এখন বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ত্রাসীদের লজ্জিত হওয়ার কারণ তো নেই, শঙ্কিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। কোনো দল ভেতরের কোনো কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে সন্ত্রাসীদের দুধ-ঘি খাইয়ে মোটাতাজা রাখতে পারে না। তখন সন্ত্রাসীরা যে দলে গেলে দানাপানি জোগাড় করতে পারবে সেই দলের আওতায় চলে যায়। এরশাদ আমলে সন্ত্রাসীরা এরশাদের পার্টিকে যখন তাদের অবস্থান-ক্ষেত্র হিসেবে বিপজ্জনক

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মনে করল, তখন তারা অন্য দলে চলে গেল। অন্যদলও তাদের লুফে নিল। ক্রমাগত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, একথা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। বরঞ্চ সন্ত্রাস-শিক্ষার আলাদা বিভাগ খুলতে হবে। একথা মুখে না বললেও কাজকর্মে এমন অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকেন। আগে সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে ঘৃণার চোখে দেখা হত, এখন সন্ত্রাসীদের প্রতি সামাজিক মূল্যায়নের পদ্ধতিটাও ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সন্ত্রাস চালিয়ে কুখ্যাতি অর্জন করে, দেখা যায় সে ছাত্রটি পরবর্তীতে মন্ত্রীত্বের গদিতে বসেছে। আগে মেয়েরা মেধাবী ভালো ছাত্রের প্রেমে পড়ত, এখন নামকরা সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মদান করার জন্য অনেকেই সেজেগুজে অপেক্ষা করে থাকে। সন্ত্রাসীদের খাওয়ার দাম শোধ করতে হয় না। ক্লাসে না আসলেও চলে। অনেক সময় সকলের সঙ্গে পরীক্ষায় না বসলেও ভালো ক্লাসটি পেয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা সন্ত্রাসের নায়কদের সঙ্গে কানে কানে কথা বলে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, দেশের সকল স্থান থেকে নামকরা সন্ত্রাসীরা পুলিশের তাড়া খেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভয়ারণ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কেউ তাদের কিছু করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এমন কতিপয় খুঁজে পাওয়া যাবে, যাঁদের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র জমা রাখে। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে করতে শিক্ষকদের মুখের ভাবে সন্ত্রাসী চেহারা ফুটে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেখানে সন্ত্রাস রাজত্ব করে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একেবারেই চলতে পারে না। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' এই পরিবেশ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে বিদ্যাশিক্ষা একেবারে অচল। প্রাণের প্রতি মমতা যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সেখানে অবাধভাবে পশুত্বের চর্চা চলতে থাকে। এখন নরহত্যা একটা সুন্দর ক্রীড়াকৌতুকে পরিণত হয়েছে। ১৮/১৯ বছরের ছেলে তার এককালীন বন্ধুর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিতে কোনরকম কুণ্ঠা বোধ করে না। আগের দিনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান এবং সংস্কৃতির আলো বিকিরিত হত। এখন সন্ত্রাসের বীভৎসতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় একদল ছাত্র চীনা কুড়োলে আরেকদল ছাত্রের হাত-পা কাটছে, শরীর থেকে মস্তক ফাঁক করে ফেলছে। এ সকল ঘটনা এত অধিক হারে ঘটছে যে সকালে পত্রিকা পড়া এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের, ধর্ষণের, জবরদস্তির এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা এত অধিক পরিমাণে ঘটছে যে সামাজিক মানুষ এগুলোর কোনো প্রতিকার আছে সেকথা চিন্তাও করতে পারছে না। খুন-সন্ত্রাস প্লেগ কিংবা এ জাতীয় মহামারীর জীবাণুর মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের মন থেকে মানবিক বোধের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত উধাও হওয়ার উপক্রম। একটি দেশ, যেখানে জ্ঞান-বিদ্যা এবং সুবিবেচনার প্রতি সর্বসাধারণের কোনো শ্রদ্ধা নেই, সেই দেশকে, সেই সমাজকে কদাচিৎ মানুষের সমাজ বলা চলে। যে সৃষ্টিনাশা অন্ধকার সময় বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার উৎপত্তিস্থল

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি করা হয় না। আগে যখন কালেভদ্রে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটত এবং মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা সাফাই গেয়ে বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বাইরে নয়। দেশে যখন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। হয়তো তখনকার দিনে এই কর্তাব্যক্তিদের কথা ঠিক ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিচ্ছে। রাজনীতিকে আশ্রয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিরাজমান রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রেখেছে। একটানা এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোও সেই কলুষতার পঙ্কে ডুবে গেছে। এই অবস্থার পরিণতি কি হতে পারে সেকথা এখন একাডেমিক আলোচনার বিষয় হিসেবেও কেউ উল্লেখ করেন না।

৪

বর্তমানে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সন্ত্রাসের প্রকোপ ঘটছে তার কেন্দ্রবিন্দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত। মুখ্যত ছাত্র-রাজনীতি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের মূল উৎস। রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে লালন করতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও নেতা-নেত্রীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে রেখে পড়াশুনা করান, পরের ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাঁদের ক্ষমতার পথ নিষ্কণ্টক করতে একটুও কসুর করেন না। শুধুমাত্র ক্ষমতা আরোহণ যখন রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন সব ধরনের মানবিক মূল্যবোধহীন রাজনীতি, জাতি এবং সমাজের জন্য কি ভয়াবহ ফল বয়ে আনতে পারে বাংলাদেশ হলো তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্ররা একেবারে রাজনীতি করবে না, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দেশের দরকারে ছাত্ররা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং পড়া উচিত। এরকম ঘটনা ১৯৭১ সালে ঘটেছিল। কিন্তু ছাত্রের প্রধান কাজ পড়াশুনা করা। পড়াশুনার অংশ গৌণ হলে ছাত্র-রাজনীতিতে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। আজকের বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে এভাবে সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ্য কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে অন্য ইস্যুকে শিক্ষার চাইতে বড় করে তোলা হয়েছে।

৫

বাংলাদেশে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে, বলতে গেলে সবগুলোই একভাবে না একভাবে এই সন্ত্রাসকে লালন করছে। নেতা-নেত্রীরা মুখ রক্ষার জন্য যাই বলুন না কেন তাঁরা চান বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস টিকে আছে। ছোট মুখে বড় কথার মতো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

শোনাবে, তথাপি আমি সাহস করে বলব, এই রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিকে ক্ষমতার ক্রীড়াক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশ এবং জাতির মঙ্গলের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁদের সামান্যতম চিন্তাও নেই। তাঁরা মনে করেন, যে উপায়েই হোক দলটি ক্ষমতায় গেলে দেশ-জাতির সমূহ মঙ্গল সাধিত হবে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সন্ত্রাস করলে কোনো পাপ হবে না। একটা জিনিস আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। কেন সবগুলো রাজনৈতিক দল একসঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে সন্ত্রাস নির্মূল করার কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে না। কেন বৃহত্তর অঙ্গনে আদর্শগত বৈরিতা ভুলে তারা একে অপরের সহযোগিতা করছে। সময় বিশেষে ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং জামাত একইরকম কথা বলেছিল। তাঁরা একই সঙ্গে সংসদে বসেছেন, সংসদে বসার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন, বিদেশ থেকে সকলেই সমানে পাজেরো গাড়ী আনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যে সন্ত্রাস এ দেশের শিক্ষাজীবনকে সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত করে ফেলেছে, সমাজে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েমের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে তাদের সম্মিলিত কোনো কর্মসূচী নেই কেন? কোনো প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে রাজনৈতিক দলগুলো এইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, আমাদের দলের ছাত্রকর্মীরা আত্মরক্ষার্থে সন্ত্রাস করেছে অথবা পূর্বতন সন্ত্রাসের বদলা নেয়ার জন্যই তাদের সন্ত্রাস করতে হয়েছে। মুখে যাই বলুন না কেন, সব দল খ্যাতনামা সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ দলের বীর হিসেবে গণ্য করে সম্মান এবং শিরোপা দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে গোটা রাজনৈতিক পদ্ধতিটাই সন্ত্রাসের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসের মাধ্যমে একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, একই দলের অভ্যন্তরে স্বার্থসম্পর্কিত কারণে, কোটারিগত কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সন্ত্রাস হালে এমন একটি আকার নিয়ে দাঁড়িয়েছে খালেদা জিয়া ইচ্ছা করলেই তাঁর দলের অনুগত ছাত্র-সংগঠনটির সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেন না। সন্ত্রাস বন্ধ করতে চেষ্টা করলে তাঁর দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। একই কথা শেখ হাসিনা এবং জামাতে ইসলামী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সুতরাং নেতা-নেত্রীরা জনসভায় যাই বলুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ত্রাস বন্ধ করার ক্ষমতা বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলেরই নেই। এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছে ছাত্রসমাজকে রাজনীতির শিশুশ্রমিকে পরিণত করার কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাস নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ছাত্ররা ছাত্র-সংগঠনগুলোর এই শিশু-শ্রমিকের ভূমিকা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে বলেই অহরহ সন্ত্রাস জন্ম নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা যদি কোনো সামাজিক শক্তি প্রয়োগ করে এই সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য বাধ্য করতে না পারি আমাদের ধারণা সন্ত্রাস অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

এখন কথা হলো সন্ত্রাস করে কারা? আগের দিনে যেমন মার্সেনারি অথবা ভাড়াখাটা সৈন্য পাওয়া যেত, আজকের দিনের সন্ত্রাসীরা রাজনীতির ভাড়াখাটা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সৈন্যদলের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। সব দলের কাছে তাদের চাহিদা আছে। একটি বিশেষ দল যদি তাদের পোষণ করতে না পারে অন্যদলের পক্ষপুটে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরুন। এখানে যতজন ছাত্র সন্ত্রাসকর্মে নিয়োজিত রয়েছে, সবদল মিলিয়ে তথ্য নিলে দেখা যাবে তাদের সংখ্যা তিনশোর ওপরে নয়। সেই তিনশো প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসীকে সহযোগিতা করে, ধরা যাক, আরও ছয়শো ছাত্র। সন্ত্রাসীরা যখন চাঁদা ওঠায়, এ সহযোগীরা তাদের সঙ্গ দান করে, বন্দুক, পিস্তল, বোমা এগুলো লুকিয়ে রাখে। এই ন'শো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সন্ত্রাসীকে মদদ যুগিয়ে লাভবান হয় আরো ন'শো ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিরিশ হাজারের মতো হবে। এই আঠারশো ছাত্র তাদের সন্ত্রাসকর্মের মাধ্যমে এই তিরিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার অধিকার হরণ করে। শিশুর মাতৃস্তন্যে যেমন অধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবারও তাদের সমান অধিকার। কিন্তু এই আঠারশো ছাত্রের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বাকী প্রায় সাড়ে আটাশ হাজার ছাত্র তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই গরীব নিম্নবিত্ত মা-বাবার সন্তান। গ্রামের হাল-লাঙল বেচে তারা পড়াশোনার খরচ চালায়। ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ জোগাতে গিয়ে নিম্নবিত্ত অভিভাবকদেরও দুর্দশার অন্ত থাকে না। আঠারশো দুর্বৃত্ত, তাও আবার একসঙ্গে নয়, প্রতিনিয়ত তাদের অধিকার হরণ করছে। বেবাক ছাত্রসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছাত্ররা সমাজের অন্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন। এই ছাত্রসমাজ তাদের প্রাণপ্রিয় অধিকারটি হরণ হতে দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। অসহায়ভাবে পরিস্থিতিকে মেনে নেয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীরা একজোট হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রাতিবাদ করতে পারে না, তার কারণও চলমান রাজনীতি। ধরুন ছাত্রলীগ একটা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাল। ছাত্রদল সেটাকে মূলধন করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চেষ্টা করে। আবার ছাত্রদল যখন অনুরূপ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দেয়, ছাত্রলীগও এই উপায়ে ফায়দা লুটতে তৎপর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো না কোনো দলের সক্রিয় সদস্য কিংবা সমর্থক। দলীয় আনুগত্য লংঘন করে অপকর্মকে অপকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার সাহস অনেকেরই নেই। খারাপ কাজকে খারাপ কাজ বললে, খুনীকে খুনী বললে ঘাড়ের ওপর মাথা টিকে থাকবে এই ভরসা খুবই কম। এই প্রতিবাদ দলীয় অন্ধ আনুগত্যের কারণে দাঁড়াতে পারে না। একটা দুঃখের ব্যাপার হলো এই যে, ছাত্ররা দেশের নাগরিকের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট। অথচ তাদেরই মুখ্য অংশ মুষ্টিমেয় সতীর্থের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে ছাত্রত্বের মৌলিক অধিকারটুকু হারিয়ে বসতে বাধ্য হয়। সে ব্যাপারে তারা সিরিয়াসভাবে কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছে, এমন তো মনে হয় না।

আমরা এরশাদ রাজত্বের অবসানের শেষ মাসটির কথা আলোচনার সুবিধের জন্য উল্লেখ করতে পারি। এরশাদ তাঁর অনুগত সন্ত্রাসীদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

করেছিলেন। সরকারী পুলিশ নিয়মিতভাবে এরশাদের সন্ত্রাসী ছাত্রদের গোলা-বারুদের জোগান দিয়ে যেত। ছাত্রসমাজ সম্মিলিতভাবে এরশাদ বাহিনীর সবরকম সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তার ফল এই হয়েছিল যে, কিছুদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা তাদের ঘাঁটি রক্ষা করতে পারলেও শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল। এই ঘটনা একটা কথাই প্রমাণ করে যে সাধারণ ছাত্ররা তাদের যে মৌলিক অধিকার আছে সেটা প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোনো সন্ত্রাস থাকতে পারে না। সন্ত্রাস অসম্ভব হয়ে ওঠে। দুঃখের কথা হলো, ছাত্রসমাজ কখনো তাদের অধিকারবোধটি সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ পায় না। আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমন রাজনৈতিক দলগুলোর সাধ্যের বাইরের কাজ। পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীও সন্ত্রাস বন্ধের কাজে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্ররা যদি চায় তাদের অধিকার কাউকে হরণ করতে দেবে না তখনই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া সম্ভব। এটা একটা নতুন ধারণা। এ নিয়ে ছাত্রসমাজ কার্যকরভাবে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। যদি সাধারণ ছাত্রদের একাংশ অগ্রণী হয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে এবং সার্বক্ষণিক সন্ত্রাসের কারণে দেশগতভাবে এবং সমাজগতভাবে আমরা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এই ব্যাপারগুলো সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সন্ত্রাস-বিরোধী সংস্কৃতির জন্ম দিতে এগিয়ে আসে, তাহলে সন্ত্রাস বন্ধ করার একটা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-বিরোধী একটা আন্দোলন সৃষ্টি করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মিলিত ছাত্রসমাজ, শিক্ষকবৃন্দ এবং দেশের সচেতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একজোট হয়ে এরকম একটি আন্দোলনের সূচনা করলে সন্ত্রাসকে পরাজিত করার একটা পথ বেরিয়ে আসবেই। এই আন্দোলনের থাকবে দুটি স্তর। একটি স্তর তাত্ত্বিক। এই দিকটি সভা, সমিতি, সেমিনার, আলোচনাসভা, গ্রুপ পর্যায়ে আলোচনা এগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সন্ত্রাস কেন হয়, সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয় কারা, তাদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কি, তারা অস্ত্র পায় কোথা থেকে, তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে কোন মানুষ, তাদের কারা ভয় পায়, চলমান রাজনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সূত্রগুলো কি কি, এবং সন্ত্রাসীদের কারণে জাতিগতভাবে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে, জাতীয় নেতৃত্বের মান কিভাবে নীচে নেমে আসছে, সর্বোপরি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কি সর্বনাশ হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় সাধারণ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং দেশের বিবেকবান কল্যাণকামী মানুষের মধ্যে ক্রমাগত প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। সন্ত্রাসীরা এখন সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে এবং মনে করে তারা সমাজের নিয়ন্তা। সন্ত্রাসীরা অপরাধী। সামাজিক ঘৃণাই তাদের প্রাপ্য; এবং এই সন্ত্রাসীদের যারা মদদ যোগায় তারাও সমানভাবে ঘৃণার পাত্র। ক্রমাগত এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে থাকলে দেশের বিরাজমান দলগুলো নিজেদের সন্ত্রাসীদের খপ্পর থেকে মুক্ত করার

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

একটা সুযোগ পাবে। একটা প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল কখনো জনমতকে পরোয়া না করে পারে না। জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল টিকে থাকতে পারে না। একটা প্রবল জনমত সৃষ্টি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্ত্রাস পরিহার করতে বাধ্য করতে হবে। এটা করা সম্ভব। সার্বিকভাবে ছাত্রসমাজ তাদের যে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে এই অধিকারবোধ প্রয়োগ করতে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রটি দুর্বল হতে বাধ্য। একটি সন্ত্রাস-বিরোধী সংস্কৃতির জন্ম না দিলে সাধারণ ছাত্রসমাজ কখনো তাদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পারবে না।

তাত্ত্বিক স্তরের পাশাপাশি একটি প্রায়োগিক দিক এই আন্দোলনের থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দলীয় ছাত্ররা সকলে মিলে একটি কমিটি গঠন করবে। সে কমিটিতে সব ছাত্রাবাসের সব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। শুরুর দিকে ন্যায়বান এবং সাহসী শিক্ষকদের একাংশকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলে আন্দোলন অনেক বেশি বেগবান হবে উঠবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দলীয় আনুগত্য এবং দলগুলোর প্রতাপ একচ্ছত্রভাবে বর্তমান, প্রথম দিকে এরকম একটি আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে তাদেরকে নানারকম ভয়ভীতির সম্মুখীন হ্তে হবে। সব দলই সন্ত্রাসীদের লালন করে এবং মনে করে যে সন্ত্রাসীদের পোষাটা দলীয়ভাবে খুবই লাভজনক কর্ম। প্রথমদিকে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদেরকে দল নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের কোপানলে পড়তে হবে। তবে একথা সত্য যে সন্ত্রাসের কারণে প্রত্যক্ষভাবে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্রসমাজ। সুতরাং তাদের ভেতর থেকেই একটা প্রতিবাদের বাণী, একটা প্রতিরোধের স্পৃহা উঠে আসতে হবে। এই সন্ত্রাস-প্রতিরোধ আন্দোলনকে যাতে সন্ত্রাসীরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এলুমনাই এসোসিয়েশন, দেশের লেখক, সাংবাদিক, বার কাউন্সিল, আরো নানা পেশাজীবীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সন্ত্রাস-বিরোধী একটি শক্তিশালী কমিটি করতে হবে। আন্দোলনরত ছাত্রদের জানমালের ওপর যদি হুমকি আসে, সেক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি নৈতিক মদদ দিতে এগিয়ে আসবে। কোনো ছাত্র, কোনো বিশেষ দল না করার কারণে যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তার ক্লাসে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে বের করে দেয়া হয়, সেই ছাত্রটি যদি নালিশ করে, তার হয়ে এ নাগরিক কমিটি মূল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। কোনো বিশেষ দলের কর্মী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি নাগরিক কমিটির কাছে এ সন্ত্রাসী ছাত্রদের নামে অভিযোগ দায়ের করবে। অতঃপর নাগরিক কমিটি প্রমাণ সহকারে মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলবে এবং এই সমস্ত লোককে দল থেকে বহিষ্কারের আবেদন জানাবে। যদি রাজনৈতিক দলগুলো রাজি না

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

হয় তাঁরা প্রাকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলবেন, আমাদের বিচারে অমুক-অমুক দল অমুক-অমুক সন্ত্রাসীকে মদদ দিচ্ছে। একথা প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করবেন। বর্তমানে সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের জনগণের প্রতিরোধ স্পৃহাকে চাঙ্গা এবং বিবেকবোধ জাগ্রত করার জন্য কতকগুলো বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। সেগুলো এরকম হতে পারে : ছাত্র কমিটি এবং নাগরিক কমিটি মিলে মিছিলের আয়োজন করতে পারে, সভা ডাকতে পারে, আলোচনা এবং সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করতে পারে। রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংলাপ চালাতে পারে। গুরুত্ব বুঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে, রাজনৈতিক দলগুলোর অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট অথবা অনশন ধর্মঘট করে তাদের অপরাধের কথা জানিয়ে দেয়া যেতে পারে। এরকম একটি সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। সাধারণ ছাত্ররা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়া সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সাধারণ ছাত্ররা তাদের মৌলিক অধিকার উদ্ধার করার জন্য কিছু করবে না, এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। হ্যাঁ ভয়-ভীতির প্রশ্ন তো আছেই। ভয়-ভীতিকে পরোয়া করলে কোন্ ভালো কাজটি করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের হাতে সাধারণ ছাত্ররাই তো বেশি মার খাচ্ছে। তাদের কি কিছু করার নেই? জাতিগতভাবে আমাদের যে সর্বনাশের শেষ সীমায় ঠেলে দেয়া হয়েছে সে অবস্থা থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে না? অধিক সময় নেই। বিলম্বে ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়বে। উত্থানশক্তি আরো অবসিত হয়ে আসবে। অতএব এখনই দরকার কিছু একটা করার।

১৯৯৫ *রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ*
(২০০০)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতীয় বই এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রসঙ্গে

নব্বুই সালের দিকে কিছু লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি মিছিল হয়। তাঁদের দাবী ছিল, ভারতীয় বইপত্রের অবাধ আমদানী এবং চোরাই পথে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় বই-পুস্তকের নির্বিচার আমদানী নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, এক শ্রেণীর অসাধু পুস্তক-ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ভারত থেকে দেদার বই-পুস্তক আমদানী করছেন। অনেকে তো লাইসেন্সের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে বই-পুস্তক আনছেন। তাছাড়াও সীমান্তের চোরাপথ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রতিমাসে আসছে। ভারতীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকায় আমাদের বইয়ের বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় বই এবং পত্র-পত্রিকা এখানে আসে, তার মুখ্য কারণ, আমাদের দেশে ওই দেশের বই-পুস্তকের বিস্তর পাঠক রয়েছে। ভারতীয় বইয়ের প্রতি এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার মুগ্ধতা এত অধিক যে, তাঁরা বাংলাদেশী লেখকদের লেখা অত্যন্ত উন্নতমানের বই দেখলেও নাসিকা কুঞ্চন করে বলতে কসুর করেন না, 'ওহ্, বাংলাদেশী বই, ও কি পড়া যাবে?' নিজের দেশের লেখকদের প্রতি একশ্রেণীর পাঠকের এই উন্নাসিকতা অবশ্য সাম্প্রতিককালে বেশ কেটে গেছে। এখন পাঠক-পাঠিকারা বাংলাদেশী লেখক- লেখিকাদের বই-পুস্তক আগ্রহ সহকারে ক্রয় করে থাকেন।

তারপরেও কিন্তু ভারতীয় বইয়ের প্রতি পাঠকের পক্ষপাত যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। তার কতিপয় কারণও আছে। গড়পড়তা ভারতীয় বই-পুস্তকের মান বাংলাদেশের বই-পুস্তকের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া উন্নতমানের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এসবের ব্যাপার তো আছেই। একটা বিষয় আছে, সেটাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের দেশের পাঠক দীর্ঘদিন থেকে ভারতীয় বই এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে অভ্যস্ত। তাই ভারতীয় জনপ্রিয় লেখকদের নাম পাঠক-সমাজে বহুল পরিচিত। সেটাও ভারতীয় বইয়ের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ বটে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারত থেকে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী — এ ধরনের নানা জাতীয় বই বাংলাদেশে আসছে। যত বই আসে তার বেশ বড় একটা অংশ বিনোদনধর্মী। এই ধরনের অনেকগুলো বই পাঠকেরা পাঠ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন বলেই পাঠ করে থাকেন। এ সকল বই না এলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে, একথা সত্যি নয়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও একেবারে নার্সারী শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত নানা বিষয়ের — কারিগরী, ডাক্তারী এবং আরো নানাবিধ বই বাংলাদেশে এসে থাকে। এ জাতীয় বইগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, সেকথাও মিথ্যে নয়। কোনো কোনো বইয়ের মান এত উন্নত যে দুনিয়ার যে কোনো দেশের ঐ সকল বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সঙ্গে সেগুলোর তুলনা করা যেতে পারে।

ঢালাও ভারতীয় বইপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা আমদানীর বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলে থাকেন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য রয়েছে। নির্বিচারে আমাদের বাজারে বই আসার ফলে আমাদের দেশের বইয়ের বাজারে একটা নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রকাশিত বই-পত্র বিদেশী বইয়ের পাশে দাঁড়াতে পারছে না। ফলে দেশীয় প্রকাশনা-শিল্প মার খাচ্ছে। দেশীয় লেখকদের চিন্তা-ভাবনা দেশের মানুষের মনে প্রভাব রাখতে পারছে না। বই যদিও পণ্য তবু বইয়ের সঙ্গে অন্য দশটা পণ্যের তুলনা করা যায় না। বইয়ের সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ, জাতীয় জীবনের নানা বিষয়ের উৎকর্ষবিধানের প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। পার্শ্ববর্তী দেশের বই এসে যদি প্রবল প্রতাপে দেশের বাজারে রাজত্ব চালায়, তাহলে এমনও সময় আসতে পারে যখন আমাদের সংস্কৃতিকে ইপ্সিত লক্ষ্যে প্রবাহিত করা অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করা সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়াবে। পার্শ্ববর্তী দেশের বই দিয়ে রসপিপাসা মেটানোর অভ্যাসটি যদি মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অনেকদিন পর্যন্ত আমরা পরনির্ভরশীল থেকে যেতে বাধ্য হব। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। আমরা ভারত থেকে যে পরিমাণ টাকার বই আমদানী করে থাকি, ভারত আমাদের দেশ থেকে তার শতকরা ১০ ভাগ বইও ক্রয় করে না। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় বই-পুস্তক আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। কেননা অপর্যাপ্ত বইপত্র আনার দরুন আমাদের প্রকাশনা-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশীয় লেখকদের বইপত্র প্রকাশ এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে না। রুচি এবং সংস্কৃতির জাতীয় চেহারাটি ফুটে উঠতে পারছে না। সুতরাং তাঁরা বলছেন, স্বল্পসংখ্যক প্রয়োজনীয় বই ছাড়া বাদবাকি সব ধরনের ভারতীয় বই আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। এঁদের যুক্তি এবং দাবীর ভালো-মন্দ বিচারের পূর্বে এই মতামতের বিপক্ষে যে মতামত রয়েছে সে বিষয়টা প্রকাশ করতে চাই।

যাঁরা ভারতীয় বই আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিপক্ষে তাঁদের অনেকেই বলে থাকেন, বই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

জগতে বন্ধ দুয়ার নীতি কখনো ভালো হতে পারে না। বাংলাদেশের লেখক-লেখিকাদের লেখা নিম্নমানের। বই আমদানী বন্ধ করা কোনো কাজের কথা নয়। বাংলাদেশের লেখক-লেখিকারা ভালো বই লিখলে পাঠক অবশ্যই পড়বেন। উন্নত ধরনের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই হলে অবশ্যই সেসব বই কিনতে মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠক-পাঠিকারা বাংলাদেশী বই কিনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেনও। এখানকার প্রকাশকরা সুরুচি-সম্পন্ন বইপত্র প্রকাশও করেছেন। শুধুমাত্র ভারতীয় বই বন্ধ করে দিলে এখানকার প্রকাশনা-শিল্পের মান উঁচু হয়ে উঠবে তার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তাঁদের অনেকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ছবি আমদানী বন্ধের বিষয়টিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। এখানে পশ্চিম বাংলার উৎকর্ষ-সম্পন্ন ছবিগুলো দেখানো হয় না। তার বদলে হলিউডের বস্তাপচা কুরুচিপূর্ণ ছবিসমূহ প্রদর্শন করা হয়। তার ফল হয়েছে এই যে বাংলা ছবির মান দিনদিন নেমে যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে অবস্থা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশের ছবি ভদ্রলোকের দেখার অযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তার বদলে যদি কলকাতার ছবিসমূহ আমদানীর ছাড়পত্র দেয়া হত, প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশী পরিচালক-প্রযোজকরা উৎকৃষ্ট ছবি নির্মাণ করতে বাধ্য হতেন। দেশীয় গ্রন্থ-শিল্প কিংবা চলচ্চিত্র-শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকলে সুস্থ বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। গ্রন্থ ছাড়াও আমাদের বইয়ের বাজারের সঙ্গে আরো অনেকগুলো অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

বই সংস্কৃতির বিকাশ-মাধ্যম। যে জাতির মানুষ যত অধিক বই-পুস্তক পাঠ করে থাকে, তার জাগতিক উন্নতির স্তরও তত বেশি পরিমাপন্ডিত হয়। তারপরেও কিন্তু একটা কথা সত্য যে, বই সামাজিকভাবে উৎপাদিত পণ্যও বটে। পণ্যের উৎপাদন, প্রসার, প্রচার এবং বিপণনের সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ই জড়িত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইপত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে কতিপয় বিষয় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ বই-পুস্তক প্রকাশিত হয় পরিমাণগত হিসেব করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় বই-পুস্তকের সংখ্যাই সর্বাধিক। অর্থাৎ এখানে বইয়ের ব্যবসায় যত মূলধন বিনিয়োজিত আছে, তার সিংহভাগ ধর্মীয় বই-পুস্তকের প্রকাশনায় ব্যয় করা হয়। কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, দোয়ায়ে গজল, আরল-অজিফা, কাসাসুল আম্বিয়া, আওলিয়া বুজুর্গদের জীবনচরিত, বেহেশতের হুর, বেহেশতের কুঞ্জি, মেফতাহুল জান্নাত, স্বামী-স্ত্রীর মিলনতত্ত্ব এবং পুঁথি আকারে লেখা আরো নানাবিধ বই। এসবের একটা স্থায়ী বাজার রয়েছে। এ জাতীয় বই-পুস্তক যে-সকল ব্যবসায়ী প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা সচরাচর অন্য কোনরকমের বইপত্র প্রকাশ করেন না। তাই দেখা যাবে পুস্তক ব্যবসায়ে পুঁজির বেশিরভাগই ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে আটকা পড়ে আছে। অন্যান্য দেশে ধর্মীয় পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তকের প্রকাশকদের মধ্যে কোনরকমের বিচ্ছিন্নতা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধর্মীয় পুস্তকের পরে আমরা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অর্থ পুস্তকসমূহ প্রকাশনার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি। ওই ক্ষেত্রেও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার সকলের চোখে পড়ার কথা। আমাদের স্কুল-কলেজের উপযোগী সমস্ত পাঠ্যপুস্তক আমাদের প্রকাশকরা প্রকাশ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী-বিদ্যা, ডাক্তারী এবং এ জাতীয় নানা ধরনের বই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। আগে আমেরিকা এবং বিলেত থেকে দেদার পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশে আসত। সাম্প্রতিককালে ওই সকল দেশ থেকে পুস্তক আমদানীর পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে। আমাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই এখন ভারত থেকে আনতে হয়। পাঠ্যপুস্তক আমদানীর ব্যাপারে ভারতের ওপর নির্ভরতা হালে এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শিশুপাঠ্য বই থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বইও ভারত থেকে আনতে হয়। কারিগরী এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করার এখানে অনেক অসুবিধা আছে মেনে নিলাম, কিন্তু শিশু-পাঠ্যপুস্তকও কেন ভারত থেকে আমদানী করতে হবে! তার পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ খুঁজে বের করা সত্যিসত্যি অসম্ভব হবে। তথাপি ভারত থেকে প্রকাশিত বই-পুস্তক এখানে আসছে। এটা প্রমাণ করে যে, আমরা মুখে যত কথা বলি না কেন, আমরা পরনির্ভর থাকতে অভ্যস্ত হবে পড়েছি। যা হোক, আসল বিষয়ে ফিরে আসি। ধর্মীয় বইয়ের পরে স্কুল-কলেজের পাঠ্য এবং অর্থপুস্তক প্রকাশনার খাতে আমাদের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত রয়েছে। তৃতীয়টিকে আমরা বলতে পারি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী এবং শিল্প-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশনা ক্ষেত্র। এই খাতটি তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে দুর্বল। সমগ্র পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে যত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত রয়েছে, এই খাতটিকে তার মাত্র শতকরা পাঁচ কি সাত ভাগ মূলধন ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশে যে-পরিমাণ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, সমালোচনা, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তার ওপর একটি জরীপ করলে দেখা যাবে, সবগুলো মিলিয়ে মানসম্পন্ন পুস্তকের পরিমাণ দাঁড়ায় খুব বেশী হলে পাঁচশোর মতো। বাংলাদেশে সাক্ষরতার পরিমাণ যত অল্পই হোক, এই অল্প পরিমাণ বই-পুস্তক দিয়ে এগারো সাড়ে এগারো কোটি মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। আমাদের ধর্মীয় পুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজে নিয়োজিত প্রকাশকেরা নিজেদের নির্দিষ্ট বই ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করেন না। গল্প-উপন্যাসের প্রকাশকদের পক্ষে আমাদের পাঠকদের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ তাঁদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়া দরকার, প্রকাশকেরা অনেক সময় অভিযোগ করে থাকেন, দেশে মুদ্রিত ভালো বইও অনেক সময় পাঠক ক্রয় করতে চান না। অথচ পশ্চিম বাংলা থেকে আমদানীকৃত খারাপ বই খরিদ করতেও অনেক সময় পাঠকসাধারণের মধ্যে কোনো কুণ্ঠা দেখা যায় না। এই অভিযোগের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য আছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেশীয় ভালো বই পাঠক কিনতে চায় না। আর পশ্চিম বাংলা থেকে আমদানী করা চলনসই মানসম্পন্ন বইও পাঠক সাগ্রহে ক্রয় করে থাকেন। এই বক্তব্যের ভেতর থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে। সেটি হলো বাংলাদেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরা কখনো বাংলাদেশের বাজারটা অধিকার করতে পারেনি। বিষয়টার একটা ঐতিহাসিক দিক রয়েছে। উনিশশো সাতচল্লিশের বিভাগ-পূর্ব আমল থেকেই আজকের বাংলাদেশের সবটাই ছিল কলকাতার বইয়ের বাজার। কলকাতাতেই যাবতীয় বই-পুস্তক প্রকাশিত হত এবং সর্বত্র বিক্রি করা হত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে এখানে একটা বই প্রকাশনার ক্ষেত্র গড়ে উঠলেও কলকাতার বইয়ের স্থান দখল করা এখানকার প্রকাশকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারত থেকে সব ধরনের বই-পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়। এই ভারতীয় পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করার একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো, এখানকার প্রকাশকেরা চুরি করে ভারতের নামী-অনামী সব লেখকের বই ছাপতে আরম্ভ করলেন। ভারতীয় বইয়ের একটা বাজার এখানে তৈরী ছিল, এ সকল চোরাই বই বিক্রি করতে বিশেষ অসুবিধা হত না। তার ফলে গল্প-উপন্যাসের প্রকাশকদের হাতে কিছু পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হলো, একথা সত্য। কিন্তু ক্ষতি হলো বেশী। দেশীয় প্রকাশকেরা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করে ভারতীয় বই-পুস্তকেরই বাজার সৃষ্টি করলেন। দেশীয় লেখকদের বই ছাপা, জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করা এ সকল বিষয় গৌণ হয়ে দাঁড়াল।

আবার আইন করে ভারতীয় বই-পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ করলে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর যে ঘটনা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি যে ঘটবে না, সে কথা নিশ্চিত করে বলার কি অবকাশ আছে? অনেকেই ভারতীয় পুস্তক আমদানীর বিরুদ্ধে কথা বলেন, কিন্তু দেশীয় বাজারে বাংলাদেশের প্রকাশকেরা যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, সে-ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে পছন্দ করেন। আসল কথা হলো, আমাদের বইয়ের বাজারটার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবার মতো পর্যাপ্ত পুঁজি আমাদের হাতে নেই। অনেকে অনেক কথা বলবেন, যেমন, ছাপা-বাঁধাইয়ের কথা, মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের কথা, সহজলভ্যতা, লেখক পরিচিতি এবং লেখার গুণাগুণের ব্যাপার ইত্যাদি। এদের মধ্যে শেষের ব্যাপারটি ছাড়া আর সবগুলোর সাথে পুঁজির একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেশীয় বইয়ের বাজার সৃষ্টি করে, চাহিদা পূরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলে এখানকার উৎপাদিত গ্রন্থপণ্য অবাঞ্ছিত ভারতীয় গ্রন্থপণ্যের গতিরোধ করবে। ভারতীয় গ্রন্থপণ্য আমদানী বন্ধ করলে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ দ্রুততর হবে বলে যাঁরা মনে করেন, অর্থনীতির সাধারণ সূত্রসমূহ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণা নেই। পণ্যের সাহায্যে পণ্যের গতিরোধ করাই হলো সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। সেটি না করে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করলে, তার প্রতিক্রিয়া অধিকতর খারাপ হতে বাধ্য।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

এই একটা জিনিস মেনে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান করা না গেলেও অন্তত কাছাকাছি যাওয়া যেত। এগারো-সাড়ে এগারো কোটির মতো মানুষের জন্য একটি বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়। দুঃখের কথা হলো, গ্রন্থ-শিল্পকে এ পর্যন্ত একটা শিল্প বলে সরকার এখনো স্বীকৃতি দেননি। এই সরকারী অস্বীকৃতির আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে বইয়ের ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার কথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু সত্যিসত্যি ভালো বই লেখা এবং সে বই বাজারে বিক্রি করার একটা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। আমাদের দেশের জনসংখ্যা সাড়ে এগারো কোটির মতো। প্রতি হাজারে তিনজন করে পাঠকও যদি ধরে নিই, আমাদের মোট পাঠক সংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার। বাদছাদ দিয়ে ধরে নিলাম এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ক্রয়-ক্ষমতার পরিমাণ যতই অল্প হোক না কেন এই সংখ্যাটা কিন্তু একেবারে কম নয়। আমাদের দেশের মধ্যে প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ বইপত্র পাঠ করে থাকেন। আমাদের গল্প-উপন্যাস এবং অন্যবিধ বইয়ের প্রকাশকদের এই জনসমষ্টির চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা নেই। আমাদের দেশীয় পাঠক দেশে প্রকাশিত বই পাঠ করতে পারে না, তার নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু মুখ্য কারণ হলো, স্থানীয় প্রকাশকদের মূলধনের অপ্রতুলতা। স্থানীয় প্রকাশকরা উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভালো কাগজে উৎকৃষ্টভাবে ছাপা এবং বাঁধাই করা বই পাঠক-সাধারণের কাছে সরবরাহ করতে পারেন না; দেশের বইয়ের বিকাশমান বাজারটার চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। লেখকদের সম্মানী দেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। লেখক লিখে বেঁচে থাকতে না পারলে লেখার মান উন্নত হবে, তা কিছুতেই আশা করা যায় না। পেশাদার লেখক ছাড়া বইপত্র লেখার মান কিছুতেই আশা করা যায় না।

বইয়ের বাজারে এই মন্দাভাব, এই অচলাবস্থার নিরসন করার জন্য একটা সুষ্ঠু গ্রন্থনীতি প্রণীত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। একটা সুচিন্তিত গ্রন্থনীতি চালু না করে দেশীয় বইয়ের বাজার চাঙ্গা করার অন্য কোনো বিকল্প পন্থা আছে বলে মনে করিনে।

এই প্রস্তাবিত গ্রন্থনীতিটি চালু করার প্রথম পদক্ষেপ হলো, গ্রন্থ-শিল্পকে অবশ্যই অন্য শিল্পের মতো যাতে সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে অর্থ ধার করতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যদি ঋণ দিতে সক্ষম না হয়, প্রয়োজনে একটা গ্রন্থ-ব্যাংক খুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত দেশে যে সকল মানসম্পন্ন বইপত্র প্রকাশিত হয়, অন্তত পাঁচশো কপি সরকার কিনে নেবেন। পাবলিক লাইব্রেরী কিংবা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে ওই সকল বই থানা-লাইব্রেরীগুলোতে বিলি করতে হবে। যাতে নিম্নমানের বই কেনা না হয় এবং কোনরকমের দুর্নীতি ঢুকে না পড়ে সেজন্য দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গঠন করতে হবে। এভাবে দেশীয় লেখকদের লেখা থানা-লাইব্রেরীগুলোতে বণ্টন করা হলে থানা-লাইব্রেরীগুলো সমৃদ্ধ হবে এবং দেশীয় লেখকদের সঙ্গে পাঠকের নিবিড় পরিচয়ের একটা ক্ষেত্র তৈরী হবে। এই ব্যবস্থার আর একটি সুফল এই দাঁড়াবে যে, পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাড়াতাড়ি লেখকদের রয়্যালটি এবং কাগজের দাম ইত্যাদি পরিশোধ করতে পারবেন, আবার নতুন বই প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হবেন। লেখকেরা লিখে জীবনধারণের মতো অর্থ আয় করতে পারলে, নিশ্চিত মনে নতুন বই লেখায় মন দেবেন। লেখার মান উন্নত হবে, বা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশে যে-পরিমাণ বই-পুস্তক বছরে প্রকাশিত হয় কোটি দুয়েক টাকা হলে সবগুলোর পাঁচশো কপি করে কিনে ফেলা যায়। বাংলাদেশ গরীব দেশ হলেও এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাটা একটুও বাজে খরচ হবে না। জাতিকে বছরে খেলাধুলার পেছনে কত টাকা খরচ করতে হয়? খেলাধুলা জাতির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পড়াটাও অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রকাশক, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীরা মিলে একটা গ্রন্থনীতি চালুর আন্দোলন করলে, কর্তৃপক্ষ একেবারে চুপ করে থাকতে পারবেন, এমন তো মনে হয় না।

তৃতীয়ত আরো একটি বিষয় প্রস্তাবিত গ্রন্থনীতির আওতাভুক্ত থাকতে হবে। অনেক প্রকাশককে দেখা যায় ধর্মীয় বই, অর্থ পুস্তক এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা বইপত্র বাংলাদেশের বাজারে বেচে বিস্তর টাকা মুনাফা করে থাকেন, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখেন না। গ্রন্থনীতি চালু করতে হবে এবং তাতে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যে-সকল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে বিশ লাখ টাকা মূলধন খাটে বছরে কমপক্ষে তাঁদের পাঁচটি কি ছয়টি শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক ছাপতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট প্রকাশকেরা অভ্যাসের জড়তার কারণে ভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক ছাপতে চান না। একবার জড়তা ভেঙে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামন্ত রুচির উপযোগী বই-পুস্তকের বদলে আধুনিক রুচির বইপত্র ছাপতে প্রবৃত্ত হবেন। আমদানীকারকদের বিষয়েও কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশীয় বই ছেপে তাদের অল্প অর্থাগম হয় বলেই অধিক লাভের আশায় বাইরে থেকে বই-পুস্তক আমদানী করে আমাদের বাজারে বিক্রি করে থাকেন। তাই আমদানীকারকদের জন্য প্রস্তাবিত গ্রন্থনীতিতে একটা শর্ত অবশ্যই জুড়ে দিতে হবে। সেটি এ রকম হতে পারে, ধরুন যে ব্যবসায়ী যে পরিমাণ টাকার বই আমদানী করবেন অন্তত তার এক চতুর্থাংশ মূলধন দেশীয় বইয়ের প্রকাশনার ক্ষেত্রে লগ্নী করতে হবে। এ গ্রন্থনীতির চেহারাটি এমন হওয়া চাই যাতে করে প্রকাশক, লেখক, বিক্রেতা সকলের মধ্যে একটা আগ্রহ এবং উদ্দীপনা তৈরী করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার বলতে কিছুই নেই। এখানে যে সমস্ত প্রকাশক আছেন তাঁরা হয়তো ধর্মীয় বই ছাপেন নয়তো নোট বই ছাপেন। সাহিত্য — যার মধ্যে জাতির প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে, সেরকম প্রকাশনা

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষেত্র আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়নি। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, শিশু একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বইপত্র ছেপে থাকে। এদের অধিকাংশ বই বাজারে পোকায় কাটার জন্যই ছাপানো হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কোটারীভুক্ত ভদ্রমহোদয়দের বাজার-খরচ জোটানোর জন্য সরকারী-আধাসরকারী সংস্থাসমূহের গ্রন্থ মুদ্রণ করা হয়। কোটি কোটি টাকা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান লগ্নি করলেও বাজারে তেজীভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই পরিমাণ অর্থ যদি প্রকাশকদের ঋণ স্বরূপ দেয়া হত এই মূলধনের প্রবাহের তোড়ে বহুকাল আগেই বাংলাদেশের প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি জঙ্গমতার সৃষ্টি হতে পারত। এ ব্যাপারে কথা বলে লাভ নেই। আমাদের পণ্ডিত এবং পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদের ভর্তুকি দিয়ে লালন পালন করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি নতুন দিগন্তের কথা ব্যবসায়ীদের সামনে সরকারী উদ্যোগে তুলে ধরা প্রয়োজন। ইংরেজী বইয়ের একটা বিশ্বজোড়া বাজার রয়েছে। ভারতবর্ষের কতিপয় প্রকাশক অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত নানা ধরনের ক্লাসিক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইউরোপ-আমেরিকায় মুদ্রিত বইয়ের যে ব্যয় ভারতে মুদ্রিত বইয়ের ব্যয় তার চেয়ে অনেক কম। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত এখন ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। শুধু ভারত কেন ইসরাইল, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড এসকল দেশেও বিস্তর ইংরেজী বই মুদ্রিত হচ্ছে এবং সেগুলো ইউরোপ-আমেরিকায় চালান হচ্ছে। এই সুযোগটা বাংলাদেশও গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ কোয়ালিটি প্রিন্টিং-এর জগতে প্রবেশ করেছে কিন্তু প্রকাশকদের সামনে আন্তর্জাতিক বাজারের একটি কল্পদৃষ্টি বা ভিশান নেই। প্রস্তাবিত গ্রন্থনীতি মোতাবেক সেবা সৃষ্টির কাজে একটা উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বই বিক্রেতারা যাই বলুন, বাংলাদেশের বইয়ের ব্যবসার উন্নতি হবে না। কলকাতা তথা ভারতবর্ষের বইয়ের বাজারের হিন্টারল্যাণ্ড কিংবা পশ্চাদ্ভূমি এখন বাংলাদেশের বইয়ের বাজার। এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং জাতীয়ভিত্তিক বইয়ের বাজার গড়ে তুলতে হলে সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থনীতি অনতিবিলম্বে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একটা সুষ্ঠু গ্রন্থনীতি বাংলাদেশের প্রকাশনা-শিল্পকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাতে পারে। বাংলাদেশের প্রকাশনা-শিল্প যদি মার খায় বাংলাদেশের আত্মা যখম হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার কোনো মূল্য থাকবে না। আমাদেরকে আত্মপরিচয়হীন সেকেণ্ডারী নেশন হিসেবে অপরের চিন্তা-চেতনা ধার করে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু সেটা কি টেকা?

১৯৯৫

নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ
(১৯৯৫)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভারতে বিজেপির উত্থান এবং তারপর

মহাত্মা গান্ধীর নাতি রাজমোহন গান্ধী পেশায় সাংবাদিক। এক সময়ে তিনি রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। রাজমোহন গান্ধী 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং দ্যা মুসলিম মাইণ্ড' শিরোনামে ভারতের মুসলিম সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চিন্তাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করে একটি গবেষণা-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি সৃষ্টির চেষ্টা তিনি দীর্ঘদিন থেকে করে আসছেন।

রাজমোহন গান্ধী ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মন্তব্য করেছিলেন, ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সত্যিসত্যি তিনি মারা গেলেন। অর্থাৎ রাজমোহন গান্ধী বলতে চেয়েছিলেন ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা সত্যিসত্যি পরাজিত হয়েছে।

যে নাথুরাম গড্সে মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪৮ সালে প্রার্থনাসভায় গুলি করে হত্যা করা করেছিল তার অনুসারীরাই ১৯৯৬ সালে লোকসভার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ভারতে সরকার গঠন করেছে।

উত্তর-ভারতে বর্তমানে যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে নেহেরু, গান্ধী, মওলানা আজাদ যে মূল্যচিন্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন আজকের উত্তর-ভারতে তার প্রভাব নিতান্তই সামান্য। বিজেপি এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহ মিলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল এতেই তার প্রমাণ মিলে।

বাবরি মসজিদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিজেপির রাজনৈতিক উত্থান। কোনরকমের রাখঢাক না করে বিজেপির নেতা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন ভারতবর্ষকে একটি পুরোপুরি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। উত্তর-ভারতের জনগণ তাঁদেরকে ভোট দিয়ে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ক্ষমতায় বসিয়েছে। অবশ্য কথা আছে, বিজেপি এই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি না? কংগ্রেসের একটি বিরাট অংশ উল্লেখযোগ্য সংসদ সদস্যের সমর্থন যদি পায় তাহলে, সকলে যেভাবে মনে করছেন, অল্পদিনের মধ্যেই বিজেপি সরকারের পতন ঘটবে।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই অটল বিহারী বাজপেয়ী ঘোষণা করেছেন তাঁরা অবশ্য-অবশ্যই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির তৈরী করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। বাবরি মসজিদের ঘটনাটি ভারতের বৃহত্তর সংখ্যালঘু মুসলিম-সম্প্রদায় সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করে গেছেন। এ পর্যন্ত বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে দু'হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসেই এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে হাত দেবে বলে যে ঘোষণা দিল তাতে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান-সম্প্রদায়ের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা জানা যায়নি। বিজেপি যে ধরনের হিন্দু-ভারত সৃষ্টি করার দাবীতে আন্দোলন করে আসছিল সে আন্দোলন সাফল্যের স্বর্ণশিখর স্পর্শ করেছে। বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের পর বিজেপি ভারতকে পুরোপুরি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে আর কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করবে সেটা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কয়েক বছর আগে পরলোকগত সাংবাদিক গিরিলাল জৈন ছিলেন ভারতের হিন্দু পুনরুত্থানবাদের একজন উগ্র সমর্থক। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নানা পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলো সংকলন করে 'হিন্দু ফিনোমেনন' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন গিরিলাল জৈন-এর লেখা বইটি বিজেপি সমর্থকদের বাইবেল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

গিরিলাল জৈন তাঁর বইতে যুক্তি এভাবে দাঁড় করিয়েছেন, ভারতে মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে হিন্দু পরিচয় ঢাকা পড়েছিল প্রায় অন্যূন এক হাজার বছর পর্যন্ত। ভারতবর্ষে হিন্দুত্বকে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই ভারত-ইতিহাসে হিন্দু পরিচয় নানাভাবে অভিব্যক্তি লাভ করতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, বালগঙ্গাধর তিলক থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকলেই নিজের নিজের পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দুত্বের অভিব্যক্তি মূর্ত করে তুলেছেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সেই প্রক্রিয়া ইতিহাসের একটি নতুন অভিযাত্রায় বেগ এবং আবেগ সঞ্চার করল। গিরিলাল জৈন প্রকৃত ভারতীয় হওয়ার তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তিন মাতার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ না করলে কেউ নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারবে না। তিন মাতার একটি হল ভারত-মাতা অন্যটি গঙ্গা-মাতা এবং তার পরেরটি গো-মাতা।

গিরিলাল জৈনের এই বইটির সঙ্গে হিটলারের 'ম্যাইন ক্যাম্প' বইটির তুলনা করা যেতে পারে। ইতিহাসকে ভাবাবেগের যুক্তিতে প্রবাহিত করার যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা বইটির

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত ইতিহাস বিচারে সেগুলোকে মাতলামো ছাড়া আর অন্য কিছু বলার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিন্দু জনগণের একটা বিরাট অংশ ইতিহাসের এই মাতাল যুক্তিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপলব্ধি বলে বিশ্বাস করতে রাজি হয়েছে। হিটলারের সময় জার্মান জনগণের একটা বিরাট অংশ আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কিরকম শিরোধার্য করে নিয়েছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

ইতিহাসে যখন ভাবাবেগ যুক্তির জায়গা দখল করে বসে তখন বড় ধরনের অঘটন ঘটে যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এই প্রথম নয়। এক সময় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্যে এসব কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন। তাতে করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ভয়ঙ্কর শংকিত হয়ে পড়ে। তারপরেই আবির্ভাব ঘটে একজন শংকর আচার্যের। তিনি বিধান দিয়েছিলেন, তুমি যদি নিজ হাতে একজন বৌদ্ধকে নিধন না করো তোমার সাত-পুরুষ নরকে যাবে। সে সময় ভারতবর্ষের এক কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতভূমি থেকে চিরতরে বিতাড়িত হতে হয়েছে। শংকর আচার্যের ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাড়াবাড়ির কারণে এত রক্তপাত ভারতীয়-সমাজে ঘটেছিল, মুসলমানেরা যখন পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করে বসল, তখন ভারতীয়-সমাজের প্রতিরোধ-ক্ষমতা রইল না। তাকে দীর্ঘ দিনের জন্যে পরাধীনতা স্বীকার করে নিতে হলো।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন যথার্থ অর্থে একজন মহান শাসক এবং কুশলী সেনাপতি। কিন্তু তিনি ধর্ম নিয়ে অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাঁর কট্টরনীতি মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যখনই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তখনই বৃহত্তর ভারতের ঐক্য বিনাশ প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়েছে। বিজেপি কি করবে এখনো তার সবগুলো আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

এই নিবন্ধে হিন্দুত্বের পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনায় আনা হয়েছে। একটা বিপরীত পরিপ্রেক্ষিতও আছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মন্তব্য করেছেন — আর তিনটি লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার অধিকার অর্জন করবে।

১৯৯৬

শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ

(১৯৯৮)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধনতন্ত্রের নব পর্যায় ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকল্প নেই। ধনতান্ত্রিকতাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনার অবকাশ এখানে অল্প। আমি ধনতান্ত্রিকতাবাদকে আমাদের দেশের ঝুরিনামা বটগাছের মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বটগাছ কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে ঝুরি নামিয়ে দেয়। ঝুরিগুলো মাটি স্পর্শ করার পর মাটি থেকে মূল গাছে রস চালান করতে থাকে। এভাবে একটা সময়ে ঝুরিগুলি মোটা হয়ে একেকটা কাণ্ডের আকার ধারণ করে। মূল কাণ্ড মারা যাওয়ার পরও বটগাছ এই সহায়ক ঝুরিকাণ্ডের উপর নির্ভর করে দিব্যি বহাল তবিয়তে শত শত বছর বেঁচে থাকে।

ধনতন্ত্রের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল ভেনিস, জেনোয়া, লিসবন, ফ্লোরেন্স এই সকল ইউরোপীয় শহরে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতির দ্বিতীয় ধাপে ধনতন্ত্র নতুন বেগ এবং গতি অর্জন করে। লন্ডন, প্যারিস, আমস্টার্ডাম, বার্লিন এই সকল নগরী ধনতন্ত্রের বিশ্বকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংযোগ ঘটে। এই একটা পর্যায়ে ধনতন্ত্র এবং উপনিবেশবাদ প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এই ধনতন্ত্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি অর্জন করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের ধারক-বাহক বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, বুর্জোয়ারা সমুদ্র মন্থন করেছে, গিরি লংঘন করেছে, রূপোর গুলিতে চীনের মজবুত পাথুরে প্রাচীর পর্যন্ত ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

ধনতন্ত্রের ক্রমাগত অগ্রযাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারেনি। কার্ল মার্কসের বিপ্লবী তত্ত্বে দেখানো শোষণই হচ্ছে পুঁজির মূল রহস্যের হেতু। এই চিন্তা ক্রমাগত কেলাসিত হয়ে এমন একটি পর্যায়ে পৌছল বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী মানুষ এবং রাষ্ট্রবেত্তাদের একদল মনে করলেন, পুঁজিবাদই শোষণভিত্তিক সমাজের জন্ম দেয়। এই শোষণভিত্তিক সমাজের অস্তিত্ব নির্মূল করে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন আর একটি সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করা সম্ভব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টি লেনিন-ট্রটস্কির নেতৃত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র জন্ম

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

নেওয়ার পর দুনিয়াব্যাপী একটা আলোড়ন চলতে থাকল। শিল্পী, লেখক, বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিশারদরা অনুভব করতে লাগলেন, পুঁজিবাদের পথ অনুসরণ না করে সরাসরি একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এশিয়া-আফ্রিকাসহ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো ঔপনিবেশিক শোষণ এবং নিপীড়নে পিষ্ট হচ্ছিল। তাদের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক সমাজকে তাঁদের সবরকম অভাব-অভিযোগ এবং পশ্চাদপদতা মোচনের মুশকিল-আসান বলে মনে করতে থাকল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীনে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপরেখা দাঁড় করালেন, তারপর থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, ঠাণ্ডা লড়াই, স্নায়ুযুদ্ধ ঘনীভূত হতে থাকে। কেননা চীন, রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ এবং কিউবা ও ভিয়েতনামসহ পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় চলে এসেছিল। পৃথিবীতে এই বিবাদমান দুই ধারার মধ্যে কোনটি প্রাধান্য বিস্তার করবে তাই নিয়ে অনুমান, বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডার অন্ত ছিল না। ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সালে যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙন ঘটে সেই সময়টি ছিল ধনতন্ত্রের সবচাইতে সংকটময় কাল। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার এ সকল ঘটনা একযোগে মানুষের চিন্তার ওপর একটা প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। আর সেটা হলো এই, সমাজতন্ত্রের আপাতত কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কি আদর্শ ব্যবস্থা? সেটাকে কি বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে?

পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী একটি এক কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে এবং পুঁজিবাদের জয় হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তারও চাইতে বড় সত্য হচ্ছে পৃথিবী আর একটি নতুন কক্ষপথে চলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী মানব সাধারণের পারস্পরিক সম্পর্কও এই ধনতন্ত্রের নব্য অভিযাত্রার অভিঘাতে অনেকখানি বদলাতে বাধ্য।

২

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ধনতন্ত্র কিভাবে বিকশিত হবে সেটা একটা আকর্ষণীয় ভাবনার বিষয় হতে পারে। বাংলাদেশের পুঁজিসঞ্চয়নের হার যতই স্বল্প হোক না কেন, বাংলাদেশ চরাচরগ্রাসী ধনতন্ত্রের স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে অতীতে পারেনি, ভবিষ্যতেও যে পারবে না, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের পুঁজির পরিমাণ এত স্বল্প যে মেরুদণ্ড সোজা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। বিদেশী পুঁজি না এলে, বাংলাদেশের জেলেরা সমুদ্রের মাছ আহরণ করতে পারে না,

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

মাঠের লবণ বাজারজাত করতে পারে না, পোশাক শিল্পের চালান বন্ধ হয়ে যায়। জয়েন্ট ভেনচারের নামে যে জিনিস এখানে চালু হয়েছে, আসলে সেটা হলো একটা পঙ্গু লোকের ক্রমাগত আছাড় খাওয়ার ইতিহাস। বাংলাদেশের পুঁজি থিতু হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তাই বিদেশ থেকে যখন পুঁজি আসে তখন দুই বগলের তলায় লাঠি হিসেবে তাকে ব্যবহার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। বাংলাদেশে যে ধনতন্ত্র হালে বিকশিত হচ্ছে তার হাত-পা-মস্তক সবকিছু নকল এবং ধার করা। কথাটা নিষ্ঠুর এবং সত্য। তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে এখানে ধনতন্ত্র বিকাশের একটি চমৎকার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে।

পুঁজির প্রসার এখন বিশ্বব্যাপী। সমুদ্রস্রোতের মধ্যে ঝড়ের তাড়নায় কোনো একটি অংশের পানি যদি সরে যায় অন্যান্য অংশের পানি তীব্র বেগে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে ছুটে আসে। পুঁজির ব্যাপারটিও অনেকটা সেরকম। কোথাও যদি বিনিয়োগের ক্ষেত্র থাকে পুঁজি অনিবার্য গতিতে সেখানে ছুটে আসে। পুঁজির দেশ-কাল-ধর্ম কিছুই নেই। পুঁজিকে পুরুষ মানুষের জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পুরুষ জননেন্দ্রিয় যেমন স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে না এলে বংশবিস্তার করতে পারে না, তেমনিই পুঁজি যদি লগ্নি করার ক্ষেত্র না পায় তাহলে পুঁজির বাড়-বৃদ্ধি ঘটে না। বাংলাদেশে পুঁজি আসছে, আসবে। এটার অন্যথা হতে পারে না। এখানে একটা রহস্যের ব্যাপার আছে, সে জিনিসটি বিশদ করতে চেষ্টা করব। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে পুঁজির একটা ক্ষীণ স্রোত ধীরে ধীরে হলেও বাংলাদেশের দিকে বইতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশের নিকটবর্তী বৃহৎ একটি দেশ। সাম্প্রতিককালে ভারতে পুঁজির বিকাশ একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করেছে। বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল ও যন্ত্রশিল্পে ভারতও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের ক্রমপ্রসারমান পুঁজির যে অভিযাত্রা বাংলাদেশে তার একটি প্রধান প্রয়োগ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতা পুঁজির চলাচল প্রতিহত করতে পারেনি। দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক অবন্ধুসুলভ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখন ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ বিগত এক দশকের মধ্যে চারগুণেরও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। এই হারে চলতে থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, ভিন্ন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশ ভারতের একটি সাব-সার্ভিয়েন্ট ইকনমিক জোনে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ ধনতন্ত্রের কোন ধারাটি গ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করছে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার ওপর। জনগণের আকাঙ্ক্ষা বলতে আমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পলিটিক্যাল উইলকে বোঝাতে চাইছি। ধরে নিলাম ভারতের ক্রমপ্রসারমান ধনতন্ত্রের ধারাটি বাংলাদেশ কবুল করে নিল। তারপর কি ঘটতে পারে? বাংলাদেশের যে সকল উঠতি ধনী পুঁজির কনিষ্ঠ অংশীদারে পরিণত হবে, তারা তাদের নিজেদের বিকাশের তাগিদে ভারতীয় পুঁজিকে নিমন্ত্রণ করে আনবে এবং রাজধানী থেকে শুরু করে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

গ্রামগঞ্জের হাট, আড়ৎ, গঞ্জ সর্বত্র ভারতীয় পুঁজির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। এক দশক-দু'দশক এই প্রক্রিয়াটি চললে, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এই দুটি শব্দ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আমরা ভারতের পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ঢুকে যাব। নিজেদের জাতিগত উত্থানের কোনো সুযোগ থাকবে না। অথচ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনগোষ্ঠী ভারতের গণতন্ত্রের যে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারগুলো ভোগ করে, সেগুলো আমরা ভোগ করতে পারব না।

এখন কথা দাঁড়াল ভারতীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে বিশ্বপুঁজিকে যদি এখানে আমন্ত্রণ করে আনি তাহলে কি পরিস্থিতিটা ভিন্নরূপ দাঁড়াবে? পুঁজির সঙ্গে অবশ্যই বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটা জড়িত। জাপান, কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর পুঁজির অবাধ আগমন এখানে ঘটতে দিলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা ভারতীয় পুঁজির অনুপ্রবেশের চাইতে কেন ভিন্ন ফল প্রসব করবে, সেকথা একটু বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় পুঁজি সবেমাত্র বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার কৈশোর সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখনও পূর্ণ যৌবন আসেনি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যেও ভারত বাংলাদেশের পরে সবচাইতে দরিদ্র দেশ। ভারতের শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ভারতে বৃহৎ শিল্পের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারত পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতে ঘুঁটের যুগ এখনো শেষ হয়নি। এই যে বিকাশমান ভারতীয় পুঁজি, তার চরিত্রটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হতে বাধ্য। এইখানে ভারতীয় পুঁজিকে যদি অনুপ্রবেশ করতে দেই, তাহলে আমরা ভারতের অধীন একটি উপঅঞ্চলে রূপান্তরিত হব। নিজেদের স্বাধীন সত্তা বলে কিছুই থাকবে না। বর্তমানে ভারত রেলওয়ে, ট্রানজিট, বন্দরের সুবিধা ও গ্যাস সরবরাহসহ যে সকল প্রস্তাব দিচ্ছে, একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে প্রতীয়মান হবে সেগুলো ভারতের ক্রমপ্রসারমান ধনতন্ত্রের পরিপূরক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরেও ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন না করতে বলা উচিত হবে না, ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। মুক্তিযুদ্ধে ভারত অনেক সাহায্য করেছে। তাছাড়া ব্যাপারটা ধনতান্ত্রিক বিকাশের পরিপন্থী।

ধরুন আমরা ভারতের মারুতি কোম্পানীকে বললাম, আপনারা এখানে গাড়ি তৈরির কারখানা বানান। আমাদের শ্রমিকদের দক্ষ করুন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুন, আমাদের বাজারে চাহিদা মোতাবেক গাড়ি সরবরাহ করুন এবং বাদবাকি অংশ আপনারা বাইরে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করুন। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পপতিদের যুক্তি হবে, 'এখানে নতুন করে শিল্প-কারখানা বসিয়ে গাড়ি তৈরি করতে যত ব্যয় হবে তার চেয়ে ঢের কম দামে আমাদের কারখানার তৈরি গাড়ি আপনাদের সাপ্লাই দিতে পারি। আপনারা গাড়ি আমদানী করুন অনেক কম দামে আপনাদেরকে দেব। খুচরো

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

যন্ত্রাংশের অভাব হলে আমাদের রিটেইলার দেব।'

জাপান কিংবা আমেরিকার কোনো কোম্পানীকে আমরা যদি বলি, বাংলাদেশে আপনাদের বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্র রয়ে গেছে, আপনারা সস্তায় শ্রমিক পাবেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে নিতে পারবেন, আপনাদের নির্মাণব্যয় অনেক কম হবে, বাংলাদেশে আপনারা কলকারখানা স্থাপন করলে বিশ্বব্যাপী আপনারা যে প্রতিযোগিতা করছেন, তাতে অনেকখানি লাভবান হতে পারবেন। পশ্চিমা পুঁজিপতিদের ভালোভাবে বোঝালে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে ছুটে আসবে। ব্যাপক আকারে এখানে পশ্চিমা পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে চীনের পেটে তাইওয়ানের মতো, জাপানের নাকের ডগায় কোরিয়ার মতো, অথবা দ্বীপদেশ সিঙ্গাপুরের মতো এখানে ভারতের প্রতিস্পর্ধী একটি অর্থনীতি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করবে।

একটি সাম্প্রতিক জরিপের কথা বলি। বাংলাদেশ সরকার ইউনিডোকে কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানী সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে কিনা, এ বিষয়টি যাচাই করে দেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ইউনিডো সেজন্য এক মার্কিন কোম্পানীকে জরিপ করে দেখার জন্য নিয়োগ করেছিল। ওই কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক মরিসন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং খাতির হয়েছিল। তিনি সেই সুবাদে দিল্লী, কলকাতা, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান এইসব দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে যে রিপোর্ট লিখেছেন অনুগ্রহ করে তার একটি কপি আমাকে পাঠিয়েছেন। কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানীর ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশে আছে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। কম্পিউটার শিল্পের মৌল কাঠামো এবং নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা বাংলাদেশের অল্পই আছে। অনেক নেতিবাচক মন্তব্যের পর মরিসন সাহেব মোক্ষম কথাটি বলেছেন। তাঁর কথা হল সফটওয়্যার ডেভলপ করতে তাইওয়ানে লাগে পাঁচ ডলার, সিঙ্গাপুরে লাগবে সাড়ে চার ডলার, ভারতবর্ষে লাগবে চার ডলার এবং এই সফটওয়্যার ডেভলপ করতে বাংলাদেশে লাগবে দুই ডলার। এই অল্প মূলধনে অধিক লাভ করার জন্য পৃথিবীর পুঁজিপতিরা এখানে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে। কিন্তু কতগুলো বাধা আছে। এখানে উৎপাদনের একটা পরিবেশ এখনো সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। হরতাল এবং কর্মবিরতি ইত্যাদি উৎপাদনবিরোধী যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছে, তা বিদেশী পুঁজি এখানে আসার অনুকূলে নয়। এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিদেশী পুঁজি আসার অন্যতম একটা প্রতিবন্ধক। তাছাড়া ভারতবর্ষের কথাও মনে রাখতে হবে। এই বৃহৎ দেশটি তার কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একটা জনমত সৃষ্টি করে প্রমাণ করতে তৎপর যে কোনো সভ্যসমাজ এখানে সৃষ্টি হয়নি। এখানে ভদ্রলোকের প্রাণ, সম্পদ, জানমাল কিছুই নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের এই ব্যাপক প্রচারণার ধূম্রজাল ভেদ করে বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ সম্বন্ধে একটি অস্তিবাচক প্রচার-অভিযান বাংলাদেশ কখনো করতে নামেনি।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশের সে ক্ষমতা নেই। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো পেটমোটা কর্মচারীদের বিহারক্ষেত্র, আমলারা অনেকেই দেশপ্রেমহীন, রাজনীতিবিদরা নাবালক এবং হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন। অনেক সময় নাকের ডগাটি দেখার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। বিশ্বব্যাপী যে সকল বাঙালী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাদের কাজ হবে এখানে যে একটি পুঁজি বিনিয়োগের চমৎকার ক্ষেত্র আছে সে জিনিসটি উজ্জ্বল করে দেখানো।

৩

আমি বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। দেখাতে চেষ্টা করেছি ধনতন্ত্র যেখানে ঝুরি প্রসারিত করে, সেখানে ঝুরি কাণ্ডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, তাইওয়ান এ সমস্ত দেশে ধনতন্ত্রের ঝুরিগুলো কাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, বটগাছের সমস্ত ঝুরি যেমন কাণ্ডে পরিণত হয় না, তেমনি ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশের সমস্ত প্রক্রিয়া ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে না। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে এই পুঁজি অনুপ্রবেশ করে শোষণের হাতিয়ার হয় সে সমাজে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাটি যদি এই অনুপ্রবিষ্ট পুঁজির পথ-গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করার একটা পদ্ধতি বেঁধে না দেয়, সেখানে পুঁজি আসবে, শোষণ চলবে। কিন্তু সমাজের পুঁজিতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে না।

বাংলাদেশে পুঁজি অনুপ্রবেশের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার পাশাপাশি এখানকার অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি আত্মীকরণ করার কর্মকাণ্ড যদি সৃষ্টি করা না হয় তবে এখানকার পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনাটি মাঠে মারা যাবে। এটি রাষ্ট্রের কাজ। রাষ্ট্রকে নির্ধারণ করতে হবে কোন্ ধরনের পুঁজিকে আমন্ত্রণ করে আনতে হবে এবং আমাদের স্থানীয় পুঁজির সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপটি কি হবে। এর একটি পূর্ণ পরিকল্পনা থাকতে হবে।

আমরা বলেছি ভারতের পুঁজির বিকাশ একটা স্তরে পৌঁছেছে এবং সেই পুঁজি বাংলাদেশে হানা দিয়ে প্রবেশ করছে। একইভাবে ভারতের মতো এত ব্যাপকভাবে না হলেও পাকিস্তানে পুঁজির দ্রুত একটা বিকাশ ঘটছে এবং পাকিস্তানী পুঁজি ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানে ঢোকার চেষ্টা করছে। ভারতের পুঁজির একটা সুবিধা আছে। ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। সীমান্তরেখা অতিক্রম করলেই পুঁজি ছুটে আসতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানী পুঁজির ভিন্নরকম একটা সুযোগ রয়েছে। এই দেশটি পাকিস্তানের অংশ ছিল এবং মুসলিম প্রধান দেশ। ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানী পুঁজির একচ্ছত্র বিচরণ ক্ষেত্র। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও পাকিস্তানী পুঁজির প্রবাহের খাতটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। পাকিস্তানী পুঁজি আবার প্রবেশ করার জন্য পা ঠুকছে।

ভারতের পুঁজি যদি আবার বাংলাদেশে আসে এবং সম্পর্কটি যদি স্থায়ী হয়ে যায়

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থাটা দাঁড়াবে ভিন্নতর রাষ্ট্রিক এবং ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বিভাগ-পূর্ব আমলের মতো। অর্থাৎ আগে বাংলাদেশ ছিল কলকাতার শিল্পকারখানার কাঁচামালের যোগানদার এবং অর্থনীতির পশ্চাদ্‌ভূমি। নির্বিচারে ভারতীয় পুঁজি বাংলাদেশে এলে বাংলাদেশকে আবার ভারতীয় অর্থনীতির পশ্চাদভূমির ভূমিকায় ফেরত যেতে হবে।

পাকিস্তানী পুঁজি এলেও অবস্থা একই রকম দাঁড়াবে, গোটা ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানী অর্থনীতির পশ্চাদ্‌ভূমি। ভিন্নতর পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশকে পশ্চাদ্‌ভূমির ভূমিকায় ফেরত যেতে হবে। বাংলাদেশের একটি পছন্দবোধ, একটি রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী যদি না থাকে তাকে অবশ্য-অবশ্যই ভারত কিংবা পাকিস্তানের অনুগত অর্থনৈতিক এলাকার ভাগ্যকে বরণ করতে হবে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের সামনে একটি বিকল্প এসে হাজির হয়েছে। তা হলো আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের পুঁজি যেভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তা অবাধে প্রবেশ করতে দেয়া এবং পুঁজি অনুপ্রবেশের সবগুলো প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা। এটা জানা কথা, ধনতন্ত্র কায়েম হয়ে বসলে চক্রবৃদ্ধি হারে শোষণের ঝুরি প্রসারিত করে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাজ হবে এই ঝুরিগুলো যেন কাণ্ডে পরিণত হয় সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঝুরিগুলো কাণ্ডে পরিণত হলে সেটা দেশীয় এবং জাতীয় ধনতন্ত্রে রূপ নেবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং এই কাণ্ডগুলো কারো পক্ষে এখান থেকে মূলসুদ্ধ উপড়ে নেয়া সম্ভব হবে না। যেমন সম্ভব হয়নি কোরিয়া, তাইওয়ান বা সিঙ্গাপুরে।

১৯৯৫ *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ*
(১৯৯৬)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

বিকল্প উন্নয়ন কৌশল

প্রতিটি সফল রাজনৈতিক পালাবদলের বেলায় একটি অর্থনৈতিক যুক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে যে সকল বড় ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল, রূপান্তর এবং পরিবর্তন ঘটে গেছে তার সবগুলোর মধ্যে অর্থনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমরা প্রথমে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কথাই ধরি না কেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ্ এবং কতিপয় মুসলিম নেতা মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটা বড় অংশকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, তৎকালীন বাঙলা প্রদেশকে ভেঙে দু'টুকরো করা হলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। বাঙলাকে দু'টুকরো করা হলো। হিন্দু মধ্যবিত্ত-সমাজের একটা বড় অংশের প্রবল বিরোধিতা বঙ্গবিভাগ রোধ করতে পারল না। বাঙলা-বিভাগ করার পরে দেখা গেল, পূর্ব-বাঙলার মুসলিম জনগণের বাস্তব অবস্থার বিশেষ হেরফের ঘটেনি। হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর একটা বড় অংশের প্রখর প্রতিবাদের মুখে ব্রিটিশ সরকারকে আবার বিভক্ত বাঙলাকে জোড়া লাগাতে হয়। মুসলিম সমাজের যে অংশটি ১৯০৫ সালে বাঙলা ভাগ করার সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা দুই বাঙলা সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিরোধ খাড়া করতে পারেননি। বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার। মুসলিম-সমাজের যে অংশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন, বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটতে না দেখে বঙ্গবিভাগ সমর্থনের সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে বসেছিলেন।

তিরিশের দশকে বরিশালের শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ক'টি নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে এসে হাজির হলেন। বাঙলার অর্থনীতি সম্পর্কে ফজলুল হকের স্পষ্ট ধারণা ছিল। তার অব্যবহিত পূর্বে স্যার আজিজুল হক বিরচিত 'ম্যান বিহাইণ্ড দ্যা প্লাউ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে কৃষকস্বার্থের পক্ষে যে সকল যুক্তি স্যার আজিজুল হক দাঁড় করিয়েছিলেন, শেরে বাংলা সেগুলোর ওপর

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ভিত্তি করে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরী করলেন। শেরে বাংলা ছিলেন সমস্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মেধাবী এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। কমিউনিষ্টদের অনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'দ্যা পলিটিক্স্ অব বেঙ্গল ইজ রুটেড ইন দ্যা ইকোনমি অব বেঙ্গল', অর্থাৎ বাঙলার অর্থনীতির মধ্যেই বাঙলার রাজনীতির আসল প্রাণশক্তি নিহিত। ফজলুল হক যখন কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করে কর্মসূচী নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হলেন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতো প্রবল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বাঙলা প্রদেশে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেন। বাঙলার মুখ্যমন্ত্রীর আসন অধিকার করার পর ফজলুল হকের সরকার বাঙলার কৃষক-প্রজা সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। ফজলুল হকের সদিচ্ছার হয়তো অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি সবসময় মুখ্যমন্ত্রীর আসনটি জবরদখল করে রাখতে চাইতেন। এই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ধরে রাখার প্রয়োজনে তাঁকে একবার লীগ একবার কংগ্রেস এবং একবার হিন্দু মহাসভার দারস্থ হয়ে রাজনৈতিক ডিগবাজির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। শেষমেশ অবস্থাটি দাঁড়াল এরকম, ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আসীন থাকাটাকেই তিনি বাঙলায় কৃষকের স্বার্থ বলে ব্যাখ্যা করলেন।

তারপর এল পাকিস্তান আন্দোলনের পালা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেব জোরালভাবে দ্বি-জাতি তত্ত্বের দাবীটি তুলে ধরলেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হলো, মুসলমানের নিজেদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি নিহিত। বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধনে-সম্পদে অগ্রসর হিন্দু-সমাজের সঙ্গে যদি তারা মিলেমিশে একসঙ্গে থাকে, মুসলিম-সমাজের আত্মবিকাশের পথ চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে থাকবে। বাঙলার জনগণের এক বিপুল অংশ পাকিস্তান দাবীর সমর্থন করেছেন এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে একটি অনমনীয় এবং দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী ঠেকিয়ে রাখার সব ধরনের প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। পকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল, এই অঞ্চলের জনগণের জাগতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, বরং কার্যত পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্ব-বাঙলার জনগণের একটি মস্ত রকম মোহভঙ্গ ঘটল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব-পাকিস্তানের একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেন। আর একুশ দফা ছিল যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ব বাঙলার শোষিত, লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িত মানুষদের অনেকগুলো প্রাণপ্রিয় দাবী স্থান পেয়েছিল। পূর্ব বাঙলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীদার মুসলিম লীগ দলটির এমন শোচনীয়

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

পরাজয় ঘটে যায়, তারপর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের কোথাও আর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে প্রতিশ্রুত একুশ দফা দাবীর কোনটাই পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। যুক্তফ্রন্টের শরীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল এগুলো লেগেই থাকত। এই পরিস্থিতিতে প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করলেন। এক দশকেরও বেশী সময় আয়ুব খানের সামরিক শাসন স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। ছয়দফা রাজনৈতিক কর্মসূচীর মর্মবস্তু ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ একটা আলাদা অর্থনীতি এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটা ঐচ্ছিক শরীক বলে মেনে নেয়ার দাবী। ছয়দফা আন্দোলন যখন বেগ এবং আবেগ সঞ্চার করল, পূর্ব বাঙলার জনগণ মনেপ্রাণে অনুভব করতে থাকলেন, এই অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে এই জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। এই ছয়দফা আন্দোলনই অতিদ্রুত স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপ নিয়েছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সারাদেশে মাৎস্যন্যায়, লুঠপাট, দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচার এত অধিক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে কোন্ গন্তব্য অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে তার কোনো সুস্পষ্ট আকার বা চেহারা কল্পনা করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন এবং দেশে সেনাশাসন কায়েম হলো। উপর্যুপরি কয়েক দফা সেনাশাসনের নীট ফল দাঁড়াল এই, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক পদ্ধতির বদলে দেশ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে ধাবিত হলো। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনও ঘটে গেছে, পূর্ব-ইউরোপসহ সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। তার ধাক্কা এসে আমাদের দেশের রাজনীতিতেও লেগেছে। দরিদ্র এবং শোষিত জনগণের স্বার্থের পক্ষে যাঁরা রাজনীতি করতেন, সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার উৎকর্ষের প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা ছিল। খোদ সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটার পরে একটা হতাশাবোধ তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এটা শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, সমস্ত দুনিয়াতে এই জিনিসটি ঘটেছে।

আমাদের দেশের রাজনীতি একটা দক্ষিণপন্থী আবর্তের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে এবং আমাদের দেশের বামপন্থী রাজনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছে তার কারণও আমাদের দেশের আকারহীন, অবয়বহীন অর্থনীতির গতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের দেশের সরকারের ধরনের মধ্যে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও যে বিশেষ শ্রেণীটি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, চরিত্রগতভাবে, তাদের ঠিক বুর্জোয়া

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বলা যাবে কিনা এ ব্যাপারে আমার মনে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। বুর্জোয়ারা শোষণ, লুণ্ঠন দুই-ই করে। কিন্তু তাদের একটি 'সেন্স অব বিলংগিং' থাকে। নিজেদের শোষণ-প্রক্রিয়াটি অব্যাহতভাবে চালু রাখার জন্য শিল্পকারখানা চালু করে, কারবার-তেজারতির প্রসার ঘটায়। কিন্তু আমাদের দেশে যে শ্রেণীটি রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে, দলীয়ভাবে তাদের পরিচয় আওয়ামী লীগ, বিএনপি যাই হোক না কেন, দেশের প্রতি তাদের কোনো 'সেন্স অব বিলংগিং' নেই। দেশের কাঁচামাল বিদেশে বেচে দেশীয় উৎপাদকদের ঠকায়। তারা বিদেশী পণ্য দেশে বিক্রয় করে, মুনাফা লুঠ করাই তাদের পেশা। তাদের আসল লক্ষ্য মুনাফা এবং মুনাফা। শিল্প-বাণিজ্যে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এটা তারা কখনো চায় না। তাদের হাতেই রাষ্ট্রের চাবিকাঠি এসে গেছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এই সকল আন্তঃদেশীয় লগ্নিকারকদের কাছে তারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

আমার কথাগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মোদ্দা কথায় আমি যা বলতে চাই, বাংলাদেশের শোষিত, নির্যাতিত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের উত্থানের প্রয়োজনে এই দেশে একটি বিকল্প উন্নয়ন কৌশল অবিলম্বে দাঁড় করানো প্রয়োজন।

মুৎসুদ্দী গোষ্ঠীর প্রতাপে যে সমস্ত সৎ দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, যারা মেধা খাটিয়ে শ্রম দিয়ে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতিশীলতা আনতে চান, সেই শ্রেণীটিকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি একটা মেরুকরণ ঘটানো সম্ভব হয়, কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও একটি মেরুকরণ প্রক্রিয়া আপনাআপনি সৃজিত হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বামপন্থী রাজনীতিতে কোনো রাজনৈতিক অগ্রগতি নেই; কারণ তারা শোষিত, নির্যাতিত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচী এবং একটা বিকল্প উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি। এই বিষয়টির উপর নির্ভর করছে বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ।

১৯৯৯

উপলক্ষের লেখা
(২০০১)

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি

সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের পতনের পর পৃথিবী জুড়ে নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্ম নেয়। ইউরোপ-আমেরিকার যে সকল ধনী দেশ জন্মলগ্ন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করে আসছিল তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উল্লাস এবং দম্ভের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিলেন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক শয়তানি-সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছি।

পশ্চিমা দেশসমূহের তাত্ত্বিকেরা ক্রমাগত প্রচার করতে থাকলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না। পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনই সেই জিনিসটি প্রমাণিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেনি শুধু, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন উদার-হস্তে সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল পৃথিবীর তিনভাগের দু'ভাগ এলাকা সমাজতন্ত্রের আওতায় চলে এসেছে। ১৯৪৯ সালে এশিয়ায় চীন-বিপ্লব সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার জোয়ারটিকে অনেক বেশী বেগবান করে তোলে। শুধু চীন নয়, কোরিয়ার একাংশ এবং ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্রের বিজয় এশিয়া মহাদেশে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা অনেকটা অপ্রতিহত করে তোলে। এই সময়ে পৃথিবী মোটা দাগে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ মিলে একটা শিবির রচনা করেছিল। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ সম্প্রসারিত করে ধনতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলোর বিরুদ্ধে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধের কাল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যেত, কমিউনিজমের খপ্পর থেকে মুক্ত রাখার জন্যে এশিয়া-আফ্রিকার স্বল্পোন্নত দেশসমূহে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আর্থিক সাহায্য প্রদান করত এবং দেশে দেশে তাবেদার সামরিক একনায়কদের ক্ষমতায় বসিয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সব রকমের মদদ দিয়ে যেত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আওতাভুক্ত দেশগুলোও তাদের সাধ্যমতো ধনতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর অপপ্রচারের জবাব দেয়ার চেষ্টা করত, সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে সর্বক্ষণ চেষ্টিত থাকত। মধ্যখানে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একটা মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সেরকম একটা সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ষাটের দশকে চীন-রাশিয়া মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে পূর্বের দৃঢ়সংঘবদ্ধ ঐক্যবোধটিও দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজতন্ত্রের পতন কি কারণে ঘটল তা নিয়ে নানারকম মতামত রয়েছে। এক দল তাত্ত্বিক বলেন, মুষ্টিমেয় মানুষ যখন নির্যাতিত জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে বসে, সেখানে ব্যক্তি- বিশেষের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। তারা মত প্রকাশ করতে পারে না। এই ব্যবস্থা স্বল্পকালের জন্যে ফলপ্রসূ হলেও দীর্ঘকাল চলতে পারে না। একসময় মানুষ বিদ্রোহ করবেই। আর একদল তাত্ত্বিক বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ প্রাথমিকভাবে সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল এই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের গতিশীলতা অনেকখানি খর্ব করে ফেলে। ফলে তারা এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে সমস্ত জনগণের মধ্যে দারিদ্র্যের সমবণ্টন করতে সক্ষম হলেও সমাজের ধন-সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেনি। আবার আরেক দল তাত্ত্বিক মনে করেন, কমিউনিস্টরা সর্বহারা জনগণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। সুতরাং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র মানে প্রোলেতারিয়েত রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সমাজের ওপর দীর্ঘস্থায়ীভাবে চেপে বসল এবং সামাজিক-জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করতে থাকল, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা গেল প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর সঙ্গে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বটিই মূল দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করেছে।

উপরে যে কারণগুলোর কথা বলা হলো, বলা বাহুল্য এগুলো পুঁজিবাদী শিবিরের তাত্ত্বিকরা প্রচার করে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বৈরী মনোভাব, নিরন্তর সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকার্যকর করে তোলার জন্য তাদের সার্বক্ষণিক চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র: শেষপর্যন্ত একটা সময়ে এসে সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার পতন ঘটানো আসন্ন করে তুলেছে।

সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার পতনের পরে দৃশ্যত পৃথিবী একটি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশসমূহের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র শক্তিধর রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিস্পর্ধী নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অন্তত স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে হলেও পৃথিবীর কোনো

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেশের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পৃথিবীর এই এক নম্বর শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার কাজে সবসময়ে চেষ্টিত থেকেছে। এখন আমেরিকা পৃথিবীর দেশসমূহের বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে তার খবরদারী এবং নজরদারীর পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। আগে এই সকল দেশের সামনে একটা অল্টারনেটিভ বিকল্প সমাজের আদর্শ ছিল। সমাজতন্ত্রের অবর্তমানে তাদেরকে পুঁজিবাদী দেশসমূহের মোড়লিপনা একান্ত অনিচ্ছায় হলেও সহ্য করতে হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মধ্যবর্তী সংঘাতের কারণে সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার পতন ঘটেছে এটা সত্য কিন্তু পুরো সত্য নয়। পুরো সত্যটি হলো এই যে, পৃথিবী একটি নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ পূর্বে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রসমূহে দ্বন্দ্বের চেহারাটি যেরকম ছিল এখন সেটা অনেক দূর পরিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ধরন পূর্বের চেয়ে ভিন্নরকম আকার পরিগ্রহ করেছে। সামাজিক-ব্যবস্থার এই পালাবদলের কারণে একেকটি রাষ্ট্রের সামাজিক শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্বের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। মোট কথা পৃথিবীর সংকট, সমস্যাসমূহের আকৃতি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সূক্ষ্ম এবং জটিল রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে।

দৃশ্যত এটা পরিষ্কার যে সমাজতন্ত্রের পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের কারণে ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ বিজয় সূচিত হয়েছে একথা ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থার তাত্ত্বিকদের পক্ষেও বলা সম্ভব হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ধনী দেশসমূহ বেবাক পৃথিবীকে তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে যে সকল কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছে সেগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা নিজেও অতটা নিশ্চিত হতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি যে সকল প্রতিষ্ঠান তারা খাড়া করেছে সেগুলোর ব্যবস্থাপত্র অক্ষরে অক্ষরে মান্য করার প্রবণতা দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে যথেষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার নিষ্ঠুর-নির্মম দিকটি দরিদ্র দেশসমূহের জনগোষ্ঠীর সামনে অনুদঘাটিত নয়। শুধু বিশ্বের দরিদ্র অঞ্চলের মানুষ নয়, খোদ মার্কিন মুলুকেও তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। মোটকথা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ যে পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করে তাবৎ পৃথিবীকে নিজেদের করতলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেটা যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে তার কিছু প্রমাণ এর মধ্যে পাওয়া গেছে।

ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষেও পরিবর্তনের স্রোত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না। এই দেশসমূহ নানারকম দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চেষ্টা করছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পুনঃপ্রবর্তনের বেলায় দেখা যাচ্ছে সেটা তাদের সংকটসমূহ আরও প্রকট এবং আরো দুর্বিসহ করে তুলেছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অস্থিতিশীলতা এবং সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। তবে এ কথাও ঠিক যে, তারা উপলব্ধি করতে পারছে পুরনো সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থার মধ্যে তাদের আবার নতুন করে ফেরত যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি মেনে নিলে যে সমস্ত সংকট-সমস্যা তাদের অহরহ পীড়িত এবং অসহায় করে তুলেছে এই ব্যবস্থার মধ্যে তার থেকে উত্তরণের কোনো পন্থা দৃষ্টিগোচর নয়। সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা সংশয়, একটা নৈরাজ্য, একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ এতকাল যেভাবে তাদের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাবস্থায় কার্যকর বলে যেভাবে প্রচার করে আসছেন এখন দেখা যাচ্ছে তার ভেতরে ফাটল ধরতে আরম্ভ করেছে। দুনিয়া জুড়ে একটা বিরাট ভাঙচুরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে সেটা ঘটছে নীরবে, অনেকটা দৃষ্টির অন্তরালে। সব মিলিয়ে একথা বলা বোধকরি অন্যায় হবে না, পৃথিবী একটা নতুন গোধূলি এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে কি বেরিয়ে আসবে আগাম বলা সম্ভব নয়।

২০০০ উপলক্ষের লেখা

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বাংলাদেশের উঁচুবিত্ত শ্রেণী এবং সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গ

গত বছর মানে ১৯৮৯ সালে, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রকাশক সমিতি ধানমণ্ডি মাঠে একটা গ্রন্থমেলার আয়োজন করেছিলেন। এই মেলাটি বসেছিল কলাবাগানের বিপরীত দিকের মাঠটিতে। সাত কি আট দিন ধরে চলেছিল। ঐ মেলায় বেচাবিক্রি কেমন হয় জানার আগ্রহ হয়েছিল। তাই একটুখানি কৌতূহলের বশেই প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমি ঐ মেলাতে গিয়েছি। কত টাকার বই বিক্রি হলো প্রকাশকদের কাছে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করেছি। 'মুক্তধারা'র মতো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা আমাকে জানালেন যে, বই বিক্রির পরিমাণ কোনোদিনই পাঁচশো টাকার উপরে যায়নি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও জানালেন যে এই মেলায় এসে তাঁদের একটা কড়া শিক্ষা হয়ে গেছে। মেলায় বিক্রির পরিমাণ এতই নগণ্য যে তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ পর্যন্ত ওঠেনি। অন্য একজন প্রকাশক আক্ষেপ করে বললেন, একেকটি মামুলি উপজেলার বই মেলায়ও এর চাইতে অধিক বইপত্র বিক্রি হয়ে থাকে। একটি উপজেলার বইমেলায়ও ধানমণ্ডির চাইতে বেশি বইপত্র বিক্রি হয়, এই তথ্যটি জানতে পেরে আমি একরকম আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।

ধানমণ্ডি ঢাকা শহরের দু'তিনটি ধনী এলাকার একটি। লেখাপড়ায়, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে, অর্থ-সামর্থ্যে একমাত্র গুলশান এবং বনানী এলাকার বাসিন্দারাই ধানমণ্ডির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এই রকম একটা ধনী এলাকায় সাত-আট দিন বইমেলা চলার পরও বিক্রির যা পরিমাণ দাঁড়াল, সচরাচর একটি উপজেলার বই মেলাতেও তার চাইতে বেশি টাকার বই বিক্রি হয়ে থাকে। পেছনের কারণ কি?

প্রকাশকেরা একবাক্যে জানালেন, ধানমণ্ডির মানুষ বই পড়ে না, পড়লেও বাংলা বই পড়ে না। বাংলাদেশে বসবাস করে অথচ বাংলা ভাষার বইপত্র পাঠ করে না এ কেমন কথা! বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। বাংলা ভাষার বইপত্র না পড়া মানে তো বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করা। গোটা জাতির সব চাইতে শাঁসালো এবং সম্পন্ন অংশের সঙ্গে দেশের জ্ঞান, বুদ্ধি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক না থাকলে

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

দেশের কি রকম চেহারা দাঁড়ায়! দেশের কি অবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি আমাদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে আমাদের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কোনো সংযোগ নেই। আমি নানা কার্যব্যপদেশে ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী এলাকার অনেক আধুনিক রুচিসম্পন্ন ধনাঢ্য ভদ্রলোকের বাড়িতে যাতায়াত করেছি। ঐ সকল এলাকায় কমসংখ্যক মানুষই বাড়ীঘরে বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন। তরুণ বয়েসি ছেলেমেয়েরা যে-সকল বাংলা শব্দ ব্যবহার করে থাকে, সেগুলোর ইংরেজী প্রতিশব্দ তারা জানে না। আর বাংলা বললেও এমন একটা ভঙ্গীতে বলে, মনে হবে আপনার প্রতি কৃপাবশত সে এই ভাষাটিতে বাতচিত করছে। এই সমস্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভঙ্গীতে আপনাকে জানিয়ে দিতে কসুর করবেন না, নেহায়েত করুণা করেই, দায়ে পড়ে, ঠেকে এই দেশটিতে বসবাস করছেন। তাঁদের বাড়ীঘরের আসবাবপত্রে, সাজসরঞ্জামে বাংলাদেশের কোনো চিহ্ন আপনি খুঁজে পাবেন না। এঁদের ঘরের ছেলেমেয়েরা ভিসিপিতে বিদেশী ছবি দেখে থাকে। বিদেশী সঙ্গীত শুনে সঙ্গীত-পিপাসা মেটায়, আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায় এমন একটা ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে যেন তারা এদেশের কেউ নয়।

আমার বন্ধু, সম্ভবত এই দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রিপোর্টার নাজিমুদ্দিন মোস্তান ঢাকা শহরকে মোটা দাগে তিনটি এলাকায় ভাগ করেছেন। নারিন্দা, গেণ্ডারিয়া, ইসলামপুর, চকবাজার, মৌলভীবাজার, পুরনো ঢাকার এসকল এলাকাকে উৎপাদন এলাকা বলে চিহ্নিত করেছেন। আজিমপুর, মতিঝিল, মীরপুর, মোহাম্মদপুর ইত্যাদি যে সকল এলাকায় অধিকাংশ চাকুরীজীবী মানুষ বসবাস করে থাকেন সেগুলোকে ভোগের এলাকা বলেছেন। ধানমণ্ডি, লালমাটিয়া, বনানী, গুলশান ইত্যাদি যে সকল এলাকায় উচ্চবিত্ত লোকেরা বসবাস করেন সে সকল এলাকাকে লুণ্ঠনকারী এলাকা বলে অভিহিত করেছেন। আমার অপর বন্ধু ড. কামাল সিদ্দিকী ঢাকার ওপর তাঁর যে গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও ঢাকা মহানগরীকে এলাকাওয়ারী ভাগ করে জীবিকা সঞ্চয়ের ওপর এবং জীবনদৃষ্টির ব্যাখ্যা করে যে মতামত দিয়েছেন, তার সঙ্গে নাজিমুদ্দিন মোস্তানের এলাকা বিন্যাসের বেশি গরমিল নেই।

আমি যে কথাটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে চাই, আমাদের দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের জনগণের ভালমন্দ, সুখদুঃখের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা সম্পদের শক্তির জোরে এদেশবাসীর বুকে পা দিয়ে টিকে আছেন। এই দেশের কোনকিছুকে চিন্তাচেতনায় তাঁরা ধারণ করেন না। দুনিয়ার এই দরিদ্র দেশটিতে এই শ্রেণীটাই হলো সবচাইতে অস্বাভাবিক এবং বিদঘুটে অস্তিত্বের অধিকারী। শ্রেণীগতভাবে এদের সমূহ অবস্থানের কথা চিন্তা করলে মনের মধ্যে সতত একটা কথাই জেগে ওঠে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেশটির সবকিছুকে ভাঙ্গানোর জন্য এ অর্থে-বিত্তে, জ্ঞানে-

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বুদ্ধিতে অগ্রসর শ্রেণীটিই মূর্তিমান অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা এই দেশে বিদেশীদের চাইতেও বিদেশী। এই দেশটিকে তাদের একমাত্র লুণ্ঠন করার জন্যই প্রয়োজন। দেশের জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি কিছুতেই তাদের অবদান নেই, কিছুতেই তাদের অংশগ্রহণ নেই, আর প্রয়োজনও নেই। এয়ারপোর্ট আর সী-পোর্ট থাকলেই হবে। সী-পোর্ট দিয়ে তাদের বিলাস এবং ভোগের সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করবেন; আর কোনরকমের বিপদ-অঘটন ঘটলে এয়ারপোর্ট দিয়ে পালিয়ে যাবেন।

সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এরকম সম্পর্কহীন কোনো উচ্চবিত্ত শ্রেণী দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বাদবাকি জনগণের ভাগে একটাই দায়িত্ব। একবেলা খেয়ে না খেয়ে এই শ্রেণীটাকে একইরকমভাবে টিকিয়ে রাখা। দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হচ্ছে আর দেশে উচ্চবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে। অবস্থা এমন নয় যে, বিত্তমানেরা বিত্ত সঞ্চয় করছে এবং একই সঙ্গে দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচনের কোনো উপায় বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে উঁচুবিত্তবানেরাই হলো বাংলাদেশের সবচাইতে কৃত্রিম বাঙালী। দেশকে শোষণ করে তারা টিকে আছে, বিনিময়ে তারা দেশকে কিছুই দিচ্ছে না।

অনেককে ইদানীং বলতে শোনা যায়, বিপ্লবের গালভরা বুলির দিন শেষ। এখন একমাত্র উম্মাদ ছাড়া কেউ বিপ্লবের কথা বলে না। এমনকি অনেক বিপ্লবী রাজনৈতিক দলও এই 'বিপ্লব' শব্দটিকে অনেকটা বর্জ্য হিসেবে গণ্য করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বিপ্লবের কথা চিন্তা না করে এখানে মানুষের বাসযোগ্য একটি সমাজ কিভাবে নির্মাণ করা সম্ভব আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে আসে না। একটা বিরাট আকারের ভাঙচুর, একটা ওলটপালটের মাধ্যমে সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে না পারলে বিরাজমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে, তা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের এই সাড়ে এগারো কোটি মানুষের মুখে দানাপানি তুলে দিতে হলে, তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে হলে, একটা শিক্ষিত জাতি সৃষ্টি করতে হলে, বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে অনিবার্যভাবে বিপ্লবের কথা এসে পড়ে। চীন, রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী দেখে অনেকে ভেবে বসে আছেন যে, আমাদের সমাজে বিপ্লবের প্রয়োজন নেই এবং এখানে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

এক যুগের বিপ্লবের বিশেষ তত্ত্ব অন্য যুগের প্রয়োজন হয়তো মেটাতে সক্ষম নয়। তাই বলে বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, একথা মোটেও সত্যি নয়। সমাজে যখন বৈষম্য বিরাজমান থাকে, যখন অন্যায়-অবিচার চলে, দারিদ্র্য এবং হতশ্রী প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে সমাজে প্রাণধারণের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও রোধ করে দাঁড়ায়; তখন কি সমাজের ভেতর থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে? পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে যা ঘটেছে সেগুলোও এক ধরনের বিপ্লব। একটি সামাজিক ব্যবস্থার নামে একটি আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর শোষণ এবং লুণ্ঠন জনগণ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আগে সমাজ-বিপ্লবের যে প্রচলিত সংজ্ঞা ছিল সেটি অচল প্রমাণিত হলে বিপ্লবের প্রয়োজন বাসি হয়ে যাবে, সেটা কখনো সত্যি নয়। বাংলাদেশের জনগণকে বাসযোগ্য সমাজ নির্মাণ করতে হলে অবশ্যই একটি সমাজ-বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য দরকার বিপ্লবের একটি নতুন সংজ্ঞা — সে সংজ্ঞার সঙ্গে পূর্বের পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞার যদি গরমিল ঘটে যায়, কিছু আসে যায় না।

১৯৮৯ *আনুপূর্বিক তসলিমা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ*

(১৯৯৪)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আমলারা নিজেরাই একটা পার্টি

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তম্ভ। ইংরেজী গ্রামার সম্পর্কে যে কথাটি চালু আছে 'A good servent but a bad master' — আমলাতন্ত্র সম্পর্কেও এ কথাটি বলা যেতে পারে। গুনার মিরডাল 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলোকে Soft States বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোতে আমলাতন্ত্র দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী। এই নড়বড়ে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাধারণত কোনো সরকার স্থায়ী হয় না। হয়তো গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এক সরকার এল, সেই সরকারের ব্যর্থতাকে পুঁজি করে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে বসে। সামরিক সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ অভ্যুত্থানে ফেটে পড়ল। এই যে বারবার সরকার পরিবর্তনটি হয়, আমলারা এই সকল পরিবর্তনের মধ্যেই রাষ্ট্রের হালটি ধরে থাকে। যেহেতু গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাটা আমলাদের হাতে থাকে যে কোনো ধরনের সরকার আসুক না কেন আমলাতন্ত্রের কাছে সারেণ্ডার করতে হয়। আমলাতন্ত্রের স্বার্থে যে সরকারই আঘাত করুক না কেন তাকে খেসারত দিতে হয়।

সরকারের দফতরগুলো যে সকল ব্যক্তি চালিয়ে থাকেন তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ হলেও তাদের মানুষী চেহারাটা দফতরের আড়ালে গোপন থেকে যায়। তাই অনেক সময় আমলারা গর্ব করে নিজেদের Faceless Bureaucrat বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আমলারা অনেক সময় বলে থাকেন, 'সরকার আসবে, সরকার যাবে কিন্তু আমরা চিরস্থায়ী। আমাদের অবস্থানের কোনো হেরফের নেই।' কাবাবে যেমন হাড্ডি, মাছে যেমন কাঁটা তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলার অবস্থান একটি তর্কাতীত সত্য। অস্থিতিশীল রাষ্ট্রসমূহে আমলাতন্ত্রই সর্বাধিক ক্ষমতার মালিক হয়ে থাকে। যাঁর হাতে অধিক ক্ষমতা দুর্নীতি করার প্রবণতাও তার ততোধিক। সাধারণ অর্থে আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণ বলেই মনে হয়। সরকারের কোর্ট-কাচারী, অফিস-আদালত, দফতরসমূহের চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানালা পর্যন্ত ঘুষ দাবী করে থাকে। এ জিনিসটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কারণে আমলাদের প্রতি সাধারণ জনগণ একটি ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভাব পোষণ করে

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

থাকেন। তারপরও একথা সত্য যে আমলাতন্ত্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্র চলতে পারে না। আমলাদের লোভ-লালসা-দুর্নীতি যদি কোনো সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বন্ধ করতে পারে তাহলে সে সরকারকে অবশ্যই ভালো সরকার বলতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান আমলাতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি আমার দুজন বন্ধুর কথা উল্লেখ করব। একবার আমি আমার বন্ধু তপন চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলাম। সে চাকরী করত বাংলা একাডেমীতে। তপন এবং মোতাহার সাহেব একজন হতাশ আমলা ও তার চামচার ভূমিকা অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। চামচা বলছে, 'স্যার, আপনি তো খুব সুখে আছেন, ভালো আছেন। রিটায়ার করেছেন। ছেলেমেয়েরা বিদেশে। বিবি সাহেব রিটায়ার করবেন। তিনটা বাড়ী, দুটো গাড়ী।' আমলা ভদ্রলোক জবাব দিচ্ছেন — 'মোতাহার, আমাকে কেউ বুঝল না। আমার অন্তরে কি দুঃখ কেউ খবর নিল না।' 'আপনার কেন দুঃখ হবে স্যার? তিনটি বাড়ী দুটো গাড়ী সব মিলিয়ে জমজমাট অবস্থা।' আমলা ভদ্রলোকের জবাব, 'মোতাহার, তুমি বাইরেরটা দেখলে, ভেতরটা দেখলে না। আসল খবর আমি তোমাকে জানাই — তোমাদের রাজনৈতিক পরিভাষায় আমি সর্বহারা মানুষ। যে তিনটে বাড়ীর কথা বলছ তার একটাও আমার নয়। ধানমণ্ডির বাড়ীর মালিক তোমার ভাবী, উত্তরার বাড়ী বড় মেয়ের, লালমাটিয়ার বাড়ীটি ছোট ছেলের। দেখতে পাচ্ছ আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তোমার ভাবী এবং ছেলেমেয়েরা বের করে দিলে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। এখন গাড়ীর কথায় আসি। পাজেরোটার মালিক তোমার ভাবীর বড় ভাই। আমাকে শুধু চালাতে দিয়েছে। টয়োটা মেজো ছেলের। এখন বুঝতে পারছ আক্ষরিক অর্থেই আমি সর্বহারা। মনে দুঃখ থেকে গেল মোতাহার, এই জিনিসটি আমি কাউকে বোঝাতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমার বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাঁদবার অভ্যাস নেই বলেই পারি না।'

আমার বন্ধু ফরহাদ মজহার আনসারদের নির্যাতনের ওপর লেখা ছেপে একমাস জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এসে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে 'আজকের কাগজ'-এ একটা লেখা লিখেছিল। সে লিখেছিল — জেলখানায় ব্যবসায়ী দেখেছে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী দেখেছে, দু'চারজন মৌলানা সাহেব দেখেছে, এমনকি সামরিক বাহিনীর কিছু লোককে জেল খাটতে দেখেছে। জেলখানাতে কোনো সরকারি আমলার সঙ্গে ফরহাদের দেখা হয়নি। অর্থাৎ আমলারা এমন এক জাত যতই অপরাধ করুক তাদের জেলে যেতে হয় না। জবাবদিহি করতে হয় না।

এমনও দেখা গেছে, নতুন সরকার এলে পুরনো সরকারের লোকদের জেলে পাঠায়। তাদের নামে নানারকম অভিযোগ হাজির করে। আইয়ুব খানের সরকার, মুজিবের সরকার; জিয়া, এরশাদ, খালেদা সবগুলো সরকারের আমলে আমলাদের নামে কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেনি। আমলাতন্ত্র এমন জিনিস — দুর্নীতি তারা করে কিন্তু প্রমাণ রাখে না। সব দোষ সরকারের লোকদের উপর গিয়ে বর্তায়। কিন্তু আমি একথাও

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

বলব সমস্ত আমলা খারাপ এবং দুর্নীতিপরায়ণ নন। অনেক সৎ এবং দেশপ্রেমিক আমলাও আমি দেখেছি। আমার একজন উচ্চপদস্থ সচিব-স্তরের আমলা বন্ধু আছেন। যিনি ধার করে কোরবানীর গরু কিনেছিলেন।

শেখ হাসিনার সরকার এখন ক্ষমতায় আসীন। একটি আন্দোলন এবং একটি নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতায় আসতে হয়েছে। প্রাক্তন সরকারে বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদলগুলো রাজপথে যে আন্দোলন করেছে তাতে ফিনিশিং টাচটি দিয়েছিলেন সচিবালয়ের কতিপয় আমলা। হাসিনা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমলাদের একটি বড় অংশ মনে করেছেন তাঁদের জয় হয়েছে। আমলারা যখন নিজেরাই বিজয়ী মনে করেন তখন একটা আশঙ্কা আপনা থেকেই জন্ম নেয়। এই জয়ের স্বাদ-পাওয়া আমলারা খালেদা জিয়ার সরকারকে কুপোকাত করে সেখানে থামবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের ভাগে যদি টান পড়ে এই সরকারকে বসিয়ে দিতে কসুর করবে না। সরকার এই আন্দোলনকারী আমলাদের প্রশাসনের শিরোভাগে টেনে এনে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন — একথা আমরা নয়, অনেকেই বলাবলি করছেন। আমরা সংবাদ পেয়েছি সচিবালয়ের একজন কনিষ্ঠ আমলার বিরুদ্ধে ভূতপূর্ব সরকার দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এ ভদ্রলোক সচিবালয় কর্মচারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। সরকার ক্ষমতায় এসেই দেখা গেল এই ভদ্রলোককে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে নিজস্ব দফতরে নিয়ে গেল। কোনো আমলার যোগ্যতা থাকলে তাঁর পদোন্নতি হবে না এমন কথা আমরা বলব না। কিন্তু গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত একজন আমলাকে পদোন্নতি দেয়ার বেলায় তদন্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত ছিল না?

শেখ হাসিনা যেভাবে জাতীয় পার্টিকে মন্ত্রিত্ব দিচ্ছেন, জামাতকে ছাড় দিচ্ছেন, জাসদ (রব) কে আপন পক্ষপুটে টেনে নিচ্ছেন, যেভাবে আন্দোলনকারী আমলাদের সম্মান-শিরোপা বিতরণ করছেন, দৈবাৎ যদি এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হত এবং বিএনপি জয়ী হত তবে তারা এই আন্দোলনকারী আমলাদের বিচার করত শৃংখলা লংঘনের অভিযোগে। তারা (বিএনপি) বলছে, আমলারা শৃংখলা লংঘন করেছে। এই আমলারা আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছে — তার পুরস্কার অন্যভাবেও দেয়া যেত। অনেকেই মনে করছে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো।

১৯৯৬

শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ
(১৯৯৮)

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

In
equits

Caitus Interruptus

My All Garbage

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

আহমদ ছফার জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন গাছবাড়িয়া গ্রামে, এক কৃষিজীবী পরিবারে। বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান। স্কুল ও কলেজের লেখাপড়া যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন, যদিও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কিছুদিন পদ্ধতিগত গবেষণা করেন। কিন্তু অচিরেই তা ছেড়ে দিয়ে মৌলিক রচনা ও চিন্তাচর্চায় আত্মনিবেশ করেন। মাঝে মাঝে স্বল্পসময়ের জন্য সাংবাদিকতা, পত্রিকা প্রকাশ, প্রেস ব্যবসা বা এনজিও কার্যক্রমকে পেশা হিসেবে নিলেও, আজীবন লেখালেখিই ছিল তাঁর মূল কাজ। ছাত্রাবস্থায়ই লিখেছিলেন *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই একটি উপন্যাস *সূর্য তুমি সাথী*। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ-কর্ম, শিশু-কিশোর সাহিত্য ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের অধিক। তাঁর *পুষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ* উপন্যাসটি জাপানি ভাষায় ও *বস্তি উজাড়* কবিতাটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়া *ওঙ্কার*সহ বেশকিছু লেখা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। *ওঙ্কার* উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। তিনি বেশকিছু গানও লিখেছেন। গোটের *ফাউস্ট* কাব্যনাট্যের বঙ্গানুবাদ তাঁর এক অমর কীর্তি।

প্রতিষ্ঠানবিরোধী ও প্রতিবাদী বক্তব্যের জন্য আজীবন তিনি ছিলেন আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রে। পাশাপাশি নতুন প্রতিভা আবিষ্কার ও তার লালন এবং নবীনদের মধ্যে চিন্তা উসকে দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর জুড়ি ছিল না।

বাংলাদেশ লেখক শিবিরের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, যদিও এই সংগঠনের দেওয়া পুরস্কারও তিনি গ্রহণ করেননি।

সমাজের বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিল্পী সুলতান পাঠশালা প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

মৃত্যু : ২০০১ সালের ২৮ জুলাই, ঢাকায়।

প্রচ্ছদলিপি : কাইয়ুম চৌধুরী

My All Garbage

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com

www.myallgarbage.com www.enoteshare.com

My All Garbage

ISBN 984410292 A

9 789844 102927

www.enoteshare.com www.myallgarbage.com